ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য ও প্রচারক

মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সর্ব্বপ্রথম প্রচার)

প্রথম ভাগ

প্রথম হইতে নবম বক্তৃতা

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মহা[illegible]

কলিকাতা, কাঁকুড়গাছি শ্রীযোগোদ্যান হইতে

স্বামী যোগবিমল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩৪৫ সাল

১০৩ রামকৃষ্ণাব্দ

গুরু-পূর্ণিমা

মূল্য ১।০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মহাপীঠ,
"শ্রীযোগোদ্যান", কাঁকুড়গাছী,
নারিকেলডাঙ্গা পোঃ, কলিকাতা হইতে
স্বামী যোগবিমল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) ভারত-সাহিত্য ভবন,
২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২) শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৪) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এবং কলিকাতার অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

ভারতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪৬।১ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণভরসা

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় বক্তৃতা—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সমন্বয় ১০৩

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

প্রথম বক্তৃতা

—:*:—

রামকৃষ্ণ পরমহংস

অবতার কি না ?

১২৯৯ সাল, ১৯শে চৈত্র শুক্রবার, প্রাতঃ ৭ ঘটিকায়
ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

---

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না?

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

অদ্য আমি যে প্রস্তাব লইয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বর্ত্তমান কালের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তদ্বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে এরূপ কথা নূতন কিম্বা বিজাতীয় নহে। রামকৃষ্ণদেব পরমহংস কিম্বা তিনি অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ লইয়া যদিও প্রকাশ্যরূপে আন্দোলন করা হয় নাই, কিন্তু এক হিসাবে তাহাও হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সালে রামকৃষ্ণদেবের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিশিষ্টে আমি অবতার-বাদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন রামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকাশ্য মহোৎসবাদি এবং তাঁহার সেবকদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানে এই বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। এমন কি, স্থানে স্থানে তাঁহার মূর্ত্তির নিত্য-পূজা এবং নির্দ্দিষ্ট উৎসবাদি সম্পন্ন হইতেছে। এ কথা সাধারণের অবিদিত নাই। এই নিমিত্ত আমার অদ্যকার প্রস্তাব যে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, তাহা কখনই নহে।

যদিও স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণের পূজাদি ও তাঁহাকে ভগবান্ জ্ঞান করিয়া অনেকে দিন যাপন করিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বদাই এ বিষয়ে নানাবিধ তর্ক বিতর্কও হয়, অনেক সময়ে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ এবং প্রকৃত পরমহংস জ্ঞান করিয়া ভগবানে পর্য্যবসিত করেন। কখন কখন তাঁহাকে সামান্য জীবশ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া অনেকে অপরিমিত নিন্দা রটনা করিয়া থাকেন। সাধারণের এই সাধারণ সংস্কার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহার মীমাংসক কে? আমরা কেহই সে পদের যোগ্য নহি। জীবের দ্বারা তাহা কখনও সম্পাদিত হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেমন অন্ধকার রাত্রিতে পাহারাওয়ালা নিজ আলোকের দ্বারা ইচ্ছানুসারে সকল দিকের পদার্থ দেখিতে পায়, কিন্তু সেই আলোকটী আপনার প্রতি ঘুরাইয়া না ধরিলে, তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না।" অথবা, "কাহার, কি ঐশ্বর্য্য আছে, কাহার কতগুলি কোম্পানির কাগজ আছে, তিনি যাহাকে সিন্দুক খুলিয়া দেখাইয়া দেন, সেই ব্যক্তিই তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকে। কেবল বাহিরের অবস্থা দেখিয়া কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত, যেমন আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি, তাহা সম্পূর্ণ বাহিরের কথা মাত্র।" সেইরূপ ভগবান্ সম্বন্ধে জানিতে হইলে, তাঁহার নিজ মুখের কথা শ্রবণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত যাহা আমি বলিব, তাহা আমার কথা নহে, আমার শোনা কথাও নহে, তাহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা জানিবেন। তাঁহার কথা—কিন্তু কেবল তাহাই যে আমি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বাতুলতা করিতে আসিয়াছি, তাহাও নহে; তাঁহার কথা—হিন্দুশাস্ত্র, বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিচার এবং প্রত্যক্ষফলের দ্বারা তাহার যে সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই অদ্য বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। যদ্যপি

তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে ধারণা করিতে শিক্ষা করুক, তাহা হইলে আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। যদ্যপি তাহা না হয়, তবে বুঝিবেন যে, এখনও সময় হয় নাই। তাঁহাকে অবতার বলিয়া বুঝিতে পারুন বা নাই পারুন, এই উভয় স্থলেই আমার দোষ বা গুণের কোন কথা গণনায় স্থান দিবেন না। আমি যন্ত্রবিশেষ, কার্য্য করা তাঁহারই কার্য্য। তাঁহার উপদেশে আছে, "যেমন বাটীর ছাদের জল পড়িবার সময় কোথাও বাঘের মুখ এবং কোথাও নলের মধ্য দিয়া বাহির হয়, ব্যাঘ্রের মুখ বা নল জলের কারণ নহে।" সেইরূপ বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই বিষয়টী পূর্ব্বকথিত মতে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না, এই বিষয়ে প্রথম শাস্ত্রীয়, দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক এবং তৃতীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম। শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

গীতায় কথিত হইয়াছে যে:—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

অর্থাৎ—হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের নিন্দা এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনার স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকি। এবং

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ †

* গীতা, ৪ অঃ। ৭। † গীতা, ৪ অঃ। ৮।

অর্থাৎ—সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুর্বৃত্তদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

হিন্দুদিগের এই পরমরত্ন গীতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা কাহারও অন্যথা করিবার অধিকার নাই। অতএব শাস্ত্রান্তরকথিত দশাবতারাদি ব্যতীত অন্য অবতার হইতে যে পারে না, তাহা কখনও স্বীকার করা যায় না। যেহেতু গীতার উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, "ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় ও সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং অসাধুদিগকে দলন করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।" এই শ্লোকদ্বয়ে কারণ এবং কার্য্য উভয়ই বর্ত্তমান আছে। কারণ অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থা, কার্য্য—ভগবানের অবতরণ। এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এই শ্লোকদ্বয়ের কার্য্য কারণ ভাব, রামকৃষ্ণের প্রতি প্রয়োগ করিয়া বিচার করিলে কি ফল হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মের অবস্থা বিচার করিলে আমাদের ধর্ম্মের কি শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অজ্ঞাত বিষয় নহে। ধর্ম্ম পদার্থটা কি? ঈশ্বর কেমন? তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না? তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? তিনি সাকার নিরাকার কিম্বা কালী, দুর্গা, শিব, মনসা, মাকাল এবং এই জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া মনুষ্যদেহের কর্ত্তব্য সাধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কি না? ইত্যাকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, সাধারণ মানব-সমাজে ইহাদের মীমাংসা একেবারে দুষ্প্রাপ্য। একদা বর্দ্ধমান রাজ-দরবারে কতিপয় ব্রাহ্মণ, শিবকে বিষ্ণু অপেক্ষা এবং আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকে শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজ-সভায় পণ্ডিতেরা ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারায়,

মহারাজা লজ্জিত হইয়া কলিকাতা হইতে জনৈক পণ্ডিতপ্রবরকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক লইয়া যান এবং তাঁহার প্রতি হর হরির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধীয় বিচারের ভার অর্পণ করেন। সুবিবেচক পণ্ডিত মহাশয় এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন যে, "মহারাজ! আমার প্রতি এ গুরুতর ভার কিজন্য প্রদত্ত হইল? আমার সহিত শিবের কিম্বা বিষ্ণুর কোন পুরুষে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই; কাহাকে বড় ছোট বলিব? যদি কখন তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ফিরিয়া আসিয়া, শিব বড় কি বিষ্ণু বড়, এবিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিব।" তাঁহার কথায় সকলের ভ্রম বিদূরিত হইল এবং সকলে বুঝিলেন যে, শাস্ত্রীয় বিচার এবং ভাব, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। আমাদের দেশে এক শাস্ত্রের অপর শাস্ত্রের দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে কিন্তু ভাব লইয়া আন্দোলন করিতে যাইলে, সকল দিক শূন্যময় হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত আমাদের দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া এত গণ্ডগোল চলিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না এবং সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মকে অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। সুতরাং পরস্পর দ্বেষাদ্বেষীর ভাব সর্ব্বদা বলবতী দেখা যায়। এই নিমিত্ত আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া সময়ে সময়ে কত বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে এবং কত বাদানুবাদ চলিতেছে। বৈষ্ণব বলেন, "আমার ধর্ম্মাপেক্ষা সুমার্জ্জিত ধর্ম্ম আর নাই," শাক্ত তাহার ঠিক বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শৈবের সহিত কাহারও মিল নাই, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র প্রকার, তন্ত্রের বিচিত্র কাহিনী, গৌরাঙ্গীয় কর্ত্তাভজা, বাউল, দরবেশ, নবরসিক সম্প্রদায়ের ব্যাপার এবং আধুনিক ব্রহ্মসমাজের উপাসনা-তত্ত্বের তত্ত্ব বোধ করিতে যাইলে যে, কি বিভীষিকা সমুৎপন্ন হয়,

তাহা যিনি এক দণ্ড চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহারই নিকটে যাইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিই পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ভ্রমাবৃত দেখাইয়া, আপনার ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সত্য বলিয়া সাব্যস্থ করিয়া দেন। এইরূপে সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের গৌরব বিস্তার করিয়া, পরস্পরের ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিলে, সত্য অনুসন্ধানকারীর তরুণ মনে কি হইবে? তাহার হৃদয় শুষ্কপ্রায় ও মন আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। সে কোথায় যাইবে এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে, এই ভাবিয়া আকুলিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সত্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধু। এরূপ সাধুরা ভগবানের জন্য যখন নিতান্ত ব্যাকুলিত হন, ভগবান্ তখন তাঁহাদের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

আমাদের দেশের যে প্রকার ধর্ম্মের ভাব, তাহাতে তাহার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি কাহারও প্রকৃত ধর্ম্মবোধ হয়, তাহার ধর্ম্ম কি কেবল অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করায় পরিণত হইবে? ইহাকেই কি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কহে? তাহা কখনও নহে। অতএব ধর্ম্মের গ্লানি হওয়া বর্ত্তমান কালের অবস্থা বুঝা গেল।

হিন্দুসম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর ধর্ম্মেরও সংখ্যা নাই এবং সেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আবার অগণন শাখা ও উপশাখা বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মূল ও শাখা প্রশাখা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, লক্ষ লক্ষ লোক অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু কয়জনের মুখে "এক সত্য সকল ধর্ম্মের মেরুদণ্ড" এ কথা শ্রবণ করা যায়? কে বলেন যে, "যে যাহা করিতেছ, সকলই সত্য?" কে বলিতেছেন যে, "উপাস্য দেবতা প্রত্যেকেরই এক অদ্বিতীয় ভগবান্।" যখন ধর্ম্ম লইয়া

ছোট বড় বিচার চলিতেছে, তখন তাঁহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মের মর্ম্মবোধ হয় নাই, একথা সিদ্ধান্ত করা না যাইবে কেন? সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মরাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইলে, ধর্ম্ম স্থাপন করা ও সত্যানুসন্ধায়ীর মনোসাধ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যখন ভগবানের অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন হয়, তখন তিনি যে অবতাররূপে পৃথিবীবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা যায় না। আমাদের ধর্ম্মের অবস্থা বিচার করিলে, অবতারের আবশ্যক হইয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। যে যে অবস্থায় ভগবান্ নররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সেই সকল অবস্থা দেখিতে পাইলে অর্থাৎ কারণ উপস্থিত হইলে তাহার কার্য্য অর্থাৎ অবতারের অবশ্যই উদয় সম্ভব হইয়া থাকে।

আমাদের বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের যে প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সামঞ্জস্য করা অবতারের কার্য্য। যদ্যপি রামকৃষ্ণের দ্বারা সেরূপ কোন কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার না করিলে চলিবে না। ফলে, রামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অনেকেই শুনিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণদেব সাধন ভজন ছলে, ভারতবর্ষের যত প্রকার ধর্ম্মপন্থা আছে, তদ্‌সমুদয় গুরুকরণ পূর্ব্বক তিন দিবস সাধন করিয়া তাহাতে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। তিনি যে বাস্তবিক সর্ব্ব ধর্ম্মে সিদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই যে, যখন যে কেহ যে কোন ধর্ম্মের উপদেশ চাহিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। কে না জানিত যে, তিনি বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদিসঙ্গত পুরাকালীন ও আধুনিক সাধ্য সাধনা ব্যতীত মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিন দিন সাধন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে তিনি খৃষ্টভাবেও তিন দিন নিমগ্ন

থাকিয়া ইহারও সত্য বাহির করিয়াছিলেন? মোটের উপর পরমহংস, কৌল, অবধৌত, দরবেশ, সাঁই, বাউল, নবরসিক, পঞ্চনামী, কর্ত্তাভজা, শিখ, রামাৎ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দু এবং মুসলমান, খৃষ্টান ও বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভাব তাঁহাতে ছিল এবং এই সমুদয় ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাব কি, তাহাও তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের নিমিত্ত বলিতেন, "যেমন জল এক পদার্থ, পৃথিবীতে জল কখনও দুই হয় না। যে দেশে যাও, যে কোন জলাশয় হইতে জল গ্রহণ কর, ইহা কখনও দুই হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে জল, ইংলণ্ডেও সেই জল, আমেরিকায়ও সেই জল; কিন্তু নাম প্রভেদ। জলকে কেহ নীর বলেন, কেহ পানি বলেন, কেহ ওয়াটার এবং কেহ অ্যাকোয়া কহেন। জল, ওয়াটার, অ্যাকোয়া, এক শব্দ নহে, কিন্তু বস্তুগত কি কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয়? সেইরূপ এক ভগবানের একই ধর্ম্ম, কেবল নামের প্রভেদ মাত্র।" তিনি আরও বলিতেন, "সূর্য্য, পৃথিবীমণ্ডলে অদ্বিতীয়। কিন্তু দেশভেদে নামের প্রভেদ আছে; সূর্য্য এবং সান্ শব্দে প্রভেদ, কিন্তু বস্তুগত এক ব্যতীত দুই হয় না।" মনুষ্যেরা এক জাতীয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত, তাহা নরদেহ-তত্ত্ববিদ্মাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র প্রকার দেখায়। সেই প্রকার ধর্ম্মমত নানাবিধ, কিন্তু মূল সত্য সকলেরই এক। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব ধর্ম্মের ভাব মন্থন পূর্ব্বক এই সত্য বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিকালে রামকৃষ্ণের পূর্ব্বে কেহ কখন সাধন দ্বারা দেখান নাই যে, সকল ধর্ম্মের ভাব স্বতন্ত্র এবং মূলে এক সত্য দেদীপ্যমান আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই ভাবের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যথা:—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥*

অর্থাৎ, যে যেরূপে ভজনা করে, আমি সেইরূপে তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! যদিও পৃথিবীর লোকেরা নানাবিধ মতাবলম্বী, কিন্তু তাহারা সকলে আমারই উপাসনা করিতেছে। ভগবান্ দ্বাপরে যে কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা রামকৃষ্ণের দ্বারা সমাধা হইয়াছে কি না, তাহা সাধারণে বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া লউন। গীতার এই শ্লোকটীর ভাষান্তর করিয়া অনেকে গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের ন্যায় সাধন করিয়া ঠিক তাঁহার মত মীমাংসা কেহ কখনও করিয়াছেন কি না, তাহার কোন ইতিহাস নাই।

সিদ্ধ রামপ্রসাদ একটী গীতে বলিয়াছেন যে, "কালী হ'লি মা রাস-বিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে" ইত্যাদি। এ স্থানে রাসবিহারীর উৎপত্তির কারণ কালী অর্থাৎ কালী কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন। আর একটী গীতে—

"মন ক'রোনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবিরে কৈবল্যবাসী॥
রামরূপে ধর ধনু, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কালীরূপে ধর অসি। ইত্যাদি

নানা কথার পর "সবই আমার এলোকেশী" বলিয়া গীতটী সমাপ্ত করিয়াছেন। এই গীতটী বিশ্লিষ্ট করিলে দেখা যায় যে, রামপ্রসাদ এলোকেশীতে যাবতীয় ভাবের পর্য্যবসান করিয়াছেন।

---

* গীতা, ৪ অঃ। ১১।

কমলাকান্তের একটী গীতে আছে :—

"জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া,
ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতি,
কখন ধানুকী হয়।
যেরূপে যে জন, করেরে সাধন,
সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে
কমলে কামিনী হয় উদয়॥

এই গীতটী "যে যথা মাং" শ্লোকের অবিকল ভাষান্তর, তাহার সংশয় নাই। এস্থানেও রামপ্রসাদের ন্যায় শ্যামারূপে সকল রূপের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু গীতার যাহা প্রকৃতভাব, তাহা এই সংগীতে প্রকাশ পাইতেছে না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত, ব্রহ্ম হইতে সকল ভাবের উৎপত্তি হয়, এই ভাব রূপবিশেষ বলিয়া কথিত; ভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি গণনা করিলে মূলে অশুদ্ধ হয়। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে, "গঙ্গা হইতে ঢেউ হয়, ঢেউ হইতে গঙ্গা হইতে পারে না। যদিও গঙ্গা এবং ঢেউ এক, কিন্তু ভাবে প্রভেদ আছে। গঙ্গা না থাকিলে ঢেউ হয় না, সুতরাং গঙ্গা কারণ এবং ঢেউ কার্য্যবিশেষ। যদিও কার্য্য দেখিয়া কারণ

স্থির হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কার্য্য কারণ এক হইতে পারে না। কার্য্য আছে, পরে থাকিবে না, কিন্তু কারণ আছে, ছিল এবং থাকিবে। ত্রিকাল যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাকেই কারণ কহা যায়। গঙ্গা ছিল, আছে এবং থাকিবে; কিন্তু ঢেউ সেরূপ নহে। রূপাদি সম্বন্ধেও রামকৃষ্ণদেব অবিকল ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "শক্তি সকলের নিদান; রূপ, জ্যোতিঃ, ভাব, অবতারাদি যাহা কিছু হয়, সমুদয় শক্তি হইতে জন্মিয়া থাকে। এই শক্তি ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি। যদিও ব্রহ্ম শক্তি বা পুরুষ প্রকৃতি দুই বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা অভেদ, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যেমন অগ্নি বলিলে কি বুঝায়? উত্তাপ, লোহিত বর্ণ, দাহিকা শক্তি ইত্যাদি, অর্থাৎ কতকগুলি ধর্ম্মের সমষ্টিকে অগ্নি কহা যায়। সেই প্রকার বিবিধ শক্তির সমষ্টিকে ব্রহ্ম কহা যায়, তখন তাঁহাকে শক্তি সম্বন্ধে অভেদ বলিলে কোন দোষ হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি নাচিতে পারে, গাহিতে পারে, লিখিতে পারে, পড়িতে পারে ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য করিবার শক্তি ধারণ করিয়া থাকে। যখন সে কোন কার্য্য না করে, তখন তাহার কোন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। শক্তি সকল নিহিতাবস্থায় থাকে। এই অবস্থাটী ব্রহ্মের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যখন সে কোন কার্য্য করে, তখনই শক্তিবিশেষের প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ঐ প্রকার। তিনি যখন কার্য্য করেন, তখনই শক্তির বিকাশ কহা যায়। এই শক্তি হইতে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি সকল রূপ বা অবতারের সৃষ্টি হয়, অথবা সেই শক্তি কিম্বা শক্তিধরের রূপান্তরবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।" ব্রহ্ম বা শক্তি আদি কারণ, রূপাদি কার্য্যবিশেষ; এই নিমিত্ত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের

ভাবে প্রকৃত ভাব বিকাশ হয় নাই এবং তাহা হইবারও নহে। শক্তি এবং শক্তির রূপান্তর ভাবে এক হইলেও রূপে প্রভেদ কহিতে হইবে। যেমন তিনি বলিয়াছেন, "পুষ্করণীর চারিটী ঘাট আছে, এক্ষণে বিচার করা যাউক যে, ঘাটের পুষ্করণী কিম্বা পুষ্করণীর ঘাট। কার্য্য কারণ হিসাবে পুষ্করণীর ঘাট হইয়া থাকে, ঘাটের পুষ্করণী হয় না। যেহেতু পুষ্করণী আদি কারণ স্বরূপ; পুষ্করণী ছিল বলিয়া ঘাট হইয়াছে। অথবা অলঙ্কারবিশেষ যেমন এক স্বর্ণ হইতে প্রস্তুত হইয়া রূপে প্রভেদ হইয়া থাকে। কাণের এবং গলার অলঙ্কার সোনার হিসাবে এক, কিন্তু ভাবে প্রভেদ।" সেইরূপ এক শক্তি হইতে সকল রূপের উৎপত্তি হয় বটে, কারণ হিসাবে সকলেই এক; কিন্তু রূপের হিসাবে সকলেই প্রভেদ। সুতরাং কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম ইত্যাদি ভাব লইয়া বিচার করিলে কখন এক বলা যায় না এবং তাহা বলিলে ভাবে অশুদ্ধ হয়। কালী বলিলে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকি, কৃষ্ণ বলিলে কি তাহা হয়, না হইবার সম্ভাবনা? রামের সহিত দুর্গার কি কোন সাদৃশ্য আছে? তবে সব এক বলা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইবে? রাম-কৃষ্ণদেব এই জন্য বলিয়াছেন যে, "রূপ ধরিলে সকলের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কারণ ধরিলে তথায় আর রূপ থাকিবে না।"

এক হইতে বহু রূপের উৎপত্তি হয় কি না, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সমক্ষে অবিরত বিরাজ করিতেছে। মনুষ্য এক, কিন্তু রূপ বহু। রূঢ়পদার্থ যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহাদি এক, কিন্তু রূপে বহু। তরবারি এবং হিরাকসে লৌহ এক, কিন্তু রূপে সেরূপ দেখা যায় না। তাহা বলিয়া হিরাকসে কি লৌহ নাই? অথবা কারণে তাহার এবং তরবারির লৌহের কোন প্রভেদ হইতে পারে?

একটী পরিধি অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্য-বিন্দু হইতে পরিধির

সমুদয় বিন্দু পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিয়া বিচার করিলে, মধ্যবিন্দু এবং পরিধির বিন্দু সকল স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম মধ্যবিন্দুর ন্যায় এবং পরিধির বিন্দু সকল ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত রূপবিশেষ, অর্থাৎ মধ্যবিন্দু হইতে যেন রূপ সকল বাহির হইয়া গিয়াছে। এই রূপ সকল আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাবিশেষ। আমরা এই দেবতাদিগের উপাসনা করিয়া, যখন আদি কারণ মধ্যবিন্দু-রূপ ব্রহ্মে গমন করি, তখন আমরা তথা হইতে অন্যান্য রূপের উৎপত্তি স্থান এক বুঝিয়া থাকি। এই নিমিত্ত রামপ্রসাদ, এলোকেশীরূপ পরিধির বিন্দু হইতে ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে অন্যান্য রূপকে অনুমান দ্বারা এলোকেশীতেই পর্য্যবসিত করিয়াছেন, কারণ এলোকেশীর রূপ ব্যতীত অন্য রূপে তাঁহার অধিকার ছিল না। রামকৃষ্ণদেব সেই জন্য পরিধির সমুদয় বিন্দু-রূপ নানাবিধ ধর্ম্ম-পথে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের পার্থক্য এবং তাহাদের মধ্যবিন্দু-রূপ সত্য সর্ব্বত্রে এক বলিয়া, গীতার শ্লোকের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। এখন বলা যায় যে, যে যেরূপ ভাবে, যেরূপ কার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার তাহাতে কখনও ভুল হয় না। ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য ধর্ম্মসাধনাই করুক বা অজ্ঞানীর ন্যায় যাহাকে অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া আমরা অহঙ্কারের পরিচয় দিয়া থাকি, তাহাই করুক, পরিণাম বা উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কখন ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। যেমন চক্ষুবিশিষ্ট এবং অন্ধের নিকট তিক্ত, কটু বা মিষ্ট পদার্থ আহারকালে আস্বাদনের তারতম্য হয় না; কেহ ইচ্ছা করিয়া জলে নামিলে তাহার শরীর যেমন ভিজিয়া যায়, একজনকে জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেও তাহারও তেমনি গাত্রাদি ভিজিয়া থাকে; যেমন একটী ঘরে একজন বসিয়া আছে, তথায় তাহার নাম জানিয়াই হউক কিম্বা না জানিয়াই হউক, যদ্যপি কেহ গমন করে,

তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকেই তাহার দর্শন হইবে; ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। এই ভাব সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ মীমাংসা রামকৃষ্ণের দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা তাঁহাকে অবতার বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা সকলে যখন এই ভাব শিক্ষা করিয়া প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিব, যখন বুঝিব যে, এক আকাশ আমাদের সকলের মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে, যখন বুঝিব যে, এক জল, এক বায়ু আমাদের সকলের সম্ভোগের জিনিস, যখন বুঝিব, যেমন এক ব্যক্তি কাহার পুত্র, কাহার স্বামী, কাহার পিতা, কাহার জ্যেষ্ঠতাত, কাহার মাতুল, কাহার শিক্ষক, কাহার বন্ধু ইত্যাদি বিবিধ ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, তখন দেখিব, সকলের সকল ভাবের একজন ভগবান্ না হইবে কেন? সীমাবিশিষ্ট মনুষ্য যখন একাকী এত ভাবের কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তখন অসীম ভগবানে তাহা বিচিত্র বা অসম্ভব হইবে কিরূপে? যখন এই ভাব প্রচার হইবে, কাহারও তখন ধর্ম্মের জন্য ভাবিতে হইবে না, কেবল শাস্ত্রের স্থূল আভাস লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে না, কোন্ ধর্ম্মটী ভাল, কোন্ ধর্ম্মটী সত্য, এরূপ তর্ক করিতে হইবে না; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মুখ তখন আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং দ্বেষাদ্বেষী ভাব, ধর্ম্মের অসামঞ্জস্য ভাব বিদূরিত হইতে আর কত বিলম্ব হইবে? অমানিশির অন্ধকার কি অরুণোদয়ে নষ্ট হয় না? হাজার বৎসরের অন্ধকার কি আলোক প্রকাশ হইবামাত্র তিরোহিত হয় না? সেইরূপ রামকৃষ্ণকথিত নবভাব যখনই যাহার অজ্ঞানরূপ অন্ধকারময় হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তথায় জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত হইয়া সকলদিকের প্রকৃত বোধ ধারণায় আসিবে। তখনই দুষ্কৃতেরা প্রদমিত হইয়া আসিবে। দুষ্কৃত—অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মের তাৎপর্য্য স্বেচ্ছামত

ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে লোককে বিপদে নিপতিত করে। ইহাদের অপেক্ষা অধার্ম্মিক আর কাহাকে বলা যাইবে? একটী সরল মাতাল এবং একজন ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যাকারীকে তুলনা করিলে অধার্ম্মিক কাহাকে কহা যাইবে? যে ধর্ম্মের সত্য অপলাপ করে, যে ধর্ম্মের মর্ম্ম উল্‌টাইয়া দেয়, তাহার দ্বারা যে কত লোকের ধর্ম্মপথে প্রতিবন্ধক পতিত হয়, তাহা চিন্তা করিয়া উঠা যায় না। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থা অবগত না হইয়া যথেচ্ছা গ্লানি বিস্তার করে, অথবা যে হিন্দুরা মহম্মদীয় কিম্বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ বা দোষারোপ করে, তাহারা ত বাস্তবিক দুষ্কৃত। চোরের দ্বারা ধর্ম্মবিপ্লব হয় না কিন্তু মিথ্যা বিদ্যাভিমানীরাই এই কার্য্যের গুরুমহাশয়। চোর কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়া একজনের বা পাঁচজনের প্রাণে সাময়িক আঘাত দিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম ভাব বিকৃত করে, তাহারা সহস্র সহস্র লোকের ইহ এবং পরকালের অশান্তির প্রশস্ত পথ খুলিয়া দিয়া থাকে। এই অশান্তিনিবারকরূপে যিনি আবির্ভূত হন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া পরিগণিত করা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। রামকৃষ্ণদেব তাহা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি অবতার।

আমরা যদ্যপি আমাদের অবতারদিগের কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে রামকৃষ্ণকে তাঁহাদের শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিতে বাধ্য হইব। প্রয়োজন অর্থাৎ দেশ কাল এবং পাত্র হিসাবে অবতারগণ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা সর্ব্বত্র অশান্তি বিদূরিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হয় এবং এক প্রকার নূতন ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। অবতারাদি নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য দ্বারা জীবের চিত্ত বিমোহিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট সাধন ভজন থাকে না, কথায় কথায় জীবগণকে কৃপা করিয়া তাঁহারা বিমল

চরণছায়া প্রদান করিয়া থাকেন। পাপী, তাপী, অনাথ, নিরাশ্রয়, পতিতদিগকে অতিশয় ভালবাসেন এবং তাঁহাদের জন্য যেন সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। রামকৃষ্ণ সেইরূপ কার্য্য করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের যে সামঞ্জস্য ভাব প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যখন সর্ব্বসাধারণে কার্য্যকরী হইবে, তখন বাস্তবিকই এই দুঃখময়-সংসারে শান্তি লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নাই।

যে নবধর্ম্মভাব রামকৃষ্ণদেবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এক্ষণে আমাদের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যদিও আমাদের অগণন উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে এবং তাহা যাঁহারা সাধন করিবেন, তাঁহাদের তাহাতেই আশা ফলবতী হইবে বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে পাত্র বিচার করিয়া দেখিলে, পুরাকালের সাধনপ্রণালী তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিবেক বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কয়জন ব্যক্তি কুম্ভকাদি যোগ করিতে সমর্থ? কয়জন ব্যক্তি কঠোর তপশ্চারণাদির নিয়ম রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন? পৌরাণিক যাগ যজ্ঞ না করাই শ্রেয়ঃ; করিতে যাইলে বিশেষ শুভ ফল প্রাপ্ত না হইয়া, অনেক সময়ে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। এইরূপ পাত্রদোষের নিমিত্ত আমাদের দেশে কলিকালে—"হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—এই বত্রিশ অক্ষরীয় মন্ত্র জপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এমনি কালের প্রবল গতি যে, তাহাতেও বিভীষিকা সমুত্থিত হইয়াছে। সাধন পথের কণ্টক কামিনী-কাঞ্চন, একথাটী রামকৃষ্ণদেব বার বার বলিয়াছেন, তাহার হেতুও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কামিনী-কাঞ্চন সঙ্গে রাখিয়া যদ্যপি কেহ ধর্ম্মসাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে পদস্খলিত হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা

এবং তজ্জন্যই ধর্ম্মপ্রণালীবিশেষের যে দুর্নাম শ্রবণ করা যায়, তাহা ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা হেতু নহে, কেবল অনধিকারী পাত্রদোষই তাহার একমাত্র কারণ। কামিনী সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সংস্কার, তাহা আমরা আপনাপনি বিলক্ষণ জানি, সুতরাং স্ত্রীলোকের সংশ্রবে চিত্তের যেরূপ স্থৈর্য্যভাব লাভ হয়, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মসাধনে করিতে যাইয়া, অনেকের বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে।

দুরন্ত লোকেরা নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের ভাব যেরূপ বিকৃত করিয়া থাকে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। কোন সন্ন্যাসী কৌশল করিয়া কোন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করে। পরে এই কথা শ্রবণ করিয়া যখন সকলে সেই সন্ন্যাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, বেদান্ত মতে সবই মায়া, আর আমার এই কার্য্যটীই কি সত্য? দেখুন—কি আশ্চর্য্য রহস্য! আর এক সময়ে, কোন ধর্ম্মোপদেষ্টার এক তরুণবয়স্কা শিষ্যার প্রতি কুভাব উপস্থিত হয়, কিন্তু নিজ মুখে তাহা প্রকাশ করিতে অশক্ত হওয়ায় তিনি তাঁহার কোন বৃদ্ধা শিষ্যাকে অতি বিনীতভাবে আত্ম-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন। বৃদ্ধা, গুরুর আদেশ অনুসারে ঐ যুবতীকে কহিতে লাগিল, "দেখ্, তুইত মালা লইয়া জপ করিতে শিখিয়াছিস্, কিন্তু মন্ত্রের মানে বুঝিয়াছিস্ কি?" সে বলিল, "ভগবানের নাম করিয়া থাকি, তাহা বুঝিব না কেন?" বৃদ্ধা কহিল, "তবেই হইয়াছে! আমরাও এক সময়ে ঐরূপ বুঝিয়াছিলাম। আহা! না শিখাইলে কি শিক্ষা করা যায়? দেখ্, 'হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে' মানে শোন্, দেখিস্ কাহাকেও বলিস্ নি। আমাদের প্রভুকে রাম্ ও কৃষ্ণ মনে ক'রে বল্‌বি, হ'রে রাম,

হ'রে রাম, রাম রাম হ'রে হ'রে, হ'রে কৃষ্ণ, হ'রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হ'রে হ'রে। তুই নিজে শ্রীমতী রাসরসেশ্বরী রাধা কিম্বা জানকী এবং ওঁকে রাধিকাবল্লভ কৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্র বলিয়া জ্ঞান ক'র্‌বি। এ ভাব যতদিন না হয়, ততদিন ভাবের ঘরে প্রবেশাধিকার জন্মিবে না।" এইরূপ বিবিধ বিভীষিকার নিমিত্ত সাধন পথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ কলির জীবতরাণ তারকব্রহ্ম রামকৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়া রামকৃষ্ণ রূপে উদয় হইয়াছিলেন। এই নবাবতারের নব লক্ষণ অতিশয় আনন্দপ্রদ। রামকৃষ্ণের নিকটে প্রথম গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার কি গুরুকরণ হইয়াছে?" যিনি তাহা হইয়াছে বলিতেন, তাঁহাকে তাহাতেই ভক্তি সহকারে সংলগ্ন থাকিতে কহিতেন। যাহার গুরুকরণ হয় নাই শুনিতেন, তাহাকে হরি, কালী, যাহা হয় একটী নাম জপ করিতে বলিতেন, কিন্তু প্রকারান্তরে তাহাকে বকল্‌মা বা আম্‌মোক্তারনামা দিতে কহিতেন। এইটী তাঁহার নবভাব। বকল্‌মায় কেবল তাঁহাকে দর্শন, পদসেবন এবং প্রসাদ ভক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য থাকিত না। যাঁহারা তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিতেন, তাঁহারাই সাধন ভজন লইয়াছেন। তিনি অনেক সময়ে বিষাদিত হইয়া বলিয়াছেন যে, "গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হ'ল; একের দয়া না হ'তে জীব ছারেখারে গেল।" অর্থাৎ, মন বিরোধী হইলে কোন কার্য্য ফলবতী হয় না।

শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

গীতা, ১৮ অঃ। ৬৬।

হে অর্জ্জুন ! তুমি সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না। শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবের সহিত রামকৃষ্ণের বকল্‌মাভাবের বিশেষ পার্থক্য আছে। বকল্‌মা বলিলে প্রতিনিধির স্বরূপ বুঝায়। এই নিমিত্ত তিনি "আম্‌মোক্তার" শব্দটীও ব্যবহার করিতেন। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে স্বয়ং অসমর্থ হয়, তাহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করার নাম আম্‌মোক্তার। শরণাপন্ন এবং বকল্‌মা এই দুইটী শব্দের দ্বারা ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশ কাল পাত্রভেদে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যে সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে শরণাপন্ন হইবার কথা বলিয়াছিলেন, সে এক সময় ; আর রামকৃষ্ণদেব বকল্‌মার কথা বলিয়াছেন, সে আর এক সময়। এ সময়ে সকলেই জ্ঞানগর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং স্ব স্ব প্রধান। ভগবান্ যেন সকলের আয়ত্তাধীন হইয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে কিরূপ কার্য্য করিতে হয়, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামীই অবগত হইবার একমাত্র পাত্র ; সুতরাং ভগবান্ নিরহঙ্কারের অবতার রামকৃষ্ণের বকল্‌মার ভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার এই ভাবটী নূতন, সুতরাং রামকৃষ্ণ অবতার।

কথিত হইয়াছে যে, অবতারেরা অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন। সর্ব্বদেশে অবতারদিগের এই একটী বিশেষ লক্ষণ শ্রবণ করা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান কালে অলৌকিক কার্য্য ভগবান্ আসিয়া আর কি দেখাইবেন ? মনুষ্যদিগের দ্বারা যে সকল অমানুষ কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহারই ইয়ত্তা করিতে আমরা পরাজিত হইয়া পড়ি। ভগবানের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়, তাঁহার জড় জগতেই দেদীপ্যমান

রহিয়াছে। এখানকার লোকেরা গিরি উত্তোলনকরণ দেখিতে চাহেন না, সমুদ্র বন্ধন করা দেখিতে চাহেন না, যাহা চাহেন, তাহারই ব্যবস্থা করিতে রামকৃষ্ণের আগমন হইয়াছিল। লোকে এক্ষণে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সত্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তন্নিমিত্ত এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সমুদায় ধর্ম্মের সত্য বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যাহার বাস্তবিক সত্য অনুসন্ধান করিবার বাসনা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহারই মস্তক রামকৃষ্ণের চরণে আপনি নিপতিত হইয়া যাইবে। এই স্থানে তাঁহার অলৌকিক ভাবের কার্য্য হইতেছে। যদ্যপি কাহারও দেখিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখিয়া লউন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান কালে, বিলাতী জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিদ্যায় সুপণ্ডিত যাঁহারা, তাঁহারাই রামকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া আপনাদের স্ব-ইচ্ছায় তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতেছেন! তাঁহার চরণাশ্রিত সেবকদিগের প্রতি চাহিয়া দেখুন, তাহারা কেহ অজ্ঞানী নহে, অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, অনেকেই শ্রীসম্পন্ন। পেটের জ্বালায় কিম্বা প্রলোভনে পতিত হইয়া কেহ রামকৃষ্ণ নাম অবলম্বন করে নাই। সামান্য অর্থের লালসায় যে মনুষ্যেরা কি না করিতেছেন, কি না করিতে পারেন, সেই অর্থের লাভ, তাহারা পদদলিত করিতে পারিয়াছে। এ সকল কি রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় নহে? কৃষ্ণাবতারে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভাব লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে সকলেই বশীভূত হইতে বাধ্য হইয়াছিল; রামাবতারে শক্তির পরিচয় দিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন; বৌদ্ধাবতারে পাণ্ডিত্যপ্রভাবে সকলের উপর অধিকার স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন; গৌরাঙ্গাবতারে রূপ, বিদ্যা এবং

প্রেমের দ্বারা সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু রামকৃষ্ণাবতারে রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, বাহ্যিক সমুদায় ভাব লুক্কায়িত রাখিয়া, দীনহীনের আকারে অবস্থিতি করিয়া, কেশববাবু প্রভৃতি কত শত ব্যক্তিকে নবভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। যে শক্তি দ্বারা তিনি লোককে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিতেন, তাহা লোকে জানে না, সুতরাং অলৌকিক। যখন অলৌকিক কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে অবশ্যই অবতার কহিতে হইবে। যাঁহাকে তিনি কৃপা করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে অবগত আছেন। তাহার পরিচয় প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত আছে। তথাপি দুই একটী দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে দেওয়া প্রয়োজন।

একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার সময় আমি শ্যামবাজারের পুলের নিকটস্থিত ময়রার দোকান হইতে কয়েক পয়সার জিলিপি ক্রয় করিয়াছিলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময়, একটী অনুমান ছয় সাত বৎসরের মুসলমানের ছেলে, একখানি জিলিপির জন্য আমার কাছে বার বার যাচ্ঞা করিতে লাগিল, আমি কিছুতেই তাহাকে দিলাম না। সে বালকটী গাড়ীর পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল। তখন আমার মনে হইল, হয়ত ভগবান্ ছলনা করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। আমারও স্মরণ হইল যে, একদা কোন সাধু রুটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত আনিতে গিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, একটী কুকুর রুটীগুলি মুখে করিয়া লইয়া পলাইতেছে। সাধু তাহার পশ্চাৎ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "রাম অপেক্ষা কর, রুটী-গুলিতে ঘি মাখাইয়া দিই।" আমি তখন ইতস্ততঃ ভাবিয়া একখানি জিলিপি তাহাকে ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু একথা কাহাকে বলিলাম না। অপরাহ্নকালে রামকৃষ্ণদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি

কি আনিয়াছ?" আমি অতিশয় শশঙ্কিতভাবে জিলিপিগুলি তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলাম। তিনি বাম হস্তে জিলিপি চূর্ণ করতঃ হস্ত ধৌত করিয়া ফেলিলেন। সে জিলিপি ভক্ষণও করিলেন না এবং তখন আমাকেও কিছু বলিলেন না। পরে একদিন আমার কোন বন্ধুকে গোপনভাবে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "উহাদের সাবধান করিয়া দিও, দ্রব্যের অগ্রভাগ বাহির হইয়া যাইলে, তাহা কোন মতেই ঠাকুরের সেবায় ব্যবহার হয় না।" আর একদিন তাঁহার কোন ভক্তের পালিতা কন্যার কয়েক বার ভেদ বমি হয়, সেই ব্যক্তি ইহাতে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া রামকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপ সর্ব্বদাই নানা প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইত। সেই জন্য তাঁহাকে অবতার কহা যায়।

নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালীমতে এবং সাধু মহাত্মাদিগের নিকট ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, ইত্যাকার দুইটী তালিকা থাকে। তথায় অসদাচারিদিগের কোন উপায় হয় না। মাতাল, লম্পট, নাস্তিক প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের জন্য কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ সাধু হস্ত প্রসারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন? এরূপ পতিত যাহারা, তাহারাই অবতারের দ্বারা পরিত্রাণ পায়। তাহাদের পরিত্রাণ করিতে আর কাহারও শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না। রামকৃষ্ণের দ্বারা সে প্রকার সংখ্যাতীত ব্যক্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে। পতিত আশ্রয়বিহীন অনাথদিগের যিনি পরিত্রাতা, তিনি ত পতিতপাবন অনাথনাথ ভগবান্। রামকৃষ্ণদেব সে প্রকার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি অবতার। অতএব সে সকল লক্ষণ থাকিলে অবতার বলিয়া অবগত হওয়া যায়, রামকৃষ্ণে তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান ছিল। অবতারেরা যে কয়েকটী লক্ষণ

দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন, সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইতেছে। প্রথম—জীবে দয়া, দ্বিতীয়—পতিতদিগের উদ্ধারকর্ত্তা, তৃতীয়—সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, চতুর্থ—ধর্ম্মের সামঞ্জস্যভাব, পঞ্চম—পরম বৈরাগী, ষষ্ঠ—জৈব-ধর্ম্মবর্জ্জিত, সপ্তম—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, অষ্টম—আদিষ্ট ধর্ম্মের নূতন ভাব, নবম—সেবকদিগের কর্ম্মনাশ। রামকৃষ্ণে এসকল ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অবতার ব্যতীত অন্য শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না।

রামকৃষ্ণকে অবতার বলিবার আরও অন্য হেতু আছে। আমরা যদ্যপি ধর্ম্মজগৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে ইহার দুইটী শাখা জ্ঞান ও ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই ভাব দুইটী অবতারদিগের দ্বারা নানাদেশে দেশ কাল পাত্র বিচার দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। রাম অবতারে সংসারের অসারতা পূর্ণ পরিমাণে অভিনয় করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব নামের মহিমাও বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। রাম নামে সমুদ্রে পাথর ভাসিয়াছিল, অর্থাৎ এই সংসার জলধিতলে আমাদের মনরূপ প্রস্তর নিয়ত ডুবিয়া থাকে, যে কেহ মুখে রাম নাম উচ্চারণ করে, তাহার সেই পাষাণ মন ভাসিয়া উঠে, সংসার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। কৃষ্ণ অবতারে সংসারের সহিত বিবেক বৈরাগ্য সংযোগ করিয়া প্রেমানন্দের রঙ্গভূমি গঠিত করিয়াছিলেন। সংসারের ভিতর হইতে ভাব শিক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি আপনি শিক্ষা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সংসারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চরসের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া আপনি তাহা সম্ভোগ করেন এবং তৎসমুদয় কিরূপে ভগবানে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের ভাবে অতি সুমধুর প্রেম-কাহিনী বিস্তারিত রূপে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে একাঙ্গ হইয়া

গৌরাঙ্গ অবতারের সৃষ্টি হইল। এই অবতারে নাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সাধন ও তাহার পরিণাম সম্যকরূপে বিস্তার করিয়া যান। ভাব, প্রেম, মহাভাব ইত্যাদি ভক্তির বিবিধ অবস্থা কাহাকে বলে এবং তাহা কিরূপ প্রকার, এই অবতারে প্রকাশিত হয়। গৌরাঙ্গ অবতার কালে জীবের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় না থাকায়, সহজ নাম সাধনের পন্থা প্রদর্শন করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অভিনয় হেতু, অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ এই তিনের স্বতন্ত্র রূপেও সৃষ্টি হইয়াছিল। অদ্বৈত রূপে জীবের একমেবাদ্বিতীয়ম্ জ্ঞান লাভ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই দেখাইয়াছেন। অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিলে তবে সর্ব্বত্রে চৈতন্যস্ফূর্ত্তি হইবার কথা। চৈতন্যময় সংসার বোধ হইলে তবে তাহার নিত্য আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই তিনটী ভাব তিনভাবে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখাইয়া রামকৃষ্ণরূপে একাধারে তাহা পরিণত করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ কেবল রাম এবং কৃষ্ণের যৌগিক নহেন, তাঁহাতে অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ, এই তিনের ভাবও বর্ত্তমান আছে। সকল ধর্ম্মের মূল এক সত্য বাহির করায়—অদ্বৈত, মূল হইতে সংশ্লেষণ প্রণালীমতে প্রত্যাগমন করায়—চৈতন্য, (কারণ, সত্যের বিকাশ যাহা, তাহাও সত্য) এবং সর্ব্বত্রে চৈতন্য বোধ হইলে আনন্দের হ্রাস হয় না, সুতরাং নিত্যানন্দের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল কারণেই আমরা রামকৃষ্ণকে অবতার বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

দ্বিতীয়। রামকৃষ্ণ অবতারে বৈজ্ঞানিক মীমাংসা।

যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য শিক্ষা করে, সেই ব্যক্তি তাহাই বলিয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যে সূতার কার্য্য করে, কোন্ সূতার কত নম্বর, সেই বলিতে পারে। অথবা যে মূলা খায়, তাহার মূলারই

টেকুর উঠে। আমাদের আজকাল যেরূপ শিক্ষা হইতেছে, তাহাতে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলে তাঁহার মাথা কিনিয়া রাখা হয়, সকলের যেন এইরূপই ধারণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ঈশ্বর বিশ্বাস বা ঐশ্বরিক বিষয় অনুশীলন করা এখনকার সাধারণ সংস্কার। পরের মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করা এবং তাহা লইয়া আন্দোলন ও মতামত প্রকাশ করা, কালধর্ম্মের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে।

ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, ভগবানের স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র হইতে যুক্তি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেরূপ শাস্ত্র কোথায়?

এই বিশ্ব-সংসার ভগবানের স্বরচিত গ্রন্থবিশেষ। যে কোন বিষয়ের মীমাংসা, যথা—কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি শারীরিক, কি আধ্যাত্মিক, যে কোন বিষয় প্রয়োজন হউক, তাহা চূড়ান্তরূপে লিখিত রহিয়াছে, পাঠ করিয়া লইলেই হয়। জগতে সকল পদার্থ এক অদ্বিতীয়রূপে অবস্থিত করে, এক পদার্থের দ্বৈত ভাব হয় না। এক পদার্থই সর্ব্বত্রে সর্ব্বস্থানে এক। যথা সূর্য্য, জল, বায়ু, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। যদ্যপি কাহারও এই এক জ্ঞান বিশিষ্টরূপে ধারণা হয় তাহা হইলে ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়ম্ বিষয়ে কোনও কালে তাহার ভ্রম জন্মিবে না। এইরূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা আমরা যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা প্রাপ্ত হইতে পারি। এবিষয়ে আমি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পদার্থ বিজ্ঞানের বক্তৃতায় দেখাইয়া থাকি। যাঁহারা বিজ্ঞান-মন্দিরে গমনাগমন করেন, তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন।

এক্ষণে অবতারবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কি সাহায্য পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এই জগতের সমুদয় পদার্থকে ভগবান্ এক সময়েই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, অথবা সময়মতে জন্মিয়া থাকে, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত

করা অতি দুরূহ। এই পদার্থদিগের বৃত্তান্ত যে পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিয়া না দেন, সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার জ্ঞানলাভ হয় না। বায়ুতে অক্‌সিজেন এবং নাইট্রোজেন আছে, তাহা প্রিষ্টলী এবং রুথাফোর্ড সাহেবের পূর্ব্বে কেহ জানিতেন কি না, তাহার কোন বর্ণনা নাই। এইরূপে যাঁহারা নূতন নূতন পদার্থ মনুষ্যসমাজে প্রকটিত করেন, তাঁহাদিগকে আবিষ্কারক শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। যাঁহারা তৎসমুদয় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষার্থী ও পণ্ডিত কহা যায়। জড় জগতে যেরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে, চৈতন্য জগতেও অবিকল সেইরূপে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

চৈতন্য জগতের নূতন ভাব প্রকাশককে অবতার এবং সেই ভাবের পণ্ডিত অর্থাৎ যাঁহারা সাধন দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধপুরুষ কহা যায়। অবতারেরা ধর্ম্মের নূতন ভাব প্রদর্শন করেন, সিদ্ধপুরুষেরা প্রদর্শিত ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব কর্ত্তৃক নূতন ভাব প্রকটিত হইয়াছে। নূতন ভাব এই যে, তাঁহাকে বকল্‌মা দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে জীবনের দিন ক'টা যেরূপে হউক কাটাইয়া যাও। সঙ্কল্প করা হউক বা না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু তিনি আর একটী কথা বলিয়াছেন, ভাবের ঘরে চুরি থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইবে, অর্থাৎ যদ্যপি কেহ রামকৃষ্ণকে বকল্‌মা দিয়া, নিজে আবার জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার বকল্‌মার ভাব কাটিয়া যায়। ইহাও নূতন কথা—এই নূতন ধর্ম্ম এবং অন্যান্য পূর্ব্বকথিত নানাবিধ ভাব, রামকৃষ্ণদেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং তিনি অবতার, সিদ্ধপুরুষ নহেন।

ভগবান্‌কে মানুষের আকারে দর্শন করিলে, কোন দোষ হয় কি না, তাহা বিচার করা এই বিভাগের অন্তর্গত।

অনেকের আপত্তি এই যে, ভগবান্ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং অনন্ত, তিনি কি জন্য সীমাবিশিষ্ট জড়দেহ ধারণ করিবেন, পার্থিব দেহ নশ্বর, এই আছে, পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। কিন্তু ভগবান্ ত্রিকাল সমভাবে অবস্থিতি করেন, অতএব ভগবানের কখনও মনুষ্যাকার হইতে পারে না। মনুষ্য সৃষ্টির অন্তর্গত, ভগবান্ তাহার বহির্ভূত। সৃজিত এবং সৃষ্টিকর্ত্তা এক হইবে কিরূপে?

এইরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে কত দিনে যে তাহার নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। অতএব সংক্ষেপে এবং আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহাই বর্ণনা করিব। জড় পদার্থ বলিয়া যাহা আমরা উল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা সম্পূর্ণ স্থূল কথা মাত্র। স্থূলে যে পদার্থকে যেরূপ দেখায়, তাহার মহাকারণ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ প্রণালীমতে বিচার করিয়া দেখিলে, আমাদের স্থূল মীমাংসাকে অতিশয় স্থূল বলিয়াই জ্ঞাত হওয়া যায়। পদার্থবিশেষের স্থূলের এবং মহাকারণের অবস্থা কখনও এক নহে। যেমন জল স্থূল, ইহার সূক্ষ্মাবস্থা অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন, কারণে শক্তি এবং মহাকারণের আর কোন কথাই চলে না। জলের সে অবস্থা উপলব্ধিরও অতীত। পদার্থ লইয়া এই প্রকার বিচার সম্পূর্ণ আনুমানিক।

পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থূল পদার্থদিগের সূক্ষ্মাবস্থার পর অন্য কোনও অবস্থা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অনুমানে, পদার্থদিগের অবিনশ্বরতা ধর্ম্মের অনুরোধে, তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদার্থদিগের বাষ্পীয়াবস্থার পর শক্তির ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। শক্তির উৎপাদক আকাশ বা ব্যোম, ইংরাজীতে তাহাকে ইথার কহে। আমাদের এদেশীয়

বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থদিগের পঞ্চাবস্থা বলিয়া গিয়াছেন। যথা, ক্ষিতি—কঠিন, অপ—তরল, মরুৎ—বাষ্প, তেজ—শক্তি এবং ব্যোম—ইথার।

স্বীকার করা গেল যে, পদার্থেরা ইথার পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, অর্থাৎ স্থূল হইতে ইথার পর্য্যন্ত পদার্থের অধিকার। ইথারের পর আর আমাদের কোন কথা চলিতে পারে না। কথিত হইয়াছে, ইথার পর্য্যন্ত গমন করাও সম্পূর্ণ আনুমানিক কার্য্য এবং ইহার পর মানব মন ও বুদ্ধি পরাজয় লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ ইথারের পর, কি ইহার প্রথমে, অথবা সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে আছেন, তাহা কে নির্ণয় করিয়া বলিতে সাহস করিতে পারেন? ভগবানের সৃজিত বস্তু, যাহা স্থূলরূপে আমরা সম্ভোগ করিতেছি, যখন তাহার আদি প্রকৃত তাৎপর্য্যই বাহির করিতে আমরা অসমর্থ হইয়া থাকি, তখন তাঁহার স্বরূপ লইয়া বিচার করিতে যাওয়া বাতুলতার কার্য্য।

জড় পদার্থ লইয়া বিজ্ঞানের কার্য্য। মনোবিজ্ঞান, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদি সমুদয় বিজ্ঞান, জড় পদার্থের অন্তর্গত। যখন মূলেই অস্থির, তখন তাহাদের অবস্থাবিশেষের বিজ্ঞান সেই সেই অবস্থার অতিক্রম করিয়া যাইলে, তাহা অনধিকার চর্চ্চা কহা যাইবে। সে যাহা হউক, এই উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গরীমায় স্ফীত হইয়া ভগবানের স্বরূপ লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করিয়া থাকি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অদ্যাপি একটী সামান্য ঘাসের প্রকৃত অবস্থাও কেহ কি স্থির করিতে পারিয়াছেন? যদ্যপি সমুদয় বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোড়িত করিয়া তাৎপর্য্য বাহির করা যায়, তাহা হইলে আমরা বাস্তবিক সেই ব্রহ্মাণ্ড-পতির কাণ্ডকারখানার আশ্চর্য্য কৌশলের এক বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিব না। একথা বলিবার হেতু এই যে, একটী পদার্থ বিচার করিতে হইলে, প্রথমে, তাহার সহিত অন্য কাহারও সম্বন্ধ আছে কি না

এবং সেই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কে নির্ণয় করিতে সক্ষম? যেমন এই পৃথিবীবক্ষে আমরা নানাবিধ পদার্থ দেখিতেছি, এই সকল পদার্থদিগের আকার ও লক্ষণাদি স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু যদ্যপি পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার (যাহার আংশিক বৃত্তান্ত আমরা হয় ত বলিতেছি) বিপর্য্যয় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পদার্থদিগের গঠনাদি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। উত্তাপ এবং বায়ুর সঞ্চালন দ্বারা পদার্থদিগের আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা অনেকের জ্ঞাত বিষয়। ইহার সহিত পৃথিবীর আকর্ষণী ও তড়িত প্রভৃতি কত কথার উল্লেখ আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নক্ষত্রদিগেরও সম্বন্ধে আছে। এতগুলি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয় না। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির কার্য্যের প্রতি মনুষ্যের হস্ত বিস্তার করা সেইজন্য বিজ্ঞানের অভিপ্রায় নহে। একজন বাটীর কর্ত্তা কি করেন বা করিতে পারেন, পরিজনেরা তাহারই নির্ণয় করিতে পারে না; আর সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কার্য্যে অভিপ্রায় প্রকাশ করা বালকের কার্য্য ব্যতীত আর কি বলা কর্ত্তব্য?

বিজ্ঞান বা শাস্ত্র কি? যাহা দশবার হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ হওয়াই শাস্ত্র। দুই আয়তন হাইড্রোজেন, এক আয়তন অক্সিজেনের সহিত সম্মিলিত হইলে জল হয়। পরীক্ষা করিয়া পাঁচ বার বা পাঁচ হাজার বার দেখা গিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়াছে। এমন কথা কি কেহ বলিতে চাহেন যে, ভগবানের রাজ্যে আর নূতন হইবার কিছু নাই? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একথা কে কহিবেন? সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির ও তাঁহার কার্য্যের উপর আমাদের মতামত প্রকাশ করাই নিতান্ত অন্যায় এবং বাচালতা মাত্র।

কার্য্য কারণ হিসাবে, ভগবান্‌কেই যাবতীয় কার্য্যের কারণস্বরূপ জ্ঞান করা যায় এবং তন্নিমিত্ত সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ানুসারে তাঁহাকেই সর্ব্বত্রে দেখা যায় বলিয়া সর্ব্বব্যাপী নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে, সর্ব্বব্যাপী বলিলে তাঁহার কোন্ অবস্থা বুঝায়? রামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে কহিতেন, "যেমন থোড়ের খোসা ছাড়াইয়া মাজ পাওয়া যায়, ইহাকে বিশ্লেষণ এবং মাজ হইতে খোসা পর্য্যন্ত পূর্ণ বিচারকে সংশ্লেষণ বলা যায়। থোড়ের মাজ খাওয়া যায়, কিন্তু খোসা ফেলিয়া দিতে হয়। মাজ এবং খোসাতে প্রভেদ হইল বলিয়া উহাদের উৎপত্তির কারণ কি স্বতন্ত্র বলিতে হইবে? অথবা, যেমন বেলের অভ্যন্তরে শাঁস বিচি সূত্রবৎ পদার্থগুলি এবং আঠা ও খোসা থাকে, শাঁস খাওয়া যায়, খোসাদি ফেলিয়া দিতে হয়। ব্যবহারের প্রভেদ হইল বলিয়া তাহাদের সত্তার প্রভেদ হয় না। সেইরূপ এক ভগবানের সত্তা সর্ব্বত্রেই আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।"

কিন্তু স্বীকার করে কে? আমাদের শরীরের উপর প্রত্যেক ইঞ্চ পরিমিত স্থানে সাড়ে-সাত সের ভার পতিত রহিয়াছে, তাহা কে বুঝিয়া থাকেন? বিজ্ঞান অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সে প্রসঙ্গ কুপ্রসঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকার যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে শিক্ষা না করিয়াছেন, যিনি ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইয়াছেন, যিনি ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া এই গভীরতম তত্ত্ব-কথার মর্ম্মবোধ করিতে কৃতকার্য্য হইবেন?

রামকৃষ্ণদেব বার বার বলিয়া গিয়াছেন, "ভগবান্ নিজেই নিত্য, নিজেই লীলা, তিনিই বিরাটরূপে এবং তিনিই ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।"

এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্ যদ্যপি নিজে লীলা হন

তবে তাঁহাতে এবং অপর বস্তুতে প্রভেদ কেন? এরূপ প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন।

এক পদার্থ যৌগিক ভাবে যখন অবস্থিতি করে, তখন তাহার স্বরূপের কোন সাদৃশ্য থাকে না। কয়লা কৃষ্ণবর্ণ, ইহাই কয়লার স্বরূপ। কিন্তু চিনিতে যে কয়লা, ঘৃতেতেও সেই কয়লা, কাগজেও সেই কয়লা, হীরকখণ্ডেও সেই কয়লা ও বৃক্ষ, জন্তু এবং আমাদের প্রশ্বাস বায়ুতেও সেই কয়লা। এই সকল দৃষ্টান্তের সহিত কয়লার লক্ষণের তুলনা করিলে কে ঐ সকল পদার্থে কয়লা আছে বলিয়া স্বীকার করিবে?

মাতৃস্তন্যপায়ী যত জীবজন্তু আছে, তাহাদের শোণিত একই প্রকার; কিন্তু গো এবং মনুষ্যে কি প্রভেদ নাই?

নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সকল বলকারক বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু সেই নাইট্রোজেন সংযোগবিশেষে বিষম বিক্রমশালী বিষের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব পৃথিবীমণ্ডলে যখন এক পদার্থ অবস্থাভেদে নব নব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া বহুবিধ আকার ধারণ করিতে পারে, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী ভগবানের প্রতি সে বিষয়ে সন্দেহ হয় কেন?

অনেকে কাঠ মাটি পূজার বিরোধী। আমাদের দেশের সম্প্রদায় বিশেষে এবং খ্রীষ্টীয় মতে উহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্যের হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই বিষয়টী লইয়া জনৈক ইংরাজ চিকিৎসকের সহিত আমার বাদানুবাদ হইয়াছিল, সেই মীমাংসাটী এইস্থলে উল্লেখ করিলেই আমাদের কার্য্য হইয়া যাইবে।

ডাক্তার সাহেবের আপত্তি এই যে, জড় হইতে জড় এবং চেতন পদার্থ হইতে চেতন পদার্থ জন্মিয়া থাকে। সেইরূপ ভগবান্ হইতে

লোকে পরিত্রাণ পায়। এই পরিত্রাণের ভার কেবল খৃষ্টের ভিতরে ভগবান্ নিহিত রাখিয়াছেন। অতএব খ্রীষ্টকে অবলম্বন না করিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। এই কথাগুলি সমুদয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া কেবল খৃষ্ট স্থানে আমরা যে কোন নাম প্রয়োগ করিতে পারি, তাহাতে আমাদের শাস্ত্রমতে দোষ হয় না। তিনি তথাপি কাষ্ঠ, মাটি, মানুষ বলিয়া আমাদের দেবতা ও অবতারদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলাম যে, আমরা যখন যাহাকে ভগবান্ বলি, তখন আমাদের মন কি কাষ্ঠ, মাটিতে, অথবা মানুষে থাকে? যদ্যপি কেহ হে কাষ্ঠ! হে মৃত্তিকা! হে মনুষ্য! তুমি কৃপা কর বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে তথায় ভগবানের নাম না থাকায় কাষ্ঠ, মাটি ও মনুষ্যের পূজাই হইত; কিন্তু ভগবান্ বলিয়া যাহাকে লক্ষ্য করা যায়, সর্ব্ব-ব্যাপী ভগবান্ হিসাবে তাহাতে ভুল হয় না এবং সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির হিসাবে তিনি তাহা অবগত হইয়া অবশ্যই প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সে কথায়ও বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমাদের শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কেন কথা কহিতেছেন? বাইবেলে কথিত আছে, "যে কেহ কাম চক্ষে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহার পরদার গমনের মহাপাপ হয়।" এই ব্যক্তির পাপগুলি ভগবানের গোচর হয় এবং তিনি তাঁহার খাতায় লিখিয়া রাখেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, যে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া হে ভগবান্! হে পরমেশ্বর! বলিয়া ক্রন্দন করিবে, তাঁহার কথা সর্ব্বজ্ঞের কর্ণগোচর হইবে না? এই কি ন্যায়সঙ্গত কথা? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। তাই আমি বলিতেছি যে, যখন পদার্থবিশেষেও ভগবানের জ্ঞান ভ্রমাবৃত বলা যায় না, বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি তাহার সমর্থন

করিতেছে, তখন সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত রামকৃষ্ণদেবকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলে কোন বিঘ্ন হইতে পারে না।

রামকৃষ্ণকে যদ্যপি মনুষ্যজ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইলেও আমার সম্বন্ধে মনুষ্যবিশেষ হইবেন এবং ভগবান্ বলিলে আমার কখনও মনুষ্য পূজা হইবে না; যেহেতু ভাব লইয়া কার্য্য হইয়া থাকে, ভাবের ব্যতিক্রম হইলে সমুদায় কার্য্য বিফল হইয়া যায়। এই জন্য তিনি সকলকে সাবধান করিতেন, "যেন ভাবের ঘরে চুরি না হয়।" ভাবের কার্য্য কি প্রকার, তাহা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছি।

কোন স্থানে একটী বারাঙ্গনার বাস ছিল। বারাঙ্গনার গৃহের সম্মুখে একটী কুটীরে জনৈক সন্ন্যাসীও বাস করিতেন। সর্ব্বদা পাপাচরণে লিপ্ত দেখিয়া সাধু একদিন বারাঙ্গনাকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ বাছা! যাইতে হইবে, এ কথা কি কখনও স্মরণ হয়?" বারাঙ্গনা কি বলিবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সাধু ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "দেখ্ তোর নিতান্ত দুরদৃষ্ট, তাহা না হইলে এরূপ বুদ্ধি হইবে কেন? এখনও বলিতেছি, আমার কথা শ্রবণ কর্। অদ্য হইতে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শিব নাম জপ করিতে থাক্, সুখে দিন কাটিয়া যাইবে এবং পরকালেও কোন চিন্তা থাকিবে না।" বারাঙ্গনা দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি বারাঙ্গনার গৃহে যখন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিত, সাধু অমনি একটী ঢিল কুড়াইয়া তথায় রাখিয়া দিতেন। কিছু দিন মধ্যে ঢিল স্তূপাকার হইয়া গেল! সাধু মধ্যে মধ্যে বারাঙ্গনাকে ঐ ঢিলগুলি দেখাইয়া কহিতেন, "দিন দিন তোর কত পাপ সঞ্চয় হইতেছে, তাহার কিছু হিসাব করিতেছিস্? এত পাপের নিমিত্ত তোকে কত দিন যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ্।" সাধুর কথায় বারাঙ্গনার

মনে প্রথম হইতেই বিবেকের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। সেই প্রথম দিন হইতে, সে পাপাচারে লিপ্ত হইবার সময় প্রাণে প্রাণে শ্রীহরি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিত এবং মনে মনে তাঁহাকে কহিত, "ঠাকুর! তুমি যদ্যপি আমাকে কুলবতী করিতে, তাহা হইলে আমি কখনও এই ঘৃণিত বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতাম না।" কালক্রমে সাধু এবং বেশ্যার এক দিনে মৃত্যু হয়। ইহাদের জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া দেখিল যে, বিষ্ণুলোক হইতে রথ এবং যমদূতেরা অপেক্ষা করিতেছে। সাধু তাড়াতাড়ি রথারোহণ করিতে অগ্রসর হইলে, যমদূতেরা আসিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল এবং বিষ্ণু-দূতেরা বারাঙ্গনাকে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "মা! তুমি রথে আরোহণ কর, বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।" সাধু এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "দূত! একি বিচার? আমি সাধু হইয়া চির সন্ন্যাসী হইয়া যমের বাড়ী যাইব, আর বেশ্যাবৃত্তি করিয়া ঐ বেশ্যা গোলোকে যাইবে? এ কি ভগবানের ব্যবস্থা, না তোমরা ভ্রমে পতিত হইয়াছ?" বিষ্ণুদূত কহিল, "সাধুজী! তুমি কি জান না যে, যাহার যেমন ভাব, তাহার তদ্রূপ ফল লাভ হয়। মনুষ্যেরা দেহ এবং জীবাত্মা লইয়া দুইভাগে বিভক্ত। সুতরাং কার্য্যও দুই প্রকার। তুমি সাধু হইয়া দেহের নিগ্রহ করিয়াছ, দেখ সাধুরা আসিয়া তোমার দেহ জাহ্নবীসলিলে ডুবাইয়া দিতেছে এবং বেশ্যা দেহে বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে, উহার দেহের পরিণাম কি হইয়াছে, তাহাও দেখিয়া লও। দেখিতেছ কি, উহা কুক্কুর শৃগালে ভক্ষণ করিতেছে? এক্ষণে মনুষ্যের দ্বিতীয়ভাগ বা জীবাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখ, অধিক আর কি বলিব? গত দুই বৎসর কাল তুমি যে প্রস্তরগুলি সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার দ্বারা তোমারই নিজের বেশ্যাগমনের পাপ জন্মিয়াছে এবং ঐ

বেশ্যা ঐ পরিমাণে শ্রীহরি বলিয়া কাঁদিয়াছে। সাধু! বিচার কর দেখি, বেশ্যা গোলোকে যাইবে, না তুমি যাইবে? অতএব ভাবই সর্ব্বমূলাধার জানিবে।”

ভাবেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত ভাবই ভগবানের শক্তির রূপবিশেষ বলিয়া উল্লিখিত আছে। নিষ্ঠাবান্ হইলে তবে ভাব লাভ হয়, ভাবের পরিপক্কাবস্থা প্রেম এবং প্রেমের পর মহাভাব উপস্থিত হয়। এই মহাভাবকে রাধার স্বরূপ বলা যায়। এ বিষয়ে ভূরি ভূরি শাস্ত্র আছে, তাহা আমি এক্ষেত্রে বিচার করিব না। রামকৃষ্ণের মহাভাব সর্ব্বজনবিদিত, এই মহাভাবের নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেব অবতার বলিয়া খ্যাত, সুতরাং রামকৃষ্ণকেও অবতার মানিতে হইবে।

তৃতীয়। প্রত্যক্ষ মীমাংসা।

এ পর্য্যন্ত আমরা রামকৃষ্ণ লইয়া আন্দোলন করিয়া আসিলাম। যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বাহিরের কথা মাত্র। আমি এক্ষণে আমার নিজের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রাণে প্রাণে যাহা উপলব্ধি করিয়াছি এবং অদ্যাপি করিতেছি, এক্ষণে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমি একজন নাস্তিক, বর্ব্বর ও অতি পাষণ্ড ছিলাম। আমার নিকটে যদ্যপি কেহ ঈশ্বরতত্ত্ব বলিতে চাহিতেন, আমি তাহার যে দুর্দ্দশা করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা আমি প্রাণে প্রাণে জানি এবং যাঁহারা সেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও জানেন। আমি জানিতাম ভোজন করিতে, জানিতাম ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে, জানিতাম আত্মশ্লাঘা বিস্তার করিতে এবং জানিতাম পরগ্লানি রটনা করিতে। ধর্ম্ম বলিয়া, ঈশ্বর বলিয়া স্বতন্ত্র বিষয় আছে কি না,

তাহা কখনও মানসক্ষেত্রে উদিত হয় নাই। বরং পদার্থবিজ্ঞানের দ্বারা পদার্থদিগের অবিনশ্বরতা এবং তাহাদের পরস্পর সম্মিলনাদিসম্ভূত যৌগিকদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পারলৌকিক শব্দটীই আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বিজাতীয় কথা বলিয়া জ্ঞান হইত। কিন্তু যখন ঈশ্বর বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত হইত, তখন একজন ধার্ম্মিকের মত আমি মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইতাম।

কালক্রমে আমার পারিবারিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে আমার সাংসারিক আমোদ-আহ্লাদ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইল। সাধের ভোজনে ব্যতিক্রম ঘটিল, কিছু ভক্ষণ করিতে যাইলে গলাধঃকরণ করিতে পারিতাম না, রাস্তায় কাঁদিয়া বেড়াইতাম। বিচার, তর্ক, যুক্তি অসময়ে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সে অশান্তির কথা এক পরমাণুও বর্ণনা করিতে অসমর্থ। যাহা হউক, আমি সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। সেই বৎসর কালীপূজার দিন বৈকালে বাটীর ছাদের উপরে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বিমল বিচিত্র মেঘ সকল চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার মনে এক প্রশস্ত ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মনে হইতে লাগিল যে, আমি কি করিতেছি? কোথায় কাহার সহিত কি করিয়া বেড়াইতেছি? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার কি বুঝিলাম? এই মেঘ কোথা হইতে সমুত্থিত হইয়া কোথা দিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে, আমরা কি সেইরূপ নহে? এই জীবনের উদ্দেশ্য কি কেবল ভোজনে এবং শয়নে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে? তাহা কখনও নহে বলিয়া আমার মনে ধারণা হইয়া যাইল। আমি সেই দিন হইতে ঈশ্বরতত্ত্বজিজ্ঞাসু-শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়িলাম।

আমি সাধ্যমত অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করি নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলে তাঁহাদিগকে এই কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম—"ভগবান্ বলিয়া কি কেহ আছেন ? তাঁহাকে কি প্রত্যক্ষ করা যায় ?" তাঁহারা যে কি বলিয়া বুঝাইতেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ব্রাহ্ম-সমাজে ঘুরিতাম, তথায়ও তদ্রূপাবস্থায় রহিলাম। বাইবেল পড়িলাম এবং পাদরী মহাশয়দিগের বক্তৃতাদিও শুনিলাম, হরিসভায় যাইতে ক্রটি করি নাই এবং ঘোষপাড়াদির ভাব কিছু সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার প্রাণের ব্যথা গেল না। প্রাণের ক্ষুধা দূর হওয়া দূরে থাক্, বরং দিন দিন হতাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে হইল, এই সংসারে এতলোক ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়া যাইতেছে, আমার ভাগ্যে তাহা হইল না কেন ? ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস না থাকায় ত তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি নাই ! পরে একদিন আমাদের গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দে আমার হৃদয় মাতিয়া উঠিল। আমি তখন ভাবিলাম, মনে কতই আশা করিলাম যে, এইবার ধর্ম্মজগতের বৃত্তান্ত কিছু বুঝিব, কিন্তু তাহাও আমার পরিতাপের নিদান হইয়া গেল! তাঁহাকে আমার প্রশ্নটী বলিবামাত্র তিনি মস্তক হেঁট করিযা রহিলেন এবং বলিলেন যে, "এ সকল কথা আমি কিছু জানি না, তবে করণ কারণ কিছু জানা আছে, আমি তাহা উপদেশ দিতে পারি।" আমি তখন স্থির করিলাম যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল বাহ্যিক কথা। ঈশ্বর বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না বলিয়া আমার যে পূর্ব্বভাব, তাহা পুনরায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু প্রাণের অশান্তি যাইল না। সময়ে সময়ে মনে হইত যে, এমন সুন্দর পৃথিবী, ইহার এমন সুন্দর ব্যবস্থা, জীব এবং উদ্ভিদ-মণ্ডলের এমন সুন্দর সম্বন্ধ, যাহা ভাবিলে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতে হয়,

ইহার কি কর্ত্তা কেহ নাই? এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইবার পর একদিন আমার সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইল।

প্রাতঃকালে পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে একজন পূর্ব্ব পরিচিত যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দ সহকারে আমার অবস্থা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অতি গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "আপনার যে রোগ হইয়াছে, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য। স্বয়ং শিব যদি চিকিৎসকরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনাকে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে একদিন আরোগ্য হইলেও হইতে পারেন। আপনি ভগবান্ চাহিতেছেন, লোকে আপনাকে তাহা কোথা হইতে আনিয়া দিবে? শাস্ত্র কি করিবে?" আমার আশাও হইল, নিরাশাও হইল। আশা হইল এইজন্য, তবে হয়ত ভগবান্‌কে একদিন লাভ করিতে পারিব; নিরাশা হইল যে, তাঁহাকে যদ্যপি লাভ করাই যায়, তবে এত লোকে কি লইয়া রহিয়াছেন? ঈশ্বর লাভ করিতে হয়, চক্ষে দেখিতে হয়, এরূপ ভাব নাই। বরং তাঁহাকে দেখা যায় না, যদ্যপি কেহ দেখে, তাহা ভ্রম, এইরূপ কথাই ত বাজারচলিত। তখন ঐরূপ নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে মনে হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট একবার মনের দুঃখ জানাইলে হয় না? পরমহংসদেবের কথা স্মরণ হইবামাত্র প্রাণ নাচিয়া উঠিল, অমনি যেন আশার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল, মনে হইল যেন তথায় যাইলে সিদ্ধমনোরথ হইব। আমি তৎক্ষণাৎ আরও দুইটী পরমাত্মীয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলাম। তাঁহাদের অবস্থাও প্রায় আমারই মত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর পৌছিয়া পরমহংসদেবের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি নিজে আসিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া

গৃহমধ্যেই প্রস্থান করিলেন। আমরাও অবাক্ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি "নারায়ণ" বলিয়া নমস্কার করিলেন, আমরাও অপ্রতিভ হইয়া প্রণাম করিলাম। অনন্তর উপবেশন করিয়া গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ পরমহংস কে, তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। যেহেতু আমাদের সংস্কার ছিল যে, পরমহংস হইলেই গেরুয়া, কৌপীন, ঝুলি, বাঘছাল ইত্যাদি আসবাব থাকিবে, কিন্তু তথায় তাহার কিছুই নাই। যদিও এই সকল সাধুচিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তথাপি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রাণে প্রাণে বুঝিলাম যে, এত দিনের পর আপনার লোক পাইলাম। তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আপন পর কাহাকে বলে। যত তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলাম, ততই যেন আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যাইতে লাগিল। আহা! তিনি মৃদু মৃদু হাসিয়া আমাদের মনের কথা সমুদায় আপনি একটী একটী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবান্‌কে কে চাহে যে, সে ভগবান্ পাইবে? তাঁহাকে পাওয়া যায় না, এ সংস্কারে সকলেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে তাঁহাকে চাহে, যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হয়, যে একবার দেখা দাও বলিয়া কাঁদিতে পারে, তাহার সমক্ষে ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে যাহাকে মায়া বলে, তাহা যখন এত প্রীতিকর, সেই মায়ার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তাঁহাকে দেখা যায় না, এও কি কথা! যে ভগবান্ বলিয়া দুই দিন কাঁদিতে পারে, নিশ্চয়ই ভগবান্ তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া থাকেন। একথা যদি মিথ্যা হয়, করিয়া দেখুক সত্য কি না? যদ্যপি ভগবান্‌কে দেখা না যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রাদির আর মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। তোমরা বলিতে চাও যে, শাস্ত্র অলীক, কলির জীবকে ভুলাইবার

জন্য কল্পিত রূপক গল্প, নাটক বা উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে," ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদের মনে কিছু হউক বা না হউক, কিন্তু তিনি নিজে আমাদের ভিতরে ঈশ্বরের নিমিত্ত যে শূন্য স্থান লইয়া আমরা ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই স্থান আসিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন। আমরা তদবধি শয়নে স্বপনে ভ্রমণে উপবেশনে রামকৃষ্ণকেই দেখিতে পাই। মনে মনে কত বিচার করিলাম যে, আমরা কি পরিশেষে মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিলাম! এত দুরদৃষ্ট হইল, লোকে বলিবে কি! কতই বিচার করিলাম, কতই তর্ক করিলাম, রামকৃষ্ণ কিন্তু আমাদের ছাড়িলেন না। কি করিব! আমাদের যুক্তি পরাজয় মানিল, বিজ্ঞান আর এক আকার ধারণ করিল, আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিল। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার কি ভয়ানক ব্যাপার, সময়ক্রমে নানাবিধ সন্দেহ উত্থিত হইয়া আমাদিগকে সাময়িক বিশেষ ক্লেশ দিত, কিন্তু তাহা আর পূর্ব্বের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করাইতে পারিত না। ক্রমে কতই দেখিলাম, কতই বুঝিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিষয় প্রভুর জীবনী এবং তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক তাঁহার উপদেশ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিছুদিন পরে আমি তাঁহার নিকটে একদিন রজনীযোগে গমন করিয়াছিলাম। যখন প্রত্যাগমন করি, তিনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" আমি এই পৃথিবী শূন্যময় দেখিলাম, কি লইব ভাবিয়া দিশেহারা হইলাম। ধন চাহিলাম না, মান চাহিলাম না, পুত্রাদি চাহিলাম না, আমি কি লইব তাঁহার প্রতি তাহার ভারার্পণ করিলাম। তিনি তখন বলিলেন যে, "তুমি আমায় দেখ এবং অদ্য হইতে তুমি সকল প্রকার সাধন ভজন আমায় প্রত্যর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও।" আমি তদবধি (কেবল আমি কেন, যাঁহার এইরূপ হইয়াছে,) কি

সুখে যে দিন যাপন করিতেছি, তাহা আর কি বলিব। তাই বলিতেছি যে, আমরা তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিব বলিয়া তথায় যাই নাই। তাঁহাকে লইয়া আমরা একটা দল বাঁধিব, সে উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না, কিন্তু কি জানি কার্য্যে যাহা আপনি হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর অধিকার কাহার! ভগবানের স্থানে যিনি আপনি বসিয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বর। রামকৃষ্ণ তাহা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি অবতার।

রামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত যেরূপ কথিত হইল, তাহাতে তাঁহাকে সাধারণ জীবশ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায় কি না, তাহা সাধারণে বিচার করিয়া দেখুন। সাধারণ জীবের সহিত রামকৃষ্ণকে তুলনা করা যায় কি না, কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাও সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। সাধারণ জীবের একটী নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার অংশ-বিশেষ আয়ত্ত করিতে জীবনের যে কত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই! অধিক কথা আর কি বলিব, একদণ্ড মনের স্থিরতার জন্য আসন প্রাণায়ামাদি বিবিধ প্রক্রিয়া করিতে হয়। আসন সাধনায় কতদিন কাটিয়া যায়, তাহা হটযোগীরাই জানেন। প্রাণায়াম করিতে কত লোকের প্রাণত্যাগ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ বা শ্বাস রোগের প্রিয়ভাজন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং এই কলিকালে এ প্রদেশে কুম্ভকের ফল প্রাপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। এমন কি রামকৃষ্ণের যিনি কুম্ভক যোগের গুরু, তিনিই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিতে চল্লিশ বৎসর অবিরাম সাধনাবস্থায় ছিলেন। রামকৃষ্ণ সেই কার্য্য তিন দিনে সমাধা করেন। সুতরাং ইহা তাঁহার পক্ষে অমানুষ কার্য্য কহিতে হইবে।

মনুষ্যেরা সাধু হইতে পারেন এবং সাধনবিশেষে সিদ্ধাবস্থাও লাভ করিতে পারেন। সিদ্ধ হইলে তাঁহারাও অপরকে সিদ্ধাবস্থায় লইয়া

যাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও লোকের স্বভাবানুযায়ী ভিন্ন ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম নহেন। রামকৃষ্ণ তাহা করিতেন। তিনি কাহাকেও বৈষ্ণব, কাহাকেও শাক্ত, কাহাকেও শৈব, কাহাকেও কর্ত্তাভজা, কাহাকেও নবরসিক, কহাকেও বাউল, কাহাকেও শিখ, কাহাকেও মুসলমান, কাহাকেও খৃষ্ট এবং কাহাকেও আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানের ভাবে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কাহাকেও সন্ন্যাসী, কাহাকেও গৃহী এবং কাহাকেও না-সন্ন্যাসী না-গৃহীর শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহারও গুরু, কাহারও ভগবান্, কাহারও বা গুরু এবং ভগবান্ উভয়ই। কেহ কেহ তাঁহাকে উপগুরুও কহিয়া থাকেন।

তাঁহার নিকটে বিধি ব্যবস্থা ছিল না। তিনি মাতাল চোর লম্পট বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার স্তুতিবাদ করিলে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইতেন। যাহারা তাঁহাকে কটুকাটব্য বলিয়াছে, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়াছে। তিনি কখন কাহাকে জীবন গঠন করিবার নিমিত্ত দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেন নাই। তিনি মাতালকে কখন মদত্যাগ করিতে বলেন নাই, লম্পটকে বেশ্যা ত্যাগ করিতে বলেন নাই, বরং একথা তিনি বলিতেন যে, যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন সম্ভোগ করিয়া লও। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, তিনি পাপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেন। কথায় বলিলে কোন কার্য্য হয় না, কার্য্যে পরিণত করাই প্রকৃত কার্য্য। তিনি তাহাই করিতেন। কোন ব্যক্তি অতিশয় সুরাপান করিত। তাঁহার জনৈক সেবক এই কথা তাঁহার কর্ণগোচর করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?" আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তি একদিন সুরাপান করিবার সময় দেখিল যে, তাঁহার জনৈক বন্ধু দুই চারি গ্লাস

পান করিয়া নেশায় অভিভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার দুই বোতলেও নেশা হইল না। ক্রমে উদরপূর্ণ হইয়া আসিল, বিরক্ত হইয়া সে তখন মদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে তিনি সকলকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেন। সাধু সিদ্ধ ব্যক্তিরা তাহা কখনও করিতে পারেন না। তাঁহারা সমাজকে বিশেষ ভয় করেন এবং সামাজিক রীতি নীতির বিরুদ্ধে কখনও কার্য্য করিতে সাহস করেন না।

সিদ্ধপুরুষেরা কাহারও নহেন। তাঁহারা নিজের ভাবে দিন যাপন করিয়া চলিয়া যান। যদ্যপি কেহ কখনও তাঁহাদের দর্শন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে প্রতারণা, ছলনা নানাবিধ বিভীষিকা দেখাইয়া পলায়ন করেন। এ প্রকার ব্যক্তি থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি ? যেমন ধনীর ধনে দীন দরিদ্রের কি ফল হইয়া থাকে ? তাহার ধন যেমন, নির্ধনীর ধন না থাকাও তেমন। মুক্তহস্ত ব্যক্তিই কাঙ্গালের আশ্রয়। সিদ্ধপুরুষ কৃপণ ধনীর ন্যায়। রামকৃষ্ণ জীবের দুর্গতি নাশ করিবার অভিপ্রায়ে দীনবেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া আমাদের মত দীনদিগকে সংসার-কূপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা অসহায়, অজ্ঞান, নরাকারে পশুর ন্যায় আহার বিহার এবং মৈথুন কার্য্য করিতেই শিখিয়াছিলাম। দয়াল প্রভু রামকৃষ্ণ আমাদের কৃপা করিয়া জ্ঞাননয়ন খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। একথা বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছি না, প্রভুর মহিমা কতদূর তাহা প্রচার করাই উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে শান্তি শব্দটী পুস্তকেই দেখিতাম, কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকি। রামকৃষ্ণ দীনের ঠাকুর, রামকৃষ্ণ অনাথের নাথ, রামকৃষ্ণ অগতির গতি, রামকৃষ্ণ মূর্খের দেবতা, রামকৃষ্ণ পতিতের অবতার। যাহারা আমাদের মত নিরুপায়, যাহারা সংসার-চক্রে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, যাহাদের দশদিক শূন্যময় বোধ

হইয়াছে, তাহাদেরই জন্য, কেবল তাহাদেরই জন্য রামকৃষ্ণ অবতার হইয়াছিলেন। তিনি একদিন ভাবাবেশে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, সকলে শ্রবণ করুন, "যে কেহ ভগবান্কে জানিবার জন্য, ভাগবান্কে পাইবার নিমিত্ত আমার কাছে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে।" এই নিমিত্ত তিনি অবতার।

তাই বলিতেছি, যদি কেহ আমাদের মত পতিত থাকেন, যদি কাহারও আপনাকে নিরাশ্রয় বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি অজ্ঞান-কূপ হইতে কাহারও উঠিবার সাধ হইয়া থাকে, যদ্যপি কাহারও হৃদয় শূন্য বোধ হইয়া থাকে, যদ্যপি এই সংসারের রহস্যভেদ করিবার কাহারও ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদ্যপি কাহারও ভগবান্কে জানিবার সাধ হইয়া থাকে, যদ্যপি এই নরদেহে এই চর্ম্মচক্ষে ভগবানের মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে কুতূহল জন্মিয়া থাকে, যদ্যপি ভগবানের জন্য বাস্তবিক প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাকুন, রামকৃষ্ণ বলিয়া আর্ত্তনাদ করুন, রামকৃষ্ণ বলিয়া লোকলজ্জার মস্তকে পদাঘাত করুন, রামকৃষ্ণনাদে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন করুন। রামকৃষ্ণ কলির জীবতরান নাম। রামকৃষ্ণ নামের কত গুণ, যিনি একবার জান্তে কি অজান্তে, ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে বলিয়াছেন, তিনিই তাহার মহিমা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। তাই বলিতেছি, যাহাদের ধর্ম্ম জীবন গঠন করিবার বাসনা হইয়াছে, তাহারা রামকৃষ্ণনাম, কেবল নাম—অন্য সাধন নাই, অন্য কার্য্য নাই—কেবল রামকৃষ্ণ নাম গান করুন, নামের গুণেই সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইহা রামকৃষ্ণের নূতন ভাব, এই নিমিত্ত তিনি অবতার।

গীত

(১)

মগন হৃদয় ভকত জাগে দয়াল নাম গানে।

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম সুধাপানে॥

রজত আসন, ধরণী শাসন, না চাহি মণি কাঞ্চনে।

তুলসী মাল, মৃগছাল, রামকৃষ্ণ বদনে॥

ভুবন মোহন, রমণী রতন, না চাহি আলিঙ্গনে।

চাহে মন রামকৃষ্ণ স্থান অভয় চরণে॥

নাহিক সাধ, মধুর স্বাদ, রসনা পরিতোষণে।

প্রসাদ শান্তি রামকৃষ্ণ-চরণামৃত সেবনে॥

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে॥

(২)

তব দরশনে নাথ, খুলিল জ্ঞান নয়ন।

জাগে মনে ছিল যত আঁধার আবরণ॥

সাধন ভজন করি, নাহি হেন শক্তি ধরি,

রামকৃষ্ণ নাম স্মরি, সুখে যাপি নিশি দিন॥

মধুর নামের গুণে, শান্তি সদা প্রাণে প্রাণে

বিলা'তে তাই জনে জনে, দীন আকিঞ্চন॥

(৩)

মন রসনা গাও রামকৃষ্ণ নাম।

(জপরে রামকৃষ্ণ নাম)

বিষয় বাসনা ধায়, মানা নাহি মানে তায়,

বিষাদ বিপদ পায় পায়—

চরণ শরণ শান্তি অবিরাম।

(৪)

সতত হৃদয়ে জাগে মোহন মূরতি নাথ।
অপার করুণা প্রভু ব'লে আর জানাব কত।
সংসার জ্বালাতে জ্বলি, বারেক রামকৃষ্ণ বলি,
নামের মহিমাগুণে সকল যন্ত্রণা ভুলি,
এই নামে জুড়াইবে—এস, কে আছ তাপিত॥

প্রথম বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

দ্বিতীয় বক্তৃতা

সাকার নিরাকার

সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

১৮ই বৈশাখ, ১৩০০ সাল, রবিবার, প্রাতঃ ৮ ঘটিকায়

ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

সাকার নিরাকার

সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমি গত বক্তৃতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে অবতার বলিয়া মীমাংসা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথিত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকটীর প্রকৃত ভাব বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবকালে সকলের হৃদয়ে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া যাওয়া আবশ্যক বিধায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনি সাধক হইয়া সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের মূলে এক সত্য এবং প্রণালী বা সম্প্রদায়বিশেষের ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভাব কাহারও এক হইতে পারে না এবং যিনি তাহা মনে করেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এই নিমিত্ত পুনরায় কথিত হইতেছে যে, ভাব স্বতন্ত্র কিন্তু উদ্দেশ্য বস্তু এক, সুতরাং সম্প্রদায়বিশেষও থাকিবে এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কার্য্যও চলিবে, কিন্তু দ্বেষাদেষী ভাবের মস্তকে অশনি নিপতিত হইয়া যাইবে। এই শিক্ষা এবং এই শিক্ষানুরূপ সাধন করা প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠানিক ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এক সম্প্রদায় আর এক

সম্প্রদায়কে নিন্দা করিলে বা সমালোচনাচ্ছলে কটাক্ষ করিলে, কখনও ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি বা প্রচার করা হয় না। কোন ধর্ম্ম কাহারও কল্পনা-প্রসূত হইতে পারে না, কোন ধর্ম্ম কাহারও নিজস্ব হইতে পারে না এবং কোন ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিমিত্ত প্রকটিত হয় নাই। যে কোনরূপে অপরের ভাবে কটাক্ষ করা হয়, অথবা তাহার ভাব অপেক্ষা নিজ ভাবের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞান করা হয়, তাহাকেই দ্বেষভাব কহে। দ্বেষ-ভাবেই আমাদের দেশ কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এই কলঙ্ক অপনোদন করিবার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। তিনি একস্থানে সকল ভাবের সমন্বয় করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে অদ্য সাকার নিরাকার বিষয়টী আলোচনা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। রামকৃষ্ণদেব দয়া করিয়া যেমন সাকার নিরাকারের নিগূঢ় রহস্য আমাকে বুঝাইয়াছেন, তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি, যেন সেইরূপ কৃপা করিয়া অদ্য আপনাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

সাকার নিরাকার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী অগ্রে আলোচনা করিবার হেতু এই যে, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের দেশের যে পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের তুলনায় নিরাকারবাদীদিগের দ্বারা বাস্তবিক প্রচুর পরিমাণে অপকার হইয়াছে এবং হইতেছে। এই নিরাকার-বাদীরা হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। যাঁহারা হিন্দুসমাজভুক্ত, তাঁহারা মৌখিক সাকার মত সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু মনে মনে নিরাকার ভাবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান করেন। সাকারের প্রসঙ্গ হইলেই তাঁহারা উপনিষদাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া 'নিরাকার ভাব সমর্থন করিতে যত্নবান হন। শাস্ত্রীয় বিচার লইয়া যদ্যপি সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব নিরূপিত

হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদা বিচার বিগ্রহে নিযুক্ত হইতে হইত না। আমাদের দেশের শাস্ত্রাদি যে প্রকারে লিখিত, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বহির্গত করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত ব্যাপার বলিলে বোধ হয় প্রকৃত কথা বলা হয়। শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিবার হেতু এই যে, যখন একটী শ্লোকের ব্যাকরণাদির সাহায্যে ইচ্ছামত অর্থ এবং তাৎপর্য্য বহির্গত করা যায়, তখন শাস্ত্র-প্রণেতার কি উদ্দেশ্য, তাহা কে কিরূপে স্থির করিতে সমর্থ হইবেন? একখানি শাস্ত্রের কত টীকা টিপ্পনী প্রচলিত হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে পণ্ডিতপ্রবরেরা তাহার নূতন নূতন ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া নব নব ভাব প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা হওয়ায়, স্বল্পাধিকারীই হউন আর পণ্ডিতাগ্রগণ্যই হউন, উভয় ক্ষেত্রেই ভাব সংগ্রহ করা বাস্তবিক কঠিন কথা হইয়া উঠে, তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত কেবল শাস্ত্রমতে ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপিত হওয়া যারপরনাই অসম্ভব এবং তজ্জন্য শাস্ত্র লইয়া আমাদের সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমি পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সমুদয় সত্য। সমুদয় সত্য বলিবার হেতু এই যে, উহা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যপ্রিয় ঋষিগণ জীবের কল্যাণ হেতু তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ছলনা করিয়া আমাদিগকে অসত্য পথে নিক্ষেপ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া সহজ জ্ঞানে বুঝা যায় না। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র অসত্য বা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া কখন একদিন মনে করিলেও অপরাধ হয়। রামকৃষ্ণদেবকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, "আমাদের দেশে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় কি সত্য এবং তাহাদের উদ্দেশ্য

কি এক ?" তিনি বলিয়াছিলেন যে, "বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি যাহা কিছু আছে, সমুদয় শাস্ত্র সত্য এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে উপাসনা করা সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাঁহার ভাববিশেষে প্রণালীর পার্থক্য হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত কাহারও ভগবানের জ্ঞান না জন্মায়, সে পর্য্যন্ত তাহার প্রভেদ জ্ঞান থাকিবেই থাকিবে। অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ না করিলে ভগবানের ভাববৈচিত্র্যের মর্ম্ম কখন কাহারও উপলব্ধি হইতে পারে না। যাহার এই অবস্থা হয়, তাহার নিকটে কেবল শাস্ত্র কেন, ভগবান্, ভাগবত এবং ভক্ত পর্য্যন্ত, তিনিই এক বলিয়া প্রতীতি হয় ; সুতরাং শাস্ত্র এবং ভক্ত ভগবানের স্বরূপ জানিবে।" এই কথা শ্রবণ করিলে কাহার মনে না সন্দেহ-তিমির জন্মিয়া থাকে ? কাহার হৃদয় না আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয় ? কে না রামকৃষ্ণদেবকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সাব্যস্থ করিতে চাহে ? ভগবানের সহিত ভাগবত এবং ভক্তের কেবল তুলনা নহে, একীভূত করা নিতান্ত অসঙ্গত এবং যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই উপহাস করিবে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "ঠাকুর! ইহার অর্থ কি ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "একদিন এই কথা কেশবের সহিত হইয়াছিল, তাহাকে কি বলিয়াছিলাম, শ্রবণ কর। সাধকের ধারণানুসারে ভগবানের ভাব প্রকটিত হয়, অর্থাৎ সাধকেরা যখন যে ভাবে ভগবান্‌কে প্রত্যাশা করেন, কিম্বা যে সময়ে ভগবান্‌কে জানিবার নিমিত্ত যে প্রকার পাত্র উপস্থিত থাকেন, সেই সময়ে তিনিও সেইরূপে প্রকাশিত হন। সাধকেরা যেরূপে এবং যে ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ কিম্বা তাঁহাকে উপলব্ধি করেন, তাহাই তাঁহারা সাধ্যানুসারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এইরূপে কখন কখন শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রাধ্যয়নকালে উহার ভাব গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য। সেই ভাব

ভগবানের, সুতরাং ভগবানেই মন পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই ভাব উভয়স্থলেই এক; সুতরাং ভগবান্ এবং ভাগবতকে সেই হিসাবে ঐক বলিতে হয়। মনুষ্যেরা যতদিন ঈশ্বরের ভাব বিরহিত হইয়া কামিনী-কাঞ্চন অর্থাৎ সাংসারিক ভাবে অভিভূত হইয়া দিনযাপন করে, ততদিন তাহাদের জীব বলে। 'পাশ বদ্ধ জীব।' পাশ বলিলে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি বিবিধ ভাব বুঝায়, এই অবস্থায় সংসারীদিগকে জীব পদে নির্দ্দেশ করা যায়। এই পাশ বা বন্ধন অর্থাৎ বিবিধ অভিমান-সূচক ভাব যখন বিলুপ্ত হইয়া আইসে, তখনই তাহাকে পাশ মুক্ত শিব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মনুষ্যদিগের এই দ্বিবিধ অবস্থা মানসিক ভাব দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মনে যখন যে ভাব উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেমন ক্রোধের উদয় হইলে মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ পায় এবং লোকেও তখন তাহাকে ক্রোধী বলিয়া বুঝিতে পারে। ক্রোধ ভাব-বিশেষ। সেই ভাব মনুষ্যে প্রকাশ পাইলে তাহাকে তদাকারে পরিণত করিয়া ফেলে; সেই সময়ে ক্রোধে এবং সেই ব্যক্তিতে অভেদ হইয়া দাঁড়ায়। সেইরূপ ভগবান্ যখন ভাবরূপে ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তখন সেই ভক্তের স্বতন্ত্র লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তদবস্থায় সেই ব্যক্তিতে ভগবানেরই ভাব থাকে বলিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলিলে অন্যায় হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধার অর্থাৎ শাস্ত্রের কাগজ বা কালী এবং ভক্তের জড় শরীর বিচার করা যাইতেছে না এবং তাহা বিচার করাও অভিপ্রায় নহে, কেবল ভাব লইয়া কথা। ভগবানে যে ভাব ভাগবতে সেই ভাব এবং ভক্তেও সেই ভাব, এই ভাব ত্রিকালেই এক। এক স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া শাস্ত্রে এবং জীবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ভাব বিচারে ভগবান্, ভাগবত এবং ভক্ত, তিনিই এক বলিয়া

স্থির করিতে হইবে। যেমন বিসূচিকা রোগ যখন কোন ব্যক্তিতে প্রকাশ পায়, তখন তাহার ধারাবাহিক লক্ষণ সকল লিপিবদ্ধ করিলে শাস্ত্র হয়। এই শাস্ত্র পাঠে বিসূচিকা রোগের ধারণা হইয়া থাকে এবং যখনই কাহাতে সেই ভাব প্রকাশিত হয়, তখনই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। এই দৃষ্টান্তে বিসূচিকার লক্ষণ উভয় স্থলেই এক প্রকার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। যদ্যপি তাহা কোন স্থানে দেখা না যায়, তাহা হইলে বিসূচিকা বলিয়াও গণনা করা যায় না। শাস্ত্রের বর্ণিত লক্ষণ অবশ্যই রোগীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে এবং রোগীতে যে যে রোগ প্রকাশ পায়, তাহা উভয় স্থলেই এক বলা ন্যায়সঙ্গত কথা। রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে উহা কোথায় কিরূপাবস্থায় থাকে, তাহা যদিও ঠিক বলা যায় না, কিন্তু সময়বিশেষে এবং ব্যক্তি-বিশেষে অবিকল এক প্রকার লক্ষণযুক্ত ব্যাধি হয় বলিয়া তাহার একটী নিত্যাবস্থাও অনুমিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কথিত ভগবান্ ভাগবত এবং ভক্তের ভাবের সহিত তুলনা করিলে, তিনেরই এক ভাব মীমাংসা করিতে হয়। ভাব লইয়া এইরূপে বিচার করিলে ভক্ত এবং ভাগবত এক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ সত্যস্বরূপ, তাঁহার ভাববিশেষও সত্যস্বরূপ, সুতরাং ভগবান্, ভাগবত এবং ভক্ত, তিনই সত্য।”

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই সত্য; সুতরাং আমরা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে অশক্ত হইয়া অযথাক্রমে শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকি। শাস্ত্রের নিন্দা করিলে, তাহার প্রতিপাদ্য ভগবানের ভাববিশেষকেও অবমাননা করা হয়, ফলে এরূপ শাস্ত্রবিচারে আমাদের সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

ধর্ম্মশাস্ত্র সকল মোটের উপর দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, বৈশ্লেষিক

(Analytical) দ্বিতীয় সাংশ্লেষিক (Synthetical) শাস্ত্র। পার্থিব স্থূলভাব হইতে বিচার করিতে ক্রমে সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া যে অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা বৈশ্লেষিক শাস্ত্রের অন্তর্গত। মহাকারণ হইতে কারণ, সূক্ষ্ম এবং পরিশেষে স্থূলে অর্থাৎ মহাকারণরূপ একভাব হইতে স্থূলের বহুভাব পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিলে যে অবস্থা বা জ্ঞান লাভ হয়, তাহা সাংশ্লেষিক শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যখন আমরা এই শাস্ত্রদ্বয়ের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া উহাদিগকে এক অবস্থায় তুলনা করিতে প্রয়াস পাই, তখনই শাস্ত্রের বিভিন্নতা, উদ্দেশ্যের তারতম্য এবং ভাবের গণ্ডগোল হইয়া থাকে। ঠাকুর বলিতেন, যেমন থোড়ের মাজ এবং খোলা এক এবং একও নহে। বৈশ্লেষিক মীমাংসায় মাজ যে বস্তু, সাংশ্লেষিক বিচারে মাজ এবং খোলাও সেই বস্তু, যেহেতু উভয়েই এক সত্ত্বায় গঠিত হইয়াছে, কিন্তু খোলা এবং মাজ এক নহে। খোলা ফেলিয়া দিতে হয় এবং মাজ খাইতে হয়। স্থূলে এই প্রভেদ, কিন্তু সত্ত্বা হিসাবে এক। সেইরূপ বৈশ্লেষিক এবং সাংশ্লেষিক শাস্ত্রদ্বয়ের ভাব স্বতন্ত্র, কিন্তু তাৎপর্য্য এক জানিতে হইবে।

প্রত্যেক শাস্ত্র অবস্থাবিশেষের কথা। অবস্থাগত ভাব মনে রাখিয়া যদ্যপি আমরা শাস্ত্র মিলাইয়া লই, তাহা হইলে আমাদিগকে কখনও বিভ্রাটে পতিত হইতে হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে আমাদের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকারী কেহ আছেন কি না, ঠিক বলা যায় না। যেহেতু যে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আর্য্যেরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া তদনন্তর সাধন দ্বারা তাহার মর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতেন, সেই পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র, এক্ষণে কামিনী-কাঞ্চন-রসে অভিষিক্ত হইয়া আপন স্বেচ্ছামতে, শাখাবিশেষ, গ্রন্থবিশেষ, গ্রন্থের পরিচ্ছেদবিশেষ শিক্ষা

করিয়া আমরা শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। বিশেষতঃ, শাস্ত্রাদি ভাষান্তর হওয়ায় আরও সর্ব্বনাশ হইয়াছে। গুরুর নিকটে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহা এবং তাহার তর্জ্জমা এক্ষণে আপন ইচ্ছায় পাঠ করা যায়। এইরূপে অর্থবোধ হইলেও ভাববোধ হওয়া যারপরনাই কঠিন কথা। উপনিষদ্ ভাষায় হইয়া গিয়াছে, যাহার ইচ্ছা তিনিই পাঠ করিতেছেন এবং সেই ভাব সকল বিষয়ে প্রয়োগ করিতেছেন, সুতরাং তাহার ফল যে নিতান্ত বিকৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেমন অধিকারীবিশেষে আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবস্থা আছে। দুই চারিখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া যদ্যপি কেহ স্বেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা খুসী পাঠ করে, তাহার যে দুর্দ্দশা হয়, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করায়ও তদ্রূপ হইয়া থাকে। হয় এই যে, আমরা পূর্ণ অভিমানী হইয়া সকল কথায় আপন সংকীর্ণ ভাববিশেষ লইয়া মতামত প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকি। কোন্ ব্যক্তি স্থূলের কথা কহিতেছেন, যিনি মহাকারণের পরিচ্ছেদবিশেষ পাঠ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তথায় সেই ভাব আনিয়া মিলাইতে চেষ্টা করিলেন। স্থূলের সহিত মহাকারণের সাদৃশ্য থাকিবে কেন? সুতরাং মতান্তর হইয়া গেল। এই নিমিত্ত শাস্ত্রাদির মীমাংসা বর্ত্তমানকালে নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রাদির বিভিন্নতার কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে তাহা শিক্ষা করিলে কখন কোন শাস্ত্রকে কোন প্রকারে কেহ দোষারোপ করিতে পারেন না।

ভগবানের স্বরূপ বা সাকার নিরাকার বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমরা কি জন্য তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকি, তাহা স্থির করা আবশ্যক। আমরা ভগবান্‌কে

লাভ করিতে ইচ্ছা করি কেন? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেওয়া যারপর-নাই কঠিন। আমরা যদ্যপি এই উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে ভগবানের স্বরূপবিষয়ও অনায়াসে স্থির হইয়া যাইবে।

নবপ্রসূত বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সে কখনও কাঁদে, কখনও হাসে এবং কখনও চুপ করিয়া থাকে। এ প্রকার অবস্থান্তর হয় কেন? আমরা যদিও এক সময়ে ঐরূপ অবস্থায় ছিলাম কিন্তু তাহা কাহারও স্মরণ নাই। কেন কাঁদিতাম এবং কেনই বা হাসিতাম, তাহার হেতু কিছুই বলা যায় না; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কাঁদার কারণ অনুসন্ধান করিলে অভাবকেই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভাব বা অতি অভাব হইলে আমরা তজ্জনিত ক্লেশানুভব করিয়া থাকি। এই অভাবের নিমিত্ত আমরা সময়ে সময়ে ব্যাকুল হই এবং তাহা যে পর্য্যন্ত না পরিপূর্ণ হয়, সে পর্য্যন্ত অবস্থাবিশেষে তাহার চেষ্টাও করিয়া থাকি। এই স্থানে যদিও 'চেষ্টা' শব্দটী ব্যবহার করিলাম, কিন্তু অবস্থাভেদে বিনা চেষ্টায় স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হইয়া যায়। একথা বলিবার আমার অন্য কারণ আছে। শিশু কাঁদে অভাবের জন্য, পৌগণ্ড কাঁদে অভাবের জন্য, বালক কাঁদে অভাবের জন্য, যুবা কাঁদে অভাবের জন্য, প্রৌঢ় কাঁদে অভাবের জন্য এবং বৃদ্ধও কাঁদে অভাবের জন্য। শিশু কাঁদিতেছে, জননী স্তনপান করাইলে সে চুপ করিল। এই ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহার এই অভাব বলিতে পারে নাই, সুতরাং রোদন করিতেছিল। অভাব পূর্ণ হইবামাত্র সে শান্তি লাভ করিল, কিন্তু তাহার মাতার স্তন প্রদান করায় যখন শিশু স্থির হইল না, তখন তাহার জননী অশান্তির অন্য কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পিপীলিকাদি দংশন করিয়াছে কি'না, শয্যায় কোনপ্রকার কঠিন পদার্থ

আছে কি না, ইত্যাকার কারণ অনুসন্ধান করিয়া শিশুর রোদন নিবারণ করিতে না পারিলে, পরিশেষে কোন প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন এবং কখনও অন্যান্য কারণও বাহির হইয়া থাকে। এইরূপ অভাব সর্ব্বত্রেই পরিদৃশ্যমান হয় এবং তাহা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমাদের যাবতীয় আয়োজন হইয়া থাকে। যাহা কিছু আমরা করি বা বালকদিগকে করাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলে, সর্ব্বত্রে অভাবকেই দেখা যায়। আমরা লেখা পড়া শিখিয়াছি কেন? অর্থো-পার্জ্জন করিবার নিমিত্ত। শাস্ত্রাদি পাঠ করি কেন? জ্ঞান লাভের নিমিত্ত। ভাল জলবায়ু দেখিয়া আবাসস্থান নির্দ্দেশ করি কেন? স্বচ্ছন্দে থাকিবার নিমিত্ত। আমাদের অভাব হইলে অশান্তি হয় এবং তাহা নিবারণের নিমিত্ত তাহার উপায়ও স্থির করিয়া রাখিতে হয়। আমাদিগের অভাব নিবারণের জন্য আমরা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং সাময়িক অভাব পূর্ণ হইবার পরক্ষণেই পুনরায় অভাবজনিত ক্লেশে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। আমরা সর্ব্বদা এইরূপ অভাব অনুভব করিতেছি এবং তাহার বিমোচনের ব্যবস্থাও হইতেছে অর্থাৎ দুঃখে-সুখে এক রকম করিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছে। আমাদের যতগুলি অভাব আছে, তন্মধ্যে ক্ষুৎপিপাসার ন্যায় কতিপয় স্থূল স্থূল অভাবই আমরা বুঝিয়া থাকি। আমরা যদ্যপি স্থূল ভাব অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মাবস্থায় আমা-দিগকে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব যে, আমাদের জন্মিবার সূত্রপাত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অভাব ব্যতীত আর কিছুই নাই। যখন আমাদের জীবনের সঞ্চার হয়, তখন আমরা আণুবীক্ষণিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তখন সমুদয়ই অভাব। ক্রমে সেই অভাব সকল আপনিই পূর্ণ হইতে থাকে। তখনকার অভাব পূর্ণ করিবার

নিমিত্ত আমাদিগকে অথবা মাতাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। মাতৃ-শোণিত আমাদের সেই আণুবীক্ষণিক দেহকে পরিপোষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরও আমাদের অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় না।

আমাদের শারীরিক অভাব অর্থাৎ দেহ বর্দ্ধিত করিবার উপায় এই পৃথিবীতে ব্যবস্থা হইয়া আছে। ভোজ্য সামগ্রী আমরা সৃজন করি নাই এবং বলবীর্য্য প্রাপ্ত হইবার প্রণালী আমাদের কল্পিত নহে। দেহ সম্বন্ধীয় অভাব যেরূপে বিদূরিত হয়, দৈহিক যন্ত্রবিশেষের অভাব বিদূরিত হওয়াও আমাদের ইচ্ছা বা কার্য্যাধীন নহে। প্রত্যেক যন্ত্রের অভাব আপনা আপনি সম্পূর্ণ হয়। দৈহিক অভাব যেমন স্বাভাবিক নিয়মে পূরণ হইতেছে, মানসিক অভাবও সেইরূপে অভাব দ্বারা সম্পূরণ হইয়া থাকে। মানসিক কিম্বা দৈহিক অভাব হইলে দেহ এবং মন উভয়েই ক্লেশ পায় এবং তাহা পূর্ণ হইলে উভয়েই শান্তি লাভ করিয়া থাকে। বলকারক খাদ্য আহার করিলে শারীরিক বলাধান হয়, সুতরাং মনও সুস্থ থাকে। ইহাকে সম্পূর্ণ মনের অভাব পূরণ বলা যায় না। মনের অভাব জ্ঞান। কোন বিষয় মানসগোচর হইলেই তাহার তত্ত্ব বাহির করিবার নিমিত্ত মনের ব্যাগ্রতা জন্মায়। যেমন দেহান্ত পর্য্যন্ত দেহের অভাব পূর্ণ হয় না, সেইরূপ মনের বিলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার অজ্ঞানতাও বিদূরিত হয় না। অর্থাৎ যতদিন মন থাকে, ততদিন জ্ঞান লাভের প্রয়োজনও হয়, এই নিমিত্ত অশান্তিও সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে অধিকার করিয়া রাখে।

যদিও মন এবং দেহের বিনাশ না হইলে তাহাদের অভাব যাইবার নহে, তথাপি আমরা শান্তির জন্য সর্ব্বদা ধাবিত হইয়া থাকি। সুখ না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারি না; এই নিমিত্ত ভগবানের

সৃষ্টিতে উল্লিখিত অন্যান্য অভাব সম্পূর্ণ হইবার ন্যায় তাহারও ব্যবস্থা হইয়া আছে। সমাহিত যোগীরা তাহার দৃষ্টান্ত। সমাধিকালে দেহ থাকিয়াও থাকে না এবং মনও বিলয়প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে আপনি বিস্মৃত করিয়া রাখে, অর্থাৎ সে সময়ে মনের এবং দেহের কোন কার্য্যই থাকে না। সমাধি হইলে কি হয়? মনের আর জ্ঞান বিচার করিবার শক্তি থাকে না, সুতরাং উহার অভাব বিদূরিত হইয়া যায়। যখন আপনিই আপন বশে থাকিতে অশক্ত, তখন আপনার ও দেহের অভাব আর কিরূপে অনুভব করিবে? এই অবস্থায় বাস্তবিক শান্তিলাভ করা যায় এবং তন্নিমিত্তই আমাদের শাস্ত্রে কুম্ভকাদি যোগের ব্যবস্থা আছে। মনুষ্যেরা যখন সমাধিস্থ হন, সে সময়ে তাঁহাদের জৈবভাব বিলুপ্ত হইয়া ভগবানের ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। সে ভাব অসীম, অনন্ত এবং অপার, সুতরাং সে অবস্থায় আর অভাব হইতে পারে না। এই জন্য ভগবানের ভাববিশেষে মন সংলগ্ন করিয়া রাখাই আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। যতক্ষণ মনে ভগবান্ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ অপর জ্ঞান তথায় স্থান পায় না।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, শান্তির জন্য যদ্যপি ভগবান্‌কে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাকে লাভ করা যাইতে পারে?

এই স্থানে আমাদিগকে দুইটী বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে। প্রথম, ভগবান্ কিরূপ প্রকার এবং দ্বিতীয়, তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? এই দ্বিবিধ প্রশ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে হইলে, যাঁহারা সে পথে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ফলে, মহাজনের অনুকরণ করাই সুবোধের কার্য্য, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে অতি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। মহাজন একজন নহেন, সুতরাং মতামত নানাবিধ। মত নানাবিধ হইবার হেতু এই যে,

সাধকেরা প্রত্যক্ষ অবস্থায় তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সাধনার পূর্ব্ব সময় এবং পরে অবস্থাবিশেষে কি করিতে হয় এবং তাহার ফলই বা কিরূপ, এই সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। ইহাদিগকেও শাস্ত্র কহে।

কথিত হইল যে, সাধকদিগের অবস্থানুসারে শাস্ত্র জন্মিয়াছে, কিন্তু কোন্ শাস্ত্র কাহার প্রয়োজন, তাহা সাধক কিরূপে আপনি বিচার করিয়া লইবেন? বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী হইতে যাইলে শিক্ষক পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, বালক তাহা পারে না, সেইরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে গুরুকরণ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে শাস্ত্র যেরূপে অধ্যয়ন করিতে হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য কি প্রকার, তাহা উপদেশ দিবার গুরুই একমাত্র পাত্র। যদ্যপি সাধক নিজে তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আপনি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কস্মিন্ কালে শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিবেন না এবং যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিমূলক হইবে, তদ্বিষয়ে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত বৈশ্লেষিক শাস্ত্রানুশীলন করা ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহা অবগত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব কহিতেন যে, "লীলা অবলম্বন করিয়া নিত্যবস্তু লাভ করিতে চেষ্টা কর।" এই উপদেশ দ্বারা আমাদের উল্লিখিত দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লীলা বলিলে ভগবানের প্রকটাবস্থা বুঝায়। যে সময়ে এই জগৎ ছিল না, সে সময়ে ভগবান্‌কেও কেহ জানিত না। লীলা বিস্তার করিবার পর তিনি স্বয়ং সকল বৃত্তান্ত আপনি প্রকটিত করেন। লীলা বলিলে ভগবানের বিরাট রূপের অভিনয়কে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহাকেই আলোচনা করিতে হয়, একথা সকলেই বুঝিয়া থাকেন।

লীলায় কি শিক্ষা করা যায়? আমরা যখন কোন পদার্থ লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তাহাকে স্থূলে এক প্রকার দেখি, পরে উহা কি প্রকারে গঠিত হইয়াছে এবং যেরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই উহার চরম ভাব কি না জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তাহাকে রূপান্তরে পর্য্যবসিত করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়া থাকি। এইরূপ বিচারকে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কহা যায়। যেমন বরফ, জল এবং জলীয় বাষ্প। এক বস্তু ত্রিবিধ অবস্থায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। জলকে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিচার করিলে, তাহা হইতে দ্বিবিধ বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই বাষ্পদ্বয় আর বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না। এক্ষণে বরফ, জল, জলীয় বাষ্প এবং বিশ্লিষ্ট বাষ্পদ্বয় (অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন) লইয়া বিচার করিলে এক বস্তুর চারিটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অবস্থা বিচার করিলে কাহার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না। বরফ ও জল এক নহে, তাহাদের কার্য্য এক নহে এবং তাহাদের ধর্ম্ম বা গুণও এক নহে। যদিও বরফের সহিত জলের প্রভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উপাদান কারণে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। জলীয় বাষ্পকে বরফ এবং জলের সহিত একেবারে তুলনা করা যাইতে পারে না। জলে সামান্য পিপাসা নিবারণ হয়, কিন্তু সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর পিপাসা তাহাতে সাম্য হয় না, কিম্বা অতি গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে ঘুরিয়া আসিয়া যখন পিপাসায় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, তখন সেই অবস্থায় এক টুক্‌রা বরফ কি প্রকার শান্তি দান করে, তাহা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকেন। জলীয় বাষ্পের দ্বারা কি সেইরূপ শান্তিলাভ করা যায়?

বরফ, জল এবং জলীয় বাষ্প এক পদার্থ, পদার্থগত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। যে দুইটী বিশ্লিষ্ট বাষ্পের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা সমভাবে এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে অবস্থিতি করে, কিন্তু অবস্থাভেদে একই পদার্থের ধর্ম্ম ও কার্য্য সমান দেখা যায় না।

লীলার প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ শোভা পাইতেছে। কি প্রাণী জগৎ, কি উদ্ভিজ্জ জগৎ, কি সৌরজগৎ, সর্ব্বস্থানে পদার্থদিগের ভাববৈচিত্র্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণীজগতে মনুষ্য এবং গর্দ্দভ এক বলিয়া কেহ স্বীকার করিতে পারে না, উদ্ভিজ্জ জগতে আম্র এবং আমড়া এক বলিয়া কেহ গ্রহণ করে না, পার্থিব জগতে মৃত্তিকা এবং লবণ এক বলিয়া কেহ ভক্ষণ করে না এবং সৌর জগতে সূর্য্য চন্দ্রও এক বলিয়া কেহ অনুমান করিতে পারে না। স্থূলে প্রত্যেক পদার্থ স্ব স্ব প্রধান এবং তজ্জন্য কাহাকেও কাহার সহিত সমান বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

স্থূলে সকলকেই স্বতন্ত্র এবং অদ্বিতীয় দেখায়। স্থূলের স্থূলে আরও প্রভেদ দেখা যায়। মনুষ্য এবং গর্দ্দভের পার্থক্য স্থূল কথা কিন্তু মনুষ্যদিগকে পুনরায় বিচার করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব স্ব প্রধান দেখায়, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ লক্ষণের দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সকলে এক পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এক নিয়মের অধীন হইয়া রহিয়াছে। রাজরাজেশ্বর হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত কাহার শরীরতত্ত্ব দুই বা বহু প্রকার হয় না। লীলা দেখিলে একের বহু ভাব বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। এই এক এবং একেরই বহু জ্ঞান লাভ করাই লীলা পর্য্যালোচনা করিবার অভিপ্রায়।

স্থূলে পদার্থদিগের ধর্ম্মকর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু কারণে গমন করিলে আর সে প্রকার বিভাগ থাকিতে পারে না। পদার্থদিগকে বিশ্লিষ্ট করিলে সকলেই এক প্রকার পদার্থে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববক্তৃতায় কথিত হইয়াছিল, যেমন হিরাকস এবং শোণিত দুইটী স্বতন্ত্র প্রকার পদার্থ, কিন্তু তাহাদের বিশ্লিষ্ট করিলে অন্যান্য পদার্থ ব্যতীত লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহ এক জাতীয় পদার্থ, কিন্তু অবস্থান্তরে তাহাকে পূর্ব্বের ভাবে দেখা যায় না। সেইরূপ সমুদায় পদার্থদিগের নির্ম্মায়ক পদার্থ এক প্রকার। যেমন লৌহ এক প্রকার পদার্থ, নানাবিধ পদার্থের যোগে নব নব পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। সৃষ্ট পদার্থের সহিত যদিও স্থূলে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সর্ব্বস্থানে সেই এক অদ্বিতীয় লৌহ।

এইরূপে একের বহুভাব বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইলে, ভগবান্‌কে বুঝিবার পক্ষে শক্তি জন্মিয়া থাকে এবং এই নিমিত্তই লীলা পাঠ করিবার জন্য রামকৃষ্ণদেব আদেশ করিয়াছেন। যদিও লীলা বলিলে আমরা ভগবানের অবতারবিশেষের কার্য্যকলাপ বুঝিয়া থাকি, কিন্তু সে ভাব প্রবর্ত্তশ্রেণী ব্যক্তিদিগের নহে। যে ব্যক্তিরা শান্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট গমন করিবার উদ্যোগ করেন, তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তসাধক কহে। এ অবস্থায় ভগবানের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ হয় নাই, তাঁহার কার্য্য দেখিবার বা বুঝিবার শক্তিলাভ হইবে কিরূপে? যে ব্যক্তি তাহা করিতে যান, তিনিই তাহার বিপরীত তাৎপর্য্য বুঝিয়া থাকেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের লীলাবিশেষ বর্ণিত আছে। অনধিকারী ব্যক্তি তদ্‌বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া রাসলীলা, বস্ত্রহরণাদির স্থূলভাব অতি সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

তাঁহারা সেইজন্য লাম্পট্যদোষে শ্রীকৃষ্ণকে কলুষিত করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহারা গিরিধরা, কালীয় দর্প খর্ব্ব করা, অর্জ্জুনকে বিরাট মূর্ত্তি প্রদর্শন করা, এ সকল কথা অসম্ভব এবং গ্রন্থকর্ত্তার অত্যুক্তি দোষ বলিয়া সাব্যস্থ করেন। এই অনধিকারীর দ্বারা শাস্ত্রের অযথা অপমান হইয়া থাকে।

অধিকারী এবং অনধিকারীদিগের অবস্থা রামকৃষ্ণদেব যেরূপ বলিতেন, তাহাই কথিত হইতেছে।

একটী সমুদ্রের ব্যাঙ কার্য্যবিপাকে কূপে পতিত হইয়াছিল। তথায় আর একটী ব্যাঙ বাস করিত। কূপের ব্যাঙ নিজ কুটুম্বকে দেখিয়া বিশেষ সম্মানাদি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, ভাই হে! তোমার বাসস্থলটী কত বড়? বোধ হয় আমার ন্যায়ই হইবে।

সমুদ্রের ব্যাঙ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আমি সমুদ্রে থাকিতাম। কূপের ব্যাঙ বলিল, তাহা আমি জানি, তবে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই মাত্র। তোমার সমুদ্র আমাদের এই কূপেরই সমান, না ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট হইবে? দ্বিতীয় ব্যাঙ উচ্চহাস্যে উত্তর করিল, আরে! কূপের সহিত কি সমুদ্রের তুলনা হয়! সে সমুদ্র, আর এ কূপ! লক্ষ লক্ষ কূপের সমষ্টি করিলে সমুদ্রের অংশবিশেষেরও সদৃশ হয় না। কূপের ব্যাঙ তথাপি কহিতে লাগিল, ভাই! ব্যঙ্গ ছাড়িয়া সত্য কথা বল দেখি, তোমার সমুদ্র এত বড় হইবে? এই বলিয়া আপনার হস্ত পদ বিস্তার করিয়া দেখাইল। সমুদ্রের ব্যাঙ কহিল, না হে না, সে যে সমুদ্র, ওরূপ সীমাবিশিষ্ট হইবে কেন? কূপের ব্যাঙ ক্রোধান্বিত হইয়া তৎপরে হস্তপদাদি অতি বিস্তৃত করিয়া কহিল, এত বড় হইবে? সমুদ্রের ব্যাঙ তথাপি স্বীকার করিল না। তখন কূপের ব্যাঙ বিরক্ত হইয়া বলিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা

বিশ্বাস হইতে পারে না। কূপের ব্যাঙের বুদ্ধিবৃত্তি এবং জ্ঞান, কূপের ভিতরে আবদ্ধ, সমুদ্রের জ্ঞান তাহার কিরূপে জন্মিবে এবং কিরূপেই বা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে? আমাদের মতামত ও জ্ঞান-গরিমাও ঐ প্রকার। অতএব অধিকারী ভেদাভেদই সকলের মূল। সাকার নিরাকার সেইরূপ অধিকারীভেদের কথা। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় এবং তিনিই বহু, তাহা লীলাবৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার সৃষ্টিতে সকল বস্তুই এই একভাবের পরিচায়ক। স্থূলে বহু, একথা যেন কখন ভুল না হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যেমন এক মাটি হইতে জালা, কলসী, ভাঁড়, গামলা, প্রদীপাদি নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, জালা এবং প্রদীপ এক নহে। স্থূলে যদিও প্রভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কারণে এক। এক সোণা হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। কাণের মাকড়ী গোটের কাজ করে না; অথবা গলার চিক নাসিকায় শোভা পায় না। স্থূলে, প্রত্যেক অলঙ্কার ভাবে প্রভেদ কিন্তু কারণে এক, সেইরূপ মহাকারণে ভগবান্ এক, স্থূলে ভাববিশেষে তিনিই বহু।

কথিত হইল যে, সাকার নিরাকার সাধকদিগের অবস্থার কথা। যখন কেহ ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন ভগবান্ কিরূপ প্রকার, তাহা লোকের মুখে শুনা ব্যতীত তাঁহাকে দেখিয়া সে কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায় না।

প্রত্যেক সাধকের প্রথমাবস্থায় সেইজন্য ঈশ্বর নিরাকার অর্থাৎ ভগবানের কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি আছে কি না, তাহা সাধকের পক্ষে অদৃষ্ট বিষয় এবং তাঁহার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আকৃতি স্বীকার করা যায় না। নির্দ্দিষ্ট আকৃতি হইলে অনন্ত ভাব আর থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার অবয়ব সম্বন্ধে কেহ কখন কোনরূপ স্থির মীমাংসা

করিতে পারে না বা করা উচিত নহে। অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতির যদ্যপি আকারের সংখ্যা সংখ্যাবাচক শব্দে অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে সীমাবিশিষ্ট করা হইল। কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহাকে নিরাকার না বলিয়া অসংখ্য আকারবিশিষ্ট বলা হউক, তাহা হইলেও তাঁহাকে সীমাবিশিষ্ট করা হয়। এই নিমিত্ত নিরাকার শব্দের দ্বারা ভগবানের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার বুঝায় না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার আকার ধারণ বা না করা দুই সমান। তাঁহার যেরূপ স্বরূপ হউক, সাধকের পক্ষে সাধনার প্রারম্ভে ভগবান্ নিরাকার। সাধক তাঁহার ভাব বা নামবিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করিয়া থাকেন। ভাব বলিলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদিকে বুঝায় এবং নামের সীমা নাই। এই নির্দ্দিষ্ট ভাব বা নাম ব্যতীত যদ্যপি কেহ কেবল ভগবান্ অথবা সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকে ডাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই ডাকা হয়। অতএব যেরূপেই হউক, অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাসেই হউক বা অবিশ্বাসেই হউক, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি কৃপা করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে এই নিমিত্ত বলিতেন যে, "জ্ঞান্তে বা অজ্ঞান্তে, ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে, যে কেহ ভগবান্‌কে ডাকে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে।"

ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি পূজায়ও নিরাকার উপাসনা হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে নিরাকার শব্দ ব্যবহার করিবার হেতু এই যে, প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা ভাববিশেষ লাভ ব্যতীত প্রত্যক্ষ কার্য্য কিছুই হয় না। প্রস্তরাদির প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অমনি পূজা করা হইত। মূর্ত্তির দ্বারা কেবল বিশেষ ভাব উদ্দীপন হইয়া থাকে।

আমরা যখন কোন প্রতিমার পূজা করি, তখন দেব দেবীকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে উহা স্পর্শ করিতে কাহারও আপত্তি থাকে না,

মুসলমানও স্পর্শ করিয়া থাকে এবং তখন কেহ ঠাকুর বলিয়া প্রমাণও করে না। ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যখন দেব দেবীকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তখনই তাঁহাকে দেব দেবী বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত তথায় ঐ ভাব থাকে। দেব দেবীর আহ্বান এবং বিসর্জ্জন অলক্ষিত ভাবেই সম্পন্ন হয়। কখন কি বেশে আসিলেন এবং কি ভাবেই বা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তাহা সকলের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় বলিয়া, এরূপ পূজাকেও নিরাকার পূজা কহা যায়।

দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এবং না করিয়া যে দ্বিবিধ নিরাকার উপাসনা কথিত হইল, ইহাদের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, উভয়স্থলেই এক ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে। নিরাকার উপাসনায় ভগবানের কোনভাব অবলম্বন করিতে হয়, তাহা না হইলে মন স্থির হইতে পারে না। পিতা, মাতা, কিম্বা দয়া, স্নেহ বা জ্ঞান ইত্যাকার যাবতীয়ভাব, জড়পদার্থেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে ভাব গ্রহণ করা যেরূপ, প্রতিমা হইতে মাতা বা পিতা ভাবও সেইরূপ বলিতে হইবে। যদিও মাতা পিতার শান্ত ভাব, জড় ভাব হইতে ভগবানে পর্য্যবসিত করা হয় এবং দেব দেবীর ভাব দেব দেবী হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই জড়াভাস থাকায়, বিশেষতঃ মা শব্দটী জড় মাতা হইতে শিক্ষা হয় বলিয়া উভয়বিধ উপাসনা-তত্ত্ব একশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইল। পিতা মাতার স্নেহ যেমন আমাদের কল্পিত নহে, তাহা আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি বলিয়া অনায়াসে উহা ভগবানে প্রয়োগ করিতে সাধ হয় এবং সেইভাবে কিয়ৎ কাল চিন্তা করিতে পারিলে প্রাণ মাতিয়া উঠে, সে সময়ে আর জড় ভাব থাকে না, আর জড় পিতা মাতার কথা মানসক্ষেত্রে সমুদিত

হয় না ; তখন এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হইয়া থাকে ; প্রতিমূর্ত্তিতে তাহা অপেক্ষা কোন মতে ন্যূন হয় না। যদিও প্রতিমূর্ত্তির কলেবর জড় পদার্থসম্ভূত কিন্তু তাহার ভাব সেরূপ নহে। মূর্ত্তি আমাদের কাহারও কল্পিত নহে, ঋষি মুনিরা দুর্ব্বল অধিকারীদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়া যান্ নাই। শাস্ত্র মধ্যে এইরূপ যে সকল শ্লোক আছে, তাহা নিরাকারবাদীদিগের স্বকপোলকল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেহেতু রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র সত্য।" এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই দেব দেবীর মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? আমাদের শাস্ত্র তাহার প্রমাণ। প্রভু বলিতেন, "যেমন সোলার আতা দেখিলে সত্যের আতা মনে হয়, মূর্ত্তি দর্শন করিলে সেইরূপ হইয়া থাকে।" যাঁহারা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের উদ্দীপনার হেতুস্বরূপ এবং যাঁহারা প্রবর্ত্ত সাধক, তাঁহাদের ভবিষ্যতের আরামের স্থল, ভগবানের নিজের ভাববিশেষ মূর্ত্তিতে থাকে বলিয়া তাহাকে জড়ভাব কহা যায় না। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিলে, বৃন্দাবনের সেই নব-নটবরবেশধারী নব-নীরদকান্তি-বিশিষ্ট ভাব মনোময় হইয়া যায়, তথায় কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তরের ভাব উদয় হয় না। কৃষ্ণ বলিলে কৃষ্ণের ভাবই উপলব্ধি হয়, কেবল উপলব্ধি কেন? আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়। ভগবানের ভাবে বিহ্বল হইয়া বহির্চ্চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আইসে। যাহা দর্শন করিয়া ভগবানের ভাব লাভ হয়, তাহাকে ভগবান্ না বলিব কেন?

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার কথা, সুতরাং ভগবান্ নিরাকার, সাকার এবং তাহার অতীত।" অতীত বলিবার হেতু এই যে, তাঁহাকে যাহাই বলিবে, তাহাই সম্ভব। অনন্ততে কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না। সম্ভব অসম্ভব আমাদের পক্ষে খাটে,

যেহেতু আমাদের ক্ষমতা, ধারণা এবং জ্ঞান দ্বারা যাহা ইয়ত্তা করিতে পারি, তাহার অতীত বিষয় কিরূপে বুঝিব? আমরা সীমাবিশিষ্ট মন বুদ্ধি লইয়া বাস করি, তদ্দ্বারা অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতির কাণ্ডকারখানা কেমন করিয়া বিচার করিয়া লইব? অদ্যাপি আমরা এই স্থূল পৃথিবীর ব্যাপার জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। অদ্য যাহা স্থির করিতেছি, কল্য তাহার ভ্রম বাহির হইয়া যাইতেছে। সে স্থলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য-কলাপ, তাঁহার অবস্থা লইয়া আন্দোলন, মতামত এবং সমালোচনা করা নিতান্ত অভিমানের কথা। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় লইয়া যদ্যপি ভগবানের বিষয় বিচার করিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে রামকৃষ্ণদেবের কথা অবনত শিরে স্বীকার না করিয়া পলাইয়া যাইবার উপায় নাই। আমরা অনেক সময়ে অভিমানে অন্ধ হইয়া এবং পরের কথা শুনিয়া পরিচালিত হইয়া থাকি। আপনাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি লইয়া যদ্যপি স্থিরভাবে ভাবের খেলা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কেহ কখনও ভগবানের স্বরূপ লইয়া বাদানুবাদ করিতে সাহস করিবেন না। ভগবান্ বাদানুবাদের বস্তু নহেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অভাব পূরণের হেতুস্বরূপ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। সে যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেবের মতে ভগবানের স্বরূপ স্থির হয় না। তাঁহার আকার আছে বলিলেও বলা যায়, আবার নাই বলিলেও ভুল হয় না এবং কিছু না বলিলেও তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃত পক্ষে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনাতীত এবং উপলব্ধির অধিকারবহির্ভূত, এই নিমিত্ত তিনি বাক্যমনের অতীত বস্তু বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যদি ভগবান্ বাক্যমনের অতীত পদার্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া আমাদের কি ফল হইবে? যাঁহাকে বুঝিতে পারিব না, যাঁহার বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারিব না, তিনি থাকিলেও যেমন, না থাকিলেও

তেমন। অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্‌কে অবলম্বন করা, শান্তিলাভের নিমিত্ত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া, তিনি মন বুদ্ধির অধিকারবহির্ভূত হইলে, কিরূপে আমাদের অভিপ্রায় চরিতার্থ হইবে? রামকৃষ্ণদেব তন্নিমিত্ত বলিতেন যে, "বাক্য মনের অতীত বলিলে, বিষয়াত্মক অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনভাবে রঞ্জিত মন এবং বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বুঝা যায় না এবং বুঝিবার উপায়ও নাই।" রামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশের দ্বারা 'অভাবের' ভাব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। যাহার মন কামিনী-কাঞ্চনে ডুবিয়া আছে, যাহার মুখে কেবল সেই কথা, যে ব্যক্তি বিষয় কার্য্য ও সাংসারিক উন্নতিচিন্তায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, যে সেই কার্য্যের নিমিত্ত সদা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, ভগবানের নিমিত্ত তাহার অভাব কোথায়? এরূপ অবস্থায় লোকের নিকট ভগবান্ কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারেন না, এইরূপ ব্যক্তির মনে স্বর্গীয় ভাব উদ্ভাসিত হইতে পারে না, সুতরাং এরূপ ব্যক্তির দ্বারা ভগবানের গুণগাঁথা পরিকীর্ত্তিত হওয়াও অসম্ভব।

অভাব বোধ না হইলে আমরা কোন বস্তুর আবশ্যকতা বুঝিতে পারি না। যখন তাহা লাভ হয়, তখন তাহার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। কোনও বিষয় বুঝিতে পারিলেই যে তাহা বর্ণনা করিবার আমাদের সামর্থ্য হয়, তাহা নহে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেমন ক্ষুধা না পাইলে ভোজন করিবার অভাব হয় না, ক্ষুধা পাইলেই যে সমুদয় ভোজ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মায়, তাহা নহে। বাস্তবিক আহার করা চাই। আহারকালীন পদার্থবিশেষের আস্বাদন বোধ হয়, কিন্তু তাহা বর্ণনা করা যায় না। যেমন সন্দেশ খাইলে তাহার আস্বাদনের স্বরূপ বর্ণনা হয় না, এইমাত্র বলা যায় যে, উত্তম, মন্দ নয়, খুব ভাল কিম্বা মাঝামাঝি, ইত্যাকার কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করা যায় এ ক্ষেত্রে

সন্দেশের প্রকৃত ভাব জ্ঞাপন করা গেল না, কেবল একপ্রকার আভাস দেওয়া হইল। যদ্যপি জিহ্বার স্বভাব বিচ্যুত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ প্রকার আভাস দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সন্দেশ ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যদ্যপি অতিশয় তিক্ত, কটু বা কষায় পদার্থ ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে সন্দেশের আস্বাদন একেবারে উপলব্ধি হইবে না। সেইরূপ কামিনী-কাঞ্চনরূপ ভাবে মন প্রাণ রঞ্জিত থাকিলে, তথায় ঈশ্বরের ভাব প্রবেশ করিবে কিরূপে? সুতরাং এরূপ ব্যক্তির নিকটে ঐশ্বরিক ভাবের স্থান পাইতে পারে না; স্থান পাইলেও তাহা উপলব্ধি হয় না। যে ব্যক্তি সংসারে শান্তি পায়, তাহার অভাব এই সাংসারিক ভাবেই পরিপূর্ণ হয়, যাহার আকাঙ্ক্ষা এই পৃথিবীমণ্ডলে মিটিয়া যায়, তাহার পক্ষে ভগবান্ কেহই নহেন। অন্ধের পক্ষে সুখময়ী প্রকৃতির সুন্দর প্রীতিপ্রদ ছবি থাকা না থাকা সমান কথা। সূর্য্য চন্দ্র থাকা না থাকায় তাহার কি লাভালাভ হয়? জননীক্রোড়শায়ী শিশুর নিকট ভুবনমোহিনী রমণীরত্নের সৌন্দর্য্য কি? বিষয়লিপ্সাবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট ভগবান্ সেইরূপ জানিতে হইবে।"

কোনও পদার্থের অভাব হইলেই যে, আমরা তাহার জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহা নহে। যে বস্তুর জ্ঞান আছে, তাহার অভাব বুঝিতে পারি। কিন্তু বস্তু বোধ না হইলেও তাহার অভাবজনিত বিরহ বোধ আমরা অনুভব করিয়া থাকি। যেমন শরীরের কোন যন্ত্র-বিশেষের পীড়া হইলে, অশান্তি ভোগ করিয়া থাকি। শরীরে তাহার অভাব হইয়াছে, কি প্রয়োগ করিলে তাহা পূর্ণ হইবে, আমরা তাহা কিছু জানিতে পারি না, তথাপি অভাবরূপ অশান্তি আসিয়া আমা-দিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সেইরূপ যখন কামিনী-কাঞ্চনে অর্থাৎ এই সংসারে আর অভাব পূর্ণ করিতে না পারে, যখন সাংসারিক

ভাব সত্ত্বেও হৃদয়ে অশান্তির অপ্রতিহত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তখন ভগবান্‌কে বুঝা যায়। অভাব জ্ঞান না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না।

একদা জনৈক রাজপুত্র মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, সংসারের সকল প্রকার আনন্দ সম্ভোগ করিয়া দেখা গেল, কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুতেই চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ হইল না। কবিরা কামিনীর মুখকমলের কত কথাই বলেন, কৈ তাহার সত্যতা কোথায়? একবার চপলাচকিতের ন্যায় ক্ষণিক আনন্দ প্রদান করিয়া বরং অপরিমেয় নিরানন্দের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া যায়। অর্থের আনন্দও তদনুরূপ। আনন্দ কোথায় পাওয়া যায়? এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় বয়স্য জনৈক তাপসকুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার তাঁহার অশান্তির বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে পর, মুনিপুত্র কহিলেন, "দেখ! আমি শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়াছি যে, সচ্চিদানন্দকে লাভ না করিলে চিরানন্দ সম্ভোগের অন্য উপায় নাই।" রাজতনয় সচ্চিদানন্দ শব্দটী শ্রবণ করিবামাত্র অমনি শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল, নয়ন জলপূর্ণ হইল, বক্ষঃস্থলে কেমন একপ্রকার ভাব হইতে লাগিল, বাক্য স্থগিত হইল, মন কোথায় চলিয়া গেল এবং প্রাণ মাতিয়া উঠিল। রাজপুত্র এইরূপে কিয়ৎকাল স্থিরভাবে রহিলেন, পরে যখন ঐ ভাবের অবসান হইয়া আসিল, তখন বয়স্যের চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাইরে! এমন মধুর শান্তিপ্রদ নাম তোমার নিকট ছিল, কেন আমায় এতদিন তাহা বল নাই! আহা! এমন প্রাণজুড়ান নাম ত কখনও শ্রবণ করি নাই। নামের এত গুণ, সচ্চিদানন্দ শব্দের এত মহিমা! আজ আমার সার্থক জীবন, আজ যে আমি হৃদয়ের শান্তিবিধাতাকে লাভ করিলাম। বল ভাই বল, কোথায় যাইলে সচ্চিদানন্দ লাভ হয়? কে আমায় তাঁহাকে প্রদান করিতে পারেন?" মুনিকুমার অবাক্ হইয়া

রাজতনয়ের ইত্যাকার ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তদনন্তর রাজপুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমাদের তপোবনের প্রান্তভাগে একজন অতি বৃদ্ধ সিদ্ধ ঋষি বাস করেন; তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় সচ্চিদানন্দের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে।" রাজপুত্র কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যে ভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা ঋষিরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাসম্মানে প্রণতি পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি একবার রাজপুত্র ও মুনিপুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজপুত্রকে তথায় উপবেশন করিতে আজ্ঞা দিয়া মুনিপুত্রকে কহিলেন, "বাপু! আনন্দ কাহাকে বলে, তুমি কি তাহার অভাব বুঝিয়াছ যে, সচ্চিদানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?" রাজপুত্রের অবস্থা দেখিয়া সচ্চিদানন্দ লাভ করিবার নিমিত্ত ঋষিপুত্রের অভিলাষ জন্মিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহা তাঁহার অভাবজনিত নহে। অন্তর্দ্দর্শী ঋষির নিকট অন্তর লুকাইবেন কিরূপে? সুতরাং ঋষির প্রশ্নের উত্তরে মুনিপুত্র কহিলেন যে, "আর্য্য! আনন্দ বুঝিয়াছি কি না, একথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়? আমি ঋষিতনয়, অভিধানখানাও কি অদ্যাপি আমার কণ্ঠস্থ হয় নাই?" ঋষি সহাস্যে কহিলেন, "তাহা আমি জানি। আনন্দ কাহাকে বলে, তুমি অগ্রে জানিয়া আইস, তবে আমি তোমায় সচ্চিদানন্দের কথা বলিব।" ঋষিপুত্র তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য! আমি ত আনন্দ শব্দের অর্থ জানি, সচ্চিদানন্দ যাঁহাকে কহে, তাহাও আমি শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়াছি এবং সে কথা রাজকুমারকে আমিই বলিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি। আমাকে সচ্চিদানন্দ লাভের অধিকারী না মনে করিয়া রাজকুমারকে

সে পদের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিলেন?" ঋষিরাজ কহিলেন যে, "তোমার এ পর্য্যন্ত আনন্দ সম্ভোগ না হওয়ায় তাহার অভাব জ্ঞান হয় নাই, সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইলেও ত গ্রহণ করিতে পারিবে না। বালককে হীরক এবং কাচ প্রদান করিলে সে কি উভয়ের ইতর বিশেষ বুঝিতে পারিবে? অতএব কাহাকে কি বলে, আমাদের পক্ষে কি প্রয়োজন, এ সকল না জানিলে কার্য্যকালে ঠকিয়া যাইবে। অর্থে যাহার প্রয়োজন নাই, তাহাকে অর্থ দিলে কি হইবে? সুস্থ ব্যক্তির গৃহে ঔষধ থাকিলে, তাহার কি ফল ফলিয়া থাকে? অথবা চুম্বকের সন্নিধানে কর্দ্দমাবৃত লৌহের ন্যায় আনন্দজ্ঞানান্ধের সমীপে কি সচ্চিদানন্দ শোভা পাইয়া থাকেন?" এতক্ষণে ঋষিপুত্র ঋষির কথার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া করযোড়ে গুরু সম্বোধনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য! আনন্দ কোথায় পাওয়া যায়, উপায় বলিয়া দিন।" ঋষি কহিলেন যে, "লোকালয়ে গমন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়া আইস। সাবধান! যখন যাহা সম্ভোগ করিবে, তখন বিচার করিয়া লইবে।" আমরা সকলেই যদিও বিষয়ানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহাতে আমাদের বীতরাগ না জন্মে, যে পর্য্যন্ত কামিনী-কাঞ্চন আনন্দ প্রদান করিতে না অসমর্থ হইবে, সে পর্য্যন্ত ভগবানের প্রয়োজন অপ্রয়োজন জ্ঞান জন্মিবে না।" যতদিন সে অবস্থা না আইসে, ততদিন ভগববানের প্রসঙ্গ করাই উচিত নহে।

বলা হইয়াছে, ঈশ্বর সাকার, নিরাকার ও তাহার অতীত। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, তাহা সাধকের কোন্ অবস্থার কথা। আমরা বুঝিয়াছি যে, সাধকের প্রথম দশায় নিরাকার ভাব হইয়া থাকে। রাজপুত্রের যেমন সচ্চিদানন্দ নাম শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব ভাবাবেশ লাভ হইয়াছিল, প্রবর্ত্ত সাধকের এইরূপ অবস্থা বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছি। এই ভাবাবেশ চরম কথা নহে। যেমন কোন মহাত্মার কথা শ্রবণ করিলে, তখন তদ্‌সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তথায় তাহার অন্ত হইয়া যায় না। সেই ব্যক্তির নিকট গমন, তাঁহাকে দর্শন এবং পরে তাঁহার সহিত বাক্যালাপাদি হইলে তবে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া থাকে। মহাত্মার নাম শ্রবণ করিলে যে ভাব লাভ করা যায়, তাহাকে জ্ঞান, গমন করাকে সাধন, দর্শনকে বিজ্ঞান এবং বাক্যালাপাদিকে প্রেম বলে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও অবিকল সেই ভাব দেখা যায়। আমরা যখন অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবানের শরণাপন্ন হই, তখনকার ভাবকে জ্ঞান কহা যায়। জ্ঞান অর্থে জানা বুঝায়। আমরা তখন এই বুঝিয়া থাকি যে, তিনি অতি মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাথপালক, দারিদ্র্য-দুঃখ-হারক ইত্যাদি। এইরূপ জ্ঞান করিলেই যে মনুষ্যজীবনের সকল অভাব পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাহা নহে। কেহ ইহাতেই পূর্ণ মনে করেন, এবং কেহ তাহা কেবল প্রথমাবস্থার ভাববিশেষ জ্ঞান পূর্ব্বক, ভগবানের দর্শন জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে, এই অপূর্ব্ব বিশ্ব রচনার কৌশল বুঝিবার নিমিত্ত সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাপি দেশ দেশান্তরের কত মহাত্মারা শরীর পতন করিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, তথাপি তাহার স্থূলভাবগুলিও প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত হইল না। যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শোভা সন্দর্শন করিয়া তাহাতেই সেই মহিমার্ণবের জ্বলন্ত-দীপ্তি উপলব্ধি করিয়া আর্য্যগণ এক সময়ে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির উপাসক হইয়া গিয়াছিলেন, যে সৃষ্টির পারিপাট্য পরিদর্শন পূর্ব্বক দর্শনাদি শাস্ত্রের নানাবিধ অভিনয় হইতেছে, যে সৃষ্টিস্থিত পদার্থনিচয়ের জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত অগণন বিজ্ঞানের অবতারণা হইয়াছে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করিয়া

থাকে ? যাঁহার স্নেহকণা জননীর হৃদয়েও উদ্ভাসিত হইয়া কত মধুর ভাব বিকীর্ণ হয়, তাহা মাতৃগর্ভসম্ভূত প্রত্যেক জীবই বিলক্ষণ রূপে অবগত আছে। ভাই ভগ্নী এবং বন্ধুর ভালবাসায় আমরা কতই প্রীতি লাভ করিয়া থাকি, সেই সখ্য প্রেম যে প্রেমার্ণব হইতে অতি সূক্ষ্ম বিন্দুরূপে উহাদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, যে মধুর প্রেমে নরনারী প্রাণে প্রাণে একীভূত হইয়া অব্যক্ত অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকে, সেই রসিকশেখরের, প্রেমিকচূড়ামণির দর্শনাকাঙ্ক্ষী না হইয়া কখন কি কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? লোকে কেন যে তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া পরিত্যাগ করে, কেন যে তাঁহাকে দেখা যায় না বলিয়া ধ্রুব নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমের ঠুলি চক্ষে বাঁধিয়া দেয়, তিনিই বলিতে পারেন, তাহার কারণ কোথায়।

যখন কোন সাধকের ভগবান্ দর্শনের জন্য মনে বাসনার সঞ্চার হয়, সেই বাসনা মন হইতে ক্রমে প্রাণে যাইয়া প্রত্যাঘাত করে, তখন সে অস্থির হইয়া পড়ে। তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না, জগতের স্থূল শোভা দেখিয়া আর ধৈর্য্য মানে না, নীরস কথায় আর প্রাণে শান্তি লাভ হয় না, তাঁহাকে নিরাকার বলিলে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখন সে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, "কোথায় নারায়ণ! কোথায় মধুসূদন! কোথায় অন্তর্য্যামী শ্রীহরি! যদি কেহ কোথাও থাক, একবার দর্শন দাও, একবার তোমার প্রেমময় কান্তির শোভা দর্শন করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিয়া লই! ঠাকুর! তোমার সৃজিত বস্তুর কত শোভা, তাহা কত মধুর, কত আনন্দপ্রদ, তুমি নিজে না জানি কত সুন্দর! হে সর্ব্বসুন্দর! একবার দেখা দাও।" এইরূপে যখন বাস্তবিক প্রাণ ব্যাকুলিত ও অধীর হইয়া পড়ে, যখন বাস্তবিক ঈশ্বর দর্শনবিহনে প্রাণ দেহপিঞ্জর হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম

হয়, তখনই ভগবান্ সাধকের বাঞ্ছানুসারে স্বপ্রকাশিত হন। এই নিমিত্ত ভক্তেরা তাঁহাকে বাঞ্ছাকল্পতরু নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, এই সাকার মূর্ত্তি যে কি পদার্থসম্ভূত, তাহা বলা যায় না। তিনি জ্যোতিঘন বলিতেন। যখন এই প্রকার সাকার রূপ প্রকাশিত হয়, অগ্রে তথায় কোয়াসার ন্যায় দেখায়, পরে তাহা রূপবিশেষে পরিণত হইয়া থাকে। সাধক সাধ পূরিয়া সেই রূপ দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, ইচ্ছামত বাক্যালাপও করিয়া থাকেন। এই সাকার রূপ তৎপরে পুনরায় দ্রবীভূত হইয়া বাষ্পাকারে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য বরফ, জল ও বাষ্পের সহিত এই রূপের উপমা প্রদান করিয়া কহিতেন, "যেমন শৈত্য প্রয়োগে অদৃশ্য নিরাকার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া কঠিন আকার লাভ করে এবং উহাতে উষ্ণতা প্রদত্ত হইলে পুনরায় অদৃশ্য ভাবে পরিণত হয়, নিরাকার হইতে সাকার এবং সাকার হইতে নিরাকার সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলীয় বাষ্প নিরাকার এবং বরফ জ্যোতিঘন রূপবিশেষ। উত্তাপ এবং শীতলতায় জলীয় বাষ্প এবং বরফ হয়, সেইরূপ জ্ঞান এবং ভক্তিতে নিরাকার এবং সাকার রূপ জন্মিয়া থাকে।" এ স্থানে জ্ঞানের সহিত উত্তাপ এবং ভক্তির সহিত শৈত্যের তুলনা করা হইয়াছে। জ্ঞানে ভগবান্ অরূপ, নিরাকার এবং উপাধিবর্জ্জিত; এই ভাব ভগবানের নহে, তাহা সাধকের ধারণা মাত্র। সাধক যাহা চাহেন না, যাহা দেখিবার নিমিত্ত লালায়িত হন নাই, তাহা কিরূপে তিনি বুঝিতে পারিবেন? আবার ওদিকে ভক্তেরা তাঁহাকে রূপ, আকার এবং উপাধিবিশিষ্ট দেখিতে চাহেন, সুতরাং তথায় তিনি তদ্রূপই হইয়া থাকেন। যেমন জলীয় বাষ্পের অবস্থান্তরে বস্তুর বিপর্য্যয় হয় না কিন্তু ভাবান্তর হয়। জলীয় বাষ্প বায়ুর সহিত প্রতিক্ষণেই আমাদের

শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহাতে পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা বিদূরিত হয় না। জল ফুটাইয়া অধিক পরিমাণে বাষ্প সেবন করিলেও তথাপি পিপাসার বিরাম হয় না, কিন্তু বরফখণ্ডের দ্বারা তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কিরূপ শান্তি হয়, তাহা প্রত্যেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। বস্তুগত জলীয় বাষ্প এবং বরফ এক, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু অবস্থাভেদে কার্য্যের প্রভেদ হইয়া থাকে। সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তিতে ভগবানের রূপান্তর হয়।

এই নিমিত্ত ভগবানের রূপ বা সাকার হওয়া সাধকের দ্বিতীয়াবস্থার কথা। রূপদর্শন করিবার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য হয়, তাহাকে সাধন বলা যায়। সাধনের সময় ভাবের ঘরে চুরি অর্থাৎ ভাবের সহিত কার্য্যের পার্থক্য না থাকিলে নিশ্চয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সাকাররূপ দর্শনের পর সাধক কি তাঁহাকে চক্ষের দেখা দেখিয়াই ছাড়িয়া দেন? তাহা কখন নহে। যাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সংসারের মস্তকে পদাঘাত করিতে হইয়াছে, যাঁহার দর্শনলালসায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইয়াছে, যাঁহার নিমিত্ত আত্মীয় বন্ধু সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, যাঁহার সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায়ে ঐহিক সুখ শান্তি কাক্‌বিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিতে হইয়াছে, যাঁহাকে দেখা যায় না বলিয়া চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়াছিল, যাঁহাকে দর্শন করা মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া কথিত হইয়াছিল, যাঁহার রূপকে অসম্ভব বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করিয়াছিল, সেই ভগবান্ সচ্চিদানন্দকে কেবল চক্ষের দেখা দেখিয়া কখন কেহ কি ছাড়িতে পারে? যে নয়ন স্থূল জগৎকে দর্শন করিয়া সুন্দর জ্ঞান করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রকৃত সুন্দরকে, সেই ভুবনমোহনকে দেখিয়া আর কি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে? পাছে প্রতিনিমিষে দর্শনের ব্যাঘাত জন্মায়, এই নিমিত্ত অনিমিষ হইয়া রহিল। এত দিনের পর যাহা

শুনিতে হয়, তাহা শ্রবণ করিল। সে মধুর শব্দ সে প্রাণজুড়ান কথা আর কে বলিতে পারে? শ্রবণ তাহা শুনিয়া আবার শুনিবে বলিয়া সতৃষ্ণ ভাবে রহিল। সেবক তখন তাঁহাকে মনের সাধে চিরদিনের সঞ্চিত সমুদয় কথা জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ আলাপনকে প্রেম কহে। ইহা সাধকের তৃতীয়াবস্থা।

সাকার রূপের সহবাসে জীব দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব কহিতেন যে, একুশ দিনের অধিক দেহ থাকে না। এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সে রূপ অদৃশ্য হইয়া যায়।

সাধকের সম্মুখ হইতে যখন রূপ চলিয়া যায়, তখন তাহারা চিরশান্তি লাভ করে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় আর অনুরাগ থাকে না। রূপের ভাব স্মরণ এবং মনন থাকে। পৃথিবীর দৃশ্য পদার্থের দ্বারা মনের ভাব কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া আসে বলিয়া, তিনি নিজভাবের উদ্দীপনার নিমিত্ত সেই রূপ কোন প্রকার জড় পদার্থ দ্বারা সংঘটিত করিয়া রাখেন। সেই প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র, তাঁহার পূর্ব্বের সেই রূপ স্মরণ হয়। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, "শোলার আতা দেখিলে আসল আতা মনে হয়। যেমন কাহার ফটোগ্রাফ কিম্বা অয়েল পেন্টিং দেখিলে, পরিচিতস্থলে সেই ব্যক্তিকেই স্মরণ হইয়া থাকে এবং অপরিচিত হইলে একজন এইরূপ ব্যক্তি ছিল বলিয়া, ব্যক্তিতেই ভাব যাইয়া পর্য্যবসিত হয়; চিত্রের উপাদান করণের কখন উদ্দীপনা হয় না। যে ইচ্ছা করিয়া রং বা কাগজাদি দেখিতে চাহে, তাহার তখন ব্যক্তির ভাব অদৃশ্য হইয়া যায়। এইরূপে যখন জড় মূর্ত্তি হইতে নিজ নিত্য মূর্ত্তি উদ্দীপিত করা হয়, তথাকার ভাবকে নিরাকার কহা যায়। ইহা সাধকের চতুর্থাবস্থা। অতএব সাধকের প্রথমাবস্থায় নিরাকার, দ্বিতীয়াবস্থায় সাকার, তৃতীয়াবস্থায়

প্রেম এবং চতুর্থাবস্থায় পুনরায় নিরাকার ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশটী আমরা বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পারিব। তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ নিরাকার, তিনি সাকার এবং তিনি তাহার অতীত, অর্থাৎ সাধক সাকার এবং নিরাকার এই দুইটী ভাব বুঝিতে পারে। কারণ, রূপ ছিল না, হইল, আবার গেল, পুনরায় হইল। তিনি যে অনন্ত এবং অসীম, কেবল নিরাকার এবং সাকার বলিলে তাঁহার অবস্থার ইয়ত্তা হইয়া যায়, সুতরাং অতীতাবস্থা স্বীকার না করিলে অনন্তে দোষ পড়িয়া যায়।

জ্যোতির্ঘন রূপ ব্যতীত তিনি অন্য রূপেও দেখা দিয়া থাকেন। রূপ দেখা সাধকের ইচ্ছায় নির্ভর করে বটে, কিন্তু তাহার বিপর্য্যয়ও ঘটে। তিনি কখন মনুষ্যরূপে সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তরের দুঃখ অপনীত করিয়া শান্তি বিধান করেন। এই সম্বন্ধে আমার জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি পূর্ব্ববক্তৃতায় বলিয়াছি যে, রামকৃষ্ণদেবের নিকটে প্রথমে সাধু জ্ঞান করিয়া ঐশ্বরিক উপদেশের আশায় গমন করিয়াছিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই আমার হৃদয়ের চিরসঞ্চিত কুসংস্কারপুঞ্জ দূরীভূত হইয়াছিল। ঈশ্বরের স্থান রামকৃষ্ণদেব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিছুদিন যাতায়াতের পর আমার মনে হইল যে, একজন মনুষ্যকে না বুঝিয়া ঈশ্বর বলিয়া ফেলিলাম! তখনই আবার আপনার ভাব আপনি খণ্ডন করিয়া বলিলাম, আমি ত কল্পনা করিয়া ঈশ্বর বলি নাই, তবে এ কথা আমার মনোমধ্যে উদ্রেক হইতেছে কেন? মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে বিষম ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ঠাকুর আপনি যদি ভগবান্ হন, তাহা হইলে আমায় অন্য কোন রূপে দেখা দিয়া এই চঞ্চল চিত্তের স্থৈর্য্য বিধান করিয়া যান।

কিন্তু বলিয়া রাখিলাম, আপনার রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতে চাহি না, অথবা শাস্ত্রীয় রূপবিশেষও দেখিতে চাহিনা, যেহেতু সে ভাব আমার মনে আছে, চিন্তার ফলে যদি তাহাই দর্শন করি, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস থাকিবে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বেলা এগারটার সময় গোলদীঘির দক্ষিণ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের দক্ষিণ ফুটপাথের উপর মিত্র কোম্পানি বলিয়া যে দোকান ছিল, তাহার সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্রের সহিত রামকৃষ্ণ-দেব সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতেছিলাম। এমন সময় দেখি, গোলদীঘির পশ্চিমের ফুটপাথ দিয়া একটী শ্যামবর্ণ, বিস্তারিতলোচন, সুদীর্ঘ ব্যক্তি, আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমার দিকে চাহিয়া তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এ ব্যক্তি কি আমার পরিচিত? কোথাও কি দেখিয়াছি? ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তিনি ক্রমে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমার বামকর্ণে বলিলেন, "অত ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স'য়ে থাক।" এই কথা শ্রবণমাত্র আমরা উভয়ে চমকিয়া উঠিলাম। গোপাল আমার দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান ছিল, সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হায়! আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন! আমরা দুইজনে কত খুঁজিলাম, আর দ্বিতীয়বার দর্শন পাইলাম না। সে সময় রাস্তায় ভীড় ছিল না যে, গোলমাল হইয়া গেল। যাঁহাকে দুই মিনিট নিরীক্ষণ করিলাম, যিনি কর্ণবিবরে আশ্বাস বাক্যরূপ অমৃত প্রদান করিলেন, যিনি আমার ব্যাকুল প্রাণ শীতল করিবার নিমিত্ত "অত ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স'য়ে থাক" এতগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তিনি কি 'মনুষ্য? মনুষ্য হইলে আমার প্রাণের বেদনা বুঝিবেন কিরূপে? আমি তাঁহাকে কোন কথা বলি নাই, কখন উপদেশ বা

সান্ত্বনা প্রার্থনা করি নাই; তবে তিনি—আমার অপরিচিত, তিনি—কেন আসিয়া শান্তিবারি ঢালিয়া দিলেন? সেই ব্যক্তির কাছে কখন আমার মনের কথা বলি নাই, কৃপাকণা ভিক্ষা করি নাই, এমন কি তাঁহাকে আমি চিনি নাই, তবে কেন আমার সহিত এরূপ রহস্য করিলেন? এইরূপে নানাবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম। পরদিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট গমন করিয়া ঘটনাটী বলিলে পর, তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এরূপ কত দেখিবে, এখন বিশ্বাস হইয়াছে কি?"

সে সাকার রূপের কথা উল্লিখিত হইল, তাহা জ্যোতিঘন নহে এবং জড়পদার্থসম্ভূত কি না তাহাও বলা যায় না।

অবতারদিগকেও সাকার কহা যায়। রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, ঈশা, মহম্মদ ইত্যাদি সকলেই অবতার, একথা রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন। এই অবতারেরা জড় দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। অতএব সাকার রূপ এক প্রকার বা এক জাতীয় হইতে পারে না। তাহা হইলে সে রূপকে ভগবানের রূপ বলা যায় না। মনুষ্য যাহা ইয়ত্তা করিয়া ফেলে, তাহাকে ভগবানের কার্য্য বলিলে অসীম ঈশ্বর সীমা-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন।

এইরূপ সাকার দর্শন সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি সংস্কার আছে, তদ্‌সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের যেরূপ অভিপ্রায় শুনিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। সংস্কারগুলি যথা—

১ম। সাকার রূপ স্বীকার করিলে অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপী ভগবানে দোষ স্পর্শ করে।

২য়। রূপ দর্শনাদি, মস্তিষ্কের বিকারজনিত সংঘটিত হইয়া থাকে।

৩য়। কাষ্ঠ মৃত্তিকার প্রতিমা পূজায় ভগবানের অবমাননা হইয়া থাকে।

৪র্থ। জড় কখন চৈতন্য হয় না এবং চৈতন্যের কখন জড়ত্ব হয় না।

৫ম। সাকার রূপ স্বীকার করিলে অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপী ভগবানে দোষ স্পর্শ করে কি না?

প্রশ্নটীই প্রশ্নের মত নহে। এইরূপ প্রশ্নকর্ত্তারা কি জ্ঞানে যে পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাহা বলা যায় না। রামকৃষ্ণদেবকথিত সাকারের কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এ প্রকার কোন দোষারোপ হইতে পারে না। যেহেতু সে রূপে আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি কিরূপে, কি পদার্থের দ্বারা, আপনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়; অনুমানের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি নিজে যখন রূপবিশেষ ধারণ করেন, তখন সে বিষয়ে কথা কহিতে যাওয়া বাচালতা মাত্র। তিনি সকলের কর্ত্তা, সকলে তাঁহার কর্ত্তা নহে। কর্ত্তার ইচ্ছায় আমাদের ভাল মন্দ কি? প্রশ্নকারীদিগের পক্ষে রহস্য এই যে, ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ জানিয়াও তাঁহার কার্য্যবিশেষে অবিশ্বাস করিতে যাইয়া, কতদূর সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

সাকার হইলে ভগবানের সর্ব্বব্যাপকতায় দোষ জন্মিয়া থাকে বলিয়া নিরাকারবাদীদিগের যে আপত্তি আছে, তাহা তাঁহাদের স্থূল দর্শনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। ভগবান্ যখন সাকার রূপ ধারণ করেন, তখন তাঁহার অবস্থা লইয়া আমাদের বিচার করিবার কোন অধিকার নাই। এমন কি এই জড় জগতেরই পদার্থবিশেষের গঠন প্রদান করিলে তাহার সর্ব্বব্যাপকতার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। বায়ু সর্ব্বব্যাপী, এই ভাব

উপলব্ধি করিতে পারিলে তবে ভগবানের সর্ব্বব্যাপকতার আভাস পাওয়া যায়। বায়ুকে ঘনীভূত করিলে ইন্দ্রিয়গোচর করা যায় এবং প্রত্যেক পদার্থের ছিদ্রতা-নিবন্ধন ও বাষ্পদিগের বিকীর্ণতা ধর্ম্ম আছে বলিয়া, ঘনীভূত বায়ুর সহিত বহির্বায়ুর বিচ্ছেদ হয় না। ইহা অপেক্ষা জলের দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর। আমরা জলের আধারবিশেষ পুষ্করিণী, কূপ, খাল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। স্থূল দৃষ্টিতে সকল জলাশয়ই স্বতন্ত্র এবং সীমাবিশিষ্ট বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। যদ্যপি সূক্ষ্ম বা জ্ঞানচক্ষে এই জলাশয় সকল দর্শন করা যায়, তাহা হইলে জলীয়বাষ্পরূপে জল সর্ব্বত্রে এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহারাই ঘনীভূত হইয়া আবার জলাকারে জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। জল জমাইয়া বরফ প্রস্তুত করিলে তথায়ও ঐ ভাব উপস্থিত থাকে বলিয়া উহাকে সীমাবিশিষ্ট বলা যায় না। স্থূলে সীমা থাকিলেও সূক্ষ্মে জলীয় বাষ্পাকারে অসীম ভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। অতএব সাকার রূপ কখনো সীমাবিশিষ্ট হইতে পারে না।

অবতারদিগের অবয়ব সীমাবিশিষ্ট হইলেও তাহাতে আমাদের বিচার চলিতে পারে না, যেহেতু জীবের শিক্ষা বিধান করাই তাঁহাদের কার্য্য। ক্ষুদ্র জীব অনন্ত ভাব কিরূপে ধারণা করিবে, সুতরাং অনন্তকে ক্ষুদ্র হইয়া থাকিতে হয়। যে শিশু 'ক' 'খ'কে 'ত' বলে, তাহার পিতা তাহাকে 'তলা তাবি', 'ল' কে 'অ' বলিলে 'আয়ু ভাজা তাবি', ইত্যাকার শিশুর মত কথা না বলিলে, সে বুঝিতে অশক্ত হইয়া থাকে। যে ইংরাজী বুঝে না, তাহার সহিত ইংরাজী কথা চলে না। সেইরূপ আমাদের মত, আমাদের ক্ষমতানুসারে ভগবান্‌কে কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং আমরা আমাদের মতই তাঁহাকে দেখিয়া থাকি।

যদ্যপি অবতার এবং সাধারণ জীব সমানই হয়, তাহা হইলে সকলকে অবতার না বলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে নির্দ্দেশ করা যায় কেন? মনুষ্য হইলেই সকলকে এক শ্রেণীর বলা যায় না। ব্রাহ্মণ যদিও এক শ্রেণীর, কিন্তু সকলেই কি সমান? সকলেই কি বেদপারগ? কাহার বেদাদি কার্য্যে অধিকার আছে, কেহ পাচক কার্য্যে সক্ষম। পাচক কি জন্য বেদবিহিত কার্য্য করিতে অসমর্থ? ব্রাহ্মণ হইলেই বর্ণ হিসাবে সকল কার্য্যে অধিকার হয় না। শক্তির ইতর বিশেষ ব্যক্তির ইতর বিশেষে হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীও স্ত্রীলোক, আর একজন পথের ভিখারিণীও স্ত্রীলোক; শরীর মন বৃত্তি বিচার করিলে উভয়কেই এক স্ত্রীজাতি বলিতে হইবে। মহারাণীর শরীরতত্ত্ব স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু কে এমন অজ্ঞান আছেন যে, ভিখারিণী এবং মহারাণীকে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিবেন? মহারাণীর ভিখারিণী হইতে প্রভেদ কিসে? কেবল শক্তিতে। এই শক্তির হিসাবেই ছোট বড় হয়, শক্তির হিসাবেই ভগবান্ এবং জীব সংজ্ঞা হয়। শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্য, আর আমরাও মনুষ্য; রামচন্দ্রও মনুষ্য, আর আমরাও মনুষ্য; শ্রীগৌরাঙ্গও মনুষ্য, আর আমরাও মনুষ্য। অবতারদিগের উদ্দেশ্যই মনুষ্য হওয়া এবং লীলা বিস্তার করা। নিত্যভাব এবং নিত্যপ্রেম জীব দুর্ল্লভ। সমাহিত হইয়া সে ভাব লাভ হয় না, এই নিমিত্ত নারদকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, "আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদিগের হৃদয়ে বাস করি না, যে স্থানে ভক্তেরা আমার গুণকীর্ত্তন করে, সেই স্থানেই আমি অবস্থিতি করি।" ভাব ও প্রেম সম্ভোগের বিষয়। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় পার্শ্বে স্ত্রীপুত্র থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না, অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বর হইলেও সে সময়ে তাহার কোনরূপ বিষয় জ্ঞান থাকে না, এমন কি নিজের অস্তিত্ব আছে বলিয়াও জ্ঞান থাকে না, সমাধিতে এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হয়। যেমন

একবিন্দু জল সমুদ্রে ঢালিয়া দিলে বিন্দুর আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না, জীবের ব্রহ্মসংযোগ হওয়াও তদ্রূপ। এই নিমিত্ত তথায় ভাব প্রেম থাকিতে পারে না। বৈশ্লেষিক শাস্ত্রাদিতে এই ভাব কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ "যোগীদিগের হৃদয়ে বাস করি না" বলিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যোগীদিগের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। তখন পরমাত্মাই একাকী থাকেন, সুতরাং যোগীর আর স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। পরমাত্মার ঘনীভূত অবস্থা-বিশেষের নাম শ্রীকৃষ্ণ, রাম, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি। অবতারদিগকে বুঝিতে হইলে তাঁহাদের শক্তি দেখিতে হয়। অমানুষ শক্তির দ্বারা সাধারণ জীব হইতে অবতারদিগকে প্রভেদ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গাদি অবতারেরা মনুষ্য হইয়া অলৌকিক শক্তিতে জীবশ্রেণীভুক্ত হন নাই। রামকৃষ্ণদেবের শক্তি দেখিলেও তদ্রূপ দেখা যায়। অবতারেরা যেমন সময়ে সময়ে রূপবিশেষ ধারণ পূর্ব্বক সাধকবিশেষের মনোসাধ পূর্ণ করিয়া থাকেন, রামকৃষ্ণদেবও তাহা করিয়াছেন। তিনি মথুরবাবুকে কালীরূপে দেখা দিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীর ভোগের অগ্রভাগ তিনি সময়ে সময়ে ভোজন করিয়া মথুরবাবুর মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। কেদারবাবুকে কৃষ্ণরূপ দেখাইয়াছিলেন। উইলিয়েম নামক জনৈক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাকে যীশুখ্রীষ্টরূপে দেখিয়াছিলেন। কেশববাবুকে নববিধানের ভাবরূপে, শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশকে চৈতন্যরূপে এবং আমাকে রামকৃষ্ণরূপেই কৃতার্থ করিয়াছেন। আমার ধ্যান জ্ঞান রামকৃষ্ণ, মন প্রাণ রামকৃষ্ণ, আমার সর্ব্বস্বই রামকৃষ্ণ। কৃষ্ণ দেখিলে দেখি রামকৃষ্ণ, রাম দেখিলে দেখি রামকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিলে দেখি রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণে সকল খেলা সমাপ্ত হইয়াছে।

জড়মূর্ত্তি অর্থাৎ প্রতিমাদি সম্বন্ধীয় সীমাবিশিষ্ট ভাব, সাকার উৎপত্তির কারণ যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তদ্দ্বারা মীমাংসা করিলে সকল সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। জড়মূর্ত্তি আমাদের কল্পিত হইলে দোষের হয় বটে, কিন্তু ভগবানের কল্পিত রূপ বিধায় তাহাতে জড়ভাব আসিতে পারে না। বিশেষতঃ জড় সাকারের উদ্দেশ্য জড় বস্তু দেখা নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

২য়। রূপ দর্শনাদি মস্তিষ্কের বিকারজনিত সংঘটিত হইয়া থাকে; এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। ভগবানের রূপ দেখা মস্তিষ্কের বিকার কি না, তাহা বিকারগ্রস্ত রোগী দেখিলে কি জানা যায় না? বিকারে লোকে ভূত দেখে, যমদূত দেখে, রাক্ষস দেখে, কাটাকাটি মারামারি দেখে, কিন্তু ভগবানের রূপ দেখে কে? কেহ কেহ বলেন যে, যখন কেহ টাকা টাকা করিয়া ক্ষেপিয়া যায়, তখন সে খোলামকুচিকে টাকা বলিয়া সংগ্রহ করে, কিম্বা আহারের সহিত বিষ মিশান আছে ইহা ভাবিয়া অনেকে পাগল হইয়া যায়, সে সকল ভোজ্য সামগ্রীতেই বিষ আশঙ্কা করে; সেইরূপ ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া মস্তিষ্কের একপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, সে সময়ে মানুষে কত কি দেখিয়া থাকে। এ কথা বাস্তবিক বটে। যাহা অতিরিক্ত চিন্তা করা যায়, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। পাগলামির ভান্ করিলে ক্রমে সে পাগল হইয়া পড়ে, কথাটা নিতান্ত হেতুশূন্য নহে। কোন সময়ে কলিকাতার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া পাগলের ভান্ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাওনাদারেরা আসিলেই মাথামুণ্ড কত কি বলিতেন। কখনো হাসিতেন কখনো কাঁদিতেন এবং কখনো উলঙ্গ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। চিকিৎসকেরা ঔষধাদি দ্বারা কোন উপকার করিতে পারেন নাই। একদা

পূর্ব্বদেশীয় কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিবামাত্র রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। গৃহ হইতে সমুদয় লোককে বাহির করিয়া দিয়া তিনি বাবুকে কহিয়াছিলেন, "মহাশয়! নকল করিতে করিতে আসল হইবার উপক্রম হইয়াছে, সাবধান হউন!" ফলে, যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই ঘটিয়া থাকে, এই কথা যদ্যপি সত্য হয়, তাহা হইলে ভগবান্ দর্শন মিথ্যা হইবে কেন? নাস্তিকেরা বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু তাঁহাদের সে ধারণাশক্তি নাই। কিন্তু নিরাকারবাদীরা তাহা বলিতে পারিবেন না। যেহেতু ভগবানের অস্তিত্ব তাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ মনে করেন, তখন অসম্ভব বলিয়া কিছুই বোধ করা উচিত নহে।

যে জিনিস আছে, তাহার গুহ্য রহস্য আপাততঃ না জানিলেও, তাহার চিন্তা করিলে সত্য বাহির হয়। কখন মিথ্যা ফল ফলে না। চিন্তার ফল—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। যাহা নাই, তাহা ভাবিলে কিছু লাভ হয় না; যেমন ঘোড়ার ডিম, আকাশকুসুম ইত্যাদি। কেবল চিন্তার ফলে সত্য বাহির হয় এবং সেই সময়ে চিন্তাকারীর কি অবস্থা হয়, তাহা মহামতি আর্কিমিডিজের "আপেক্ষিক গুরুত্বতত্ত্বের" আবিষ্কারের ঘটনা স্মরণ করিলে, চিন্তার মরণে কে না ষোড়শোপচারে পূজা দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন? সাইরাকিউসের অধিপতি হিরো, দেবার্চ্চনার নিমিত্ত একখানি স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্বর্ণকারেরা সোণা চুরি করিয়া খাদ মিশাইয়া দেয়, ইহা চিরকালই লোকের সংস্কার আছে। মুকুট দেখিয়া নরপাল বিশেষ আনন্দিত হইলেন, কিন্তু সভাস্থ কোন ব্যক্তি মুকুটে খাদ মিশ্রিত আছে বলিয়া সন্দেহ করিলেন। রাজা বিষাদিত হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে, মুকুট নষ্ট না করিয়া ইহাতে কত খাদ আছে বলিতে হইবে। এই বিষম সমস্যার

ভার আর্কিমিডিজের স্কন্ধে পতিত হইল। আর্কিমিডিজ এই প্রশ্নটী অশনি পতনের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। তিনি ভাবিয়া আকুলিত হইলেন, কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে রাজার নিকট হইতে তাড়না আসিলে তাঁহাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিত। এইরূপ কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন স্নান করিবার সময় জলপূর্ণ টবে নিমজ্জিত হইবামাত্র কিয়দ্‌পরিমাণে জল ছাপিয়া উঠিয়া পতিত হইয়া গেল। আর্কিমিডিজ এই ঘটনাটী দেখিয়াই "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিয়া উলঙ্গাবস্থায় একেবারে রাজসভায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিন্তার বিক্রম কতদূর, চিন্তায় কি হয় বা না হয়, চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতীত তাহা কে বুঝিতে সক্ষম? চিন্তায় লোককে উচ্চ সোপানে উত্থিত করিয়া থাকে, চিন্তায় লোককে সত্য প্রদান করিয়া থাকে, চিন্তায় লোক পাগল হয়, চিন্তায় লোকে উলঙ্গ হইয়া লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। যে ভগবানের জন্য চিন্তা করে, যে ভগবানের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে, যে ভগবানের দর্শনের জন্য ধাবিত হয়, সে পাগল হইতে পারে, সে উলঙ্গ হইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে পারে, সে পথের ধারে কুকুরের সহিত উচ্ছিষ্ট একত্রে ভোজন করিতে পারে। যে সত্য প্রার্থনা করে, সে কি মিথ্যা কাল্পনিক স্বার্থপরতাপূর্ণ সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে পারে? ভগবান্ ভাবিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া ত্যজনীয় নহে, তাহাই বৈজ্ঞানিক সাধকের বাঞ্ছনীয় বিষয়।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, চিন্তাবিশেষে, সত্যবিশেষে, মস্তিষ্কের ভাবান্তর হয়। মস্তিষ্কের যে ভাবে বিষয়ের সুব্যবস্থা হয়, মস্তিষ্কের যে ভাবে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করা যায়, মস্তিষ্কের যে ভাবে লোকের গলায় ছুরি দেওয়া হয়, মস্তিষ্কের যে ভাবে ঈশ্বরকে চূর্ণ-

বিচূর্ণ করা যায়, সে মস্তিষ্কে ভগবান্‌কে দর্শন করা যায় না; কিন্তু দর্শনের সময় মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা না হইলে সে তাঁহাকে দেখিবে কিরূপে? আমরা আমাদের বিষয়ভাবসংযুক্ত মস্তিষ্ককে স্বাভাবিক ও আদর্শ জ্ঞান পূর্ব্বক ঈশ্বর-দর্শনের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করিয়া থাকি, সুতরাং প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকি; অভাব পূর্ণ মস্তিষ্ক কখন আদর্শ হইতে পারে না, এই নিমিত্ত এই আপত্তিটি নিতান্ত হেতুশূন্য বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইতেছে।

৩য়। কাষ্ঠ মৃত্তিকার প্রতিমা পূজায় ভগবানের অবমাননা হইয়া থাকে; এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। মান অপমানের কর্ত্তা আমরা নহি। যিনি সকলের কর্ত্তা, তিনিই বিচার করেন। যাঁহারা এরূপ মান অপমান মনে করেন, তাঁহারা কি ভগবানের মুখে একথা শুনিয়াছেন? যদিও শাস্ত্রের কোন স্থানে কাঠমাটির কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার ভাব স্বতন্ত্র। কাঠমাটিকে ভগবান্ বলিলে তথায় ভগবানের ভাব থাকে না, এই নিমিত্ত তাহাতে সাবধান করা হইয়াছে। কাষ্ঠের কৃষ্ণেই জীবন অতিবাহিত না করিয়া, নিত্য কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাব কৃষ্ণাবতারে অভিনীত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব বক্তৃতায় আভাস দিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে জীবের ভাব শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকা আয়ানের স্ত্রী হইয়া কৃষ্ণকে গোপনে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্যভিচারিণীর ভাব শিক্ষা দিবার জন্য কি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? এবং তাহাই লীলা বলিয়া শাস্ত্র হইয়া গিয়াছে? স্থূলদ্রষ্টা ভাববিরহিত বালকেরা এই কথা লইয়া কৃষ্ণকে কত কটুকাটব্য কহিয়া থাকেন; কিন্তু যে কেহ ভগবানের লীলা রহস্য ভেদ করিবার নিমিত্ত চিন্তাকে আশ্রয় করেন, ভগবান্ সেই চিন্তার-

স্রোতে তাহাকে আপনার তত্ত্বে লইয়া উপস্থিত করেন। সে তখন তাঁহার স্বরূপ বৃত্তান্ত অবগত হইতে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমতী আয়ানের সহধর্ম্মিণী হইয়া কেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন প্রাণ সঁপিয়া কলঙ্কিনী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন? জীবগণ তাহাতে শিক্ষা করিবে কি? তাহারা সকলেই সে ভাবে সিদ্ধ। তাঁহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। জীবের জৈব ভাবে দিন কাটাইয়া পরমায়ু নিঃশেষিত করিলে প্রকৃত কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। স্ত্রীজাতিরা স্বামীকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন। যদিও স্থূল শিক্ষার অন্য স্থান নাই বটে, কিন্তু তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলা যায় না। স্বামীর সহিত জড় ভাব ব্যতীত চৈতন্য ভাব মনে হইতে পারে না। যেহেতু স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যে ভাবে আরম্ভ হয়, পরস্পরের যাহা অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইতে চৈতন্য ভাব কেমন করিয়া আসিতে পারে? কিন্তু স্ত্রীজাতিদিগের স্বামী ভাব অভ্যস্ত বিধায়, এই ভাব ভগবানে অনায়াসে প্রয়োগ হইতে পারে; ভগবান্ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিতে এভাব প্রয়োগ করিলে, তথায় স্বামীর ন্যায় ভাবেই কার্য্য হয়, কিন্তু ভগবানে সে ভাব দাঁড়াইতে পারে না। তাঁহাকে মনে করিলে ছার কুক্কুর শৃগালের আনন্দ অপেক্ষা অনন্ত কোটী গুণে আনন্দ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত তাঁহাতে পতিভাব হওয়া স্ত্রীজাতিদিগের পক্ষে বিধি, শ্রীমতী তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। একটি জড়পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর জড়পতির অনুগামিনী হওয়াকে ব্যভিচারিণী কহে। জড়পতি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে গমন করা জগজ্জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

ঠাকুর বলিতেন, কোন রাজমহিষী প্রাণান্তে স্বর্ণবলয় পরিতেন না। তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কেহ সোণার বালা পরাইয়া দিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দিয়া রুলি ধারণ করিতেন কালক্রমে রাজার

মৃত্যু হইল। রাণী তাড়াতাড়ি রুলি চূর্ণ করিয়া সোণার বালা পরিয়া বসিলেন, সুতরাং লোকে তাঁহাকে পাগলিনী বলিয়া মনে করিল। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "মা! মহারাজা জীবিত থাকিতে আপনি বালা না পরিয়া রুলি পরিতেন কেন? এবং এক্ষণেই বা রুলি ভাঙ্গিয়া আপনার বালা ধারণ করিবার হেতু কি?" রাজ্ঞী হাসিয়া বলিলেন, "যতদিন আমার অনিত্য স্বামী ছিল, ততদিন আমি সধবার অনিত্য চিহ্ন রাখিয়াছিলাম; যেদিন আমি নিত্য স্বামী লাভ করিয়াছি, সেইদিন হইতে আমি নিত্য চিহ্নও ধারণ করিয়াছি। ইহাতে ক্ষতি হইয়াছে কি?"

স্ত্রী জাতিরা স্বাধীন নহেন, তাঁহাদিগকে স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে চলিতে হয়, সেই শিক্ষাই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, স্বামীর মৃত্যু হইলে সে শূন্য স্থান কে অধিকার করিবে? এবং শূন্য রাখিলে বিপদের সমূহ আশঙ্কা, এই নিমিত্ত তথায় শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশন করাইয়া রাখিলে, স্বামীর অভাবজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। মৃত্তিকা বা কাষ্ঠের কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া অনুগামী হইলে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ভাবের আবির্ভাব হয়। কাষ্ঠ মৃত্তিকা সে ভাব প্রদান করিতে পারে না, সুতরাং কাষ্ঠখণ্ডে এবং কাষ্ঠের কৃষ্ণে এত বিভিন্নতার ভাব দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণ বলিলে তখন ঐ জড় মূর্ত্তিতে জড় ভাব নাই এবং তাহার উপাসনায় ভগবানেরই উপাসনা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক মূর্ত্তির দ্বারা ভাববিশেষ লাভ হয়।

৪র্থ। জড় কখনও চৈতন্য হয় না এবং চৈতন্যের কখনও জড়ত্ব হয় না। স্থূলে একথা পূর্ণ মাত্রায় স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থূল ত্যাগ পূর্ব্বক মহাকারণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া যাইলে, জড় ও চৈতন্যের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

স্থূলে, আমরা জড় ও চৈতন্য বলিয়া যাহাদিগকে দেখিতে পাই, তথায় জড়ের অবস্থাবিশেষকে চৈতন্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। এই আমি হাত পা নাড়িতেছি, আমি চেতন; যখন সংজ্ঞাশূন্য হইলাম, তখন আমি চৈতন্যবিহীন হইলাম। এ ভিন্ন চৈতন্যের অন্য রূপ দেখিয়া আমাদের জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য বোধ হয় না। অতএব চৈতন্য বলিয়া আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ স্থূল বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, জড় ও চৈতন্য কাহাকে কহে, তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা যখন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তখন তাহাদিগকে চেতন এবং জড়ের যৌগিক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। দেহ জড় এবং দেহী চেতন, যেহেতু মরিয়া গেলে দেহ পড়িয়া থাকে। আহারাদি দ্বারা যেমন শরীরের পুষ্টি ও বলাধান হয়, তেমনি চৈতন্যশক্তিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শিশুর শরীর এবং চৈতন্য, বালক যুবা এবং বৃদ্ধের শরীর ও চৈতন্যের সহিত তুলনা হয় না। ক্রমে স্থূল শরীর বর্দ্ধিত হয় এবং চৈতন্যও বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। চৈতন্যে বর্দ্ধিত শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, স্থূল পদার্থের কম-বেশীর নিমিত্ত কলেবরের ছোট বড় হয় এবং তজ্জন্য তাহার কার্য্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে; সেইরূপ প্রথম হইতে চৈতন্য পূর্ণ থাকিলে, তাহার পূর্ণ কার্য্য সর্ব্বসময়ে প্রকাশ পাইত, কিন্তু তাহা কখনও হয় না।

যেমন আহার করা যায়, শরীরের কার্য্যও তদ্রূপ পরিণত হইয়া থাকে। বলকারক আহারে বল হয় ও জ্ঞানের প্রাখর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং তাহার অভাব হইলে বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়। আহার বন্ধ করিলে দুর্ব্বল হওয়া যায়, জ্ঞানকাণ্ড বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, ভোজ্যসামগ্রী জড়,

চেতন কিম্বা উহা চেতন এবং জড়ের যৌগিকবিশেষ? জড় বলা যায় না, চেতন পদার্থ বলিতেও ভরসা হয় না। কিন্তু কার্য্যে দেখিলে উহাকে জড় এবং চেতন না বলিলে মীমাংসা করা দুরূহ হইয়া উঠে।

জড় ও চেতনের তাৎপর্য্য বাহির করিতে হইলে, জড় পদার্থ লইয়া বিচার করিতে হইবে। জড় পদার্থ কি, কাহাকে কহে, স্থির করিতে হইলে, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও সর্ব্বশেষে মহাকারণে যাইলে, তবে জড়ের মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহা এ ক্ষেত্রে বিচার করিব না। মোটের উপর এই আভাস দিতেছি যে, স্থূলে পদার্থদিগকে হয় রূঢ় বা যৌগিক কিম্বা মিশ্রিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। রূঢ় পদার্থদিগকে বিশ্লেষণ করিলে অন্য পদার্থে পরিণত করা যায় না। বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শক্তি দ্বারা সাধিত হয়। পদার্থকে শক্তির সহবাসে রাখিলে, উহা এরূপ অবস্থায় পর্য্যবসিত হয় যে, তথায় পদার্থের আর কোন লক্ষণ আছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত পদার্থের পরে শক্তি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের অভিপ্রায়। শক্তি ব্যোমের স্পন্দন মাত্র। ব্যোম বলিয়া জানিবার ও বুঝিবার কিছুই থাকে না, কেবল একমাত্র জ্ঞান থাকে। এই জ্ঞান হইতে অবরোহণ বা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারা পুনরায় শক্তি, পদার্থ, রূঢ় এবং যৌগিকাদিতে প্রত্যাগমন করা যায়। এক্ষণে বিচার করিলে কি বুঝা যাইবে? জ্ঞান সকলের মূল, জ্ঞান ব্যতীত সকলই অবস্থার কথা মাত্র। এই জ্ঞানকে চিৎ কহা যায়, চিৎ সচ্চিদানন্দের শক্তিকে বলে। এই চিৎ শক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত সকলই চৈতন্যস্বরূপ। অতএব জড় বলিয়া কিছুই নাই, তাহা কেবল চৈতন্যের অবস্থা মাত্র। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার

রহিল, বারান্তরে তাহা আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বৈশ্লিষিক এবং সাংশ্লেষিক দ্বিবিধ শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিব যে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? বৈশ্লেষিক শাস্ত্রমতে, এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে বলিয়া, ক্রমান্বয়ে মহাকারণ পর্য্যন্ত বিচার দ্বারা গমন করিতে হয়। মহাকারণে অর্থাৎ যে স্থানে মন বুদ্ধি অবলম্বনহীন হইয়া পড়ে, তথায় সত্য স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করা যায়। এই অবস্থার সাধকেরা কোন অবলম্বন না পাইয়া নিরাকার ভগবান্ বলিতে বাধ্য হন। এই অবস্থা হইতে অবতরণ করিয়া লীলা বা স্থূলে বিবিধ ভাব সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদিকে সাংশ্লেষিক বা সাকারবিষয়ক শাস্ত্র কহে।

রামকৃষ্ণদেবের প্রমুখাৎ সাকার নিরাকার সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং তিনি যাহা বলাইলেন, তাহাই বলিলাম। তিনি সাকার নিরাকার যাহাকে বলেন, তাহা অদ্যাপি কেহ বলেন নাই। সাকার নিরাকার ভগবানের অবস্থার কথা এবং সাধকেরও অবস্থার কথা; তাহা বিচার ও তর্কের কথা নহে। সাকার হন তাহাও তিনি, নিরাকার হন তাহাও তিনি, তাঁহাকে লইয়া বিবাদ কেন? মতভেদ কেন? দাম্ভিকতা কেন? ঠাকুর বলিতেন, "কোন ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সহিত উদ্যানে গমন করিয়াছিল। সে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দিন বাগানটী সমালোচনা করিয়া বেড়াইল। ঐস্থানে আম্রের বৃক্ষ কেন? এস্থানে পুষ্করিণী না হইলে ভাল হইত, এস্থানে পেয়ারা গাছ পুঁতিলে কেন? এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইল।" সেইরূপ আমাদের দিন যাইতেছে, একদিন সন্ধ্যা হইবেই, তাহার সন্দেহ নাই, কি করিতে আসিলাম, কি করিলাম, কি হইল, কি বা হইবে, তাহা না

ভাবিয়া কি করিয়া যাইতেছি ? যে পৃথিবী, পৃথিবীর প্রারম্ভে ছিল, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে, কিন্তু কত লোক জন্মিল, কত লোক কোথায় গেল, তাহার হিসাব কে রাখিয়াছেন! তাঁহারাও ঈশ্বর লইয়া কত আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহাকে কখন সাকার বলিয়াছেন, কখন নিরাকার বলিয়াছেন এবং কখন তাঁহাকে' উড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন সেইরূপ কতলোকে তাঁহাকে কত কথা কহিয়াছেন, তাঁহার তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হয় ? ক্ষতি বৃদ্ধি আপনাদের। তাই রামকৃষ্ণদেব কহিতেন যে, বাগানের গাছ গণনা করিয়া ফল কি ? দুটো ফল খাইয়া লও যে, জীবন সার্থক হউক। ভগবানের অবস্থা বিচার না করিয়া ভগবান্ বলিয়া ডাকুন, ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য সচেষ্টিত হউন, ভগবান্ যে রূপ দেখাইবেন, যে রূপ বুঝাইবেন, তাহাই দেখুন, তাহাই বুঝুন, লোকের কথায় কি হইবে ? আমার উদর অন্যের আহারে পূর্ণ হয় না, আমার শান্তি অন্যের শান্তিতে হয় না এবং আমার পরিত্রাণ অন্যের পরিত্রাণে হয় না। আমি তাহা দেখিয়াছি, প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি, সেই জন্য বলিতেছি, বিবাদ-বিসম্বাদ কেন, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করুন, সকল দিকে সুবিধা হইবে।

রামকৃষ্ণদেব এমন কথা বলেন নাই যে, সকলে তাঁহার উপাসনা করুন, তিনি এমন কোন কথা বলেন নাই যে, উপাসনা-প্রণালী-ভেদে উদ্দেশ্য বস্তুর লাভ সম্বন্ধে ক্ষতি বৃদ্ধি হয়। তিনি নিজে সাধন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, "যে যাহা বলিয়া, যেমন করিয়া, যে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসনা-প্রণালী মতেই হউক, যদ্যপি অনুরাগ সহকারে ভগবান্ প্রাপ্ত হইব বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে, তাহারই অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে।" কিন্তু তাহা করে কে ? যে করে, সেই তাহার সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারে। ভগবান্‌কে দেখিবে কি ? তাঁহাকে দেখা যায় না,

দেখিলেও তাহাকে মস্তিষ্কের ভুল বলিতে হইবে বলিয়া আপনারাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি। ভগবান্‌কে দেখা দূরে যা'ক, ভগবানের বাঁচাই দায় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সকলের কেনা-বেচার মধ্যে হইয়াছেন, মনুষ্যের সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধির আয়ত্তাধীনে আসিয়াছেন। তাহারা তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব যাহা বলিবে, তাঁহাকে তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এমন অবস্থায় ভগবানের ভাব কোথায়? যে তাঁহাকে চাহে, যে তাঁহার বিরহে অস্থির হয়, যে তাঁহার অদর্শনে সকল দিক শূন্যময় দেখে, যাহার জীবন তাঁহার অদর্শনে কণ্ঠাগত হয়, সেই ভক্তের সম্মুখে তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সেই চতুর ব্যক্তিই ভগবানের সাকাররূপের মহিমা বুঝে, সেই ব্যক্তিই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞাত হইবার একমাত্র অধিকারী।

গীত

ভাবের ঘরে চুরি না চলে।
যেই সাকার, সেই নিরাকার
একের খেলা কতই খেলে॥
দিনমণি, কিরণ খানি, হাসায় কমলে,
সলিল শুকায়, রূপ মিশে যায়,
আঁখির আড়ালে।
হেরি শশী, বাষ্পরাশি, সোহাগে গলে,
নীহার ছলে, উষার গলে,
তুষার 'অচলে।

বারি, বরফ, বাষ্প আদি, একটী আসলে ;
সোজা বোঝ, তর্ক ত্যজ,
বিশ্বাসেই মিলে ॥

জপমালা, তুলসীতলা, সকল খেলা সায় করেছি।
যোগসাধনা, উপাসনা, বাসনা বিদায় দিয়েছি ॥
লুকোচুরি প্রাণে প্রাণে, কারে পূজি কেবা জানে,
জানা শুনা অনুমানে, প্রত্যক্ষ তোমায় দেখেছি ॥

একবার ডাক দেখি মন, দয়াময় রামকৃষ্ণ ব'লে।
পাবি দরশন, (ওরে) ডাকার মত ডাকা হ'লে ॥
আর কতদিন ভবে, পাপের বোঝা মাথায় ব'বে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, পাঁচজনার কলে ॥
কোথা তোর অন্তরের ধন, অন্তরে তাঁর কর্‌রে সাধন,
সঁপিয়ে জীবন মন চরণতলে ॥

দ্বিতীয় বক্তৃতা সম্পূর্ণ

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

তৃতীয় বক্তৃতা

—:*:—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সমন্বয়

———

১৩০০ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, প্রাতঃ ৮ ঘটিকায়

ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সমন্বয়

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম

পূর্ব্ব বক্তৃতাদ্বয়ে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' শ্লোকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেবের পূর্ব্বে কেহ কখন তাহা কার্য্যের দ্বারা মীমাংসা করিয়া যান নাই যদিও এদেশে রামপ্রসাদাদি, পশ্চিমাঞ্চলে সুরদাস ও তুলসীদাস প্রভৃতি সাধকগণ ঈশ্বরের নানা মূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন ; যদিও খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্প্রদায়ে এক ভাবের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ (Spirit is the same, but manifestations different) কথাটী শ্রবণ করা যায়, কিন্তু বাস্তবিক সকল ধর্ম্মই এক সত্যের বিকাশ কি না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেহ কখন সাধন করিয়া তাহার সত্য বহির্গত করিতে প্রয়াস পান নাই। অর্থাৎ এক ঈশ্বরের বহুভাব এবং বহুভাব এক ঈশ্বরের, এপ্রকার সাংশ্লেষিক এবং বৈশ্লেষিক বিবরণ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে এমন কি অতি সামান্য জ্ঞান-সম্পন্ন চাষারাও বলে, "যে রাম সেই রহিম", কিন্তু কার্য্যস্থলে ঠিক তাহার বিপরীত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালীন সাধকগণের এক ভগবানের বহুভাবজ্ঞান যেরূপ ছিল এবং রামকৃষ্ণদেব সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমার প্রথম বক্তৃতায় উল্লিখিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব গীতার মতে বলিয়াছেন যে, যে কেহ, যেরূপে,

যে ভাবে ভগবান্‌কে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা কখনও মিথ্যা এবং পণ্ডশ্রম হইতে পারে না। কারণ তিনি বলিতেন যে, তাহা শাস্ত্রোক্ত এবং আমি সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া লইয়াছি। তিনি তজ্জন্য একের বহুভাব দৃশ্য জগতের নানাবিধ পদার্থে দেখাইয়া গিয়াছেন। তথাপি এখনও অনেকের সে সম্বন্ধে ভ্রমোচ্ছেদ হয় নাই। তাঁহারা বলেন যে, এক ঈশ্বর সকলেরই মত, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনাদি করিয়া আসিতেছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন এবং সকল ভাবের সিদ্ধপুরুষেরাও এক কথাই বলিয়াছেন এবং এখনও বলেন। এই নিমিত্ত "সব সেয়ানা কি এক বাত" এবং "কিস্‌কো নিন্দো, কিস্‌কো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি" কথাগুলি বহুদিন হইতে পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তথাপি এই স্থানেই ধর্ম্মের দ্বেষভাব অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়া রহিয়াছে, অতএব ইহা পৃথিবীর নিয়মবিশেষ। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধকের ভেক ধারণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে অকুতোভয়ে কহিতেছেন যে, দ্বেষভাব কখনও যাইবার নহে, ইহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিবে, এমন শক্তি কাহার?

এইরূপ আপত্তিটী নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক হইলেও বহুদর্শনের ফল-স্বরূপ বিধায়, সাধারণ মানবের স্কন্ধে কলঙ্কের ডালা স্থাপন করা যায় না। কথাটাও মিথ্যা নহে। সকলে একের বহুভাব মুখে স্বীকার করিয়াও অপর ভাবের নিন্দা করেন। এস্থলে দোষারোপ করা যাইবে কোথায়?

যাঁহারা একের বহুভাব প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা বহুভাবের এক ঔৎপত্তিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বহুভাবের ভাববিশেষে সমুদায় ভাবের পর্য্যবসান করিয়া গিয়াছেন। আমি

তাহা প্রথম বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছি। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষেরা যেরূপে নিজ কালীভাবে, সমুদয় ভাবের উৎপত্তি ও সমাপ্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অন্যান্য সিদ্ধপুরুষেরাও অবিকল সেই ভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

তুলসীদাস কহিয়াছিলেন—

"যো রাম দশরথ্ঁ কি বেটা,
ওই রাম ঘট্ ঘট্‌মে লেটা,
ওই রাম জগৎ পসেরা,
ওই রাম সব্‌সে নেহারা।"

অর্থাৎ যে রাম দশরথের পুত্র, সেই রামই সর্ব্বজীবে বিরাজ করেন এবং সেই রামই সর্ব্বত্রে অন্তর ও বাহিরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই স্থানে দশরথাত্মজ রামচন্দ্রই তুলসীদাসের আদি ভাব, এই ভাবেই সকল ভাব পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকথিত ইংরাজী মতে এক ভাবের বহুবিকাশ কথাটী প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি কেহ এই বহুভাব একে পর্য্যবসিত করিতে পারেন নাই। বহুভাব কথাটী কথাবিশেষ হইয়া আছে, কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অদ্যাপি ভাবের খেলা আরম্ভ হয় নাই। এই নিমিত্ত তথায় দ্বেষভাব অতিশয় প্রবল এবং স্পিরিট (Spirit) শব্দটী খৃষ্ট ব্যতীত আর কুত্রাপি প্রয়োগ হইতে পারে না বলেন বলিয়া, সাম্প্রদায়িকভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার হেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

মনুষ্যের দ্বারা যাহা সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। একটী ভাবে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, কিন্তু সমুদয় ভাবে পরিভ্রমণ করা সীমাবিশিষ্ট খণ্ড জীবের ধারণার অতীত বিষয়। কথিত হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের

বর্ণমালা অভ্যাসপূর্ব্বক তাহাদের সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সত্যেতে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য এক স্থানে সকলভাবের পর্য্যবসান হয়, এ কথা তিনিই জোর করিয়া বলিতে পারিতেন। ভাব লইয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাব বিবর্জ্জিত হইলে সকলের একাবস্থা লাভ হয়। এই স্থানে সকলেই এক কথা কহিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পরে ভাবের সহিত একীভূত করিয়া গিয়াছেন। এইপ্রকার ভাব একীকরণের নাম ধর্ম্ম-সমন্বয়।

রামকৃষ্ণদেব কি ভাবে এই ধর্ম্ম-সমন্বয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই আলোচনা করিবার জন্য সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি আমাদের দেশে বৈদান্তিক, তান্ত্রিক এবং পৌরাণিক, এই ত্রিবিধ মূল সম্প্রদায়ের সহিত অন্যান্য যাবতীয় সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহা পরে কথিত হইবে। অতএব এই ত্রিবিধ মতের তাৎপর্য্য কি, তাহা এক্ষণে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৈদান্তিক মতের সাধকেরা বৈশ্লেষিক প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে স্থূল জগৎকে মায়া বা অসার বলিয়া পরিত্যাগ করেন, পরে সূক্ষ্ম কারণ এবং মহাকারণে গমন পূর্ব্বক চিদাভাস প্রাপ্ত হইয়া, সৎকে সকলের নিদান জানিয়া পরমহংসাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই চিদাভাস বৈশ্লেষিক সাধনের ফলস্বরূপ অর্থাৎ জড়ভাবসম্পন্ন, সুতরাং তদ্প্রসূত জ্যোতিঃ, রূপ, ভাব, প্রেম ইত্যাদি ভাবসমূহ জড়সম্বলিত জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

পরমহংসেরা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক। কারণ সচ্চিদানন্দের কেবল সৎ তাঁহাদের ধারণার বিষয়। চিৎ, কথিত হইয়াছে, জড়ের ঔৎপত্তিক কারণ বিধায় অর্থাৎ তাহা হইতে স্থূল জড় জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে বলিয়া, তাঁহারা জড়সংযুক্ত চিৎ কহিয়া থাকেন এবং তন্নিমিত্ত

আনন্দকেও জড়ানন্দ জ্ঞান করেন। তাঁহারা ব্রহ্ম বা সৎ বস্তুকে "কেবলাত্মা" "শুদ্ধ স্বরূপ" "শিবঃকেবল" ইত্যাকার শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। পরমহংসেরা মহাকারণে বিচরণ করেন, সুতরাং তথায় কারণ, সূক্ষ্ম বা স্থূলের কোন ভাব স্থান পাইতে পারে না।

নির্গুণ উপাসকদিগকে প্রকারান্তরে আত্মজ্ঞানী কহা যায়। আত্মজ্ঞানীরা আপনাদিগকে ব্রহ্মপদে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত "সোহং" শব্দটী সর্ব্বদা তাঁহাদের মুখে বাহির হইয়া থাকে। পরমহংসেরা চিরসন্ন্যাসী, সুতরাং তথায় কামিনী-কাঞ্চনের কোন সংশ্রব থাকিতে পারে না। এই অবস্থাপন্ন সাধকদিগকে জ্ঞানী কহা যায়। "সোহং" শব্দটী বলিবার নহে, তাহা অবস্থাবিশেষের কথা। যেমন কোন ব্যক্তি নিদ্রাগত হইলে তাহার তখন অস্তিত্ব বোধ থাকে না, কিন্তু নিদ্রাবসান হইলে পূর্ব্ব এবং জাগ্রতাবস্থায় ভাব দুইটী বিচার পূর্ব্বক মধ্যের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে। "সোহং" ভাবও তদ্রূপ, যেহেতু, ব্রহ্মের স্থলে দ্বিতীয় কিছুই নাই এবং তথায় কাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় পরমহংসেরা সমাধিলাভ করেন এবং তাঁহারাই বিজ্ঞানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানের ভাব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অপর ভাবের সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিজ্ঞানাবস্থায় আর ভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং তথায় একাকার হইয়া যায়। স্থূলে বহু এবং মহাকারণে এক, ইহা রামকৃষ্ণদেব বার বার বলিয়া গিয়াছেন। অতএব ভাবে প্রভেদ-জ্ঞান থাকিবে, কিন্তু ভাব বিবর্জ্জিত হইলে আর পার্থক্য-জ্ঞান থাকিতে পারে না।

পরমহংসদিগের সহিত তান্ত্রিক সাধকদিগের চরমাবস্থায় সাদৃশ্য আছে তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষদিগকে কৌল কহে। পরমহংসের ন্যায়

কৌলেরাও আত্মজ্ঞানী এবং আপনাদিগকে শিব বলিয়া ব্যক্ত করেন। কৌলেরা আত্মজ্ঞানী হইলেও সগুণ উপাসক। তাঁহারা পরমহংসের ন্যায় কামিনীত্যাগী না হইয়া কামিনীবিলাসী হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্ত্রীবিশেষকে চিৎশক্তি বা ভগবতী এবং আপনাকে সৎ বা শিবজ্ঞান পূর্ব্বক উভয়ের সম্মিলন দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ বা সচ্চিদ্ একীভূত করাকে সাধনের চরম ভাব কহিয়া থাকেন। এই অবস্থায় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। তখন তাঁহারা উভয়ে পুরুষ-প্রকৃতি জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন, এমন কি সময়বিশেষে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। এই অবস্থার বিরাম হইলে পূর্ব্বস্মৃতি দ্বারা সৎবোধ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ আমি ছিলাম, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এখনও আছি, পরে থাকিব। যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে, তাহাই সৎ, সুতরাং আপনারা শিবপদে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এক্ষণে বৈদান্তিক এবং তান্ত্রিক এই দুইটী সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্য বাহির করিলে দেখা যায় যে, স্থূলে উভয় পক্ষের ভাবের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। বেদান্ত মতে জড় পরিত্যাগ ও তন্ত্রমতে তাহা অবলম্বন করা বিধেয়। পরমহংস-দিগকে আত্মজ্ঞানী বলিলেও তাঁহারা দেহকে মায়াজ্ঞান করেন এবং দৈহিক কার্য্যকলাপগুলিও সুতরাং মায়াপ্রসূত ঐন্দ্রজালিক ঘটনা-বিশেষ বলিয়া বিবেচনা করেন। কৌলদিগের জড় লইয়াই সাধনা। তাঁহারা দুইভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। বামাচার মতে আপনাকে শিব এবং স্ত্রীলোকবিশেষকে ভগবতী জ্ঞানপূর্ব্বক উভয়ের সংযোগ-প্রসূত অতি আনন্দের অব্যবহিত পরে চকিৎ সমাধিবৎ অবস্থালাভ করাই উদ্দেশ্য। দক্ষিণাচারীরা আপনাতেই সচ্চিদের ভাবজ্ঞান করিয়া চিৎশক্তির রূপবিশেষ কুণ্ডলিনীকে আধারচক্র হইতে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক সহস্রার পরম শিবের সহিত সম্মিলন কার্য্য সাধনান্তে

সমাধি লাভ করেন। এই অবস্থার পর্য্যবসানকালে পূর্ব্বের স্মৃতি দ্বারা কথিত মতে আপনাকে শিবজ্ঞান করিয়া থাকেন।

পরমহংসেরা আপনাকে সৎ মনে করেন, কৌলেরাও আপনাকে সৎ মনে করেন, এই অবস্থায় উভয়েই একভাবাপন্ন। পরমহংসেরাও যখন বৈশ্লেষিক বিচার করেন, তখন মহাকারণে তাঁহাদের সমাধি হয়, এই অবস্থা দক্ষিণাচারী কৌলদিগের সমতুল্যভাব এবং অবস্থা বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু এতদুভয়ের কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার। বামাচারী-দিগের অবস্থা যদিও দক্ষিণাচারী এবং পরমহংসদিগের সহিত পরিণামে নিতান্ত অসামঞ্জস্যভাবে পরিদৃশ্যমান হয়, কিন্তু অবস্থাগত সাময়িক ভাব তুলনা করিলে কিয়ৎপরিমাণে মিলিয়া থাকে। বামাচারীভাব পরি-শেষে দক্ষিণাচারীতেই পর্য্যবসিত হয়। ইহা কেবল তমোগুণী ব্যক্তি-দিগের প্রথমাবস্থার কার্য্যবিশেষ বলিয়া জ্ঞান করা যায়। তন্ত্রের 'কৌল' বলিলে ষট্‌চক্রভেদী সমাধিস্থ ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে। কথিত হইল যে, গুণের দ্বারা ভাবের প্রভেদ হয়, অতএব গুণ বলিলে কি বুঝা যায়, তাহা এই স্থলে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, গুণভেদে ব্যক্তিগত ভাবান্তর হয় এবং তন্নিমিত্ত কার্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণী না হইলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের ভাব আসিতে পারে না। সাত্ত্বিক মন সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে চাহে এবং বৈশ্লেষিক বিচার সমাপন করিয়া মহাকারণস্বরূপ সৎভাবের সমীপে উপস্থিত হইতে পারে। রজস্তমে তাহা হয় না। কিন্তু যখন উহারা সত্ত্বের সহিত যৌগিকভাব লাভ করে, তখন মহাকারণের আভাসজ্ঞান অবশ্যই প্রদান করিতে পারে। বামাচারভাবেও সৎ-সম্বন্ধীয় আভাসজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ইহা পরমহংস-প্রণালীর বিরুদ্ধভাব হইলেও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে না। কারণ উভয় স্থলের ভাব, এক সংকে লাভ করা। এই কারণে প্রণালীস্বরূপ গুণযুক্ত সাধকের অবস্থা বিচার করিলে কাহাকেও ইতর বিশেষ করা যায় না। গুণ কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। যখন যাহাতে যে গুণের প্রাধান্য হয়, তখন তাহাতে সেইরূপই কার্য্য হইয়া থাকে। গুণ অতিক্রম করিয়া কাহারও কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। গুণেই এই সংসার চলিতেছে। ব্রহ্মাই ত্রিগুণাবলম্বনে রূপ-বিশেষ লাভ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি ত্রিবিধভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। এই গুণত্রয়ের বিবিধ সংযোগে অসীম যৌগিক উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে স্বপ্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ সৎ চিৎ বলিলে গুণ-যুক্ত সৎ এবং গুণবিবর্জ্জিত সৎ, দুই বুঝাইয়া থাকে। যখন চিৎ হইতে সতে গমন করা যায়, তখন গুণবিবর্জ্জিতভাব, সৎকে লীলায় দেখিলে গুণযুক্ত দেখা যায়, কিন্তু চিৎ সতের সহিত উভয় ক্ষেত্রেই মিলিত থাকা প্রযুক্ত উভয় ভাবকেই সত্য বলা হয়। কিন্তু পরমহংসেরা চিৎকে জড়াভাসসম্পন্ন জ্ঞান পূর্ব্বক কেবল সতে অবস্থিতি করিতে চাহেন। জড়াভাসসংযুক্ত চিৎ বলিতে তাঁহারা রজস্তমো ভাব বুঝিয়া থাকেন। রজস্তমো নিম্নভাবের কথা, সুতরাং সৎপথের পথিকেরা তাহা ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা জ্ঞান করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব এই স্থানে মীমাংসা করিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গুণ হইলেও উহা একের বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কার্য্যবিশেষে, স্থূলে গুণের পার্থক্য জ্ঞান করা যায় বটে, কিন্তু কারণ পর্য্যন্ত বিচার করিলে একেরই রূপান্তর বোধ হইবে। যেমন এক ব্যক্তি কোন সময়ে দানশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সত্ত্বগুণের পরিচয় দিতেছে, সেই ব্যক্তি আর এক সময়ে নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের ক্রীড়ার দ্বারা রজোগুণের অভিনয় করিতেছে এবং সময়ান্তরে কাহারও সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক

তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া পূর্ণ তমোগুণের সাক্ষ্য দিতেছে। যেমন অহিফেণ এক বস্তু। যখন উদরাময় কিম্বা বেদনাদি জনিত রোগে কেহ আক্রান্ত হয়, তখন মাত্রাবিশেষে সেবন করিলে উহা দ্বারা রোগের শান্তি বিধান হয়, অহিফেণ এস্থলে অমৃতবৎ কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু মাত্রাধিক্য হইলে সেই ব্যক্তির জীবননাশের সম্ভাবনা। এই দৃষ্টান্তে দোষ গুণ কাহার কহা যাইবে? স্থূল কথায়, আমরা নানাবিধ দোষারোপ করিতে পারি বটে, কিন্তু স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এক বস্তুর অবস্থান্তরে ফলের তারতম্য হয় বলিয়া শিক্ষা করা যায়। যেমন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্ব্বন যৌগিকবিশেষে অমৃতবৎ ফল প্রদান করে, যথা—দুগ্ধ, ডাল, মৎস্যমাংসাদি—যাহাদিগকে নাইট্রোজিনাস্ (nitrogenous) বা বলকারক সামগ্রী বলিয়া আমরা আহার করিয়া থাকি; কিন্তু এই সকল পদার্থেরা যৌগিকবিশেষে কালান্তক কালকূটাপেক্ষা তীব্র প্রাণনাশকরূপে কার্য্য করে, হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড তাহার দৃষ্টান্ত। দুগ্ধ পরম প্রীতিপ্রদ বলকারক পদার্থ বলিয়া আমারা জানি, কিন্তু উদরাময়াদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিলে অথবা সুস্থ ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে পান করাইলে, বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই প্রকার গুণভেদে যখন ব্যক্তিগত ভাবের তারতম্য হওয়া লীলাময়ের অভিপ্রায়, তখন লীলান্তর্গত জীবের কার্য্য-বৈচিত্র্য দেখিয়া দোষের বোঝা তাহাদের উপর বিন্যস্ত করিলে, মূলে বাস্তবিক অশুদ্ধ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রভু আমার বলিতেন,—

"সাপ হ'য়ে খাই আমি, রোজা হ'য়ে ঝাড়ি;
হাকিম হ'য়ে হুকুম দিই, পেয়াদা হ'য়ে মারি।

এই উপদেশে, এক বস্তুর গুণভেদে কার্য্য-বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে। সাপ জীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা মনুষ্যের ন্যায়, জড়-চেতন

পদার্থ। সাপের দেহ বিসমাসিত করিলে মনুষ্যের ন্যায় রূঢ় এবং যৌগিকাদি পদার্থ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সম্বন্ধে কেবল মনুষ্য কেন, পার্থিব কোন জীব হইতে তাহারা স্বতন্ত্র হইতে পারে না। সর্পের সহিত রোজাকে বিচার করিয়া দেখিলে, যদিও স্থূলে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য ভাব লক্ষিত হইবে, কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণাদিতে ইহাদিগকে কখন পৃথক জ্ঞান করা যাইতে পারে না। শরীর এবং চৈতন্য উভয় স্থলে এক জাতীয় পদার্থ না বলিয়া আর কি বলা যাইবে? সর্প এবং রোজার আদি কারণ বিচারে ইহাদিগকে একেরই বিকাশ বলিয়া রামকৃষ্ণদেব উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মনুষ্যদিগকে স্থূলে সকলকেই স্বতন্ত্র দেখায়। সকলেরই কার্য্য স্বতন্ত্র প্রকার। মনুষ্যের দ্রব্য মনুষ্যে চুরি করিতেছে, মনুষ্য মনুষ্যকেই চোর বলিয়া বন্ধন করিতেছে, মনুষ্যেই বিচারপতিরূপে মানুষকে দণ্ডবিধান করিতেছে এবং মনুষ্যই মনুষ্যকে বেত্রাঘাত করিতেছে; মনুষ্য শিক্ষক, মনুষ্যই ছাত্র; মনুষ্য রোগী, মনুষ্যই চিকিৎসক; মনুষ্য বাবু, মনুষ্যই তাহার ভৃত্য; মনুষ্য ধনী, মনুষ্যই নির্ধন; মনুষ্য রাজা, মনুষ্যই প্রজা; মনুষ্য পাপী, মনুষ্যই দেবতা: মনুষ্য এক এবং মনুষ্যই কার্য্যবিশেষে নানাবিধ ভাবের পরিচয় দিতেছে।

যদিও মনুষ্যেরা এক প্রকার পদার্থে সংগঠিত হইয়া এক প্রকার নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু গুণভেদে তাহাদের কার্য্যবৈষম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহার যে প্রকার গুণে জন্ম, সেই গুণধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাওয়া তাহার শক্তিসঙ্গত নহে। এই গুণত্রয় চিৎশক্তির রূপবিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং যে যাহা করে, তাহা তাহার দোষ বা গুণের কার্য্য নহে। যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কালীয় সর্পের দর্পচূর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুই কি জন্য বিষ উদ্গীরণ করিয়া সকলের

মৃত্যুর কারণ হইয়াছিস্?" কালীয় বিনীত ভাবে বলিয়াছিল, "প্রভো! আমি অমৃত কোথায় পাইব? আমায় তুমি বিষধর করিয়াছ; বিষের পরিবর্ত্তে যদ্যপি অমৃত দান করিতে, তাহা হইলে আমার মুখে তাহাই নিঃসৃত হইত। তুমি যাহাকে যাহা দিয়াছ, তাহা হইতে তাহাই বহির্গত হয়। গাভীকে দুগ্ধ দিয়াছ, সে দুগ্ধ দিতে পারে। পুষ্পে পরিমল দিয়াছ, সে তাহার দ্বারা সকলকে আমোদিত করিতে পারে। ফলে—যে স্থানে তুমি যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ, সেই স্থানে সেইরূপেই কার্য্য হইতেছে।" প্রভু আরও কহিতেন, "যেমন গ্যাস, এক ঘর হইতে নলের ভিতর দিয়া নানা স্থানে উহা প্রেরিত হইয়া কোথাও পরীতে, কোথাও লণ্টনে, কোথাও ষ্টারাকৃতিতে, কোথাও ঝাড়ে, ইত্যাকার বিবিধ বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আলোকের আধার বিচার করিলে সকলকেই স্বতন্ত্র জ্ঞান করিতে হইবে কিন্তু মহাকারণ হিসাবে গ্যাস সর্ব্বত্রে এক এবং এক স্থান হইতে একই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ভগবান্ সম্বন্ধেও তদ্রূপ, তিনি এক, কিন্তু আধার বা গুণভেদে তাঁহাকে স্বতন্ত্র দেখায়।"

এই গুণভেদের নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক বা বহু ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যদ্যপি বৈদান্তিক পরমহংস এবং তান্ত্রিক কৌলদিগের বৃত্তান্ত বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট বলা যায় না। সৎ এক বস্তু এবং চিৎও এক বস্তু। চিৎ ত্রিভাগের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ গুণ বা তাহার যৌগিক পন্থাবিশেষ অবলম্বন ব্যতীত কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না। বৈদান্তিক এবং তান্ত্রিকভাব ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ এবং গুণাবলম্বন করাও সাধনের অঙ্গ, সুতরাং উভয় স্থলেই উদ্দেশ্য একই প্রকার, তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি বৈশ্লেষিক বা জ্ঞান এবং সাংশ্লেষিক বা ভক্তি নামে দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই বিভাগকে দুইটী আদি প্রণালী কহা যায়। মানববর্গেরা যে প্রকার সম্প্রদায় সংগঠিত করিয়া স্থূলে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করেন, তৎসমুদায় দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। জ্ঞানপন্থীদিগকে অবস্থাভেদে দুই প্রকার দেখায়। কেহ কেহ সৎ ব্যতীত অন্য কিছুই বিশ্বাস করেন না এবং কেহ কেহ সৎকে সত্য জ্ঞান পূর্ব্বক তৎপ্রসূত ব্রহ্মাণ্ডকেও সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই উভয়বিধ মতাবলম্বীরা আত্মজ্ঞানী বলিয়া কথিত। যাঁহারা কেবল সৎকে বিশ্বাস করেন, পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহারা দৃশ্য জগতকে মায়া কহেন এবং ইহার কোন অংশকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। যে কেহ মহাকারণকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকার হইয়া থাকে। মহাকারণে মন সংলগ্ন হইলে তখন আর তাঁহার স্বাতন্ত্র্যভাব থাকে না। জ্ঞানীদিগের এই অবস্থাকে সমাধি বলে। এই অবস্থা হইতে যাঁহারা পুনরায় পবিত্র হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক পুরুষ কহা যায়। জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী বলিয়া যাহা কথিত হইল, তাহা কেবল অবস্থান্তরের কথা মাত্র বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সৎ জ্ঞান এবং সৎ সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান কহা যায়। যেমন ভূগোল পাঠে কাশীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া—এই শিক্ষাকে জ্ঞান কহে। যদ্যপি কাশীতে গমন করিয়া কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করেন, তাহার সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। এই বিজ্ঞান লাভ করিতে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহাকে সাধন কহে।

বিজ্ঞানী এবং জ্ঞানীদিগের ভাব একই প্রকার। তাঁহারা সর্ব্বত্রে সৎই উপলব্ধি করেন, এই নিমিত্ত সকল বস্তুতেই 'সোহং' বা 'আমি' জ্ঞান করিয়া থাকেন।

সৎ মতের উদ্দেশ্য মহাকারণ, সুতরাং তাহার সাধন প্রণালীতে স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদির কোন ভাব থাকিতে পারে না। এইজন্য এই প্রণালীতে কামিনী-কাঞ্চন ভাব একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তান্ত্রিক মতেও মহাকারণে সৎ এবং চিৎ বা পুরুষ এবং প্রকৃতি ভাব, কেবলমাত্র স্থূলে সাধনা হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, বামাচারীরা আপনাকে পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে শক্তি জ্ঞান করেন; দক্ষিণাচারীরা আপনাকে দুইয়ের সমষ্টি বোধে কুণ্ডলিনী চিৎ এবং পরম শিবকে সৎ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, অতএব তন্ত্র এবং বেদান্তাদি মতে কার্য্য প্রণালী পরস্পর সম্পূর্ণ প্রভেদ হইলেও উদ্দেশ্য উভয়স্থলেই এক প্রকার।

পুরাণ শাস্ত্রাদি লইয়া তৃতীয় প্রকার সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছে। ইহাকে লীলা বা আনন্দ পন্থা কহা যায়। লীলা বা পৌরাণিক মতে চিৎ শক্তির কার্য্যকলাপ অবলম্বন করিয়া সাধনাদি করাই অভিপ্রায়।

চিৎ শক্তির এক পক্ষীয় বিকাশ আমরা এই দৃশ্য জগতকে কহিয়া থাকি এবং আর এক পক্ষীয় বিকাশ ভগবানের রূপাদি ধারণ করাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। জ্ঞানীরা এই জড়াভাস সংযুক্ত চিৎ অনুধাবন করিতে পারেন, যেহেতু, জড় বিচার দ্বারা তাঁহারা সৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু চিৎ শক্তির লীলার দিক তাঁহারা বুঝিতে পারেন না বলিয়া, তাহাকেও জড় ভাবে পর্য্যবসিত করিয়া দেন। লীলায় চিৎ-শক্তিরই বিকাশ প্রতীয়মান হয়। যদিও চিৎ শব্দটী ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু উহা দ্বারা সৎকে পরিত্যাগ করা যাইতেছে না। চিতের কার্য্য হইলেই তথায় সৎ আছেন, একথা স্থির নিশ্চয় জানিতে হইবে। সৎ ব্যতীত চিৎ থাকিতে পারেন না। এই নিমিত্ত লীলায় চিৎ শক্তির কার্য্য বলিলে সৎ চিৎ যুগল থাকা কর্ত্তব্য। সৎ চিৎ জ্ঞানের আদর্শ

শিব দুর্গা। শিব সৎ বা পুরুষ এবং দুর্গা চিৎ বা শক্তি। রাম সীতা ও কৃষ্ণরাধার স্থানেও ঐরূপ পুরুষ প্রকৃতির ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লীলায় সেব্য-সেবকভাবে উপাসনার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে আমি এবং আমার অর্থাৎ আমি সেই অদ্বিতীয় ভগবান্ সৎ স্বরূপ এবং আমার চিৎ শক্তির বিভূতি সর্ব্বত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেব্য-সেবকভাবে তুমি এবং তোমার অর্থাৎ তুমিই সৎ স্বরূপ একমেবাদ্বিতীয়ং এবং তোমার অর্থাৎ চিৎ শক্তির অনন্ত ব্যাপারে আমরা সৃজিত জীববিশেষ। এইরূপে ধর্ম্ম-রাজ্য বিশ্লেষণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব সমুদায় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দুইটী ভাবে পর্য্যবসিত করিয়া কহিয়াছেন, "যেমন সমুদ্রে নদ নদী আসিয়া মিলিত হয় অথবা তাহারা মিলিত আছে, সেইরূপ সকল সাম্প্রদায়িকভাব অনন্ত ব্রহ্মেই সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।" "যেমন বৃক্ষের প্রশাখার পল্লবাদি দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা সকলেই শাখাবিশেষ দ্বারা এক গুঁড়িতেই সম্বন্ধ রহিয়াছে। গুঁড়ি এক, কিন্তু কাণ্ড, প্রকাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, প্রপল্লব, বিচার করিলে ক্রমে বহু, এক গুঁড়ি হইতে অনেক দূর বলিয়া প্রতীতি হয়; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এক সত্বা সর্ব্বত্রে উপলব্ধি করা যায়।"

কথিত হইল যে, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বহু এবং অসংখ্য হইলেও মূলে দুইটী ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা আত্ম-তত্ত্ব এবং লীলা-তত্ত্ব বা সেব্য-সেবক ভাব। এই দ্বিবিধ ভাবের বিবিধ ছায়ায় অর্থাৎ গুণ ভেদের নিমিত্ত স্থূলে ধর্ম্ম প্রণালীর পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব আপনি সাধক হইয়া, এই রহস্য ভেদ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন এবং সাধন ফলের দ্বারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের দ্বেষ ভাব বা গোঁড়ামি চূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগকে এই ভাব শিক্ষা করিতে হইবে যে, যিনি যাহা বলিয়া ঈশ্বর

সাধনা করিবেন, তাহাতে অন্যের আপত্তি চলিবে না, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির মস্তকে রামকৃষ্ণদেবের এই নব শিক্ষা-রূপ অশনি নিপাত করিতে হইবে। গোঁড়ামির জ্বালায়, দ্বেষাদ্বেষির জ্বালায়, সুকুমারমতি :নব প্রস্ফুটিত মেধাবিশিষ্ট যুবকদিগকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। এমন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, যাহার সৌরভে দেশ বিদেশ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে যে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক সংগঠন ইয়ত্তা করিতে বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক অদ্যাপি ঘূর্ণায়মান হইতেছে, সমাধি লাভ, স্বরূপ দর্শন, যোগের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা বুঝিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত হিন্দু সন্তান ব্যতীত কোন জাতির অধিকার বিস্তারিত হয় নাই, সেই হিন্দু সন্তানেরা আপন ধর্ম্ম, আপন পিতৃ পুরুষের পৈতৃক সম্পত্তির উপকারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত ভাববিশেষ লইয়া গোঁড়ামির বাদশা এবং দ্বেষভাবের অবতার-স্বরূপ হইয়া আত্মম্ভরিতা প্রচার করিতেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আমি অনুনয়ে করযোড়ে চরণে পতিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের এই নবভাব শিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খৃষ্টান হউন, বৌদ্ধ হউন, আর যে কেহ হউন, কাহাকেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না। যিনি যাহা সাধন করিতে ভালবাসেন, তিনি তাহাই অতি অপূর্ব্ব ভাবে সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। যে গোঁড়ামির পূতিগন্ধে দশদিক কলুষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরিষ্কৃত হইয়া নৈষ্টিক ভাব-রূপ স্বাস্থ্যজনক ভাবে পরিণত হইবে।

গোঁড়ামি কাহাকে কহে, এই স্থানে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। অজ্ঞানকেই গোঁড়ামির গর্ভধারিণী বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ধর্ম্মের যে ভাবে বিশ্বাস করিয়া সাধন করেন, তাঁহারা যত্তপি সিদ্ধাবস্থা লাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, পরে মন্তব্য বাহির

করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি কস্মিন্‌কালে কাহাকেও নিন্দা করিতে পারেন না, তদ্বিষয়ে সকল জাতির সিদ্ধ পুরুষেরা ভূরি ভূরি প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন কথায় বলে, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি," ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গোঁড়ারাও সেই প্রকার। যাহারা গোঁড়া, তাঁহাদের ইহকাল এবং পরকাল অন্ধকারাবৃত। প্রভু বলিতেন, "যাহার এখানে আছে, তাহার সেখানেও আছে।" গোঁড়াদিগের হৃদয় সর্ব্বদা পরচর্চ্চায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অন্যের ধর্ম্ম সাধন হইতেছে না, অন্যে সত্যভ্রষ্ট হইয়া মিথ্যা কাল্পনিক ভাবে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি দিতেছে, ইত্যাকার আলোচনা দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া, নিজ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া, নিজ সাধ্য বস্তু হইতে কোথায় নিপতিত হইয়া যাইতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিক তিনিই দিশেহারা হইয়া পড়েন। ধর্ম্ম সাধন করা শান্তির জন্য, নিজ অভাব বিমোচনের জন্য, কিন্তু গোঁড়ামিতে তাহা হয় কি না, একবার স্থির হইয়া বিচার করিলে তদ্দণ্ডে জ্ঞান জন্মে। যাহারা গোঁড়া, তাহারা অশান্তির করকবলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক ব্যক্তির বিরক্তির এবং অশান্তির হেতু হইয়া থাকেন। গোঁড়াদের আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্ম নিজ নিজ সাধন-লব্ধ-সামগ্রী, অন্য কর্ত্তৃক তাহা প্রদত্ত হইলেও নিজের যত্ন এবং চেষ্টা প্রয়োজন। প্রভু বলিয়াছেন যে,—

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হ'ল।
একের দয়া না হ'তে জীব ছারেখারে গেল।"

অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভগবৎ ভক্তেরা লোকের মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকেন। যে পথভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য ভক্তেরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেন, সেই ভক্ত-বাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র উহাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত ভগবান্ গুরুর হৃদয়ে আসিয়া উদয় হন। সুতরাং ঐ

ব্যক্তিবিশেষের প্রতি গুরুর দৃষ্টি পতিত হয়। গুরু তাহাকে পরম ধন প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিল না। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা রামকৃষ্ণদেবের নিকট দেখিয়াছি। এক ব্যক্তি নানা দেশ, নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া অবস্থিতি করিল। এই ব্যক্তি অনুমান তিনশত বিয়াল্লিশ জনকে গুরু করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা মালা জপ করিতে ভালবাসিতেন। ভক্তেরা এই ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষে মালা জপ করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিষাদিত হইয়া তাহাদের মনের খেদ প্রভুর কর্ণগোচর করিলে পর তিনি এক দিন উক্ত সাধকের মালা কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, "অদ্যাবধি তোমার জপমালা সাঙ্গ হইল।" সে ব্যক্তি তখন "যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা" করিয়া পুনরায় ঐ মালা জপ করিতে লাগিল। উহাকে পুনরায় মালা জপ করিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব বিষাদিত হইয়া বলিলেন যে, "দেখ আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে অবিশ্বাস করিও না, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।" সে ব্যক্তি তথাপি শুনিল না। তাহার মন কি বুঝিয়া আপনাকে অভিমানে উন্নত করিয়া রাখিয়াছিল যে, এমন দেবতাদুর্ল্লভ ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত হইয়াও কোনমতে গ্রহণ করিল না। অতএব কত যত্নে যে পরম পদার্থ রক্ষা হয়, যিনি তাহার কার্য্য করেন, তিনিই ইহা বুঝিবার একমাত্র পাত্র। গোঁড়ারা সেই পরম সত্যস্বরূপ সনাতনকে প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়বিশেষে প্রবেশ করেন; কিন্তু তথায় আপনাদের আপনারাই হারাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে ঠকিয়া যান। অতএব গোঁড়ামিতে দুকুল অপবিত্র হয়, অর্থাৎ আপনাদিগকে ঠকিতে হয় এবং তাহাদের কথা যাহারা শ্রবণ করে, তাহারাও ঠকিয়া যায়।

আমি বলিয়াছি যে, কার্য্য হিসাবে ফল লাভ হয়। যে কার্য্য করে,

সেই তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে থাকে। যে চুরি করে, সেই কারাগারে পচিয়া মরে, চোরের শাস্তি অপরে প্রার্থনা করিয়া লইলেও তাহার মুক্তি লাভ হয় না। যে যতদূর পূর্ব্বে যাইবে, ততদূর পশ্চিম তাহার পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে। সেইরূপ আপন জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া অপরের ভাবে কুৎসা বা দোষ বাহির করিতে চেষ্টা না করিয়া, নিজের কি হইল চিন্তা করিলে, যে সময় অপরের ধর্ম্মের গ্লানি কীর্ত্তনে কাটিয়া যায়, সেই সময় আপন ইষ্টকে স্মরণ করিলে অসীম উপকারের সম্ভাবনা।

কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা করিবার পূর্ব্বে, তাহার নিজের ভাব বুঝিয়া লইয়া অপরের ভাব বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে কেহ কখন কাহাকে বিদ্বেষ করিতে পারে না। যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সকলেই আহার করিয়া থাকে। আমিও আহার করি, আমার ক্ষুধা শান্তি হয়; আর একজন আহার করে, তাহারও ক্ষুধা শান্তি হয়। আহারীয় সামগ্রী সর্ব্বত্রে একপ্রকার হইতে পারে না। গুণভেদে রুচি-ভেদ হয়, সুতরাং ভোজ্য পদার্থ তদনুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদ্যপি কেহ বলেন যে, "আমি যাহা ভোজন করি, তাহাই ভক্ষণ করিবার একমাত্র বস্তু ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়াছে, অন্যে যাহা আহার করে, তাহা একেবারে ভোজ্য পদার্থের শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে না;" সাধারণে এ প্রকার ব্যক্তিকে যেরূপ অজ্ঞান বা বাতুল বলিয়া মনে করেন, সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদিগকেও তদ্রূপ মনে করা কর্ত্তব্য। গোঁড়ামি কতদূর নিকৃষ্ট এবং তাহা যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে উহা কতদূর অনিষ্টজনক, একটী উপাখ্যান দ্বারা রামকৃষ্ণদেব তাহা কহিয়া গিয়াছেন।

কোন দেশে এক ব্যক্তি অতি বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। তিনি অতি-

কঠোরতার সহিত তাঁহার ইষ্টদেবের আরাধনা করায়, বিষ্ণু উঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলি শ্রবণ কর। তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে হর-হরি এক? তবে কি জন্য হরের প্রতি দ্বেষ ভাব যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ?" বিষ্ণু প্রমুখাৎ 'হর' শব্দ বহির্গত হইবামাত্র ঐ সাধক অমনি দুই করে শ্রবণদ্বয় আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর! আমি ও নাম শ্রবণ করিব না বলিয়া লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাননবাসী হইয়া আপনার উপাসনা করিতেছি, আপনিও তাহা জানেন। তবে দাসের প্রতি এত নির্দ্দয়াচরণ করিলেন কেন? আপনি আমার সর্ব্বস্বধন, আপনিই আমার একমাত্র শ্রোতব্য।" বিষ্ণু বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন।

বিষ্ণুর এই প্রকার কার্য্য অবলোকনে সাধক নিতান্ত বিষাদিত হইয়া পুনরায় সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল ঘোরতর সাধন দ্বারা বিষ্ণুকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেন। তিনি দুই পদ অগ্রসর হইয়া সাধকের শিবের প্রতি দ্বেষ ভাব স্মরণ পূর্ব্বক দশ পদ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু ধন্য সাধনা, পরিশেষে তিনি ভক্তের নিকট গমন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু এবার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একাধারে হর-হরি রূপ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন। ভক্ত নিজ ইষ্টকে সাক্ষাৎ দেখিয়া আনন্দ সহকারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে জল লইয়া বিষ্ণুর লক্ষণাক্রান্ত চরণটী ধৌত করিয়া দিলেন, কিন্তু শিব লক্ষণযুক্ত দ্বিতীয় চরণের দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করিলেন না। ঐ চরণে সচন্দন তুলসী পত্র স্থাপন করিয়া পরে সুগন্ধ পুষ্পাদি লইয়া অঞ্জলি দিলেন। পূজান্তে ধূপাঘ্রাণ করাইবার সময় তিনি বাম হস্তে শিবলক্ষণযুক্ত নাসিকারন্ধ্র টিপিয়া ধরিলেন। ভক্তের এই

প্রকার কু-ব্যবহার এবং বিদ্বেষ ভাবের আতিশয্য দেখিয়া তখন বিষ্ণু বলিতে লাগিলেন, "রে দুর্ম্মতি ! তোর্ নিতান্তই দুরদৃষ্ট। আমি তোকে একাধারে হর-হরি রূপ দেখাইলাম, তথাপি তোর শিবের প্রতি দ্বেষ গেল না। আমিই শিব, আমিই হরি, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তোর জ্ঞানোদয় হইল না? তোকে আর আমি কি বলিব? তুই দেবতা হইবি বলিয়া কামনা করিয়াছিস্, তাহা পূর্ণ হইবে বটে কিন্তু শিবের প্রতি দ্বেষ ভাবের জন্য তোকে অতি শোচনীয় ভাবে দিনযাপন করিতে হইবে। দেবতা হইবি, তাহা আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু তোর পূজা শাস্ত্রবিহিত হইবে না। যে পুষ্পে দেবতাদিগের পূজা হয়, তাহা তোকে প্রদত্ত হইবে না, ঘেঁটু ফুল তোর জন্য ব্যবস্থা হইল। দেবতা পূজায় যাহাদের কোন অধিকার নাই, সেই স্ত্রীজাতিরা বামহস্তে তোকে পূজা করিবে। যে সকল উপচার অন্যান্য দেবতাদিগের জন্য কথিত আছে, তদ্দ্বারা কেহ তোর তৃপ্তি সাধন করিবে না। অন্যান্য দেবতার পূজান্তে লোকে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, তোর পূজায় তোর নিগ্রহ দ্বারা তাহারা আনন্দ সম্ভোগ করিবে।" এই বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্দ্ধান হইলেন। সাধক ইষ্টদেবের এই প্রকার কঠোর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াও শিব নিন্দা করিতে বিরত হইলেন না।

তিনি অতঃপর লোকালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক তিনি দেবতাবিশেষ হইয়াছেন, তাহাও প্রচার করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে তখন শিবনিন্দুক বলিয়াও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল। বালকেরা যখন শ্রবণ করিল যে, সাধক ঠাকুর শিব-নামে নিতান্ত বিরক্ত হন, তাহারা সেই দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অমনি হাত তালি দিয়া 'শিব' 'শিব' বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল। যত 'শিব নাম তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত

হইত, তিনি ততই বিরক্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেন। কখন বা বালকদিগকে তাড়না করিতেন এবং কখন বা তাহাদিগকে প্রহারও করিতেন। ক্রমে ছেলেদের জ্বালায় যারপরনাই বিরক্ত হইয়া বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তদনন্তর তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, কোথায় যাইয়া শান্তি লাভ করিব? ছোঁড়ারা এক মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া উপবেশন করিতে দেয় না। অগ্রে পথে বাহির হইলে তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইত, এক্ষণে বাসস্থান পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, যাহাতে কর্ণবিবরে আর ঐ 'শিব' 'শিব' শব্দ প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তদবধি দুই কর্ণে দুইটী ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলেন। যখন বালকেরা 'শিব' 'শিব' বলিয়া চীৎকার করিত, তিনি তখনই মস্তক নাড়িয়া ঘণ্টা ধ্বনি করিতেন। তদবধি ঘণ্টার শব্দে শিব শব্দ শ্রবণ করা স্থগিত হইল। এই সাধক এক্ষণে 'ঘণ্টাকর্ণ' বা 'ঘেঁটু ঠাকুর' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মদ্বেষীদিগের বাস্তবিক শান্তি নাই। তাই তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন, তথাপি কেমন সংস্কারের বিচিত্র মহিমা যে, তাহা হইতে তাঁহারা কোন মতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। প্রভু এই নিমিত্ত বলিতেন যে, "একবার কোন বিষয়ে সংস্কার জন্মিয়া গেলে, তাহা দূর করা অতীব কঠিন। যেমন ধোপার বাড়ীর কাপড় যে রঙে ইচ্ছা অনায়াসে রঞ্জিত করিতে পারে, কিন্তু একবার একটী রং ধরিয়া গেলে তাহার উপরে আর অন্য রং দেওয়া সহজ নহে। সেইরূপ আমাদের মনে সংস্কারবিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে।"

সংস্কারের কার্য্য অতিশয় প্রবল। যেমন কোন পাত্রে পেঁয়াজ কিম্বা রশুন ছেঁচিয়া রাখিলে শতবার ধৌত করিলেও তাহার গন্ধ যায় না, সংস্কারও তদ্রূপ। একদা আমার জনৈক পূজ্যপাদ প্রভু-পদাশ্রিত ভ্রাতা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "দেখ আমি পথে আসিতেছিলাম, এমন সময়ে মলের শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম যে, একটী বারাঙ্গনা আসিতেছে। আমি তখনই আপনাপনি মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মন! তুমি কেন ফিরিয়া দেখিলে? তুমি কি ঐ বারাঙ্গনার আলিঙ্গনাকাঙ্ক্ষী' মন তাহা স্বীকার করিল না। যদ্যপি মনের এরূপ কোন বাসনা ছিল না, তবে মলের শব্দে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল কেন?" আমি তাহার কোন কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। অতঃপর এই বিষয়টি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি একদা দেশ হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় পথে বিশ্রাম করিতেছিলাম। বাসার নিকট একখানি গরুর গাড়ীর দুইটী দামড়া গরু বাঁধা ছিল। একটী দামড়া গরুকে মধ্যে মধ্যে আর একটীর উপর উঠিতে দেখিয়া, গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, ঐ গরুটীকে অধিক বয়সে দামড়া করা হইয়াছিল, সুতরাং তখন উহার সহবাস সংস্কার জন্মিয়াছিল। সেই পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ দামড়ার এরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তোমাদের পূর্ব্ব সংস্কার জনিত মলের শব্দে ঐরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল।" তিনি পূর্ব্ব সংস্কার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে একটী সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে লইয়া অনেক সময় আনন্দ করিতেন। সাধুটীকে ক্রমে সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল।

যে স্থান দিয়া গৃহস্থ মহিলারা গঙ্গার জল আনয়ন করিতে যাইত, সাধুজী সেই স্থানে আসন করিয়া বসিতেন এবং অনিমিষ নেত্রে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন ও মধ্যে মধ্যে নস্য লইতে লইতে বলিয়া উঠিতেন, "আরে, এই আওরাৎ বড়া খপসুরৎ হ্যায়।" একদিন রামকৃষ্ণদেব এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে যারপরনাই তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার এখনও এত সাধ আছে, তবে কেন সন্ন্যাসী হইয়াছিলে? যাহা একবার উদগীরণ করিয়া ফেলিয়াছ, পুনরায় তাহাই ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে কেন? ছি! ছি! ইহা নিতন্ত নিন্দার কথা!" এই সাধুটী যদিও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যদিও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া ধৈর্য্যরেতা হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বা স্ত্রী সম্বন্ধে সংস্কার ছিল বলিয়া, স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র তাহার পূর্ব্বের ভাব উদ্দীপন হইত।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গোঁড়ারা সেইরূপ কতকগুলি গোঁড়ামি-রূপ সংস্কারের দাস হইয়া সর্ব্বদা ঘৃণিত হইয়া থাকেন। শাক্ত বৈষ্ণবকে এবং বৈষ্ণব শাক্তকে, সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে, নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে, খ্রীষ্টান হিন্দুকে, হিন্দু খ্রীষ্টানকে, মুসলমান হিন্দু এবং খ্রীষ্টানকে অযথা নিন্দা এবং দ্বেষভাবে নানাবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। সকলেই সকলের দোষ বাহির করিতে চেষ্টা করেন, সকলেই আপনার ধর্ম্ম-ভাব অভ্রান্ত উজ্জ্বল জ্ঞান করিয়া অপরকে পথভ্রান্ত এবং অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। এরূপ দ্বেষভাব নিজ ধর্ম্মের ও বিশ্বাসের ক্রটির নিমিত্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি প্রায় সম্পূর্ণ বাহ্যিক এবং কপটতায় পরিপূর্ণ। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "এক দিন কৈলাসশিখরে ভগবতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি গঙ্গার

যে এত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাক, তবে গঙ্গাস্নায়ী ব্যক্তিরা আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে কেন? গঙ্গা কি তাহাদিগকে মুক্তিদান করিতে অক্ষম? অক্ষম নহেই বা বলিব না কেন?' শিব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'দেবি! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে মিথ্যা নহে। লোকেরা অজ্ঞানী, গঙ্গাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের কার্য্য এবং অন্তরের ভাব দুই প্রকার হয়। গঙ্গাস্নান করে বটে কিন্তু বিশ্বাসে নহে।' ভগবতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'সেকি কথা? সকলেই অবিশ্বাসী?' শিব বলিলেন, 'চল, সত্য মিথ্যা এখনই স্বচক্ষে প্রত্যহ করিবে।'। শিব-দুর্গা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর রূপে জাহ্নবীর কূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, প্রবীণ বিজ্ঞপ্রবর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অসংখ্য নরনারী অবগাহন করিতেছে। তাহারা প্রশান্তচিত্তে বিল্ব জবা সহকারে পূজার্চ্চনাদিও করিতেছে এবং কত বিচিত্র প্রকার মন্ত্রাদি উচ্চারণও করিতেছে। ভগবতী এই সকল দেখিয়া নিতান্ত আনন্দিতা হইলেন। তদনন্তর মহাদেব ভগবতীকে কহিলেন, 'দেখ আমি এই স্থানে বস্ত্রাবৃত হইয়া মৃতবৎ পতিত থাকি, যাহারা স্নানাদি সমাধা করিয়া প্রত্যাগমন করিবে, তুমি তাহাদিগকে কহিবে যে, আমার স্বামী সহসা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু কথা আছে যে, যে কেহ পুণ্যবান্ অথবা পুণ্যবতী হইবেন, তাঁহার করস্পর্শে ইনি পুনর্জ্জীবিত হইবেন। এই কথা বলিয়া শিব ভূমিতলে শবের আকার ধারণ করিলেন। ভগবতী অতি বিনয়ে সরোদনে প্রত্যেক নরনারীকে শিবের আদেশমত কথাগুলি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। সকলেই আপনাপন পাপ কর্ম্মগুলি স্মরণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, 'বাছা আমরা সংসারী জীব, আমাদের দেহ নানাবিধ পাপে কলুষিত এবং এরূপ অভিমানও নাই যে, আমরা আপনাদিগকে পাপবিবর্জ্জিত জ্ঞান

করিতে পারি।' ভগবতী কহিলেন, 'কেন, গঙ্গাস্নান করিয়াছ, তথাপি পাপ বিনষ্ট হয় নাই? তবে গঙ্গাস্নানের ফল কি?' তাহারা হাসিয়া বলিল যে, 'শাস্ত্রে যাহা লেখা থাকে, সমুদয় কি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?' দুর্গা কহিলেন, 'সে কি মহাশয়! শাস্ত্রের কতক সত্য, কতক মিথ্যা স্বীকার করিলে শাস্ত্রের আর রহিল কি?' তাহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'শাস্ত্রের কথায় তোমার অধিকার কি? তোমরা স্ত্রীজাতি, যেমন শুনিয়াছ, তেমনি বিশ্বাস করিয়াছ। সে যাহা হউক, আহা! তোমার সমূহ বিপদ বটে কিন্তু কি করিব, আমাদের দ্বারা তোমার অনুরোধ রক্ষা হওয়া অসম্ভব,' এই বলিয়া সকলেই চলিয়া যাইল। ভগবতী সংসারের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইতে লাগিলেন। এত লোক পবিত্র হইবে বলিয়া গঙ্গার আশ্রয় লইতেছে কিন্তু কি পরিতাপ, সকলেই অবিশ্বাসী! এমন সময়ে একজন মাতাল টলিতে টলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতালকে দেখিয়া ভগবতী কিঞ্চিৎ ভয়ের ভাণ দেখাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'বাবা! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!' মাতাল ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'কেন মা! তোর্ উপযুক্ত সন্তান আমি রহিয়াছি, কি হইয়াছে আমায় বল্, আমি এখনই তাহার প্রতিবিধান করিতেছি।' ভগবতী আপন বৃত্তান্তটী কহিবামাত্র মাতাল সহাস্য বদনে বলিল, আরে বেটি! এও কি বিপদ! সম্মুখে মা ভাগীরথী, দেখ্ না মা, পুণ্য সলিলের তীরে পুণ্য ব্যক্তির অভাব? ইহা অপেক্ষা রহস্যের কথা আর কি আছে? তুই একটু বিলম্ব কর্, আমি একটা ডুব দিয়া আসিয়া বাবাকে জীবিত করিব।' এই বলিয়া মাতাল দ্রুতপদে গঙ্গায় অবগাহন করিতে চলিয়া গেল। শিব তখন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবতীর দিকে চাহিবামাত্র কহিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, এতক্ষণে আমি তাহা বুঝিলাম।"

অতএব বাহ্যিক তপ, জপ, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বাক্‌বিতণ্ডা ইত্যাদি যে স্থানে হয়, সে স্থানে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

অনেকে সাম্প্রদায়িক ভাবকে নৈষ্ঠিক ভাবের সহিত একাকার করিয়া থাকেন। অতএব এস্থানে নৈষ্ঠিক ভাবের তাৎপর্য্য অনুশীলন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ারা আপনার ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, অপরের ধর্ম্মে হস্ত প্রসারণ করেন। নৈষ্ঠিক ভাবে তাহা হয় না। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আপনার ভাবে আপনি অবস্থিতি করেন এবং প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। নৈষ্ঠিক ব্যক্তি কখন অন্য ধর্ম্মের গ্লানি বিস্তার করিতে পারেন না। ঠাকুর কহিয়াছেন যে, "নৈষ্ঠিক সাধকের ভাব সতী স্ত্রীর ন্যায়।" সতী স্ত্রী আপন স্বামী ব্যতীত পরপুরুষের মুখাবলোকন করা দূরে থাকুক, তাহার নাম শ্রবণ করাকেও স্বভাবের ব্যতিক্রম বলিয়া গণনা করেন। পতি সুরূপসম্পন্ন সদ্‌গুণালঙ্কৃত হউন বা না হউন, পতিব্রতার চক্ষে তিনি কন্দর্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পতি কদাকার হউন, বা কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হউন, পতিব্রতা তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া মনে করেন। পতিব্রতার সমক্ষে কন্দর্পকে স্থাপন করিলে তাঁহার দিকে তিনি দৃক্‌পাত করেন না, যেহেতু, তাহাতে নৈষ্ঠিক ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। সতী স্ত্রী নিজ পতির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, পতি কি বস্তু তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন, সুতরাং তিনি ব্যতীত পতিভাব বুঝিবার অপরের অধিকার নাই। পতির নিন্দা হইলে সতীর প্রাণে যেরূপ আঘাত লাগে, অপরের পতিকে নিন্দা করিলে তিনি আপন ভাবে তাঁহার মর্ম্মবেদনা বুঝিয়া থাকেন।

এই নিমিত্ত সতীর মুখে কখন পরের পতি নিন্দা বাহির হইতে পারে না।

সতী পতির সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতাদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন, সকলের সেবা করেন, তাহাতে তাঁহার নৈষ্ঠিকভাবের দোষ হয় না, কিন্তু পতির ভ্রাতারা একস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, যদ্যপি তাঁহাদিগকে পতির ন্যায় জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে নৈষ্ঠিক ভাব বিলুপ্ত হইয়া ব্যভিচার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। নৈষ্ঠিক ভাবও তদ্রূপ। যাহার যে ভাব, তাহার আপন ভাবকে পতির ন্যায় সর্ব্বস্ব জ্ঞান না করিলে কখন নৈষ্ঠিক ভাবের কার্য্য হইতে পারে না।

নৈষ্ঠিক ভক্তদিগের কার্য্যকলাপে যদিও কিঞ্চিৎ অভিমানের ন্যায় ভাব প্রকাশ পায় এবং যদিও স্থূল দ্রষ্টারা উহাকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বলিয়াও অনেক সময়ে পরিগণিত করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা অভিমানও নহে এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিও নহে। যেমন সতীর সতীত্বতে দোষারোপ করিয়া যদ্যপি কেহ তাহা নষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রলোভন দেখায়, সতীর তাহাতে অবজ্ঞাসূচক ভাব প্রকাশ পাইলে কি তাহাকে অভিমানিনী, দুরাচারিণী বলিয়া ব্যক্ত করা যাইবে? না তদ্রূপ করাই প্রকৃত সতীর লক্ষণ বলিয়া কথিত হইবে? সেইরূপ নৈষ্ঠিক ভক্তের ভাবে আঘাত করিলে যে অভিমানের ভাব প্রকাশিত হয়, তাহা উক্ত ভক্তের প্রশংসার বিষয়।

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে পরম ভক্ত বিভীষণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। অগ্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিভীষণকে নানাপ্রকার সাধুবাদ দিয়া আপনি যুধিষ্ঠিরের সমীপে লইয়া যান এবং রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে সম্মান প্রদান করিবার জন্য মস্তকাবনত করেন। বিভীষণ তাহা

দেখিয়াও তথাপি মস্তকাবনত না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলেন। বিভীষণের ঈদৃশ ব্যবহারে সভাস্থলে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকলকে স্থির হইতে বলিয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভীষণ! তুমি কি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া অস্বীকার কর, তজ্জন্য মস্তকাবনত করিয়া রাজসম্মান প্রদান করিতে অপারগ হইতেছ?" বিভীষণ অতি বিনীতভাবে বিষাদিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু! দাসের প্রতি এত নিগ্রহ করিতেছেন কেন? অনুমান করিলাম, অবশ্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, তাহা না হইলে এ প্রকার হৃদয়ভেদী অভিযোগ প্রভুর মুখে বহির্গত হইবে কেন?" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তোমার মস্তকাবনত না করিবার হেতু কি? আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।" বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, "প্রভো! এ আবার কি রহস্য আপনার? আমার মস্তক কোথায় প্রভো? সেই নবদুর্ব্বাদল রূপে আমার মস্তকটী যে অধিকার করিয়া লইয়াছেন! যে মস্তকে শ্রীরামপাদপদ্ম রক্ষিত হইয়াছে, যে মস্তকে লীলাময়ের লীলারূপের সর্ব্বজনবাঞ্ছিত চরণরেণু নিপতিত হইয়াছে, সেই মস্তক কেমন করিয়া জীবের নিকটে অবনত করিতে পারি? যাহাতে আমার স্বত্ব নাই, তাহা কিরূপে অপরকে প্রদান করিব? মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আমি রাজসম্মান দিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছি।" এইরূপ ভাবকে নৈষ্ঠিক ভাব কহে। নৈষ্ঠিক ভাবের জলন্ত অভিনয় হনুমানের বৃত্তান্তে দেখা যায়। হনুমানের রামসীতা যুগল ভাব ধারণা ছিল। যখন অযোধ্যানাথ রঘুকুলপ্রদীপ রামচন্দ্র রাবণ নিধনান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হনুমানকে মুকুতার হার প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই মুকুতাগুলির ভিতরে রামসীতা

আছেন কি না, দেখিবার জন্য সেগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তদনন্তর আপন হৃদয়ের ভিতরে ঐ যুগলরূপ দেখাইয়া অবিশ্বাসী-দিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। দ্বাপরে গরুড়ের সহিত একবার নীল-পদ্মের নিমিত্ত শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ সম্বন্ধে বিতণ্ডা হইয়াছিল। গরুড় উভয়কে এক বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু হনুমান তাহা মহাকারণে স্বীকার করিয়া স্থূলে কমললোচন রামচন্দ্রকে সর্ব্বস্ব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে দ্বেষ ভাবের লেশমাত্র নাই, নিজ ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া নৈষ্ঠিক ভাবের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

নৈষ্ঠিকভাবের ভূরি ভূরি উপাখ্যান আছে, তাহা উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে দুইটী দৃষ্টান্ত দেখান গেল, তাহাই যথেষ্ট, তবে আর একটী দৃষ্টান্ত না দেখাইলে কিঞ্চিৎ ত্রুটি বোধ হইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

কথিত হইয়াছে যে, নৈষ্ঠিকভাবে কিঞ্চিৎ অভিমানের ন্যায় ভাব দেখা যায়। যখন শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণরূপ দেখিব না বলিয়া অভিমান করেন, সেই সময় তাঁহার মান ভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী তথাপি কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মস্তকাবনত করিয়াছিলেন। গোপীরা তজ্জন্য শ্রীমতীকে গরবিনী বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

শ্রীমতী যদিও স্বয়ং লীলাময়ী পরমাপ্রকৃতি, কিন্তু জীবের নৈষ্ঠিক ভাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার অবতরণ হইয়াছিল। তিনি অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া ভূমিষ্টকালে নয়নোন্মীলন করেন নাই। সেইজন্য সকলে তাঁহাকে অন্ধ বলিত। একদিন নন্দরাণী কৃষ্ণকে বৃকভানু মহিষীর নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, সে শুভক্ষণে, শ্রীমতী চক্ষু মেলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন।

এমন নৈষ্ঠিক ভাব যাঁহার, তিনি কি জন্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া অভিমান করিলেন এবং কি জন্তই বা কৃষ্ণকে পায়ে ধরাইয়া হেঁট মস্তকে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন ? স্থূলে এ কথা নৈষ্ঠিক ভাবের বিরুদ্ধ। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের রহস্য ভেদ করে এমন শক্তি কাহার ? রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, যিনি নৈষ্ঠিক ভাবের প্রতিমা, তাঁহার কখন কি ভাবান্তর হইতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সর্ব্বদা মনোসাধে দেখিতে পাইতেন না, হয় গোপেরা, না হয় গোপ বালকেরা অথবা গোপাঙ্গনারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি একেবারে কৃষ্ণের সমুদয় অঙ্গ দেখিতে পাইতেন না। কৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ছিলেন, যে স্থানে শ্রীমতীর নয়ন পতিত হইত, সেই স্থানেই যেন উহা একেবারে সংলগ্ন হইয়া যাইত, সুতরাং এককালে সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করা ঘটিয়া উঠিত না। সেইজন্ত অভিমানের ভাণ করিয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত কণ্ঠভূষার মধ্যমণিতে শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় অঙ্গ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়া প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া লইয়াছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে চরণ ধারণ করিতে বসিলে তাঁহার প্রতিবিম্ব সেই মধ্যমণিতে পড়িয়াছিল।)

আমাদের সম্প্রদায়বিশেষে যে নৈষ্ঠিক ভাবের কথা শ্রবণ করা যায়, তাহাকে একেবারে নৈষ্ঠিক ভাব বলা যায় না। যেমন বৈষ্ণবেরা 'কালী' না বলিয়া 'সেহাই' বলিয়া থাকেন। কালীর প্রসাদ তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, কালী দর্শনকরাকে পাপ মনে করেন, এ সকল ভাবকে দ্বেষ ভাব কহা যায়। যেমন নিরাকারবাদীরা দেবদেবীর সমক্ষে গমন করা অপরাধ মনে করেন, অথবা বৈষ্ণবদিগের প্রতি শাক্তদিগের বিদ্রূপাত্মক কার্য্যকলাপ দ্বেষভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে কথিত হইয়াছে যে, সতী স্ত্রী যেমন

স্বামীর ভ্রাতাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারে, তাহাতে তাহার কোন দোষ হয় না, সেইরূপ ইষ্ট ভিন্ন অপর দেবদেবীর প্রসাদাদি প্রাপ্ত হইলে কখন নিজ ভাবের ক্ষতি হয় না, না করিলে ঘণ্টাকর্ণের ন্যায় বিদ্বেষ ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে। প্রসাদের বা মূর্ত্তির অপমান করিলে, ভগবানের রূপবিশেষের কি অপমান করা হয় না? স্বামীর ভ্রাতাকে অভক্তি করিলে বা হতাদর করিলে, সুস্বামী কখন কি তাহাতে সুখী হইতে পারেন? ঘণ্টাকর্ণ বিষ্ণুর পরমভক্ত ছিলেন, কিন্তু শিবনিন্দার জন্য তাঁহার অত দুর্দ্দশা হইল। দক্ষযজ্ঞ দ্বেষভাবের আর একটী দৃষ্টান্ত। সকল দেবতার প্রতি দক্ষের ভালবাসা সত্ত্বেও এক শিবদ্বেষী হইয়া তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল; এবং এই বর্ত্তমানকালে দ্বেষ ভাবের পরিণাম যে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কে না প্রাণে প্রাণে অনুমান করিতে পারিতেছেন। ধর্ম্ম লইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। যিনি যাহা বলিবেন, যাহা ভাল বাসিবেন, তাহা অপর যে না প্রতিপালন করিবে, তাহাকেই অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করা হইবে। এপ্রকার অভিমানসূচক সময় আর কখন দেখা যায় নাই। শাস্ত্র মানিব না, মহাজনের কথা শ্রবণ করিব না, সাধন করিয়া ভগবৎতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিব না, যাহা আপনার খুসী, যাহা বিষয়পূর্ণ মন আজ্ঞা করিবে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মভাব ভগবান্ হইতে লাভ না করিয়া আপনার সুবিধামত তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। এপ্রকার ধর্ম্মের দ্বারা কিরূপে শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? কিরূপেই বা দ্বেষাদ্বেষী বিলুপ্ত হইবে? কিরূপেই বা সর্ব্বত্রে আনন্দ বিস্তারিত হইবে? যদ্যপি কাহারও ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়, রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, অকপট অভিমানশূন্য হইয়া আপনাকে দীনহীন জ্ঞানপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যিনি

আপনাকে দীন মনে করেন, দীননাথ তাঁহার জন্য কাতর হইয়া থাকেন, সেই দীননাথকে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র অধিকারী। ভগবান্ কল্পতরু-বিশেষ, তাঁহার নিকটে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, তাহার মনোসাধ সেইরূপেই পূর্ণ হইয়া থাকে। মানবসমাজ দেখিলেই একথাটীর মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রত্যেক লোকে নিজ নিজ বাসনায় ধাবিত হইতেছে এবং অনেকেই তাহাতে সিদ্ধমনোরথও হইতেছে। কেহ পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করেন, কেহ বিষয়ী হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করেন, কেহ সাধু হইবার জন্য প্রাণপণ করেন, কেহ বা মাতাল ও বেশ্যাসক্ত হইতে সংকল্প করেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুসারে ফল লাভ করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্বদা দ্বেষভাবের সংস্কারের সংকল্প করিতেছি, আমরা সর্ব্বদা আপনাকেই জ্ঞানী মনে করিতে ভালবাসি, ফলে তাহাই আমাদের ঘটিয়া থাকে।

একদা জনৈক পথিক পথশ্রান্ত হইয়া পথের পার্শ্বস্থিত একটী বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতেছিল। উহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হইল, কিন্তু সেই জনশূন্য মাঠে কে তাহাকে ভোজ্যসামগ্রী প্রদান করিবে ভাবিয়া মনের আবেগ সম্বরণ করিতেছে, ইত্যবসরে তাহার সমক্ষে চতুর্ব্বিধান্ন সংস্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইল। পথিক নিতান্ত আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি, তন্নিমিত্ত মস্তিষ্কের বিকার জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে এরূপ অসম্ভব ঘটনা সংঘটিত হইবে কেন? ক্রমে অন্ন ব্যঞ্জনাদির সুগন্ধ পথিকের নাসিকায় প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সে ভাবিল যে, ভাল, আমার চক্ষুই ভ্রম দেখিতেছে, নাসিকাও ভ্রমে পতিত হইল? যাহা হউক, চক্ষু

নাসিকার বিবাদে প্রয়োজন কি? শুষ্ক বিচারাপেক্ষা পরীক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এই বলিয়া সে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কুপ কাপ্ স্থপ্ সাপ্ করিয়া উদরপূর্ণ করিতে লাগিল। পথিক উদরপূর্ত্তি করিয়া মনে মনে ভাবিল যে, এই সময়ে একটী শয্যা হইলে আমার বাস্তবিক শান্তি হয়। মনের কথা মনেই থাকিতে থাকিতে অমনি সম্মুখে শয্যা প্রস্তুত দেখিতে পাইল। পথিক তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া শয্যায় হস্ত-পদ বিস্তারিত করিয়া পুনরায় চিন্তা করিল যে, এই সময়ে যদ্যপি একটী কামিনী প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমার পদ সেবা করিয়া দেয়। সঙ্কল্পাবসানেই পাদমূলে এক ষোড়শী কামিনীকে দেখিতে পাইল। পথিক তখন মনে মনে স্থির করিল যে, নিশ্চয় আমি সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি। যাহা মনে করিতেছি, তাহাই যখন সাধন হইয়া যাইতেছে, তখন আর আমায় পায় কে, এইবার সহরে যাইয়া আমি একজন ধর্ম্মপ্রচারক হইব। এইবার আমি একটা নাম বাহির করিব, এইবার আমি ধর্ম্মজগতের মীমাংসক হইব।

বাস্তবিক কথা এই যে, আমাদের বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম-প্রচারকেরা এই শ্রেণীর লোক। তাঁহারা ইচ্ছামত আহার করিতে পারেন, ইচ্ছামত শয্যার সংস্থান করিতে পারেন এবং পছন্দসই কামিনীরত্নও লাভ করিতে কৃতকার্য্য হন। এই সকল কার্য্যে নিজ কর্ত্তৃত্বজ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া ধর্ম্মজগতে আসন গ্রহণ করিতে স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া থাকেন। যাঁহাদের জ্ঞান ভোজনে শয়নে এবং কামিনী পর্য্যন্ত যাইয়া স্থগিত হইল, তাঁহাদের নিকট ঐশ্বরিক ভাব স্থান পাইবে কিরূপে? কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইয়া ভগবান্ লইয়া আন্দোলন করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, পথিক এইরূপে কিয়ৎকাল ভাবিতে ভাবিতে মনে করিল যে,আমি

মাঠের মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া রহিয়াছি, যদ্যপি ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি হইবে? নির্ব্বোধ পথিকের মনের কথা মনে বিলয়প্রাপ্ত হইতে না হইতেই, অমনি তের হাত লম্বা একটী ব্যাঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহাকে আক্রমণ করিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিল; সুতরাং তথায় পথিকের জীবনরঙ্গভূমির যবনিকা পতিত হইয়া গেল। প্রচারকদিগের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। পথিক যেমন ভগবান্ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে, কেবল সাংসারিক ভাবে সিদ্ধমনোরথ হইয়া আপনাকে একেবারে প্রচারকশ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহার পরিণাম তথায়ই সমাপ্ত হইল; সাম্প্রদায়িক প্রচারকেরা সেইরূপ ভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ না করিয়া ভগবান্ কি বস্তু তাহা অবগত না হইয়া, শান্তিবিধাতাকে হৃদয়াসনে উপবেশন না করাইয়া, ভগবানের স্বরূপবোধ না বুঝিয়া, ধর্ম্মের বর্ণ-মালা গুরুকরণ পূর্ব্বক শিক্ষা না করিয়া, পথিকের ন্যায় আহার বিহার কেবল আহার বিহার পর্য্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করিয়া ধর্ম্ম লইয়া নাড়াচাড়া করিতে যাইলে কি ফল হইবে? যে ব্যক্তি নিজে যাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, যাহার কখনও ধর্ম্মজগতের কোনভাবে অধিকার স্থাপন হয় নাই, সে ব্যক্তির নিকটে ধর্ম্ম কথা—ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; এবং যাঁহারা ভ্রমপ্রযুক্ত তাহার কথায় আকৃষ্ট হন, প্রকৃত কার্য্যকালে অর্থাৎ যখন তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হন, যখন উক্ত প্রচারকের নিকট ধর্ম্ম যাচ্ঞা করেন, যখন এই ব্যক্তিরা হা ধর্ম্ম হা ধর্ম্ম করিয়া পাগল হন, যখন আর নীরস বাক্যচ্ছটায় প্রাণ শীতল না হয়, তখন সেই প্রচারকের বিদ্যা-বুদ্ধি বাহির হইয়া পড়ে। ধর্ম্মপিপাসুরা তাহাকে চিনিতে পারিয়া তখন তাহার সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

এই সময়ে উক্ত পথিকের ব্যাঘ্রাহত হওয়ার ন্যায় প্রচারকের দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার সাম্প্রদায়িক অবস্থা আমাদের বর্ত্তমানকালে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং তাহার পরিণাম যদিও চূড়ান্ত-রূপে নিষ্পত্তি হয় নাই, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বতা সম্বন্ধে কতদূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহা অচিরাৎ সাধারণে বুঝিতে পারিবেন।

উল্লিখিত কথার দ্বারা যাহা বলা হইল, তাহা সংক্ষেপে পুনরায় বলিতেছি। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিলে, পূর্ব্বকথিত দুই আদি বিভাগের শাখা-প্রশাখা ধর্ম্মভাব বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান বা আত্ম-তত্ত্ব এবং লীলা বা ভক্তি-তত্ত্ব কিম্বা সেব্যসেবক-তত্ত্ব ব্যতীত তৃতীয় প্রকার প্রণালী হইতে পারে না। যে যেরূপে উপাসনা করে বলিলে, এই দুই প্রকার ভাববিশেষ বুঝিতে হইবে। যে কেহ ভগবান্ ভাবেন, তাঁহার ভাব অবশ্যই এই দুই প্রণালীতে অন্তর্গত না হইয়া যাইতে পারে না। এক্ষণে আমার এই কথাটী সত্য কি না তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে কয়েকটী প্রকাশ্য সম্প্রদায় ব্যতীত নানাপ্রকার অপ্রকাশ্য বা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। প্রকাশ্য সম্প্রদায়েরা সকলেই উল্লিখিত ত্রিবিধ মতে কার্য্য করিয়া থাকেন। হয় বৈদান্তিক, তান্ত্রিক, না হয় পৌরাণিক। আত্ম-তত্ত্ব বা জ্ঞান-মতে বৈদান্তিক এবং তান্ত্রিক, ভক্তি-মতে পৌরাণিক। মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের মধ্যেও এই দুই ভাবে কার্য্য চলিতেছে। সর্ব্বত্রে যদিও আমাদিগের ভাবের ন্যায় অবিকল এক প্রকার লক্ষিত না হউক, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। মুসলমান এবং খৃষ্টানেরা এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা তাঁহাকে দয়াময়, ন্যায়বান্ এবং পাপী ও পুণ্যবানের তিরস্কার পুরস্কারদাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা ভগবান্‌কে শান্তভাবে

অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত প্রভু শব্দ, পিতৃ শব্দ তাঁহাতে ব্যবহার করা হয়। এই সকল ভাব কি আমাদের নাই? খৃষ্টানদিগের সম্প্রদায়ে যীশুখ্রীষ্টকে ভগবানের রক্তমাংসবিশিষ্ট অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্য-দিগের ন্যায় পুত্রবিশেষ জ্ঞান করা হয় এবং তাঁহার কথিত উপদেশসমূহ ভগবানের কথা বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে।

যীশুখৃষ্ট যদিও মনুষ্যের ন্যায় অবিশ্বাসী কর্ত্তৃক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ঐশী শক্তি সম্বন্ধে কাহারও অবিশ্বাস করিবার অধিকার নাই। তিনি বহুদিন প্রকাশ্যে লীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই শক্তি এক্ষণে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়া ফেলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না। খৃষ্টানেরা যদিও যীশুখৃষ্টে আমাদের ন্যায় অবতার শব্দটী ব্যবহার করেন না, কিন্তু কার্য্যে তাহা-পেক্ষা কোনমতে ন্যূন দেখা যায় না। খৃষ্টকে বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি নির্ভর, তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ না করিলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবার দ্বিতীয় প্রণালী নাই, অর্থাৎ সাধকের যাবতীয় কার্য্য খৃষ্টকে সমর্পিত হয় এবং তাঁহাতে সর্ব্বস্ব প্রদত্ত হইলে ভগবানের নিকটে আর ভয় থাকে না। কথায় যদিও ভগবান্ এবং খৃষ্ট দুই বলা হইল, কিন্তু কার্য্যে একই দাঁড়াইয়াছে। কারণ, খৃষ্টকে বিশ্বাস করিলে যখন সর্ব্ব-মনোরথ সিদ্ধ হয়, তখন দ্বিতীয় ভগবান্ কেহ থাকুন বা না থাকুন, খৃষ্টসাধকের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এই ভাবটী আমাদের ভক্তি বা লীলামতের অন্তর্গত। ভগবানই লীলায় লীলারূপ অবতার-বিশেষে প্রকটিত হইয়া জীবের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। অবতারদিগের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মোৎসর্গ না করিলে, কস্মিন্‌কালে কাহারও পরিত্রাণ নাই এবং হইতে পারে না, একথা আমাদের লীলা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। খৃষ্টানদিগের যীশুর প্রতি যে ভাব, আমাদের

অবতারদিগের প্রতিও সেই ভাব বলিবার হেতু এই যে, খৃষ্টানদিগের ভাব আমাদের ব্রহ্মশক্তি ভাবের সহিত সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা এ ক্ষেত্রে আলোচনা করিব না।

খৃষ্টের কার্য্যকলাপ দেখিলে, তাঁহার সহিত অবতারদিগের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। ইংরাজেরা যে প্রভেদ দেখাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের প্রকৃতিগত ভাবের নিমিত্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া ভগবানের সহিত কার্য্য হইতেছে, আমরা তাঁহাকে কখন মাতা, কখন পিতা, কখন ভ্রাতা এবং কখন স্বামী বলিয়া প্রেমের পারাবারে ভাসিতে থাকি, কিন্তু ইংরাজদিগের সামাজিক হিসাবে অন্যান্য ভাব সেরূপ বিকশিত হয় না, সুতরাং শান্ত ভাবটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সেই ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে যাহা হউক, খৃষ্টানেরা যখন শান্ত অর্থাৎ সেব্য-সেবক ভাবে সাধন করেন, তখন আমরা তাঁহাদের অবজ্ঞা করিতে পারি না এবং তাঁহারাও যদ্যপি তাঁহাদের সাধনপ্রণালীর প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম-ভাবকে কখন ঘৃণা করিতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অল্প অধিকারী ব্যক্তিদিগের দ্বারা এইরূপ দ্বেষাদ্বেষীর কার্য্য হইয়া থাকে। বিলাতের কোন বিজ্ঞপ্রবর চিকিৎসক ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব অর্থাৎ কোথায় যাইলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই বিষয়টী কয়েকটী কথায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

Look again and look further and yet nearer till in the reign of law you can perceive a truely Divine order and in nature a Living force behind nature.

এই কয়েকটী কথার তাৎপর্য্য বাহির করিলে, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং

মহাকারণাদির ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূলে যাহা দেখি, তাহা প্রকৃত দেখা নহে, এই নিমিত্ত পুনরায় তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। যেমন একটী গোলাপ ফুল দেখিলাম। এই স্থানে তাহার দেখার সীমা কারলে তাহাকে স্থূল দর্শন কহে, এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে (Look again) আবার দেখ। গোলাপ ফুলকে আবার কি দেখিব? স্থূল অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, অর্থাৎ গোলাপফুলটী যৌগিকবিশেষ, ইহা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, এই নিমিত্ত (Look further) কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উহা দেখিবার কথা আছে। যৌগিকেরা রূঢ় পদার্থদিগের সংযোগসম্ভূত, অতএব এই স্থানে তাহাদিগকে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই দর্শনাবসানে পদার্থদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া না দেখিলে, নিয়মের সাম্রাজ্যে গমন করা যায় না, তন্নিমিত্ত আরও নৈকট্য ভাবে দর্শন করিয়া নিয়মের সাম্রাজ্যে উপনীত হওয়া কাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বলা হইয়াছে (Yet nearer till in the reign of law you can perceive a truely Divine order) অর্থাৎ রূঢ় পদার্থদিগের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে শক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। এই শক্তি সকল এক হইয়া প্রকৃতিগত অবস্থাবিশেষে বিবিধ ভাবের পরিচয় দিয়া মহিমার্ণবের অনন্ত সর্ব্বশক্তিমানের স্বর্গীয় বিধি বোধ জন্মাইলে তাহাকে কারণ জ্ঞান কহা যায়। প্রকৃতির ব্যবস্থা বুঝিতে পারিলে মানববুদ্ধি পরাজিত ও আত্মাভিমান খর্ব্বপ্রায় হইয়া আইসে। তখন তাহার মানস-পটে চৈতন্য-শক্তি (Living force) উদ্ভাসিত হইয়া মহাকারণের জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃতির অন্তর বাহ্য একাকার করিয়া দেয়; অর্থাৎ সর্ব্বত্রে চৈতন্য-শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। আমরা বৈশ্লেষিক ও সাংশ্লেষিক বিচার দ্বারা যে ভাব ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ

করিয়াছিলাম, ইহার ভাবও তদ্রূপ। সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদিগের দ্বেষ ভাব অজ্ঞানতা প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে বলিয়া যে মীমাংসা করা গিয়াছে, তাহার কারণ এই। বিলাতে এই বৈজ্ঞানিক সাধক যাহা অনুমান করিয়াছেন, ইহা আমাদের শাস্ত্রভাবসঙ্গত, সুতরাং আমরা কেহই কাহাকে দোষারোপ করিতে পারি না।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোড়ন করিলে এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য ভগবান্ বলিয়া আর কাহাকেও দেখা যায় না। মহম্মদকে ভগবানের প্রেরিত ভৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করা হয়। ভগবানের কথাও তাঁহার আজ্ঞা সকল মহম্মদের দ্বারা প্রচার হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে হইলে, মহম্মদের সহায়তা ব্যতীত তাহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলে, স্বর্গরাজ্যে গমন করিবার নিমিত্ত মহম্মদ দ্বার-স্বরূপ স্বীকার করিতে হইতেছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মে শান্তভাবে কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্য-স্বরূপ যখন যে কেহ আবির্ভূত হন, তাহা সেই এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ্বরের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। তিনি দেশকাল-পাত্র বিচার পূর্ব্বক রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কখন এক ডুব দিয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধরেন, এক ডুব দিয়া রামরূপে অবতীর্ণ হন, কখন এক ডুব দিয়া মহম্মদ এবং এক ডুব দিয়া যীশুখৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি আর এক ডুবে বুদ্ধ ও গৌরাঙ্গ রূপে দেখা দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ লীলাখেলা একজনই করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় আর কেহ নাই, যাঁহা কর্ত্তৃক এইরূপ কার্য্যসমূহ স্বীকার করা যাইবে।" যেমন এক সূর্য্য জগতের অদ্বিতীয় আলোকবিধাতা, এক বায়ু জগতের রক্ষাকর্ত্তা, এক জল

জগতের জীবনস্বরূপ, সেইরূপ এক পরমেশ্বর জগতে অদ্বিতীয় পরিত্রাতা। তিনি বলিতেন, "যেমন একটী পুষ্করণীর চারিদিকে চারিটী ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা, দ্বিতীয় ঘাটে মুসলমানেরা, তৃতীয় ঘাটে খৃষ্টানেরা এবং চতুর্থ ঘাটে অপরাপর ব্যক্তিরা জলপান করিতেছে। সকলেই এক অদ্বিতীয় জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। প্রভেদ তথায় নাই। প্রভেদ কেবল ঘাটের, প্রভেদ বাক্যের, অর্থাৎ স্থূল ভাবের পার্থক্য থাকে, উদ্দেশ্যে প্রভেদ নাই।" সেই প্রকার সকলেই পরিত্রাণের নিমিত্ত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, ভগবান্ বলিয়া সকলেই আর্ত্তনাদ করেন, ভগবান্ ভাবে সকলেরই সাধনা হয়, ভগবান্ বলিলে সকলের এক ভাবেরই উদ্রেক হয়, এই অবস্থাটী বিচার করিয়া লইলে, এই স্থানে সকলের ভাব মিলাইলে, এক ব্যতীত দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান কখনও লাভ হইতে পারে না। এই স্থানেই সকলের সকল ভাব বিলুপ্ত হইয়া একাকার হইয়া থাকে। স্থূলে বহু, পূর্ব্বে এ কথা বার বার বলা হইয়াছে। মহাকারণে গমন করিলে ভাবের সামঞ্জস্য হয়, স্থূলে তাহা কদাপি হইবার নহে। স্থূলে অবস্থিতি করিয়া যাঁহারা ভাব মিলাইতে চেষ্টা করেন, সেই স্থলেই গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক বলিলে এক জাতি বুঝায়, কিন্তু ভাবে বহু হইয়া পড়ে। মাতা স্ত্রীলোক, ভগ্নী স্ত্রীলোক, স্ত্রী স্ত্রীলোক, মাতামহী পিতামহী স্ত্রীলোক, কন্যা স্ত্রীলোক, পুত্রবধূ স্ত্রীলোক, খুড়ী জ্যেঠাই মাসী পিসী মামী স্ত্রীলোক, প্রতিবাসিনীরা স্ত্রীলোক, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় স্ত্রীলোক ভাব-রাজ্যে বহুভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। মনুষ্য-দিগের এই ভাব এক্ষণে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বহু ভাব সত্ত্বেও স্ত্রীলোক যেমন এক বলিয়া বুঝা যায়, ভগবান্ সম্বন্ধে তদ্রূপ জ্ঞান করিতে হইবে; অর্থাৎ একও তিনি এবং বহুও তিনি। রামকৃষ্ণদেব,

এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মের ভাব স্বতন্ত্র রাখিয়া, তাহাদের ঔৎপত্তিক কারণ এক স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বলিলে, একথা কেহ যেন না বুঝেন যে, সব ভাব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দিয়া গিয়াছেন। ভাব লইয়া যখন কথা, তখন সমুদয় স্বতন্ত্র, ভাব বিরহিত কথা এক। ভাবের তাৎপর্য্যবিশেষে কার্য্যও স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এক কার্য্যের দ্বারা সকল ভাব লাভ হয় না। যেমন ভগ্নী ভাবে মাতার ভাব বুঝা যায় না, ভগ্নীতে ভগ্নী ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগ্নীতে স্ত্রীভাব উপলব্ধি করিতে যাইলে ভগ্নীভাব বিকৃত হয়।

এইরূপ ভাব বিপ্লব করিলে যেমন তাহাকে ব্যভিচার বলে, ধর্ম্ম রাজ্যের ভাব উড়াইলেও তাহাকে ব্যভিচার ধর্ম্ম কহা যায়। যেমন ভাব রাজ্যে যাহার যে ভাব, তাহার সহবাসে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে—মাতার নিকট থাকিলে তাঁহার স্নেহ উপলব্ধি হয়, যাহার মা নাই, সে কখনও মাতৃস্নেহ সুচারুরূপে বুঝিতে পারে না। ভগ্নী যাহার নাই, সে কিরূপে ভগ্নীয় ভালবাসার জ্ঞান লাভ করিবে? স্ত্রী বিবর্জ্জিত ব্যক্তি স্ত্রীর ভাব কিরূপে অনুধাবন করিতে পারিবে? অর্থাৎ যাহার যে ভাব, তাহার সহিত সহবাস করিলে তবে তাহা বোধ হইয়া থাকে। সেইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্য এক বস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাকা প্রযুক্ত, সেই সেই ভাব শিক্ষা দ্বারা সাধন করিলে তবে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে। তাহা না করিলে কখনও সে ভাব লাভ করিবার উপায় নাই। যেমন খ্রীষ্টমতের চরমাবস্থায় যে ভাব লাভ হইবার কথা, তাহা আমাদের শক্তি সম্প্রদায়ে লাভ হইবে কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান বৌদ্ধমতে আসিতে পারে না। যে যে সম্প্রদায় যে যে ভাবে সংগঠিত হইয়াছে, সেই সেই মতে সাধন করা চাই, এইরূপে তাহার মহাকারণে গমন করিলে, তবে সেই ভাব

উপলব্ধি হইবে। একদিন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী প্রাসাদের উপরে সখীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোধন ক্রীড়া অবলোকন করিতেছিলেন। এমন সময়ে রঙ্গময়ী ললিতা সখী ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, “হ্যাগা! এইত কৃষ্ণের রূপ, নামটীও যেমন, রূপটীও তেমন। কৃষ্ণ শব্দে কাল, বাস্তবিক দেখতেও কি তাই! ভাল কালই যেন হ’ল, গঠন-খানি আবার বাঁকা, এক আধ স্থানে নহে—ত্রিভঙ্গ, তবে কি দেখিয়া তুমি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ?” শ্রীমতী বিষাদিতা হইয়া কহিলেন, “ললিতে! তোমার চক্ষে কৃষ্ণকে কাল দেখিতেছ, তোমার চক্ষে ত্রিভঙ্গ দেখিতেছ, তোমার চক্ষে কৃষ্ণকে কুৎসিত কুরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু তুমি আমার চক্ষু লইয়া আমার ভাব লইয়া একবার দেখ দেখি, তখন কেন আমি কৃষ্ণকে ভালবাসি, কেন আমি অতি সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাই, বুঝিতে পারিবে।” সেইরূপ যাহার যে ভাব, সেই ভাবাবলম্বন ব্যতীত তাহার সৌন্দর্য্য কখনও দেখা যায় না।

রামকৃষ্ণদেবের সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় আনুমানিক কবিতা-কুসুমের ন্যায় নহে। তিনি গীতায় ‘যে যথা মাং’ শ্লোকটীর ভাবান্তর করিয়া তাৎপর্য্য বাহির করেন নাই। তিনি আপনি সাধক হইয়া তাহার মর্ম্মোদ্ধার পূর্ব্বক সর্ব্ব ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন। এই গুরুতর কার্য্য, এই মনুষ্যাতীত কার্য্য, যাহা অদ্যাপি কোন স্থানে হয় নাই, কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া আমরা তাঁহাকে অবতার বলিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি এই নূতন ভাব আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এই সত্য বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবকালে নিতান্ত প্রয়োজন, এই সত্য সকলের প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না হইলে আমাদের আর কল্যাণ নাই। ধর্ম্মদ্বেষে আমরা বাস্তবিক নরাকারে পশুবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছি। এরূপ ভাবে কি

সংসার চলিতে পারে? আমি তোমাকে ঘৃণা করিতেছি, তুমি আমাকে ঘৃণা করিতেছ, ঘৃণাবৃত্তি যদ্যপি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তবে আর আমরা শান্তি পাইব কবে? এই অবজ্ঞার ভাব যাহাতে অপনোদন হয়, যাহাতে তাহাকে আমাদের হৃদয়-কানন হইতে সমূলে উৎপাটন করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কথিত হইয়াছে যে, যে যেরূপে উপাসনা করে, তাহার মনোরথ সেইরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব তাহার প্রমাণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে একটী প্রশ্ন হইতেছে যে, রামকৃষ্ণদেব এ কথাও বলিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ জ্ঞান্তে বা অজ্ঞান্তে ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে ভগবান্‌কে ডাকিবে, তাহারও মনোসাধ পূর্ণ হইবে এবং শত্রুভাবেও তাঁহাকে লাভ করা যায়, একথাও প্রচলিত আছে। ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে?

ভগবানের কথা এই যে, যে কেহ তাঁহাকে যে ভাবেই উপাসনা করিবে, তাহার মনোরথ সেইরূপে পূর্ণ হইয়া থাকে। যাঁহারা তাঁহাকে বন্ধুরূপে দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সেইরূপেই দেখেন, যাঁহারা শত্রুরূপে দেখিতে চাহেন, তাঁহারা শত্রুরূপেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। এই নিমিত্ত রাবণের রাম-দর্শন শত্রুরূপে হয়, কংশের কৃষ্ণ প্রাপ্তি শত্রুরূপে হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপুর নৃসিংহমূর্ত্তি শত্রুরূপে দর্শন হয়। দ্বেষভাবের সহিত শত্রুভাবের প্রভেদ এই যে, দ্বেষভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা এবং শত্রুভাবে তাঁহাকে প্রত্যাশা করা। অতএব দ্বেষভাব এবং শত্রুভাব এক নহে। শত্রুভাব স্বাভাবিক ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহার হেতু এই যে, স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের প্রতি সর্ব্বদা মন সংলগ্ন রাখা যায় না, কিন্তু শত্রুভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ ভগবানকে স্মরণ থাকে, কেবল স্মরণ কেন, প্রাণ পর্য্যন্ত

মাতিয়া উঠে। সুতরাং ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে বিলম্ব হয় না। যেমন দুরন্ত সন্তানেরা পিতামাতাকে বিরক্ত করিয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লয়, শত্রুভাবের কার্য্যও তদ্রূপ। রাবণ কি বলিয়াছিলেন? একদিন মন্দোদরী রাবণকে বলেন যে, "তুমি সীতাকে কটুকথা প্রয়োগ না করিয়া, যখন রাক্ষস-মায়ায় রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে অনায়াসে আয়ত্তে আনিতে পার, তখন কেন তাহা না করিয়া অনর্থক তাঁহার বিরাগভাজন হইতেছ?" রাবণ হাসিয়া কহিলেন, "কি বলিলে? রামরূপ ধারণ করিয়া সীতার সহবাস-সুখ সম্ভোগ করিব? তুমি স্ত্রীজাতি, স্বল্পবুদ্ধি তোমার। তুমি সেইজন্য আমায় এরূপ পরামর্শ দিতে সাহস করিয়াছ। তুমি ত জান না যে, রামরূপ ধারণ করা দূরে থাক্, একবার সেইরূপ মানসক্ষেত্রে সমুদিত হইলে, একবার রাম বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলে, হৃদয়ে যে আনন্দ, যে অপূর্ব্ব বচনাতীত ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা স্মরণ করিলে ব্রহ্মপদও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান হয়, পৃথিবীর ছার সুখে কি মন আর ধাবিত হইতে পারে? না, আর কুক্কুর শৃগালের ন্যায় পরজায়া সহবাস করিতে মনে আশক্তি জন্মায়?" অতএব রাবণ বৈরীভাবে কিরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন সেই চতুর ব্যক্তিই তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত শত্রুভাবে স্থূলে প্রভেদ কিন্তু মহাকারণে অদ্বিতীয় ভগবানে তাহা বিলীন হইয়া থাকে।

অজ্ঞাতে এবং ভ্রান্তে ভগবানের নাম করিলে ভগবান্ লাভ হয়, তাহার হেতু অনুসন্ধান করিতে অনেক দূর গমন করিতে হইবে না। প্রভু বলিতেন, "যেমন জল পতিত হইলে গাত্র ভিজিয়া যায়, অমৃত-কুণ্ডে পতিত হইলে অমর হয়, অগ্নি স্পর্শ করিলে হস্ত দগ্ধ হয়, বিষের হ্রদে পতিত হইলে মরিয়া যায়, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারে না,

সেইরূপ ভগবান্ সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। কেবল ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে সকল কার্য্য ব্যর্থ হইয়া থাকে।"

পরিহাসচ্ছলেও ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে, তাঁহাকে লাভ করা যায়।

কোন কুলমহিলা ভ্রষ্টাচারিণী হইয়া তাহার উপপতির সহিত অকুতোভয়ে আমোদ-আহ্লাদ করিবার মানসে নীলাচলে যাত্রা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে রথযাত্রা পর্ব্বোপলক্ষে বহুযাত্রী গমন করিতে-ছিল, সুতরাং পথে অনেক সময়ে ইহাদের আনন্দের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ক্রমে লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল এবং উহাদের ঘৃণিত অভিপ্রায়ও তাহাদের নিকট লুক্কায়িত রহিল না। অনেকে তাহাদিগকে উপদেশাদিও দিতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু যাহারা নবানুরাগে কুলে জলাঞ্জলি দিয়া রাজপথে বাহির হইয়াছে, তাহাদের কি কেবল কথায় জ্ঞান হয়? তাহারা কাহারও কথা না শুনিয়া নিঃসঙ্গ হইবার সুযোগ পাইলে তাহারা প্রশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। যাত্রীসকল পুণ্যধামে গমনকালে এ প্রকার বিড়ম্বনা দেখিয়া সকলেই তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা সহকারে নিকট হইতে তাড়াইয়া দিত। কেহ আর আহা বলিয়া তাহাদের দিকে দৃক্‌পাত করিত না। তাহারা এমন করিয়া তুলিল যে, চটীতে কেহ তাহাদের থাকিবার আর স্থান দিতে চাহিত না।

এইরূপ অপমানে ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রাণে নিতান্ত আঘাত পাইতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইল যে, এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি যে সকলেরই কাছে ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িয়াছি। এমন জানিলে অন্য কোন-দিকে চলিয়া যাইতাম। শ্রীক্ষেত্রে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে সময়ে তাহার এই প্রকার ভাব উদ্রেক হয়, সে সময়ে তাহারা পুরীর সন্নিহিত হইয়াছিল, সুতরাং আর প্রত্যাগমন করিবার সুবিধা হইল না।

পুরীতে পৌছিলে কোন পাণ্ডা তাহাদের স্থান দিল না। তথাকার লোকেরা উহাদের কাহিনী অবগত হওয়ায়, এমন কি বাজারেও তাহাদের স্থান মিলিল না। কি করে, উপায়বিহীন হইয়া বৃক্ষমূলেই উহাদিগকে রজনীযাপন করিতে হইল। এইরূপ দুর্দ্দশায় কুলটার আপনাপনি ধিক্কার আসিল। আর তাহার উপপতিকে ভাল লাগিল না। ক্রমে তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। উপপতি মিষ্ট কথায় বুঝাইতে গেলে সে আরও জ্বলিয়া উঠিত। তাহাকে যথোচিত লাঞ্ছনা করিয়া বলিত যে, "তুই আমার এই দুর্দ্দশার হেতু, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিস্? ছিলাম গৃহে, কিছুই জানিতাম না। বালিকাকালে বিধবা হইয়া এতদিন স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া গিয়াছিল। তুই কত কৌশল করিয়া আমার মাথা খাইয়াছিস্? তখন যাহা বলিয়াছিলি, মনে করিয়াছিলাম যে, এমন রসে আমি বঞ্চিত আছি, তাই দিগ্বিদিক না দেখিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, তোর কথায় বাটীর বাহির হইয়াছিলাম। হায়! হায়! কি করিয়াছি! এমন পথে তুই আনিয়াছিস্ যে, আত্মঘাতিনী হওয়া অথবা সমুদ্রে ডুবিয়া মরা ব্যতীত আর উপায় নাই।"

আহা! ভগবানের কি মহিমা! জগন্নাথের কি অপার করুণা! ঐ কুলবালা কুল-কলঙ্কিনী হইয়া অশেষ আনন্দের নিমিত্ত জগন্নাথে আসিল। তীর্থপর্য্যটন কিম্বা প্রভুর রূপ দর্শন করিবার বাসনায় তাহা করে নাই। অন্তর্য্যামী ভগবান্ কিরূপে জীবের কল্যাণ বিধান করেন, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাহিলে সকলেই সর্ব্বদা দেখিতে পায়। এই ভ্রষ্টাচারিণী পরিহাসচ্ছলে আনন্দ-সম্ভোগের নিমিত্ত জগন্নাথে যাইব বলিয়া বাহির হইল, কি সুন্দর প্রক্রিয়ায় তাহার নিজ দুষ্কৃতির বিষময় ফল আপনি জানিতে পারিল! ভগবানের দয়া আর ইহা অপেক্ষা কি হইতে পারে? জীব যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে, সে

পর্য্যন্ত নিজ কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, সে পর্য্যন্ত তাহার কল্যাণ হয় না। ভগবানের কৃপা হইলেই তাহার কর্ম্ম বোধ হয়, কর্ম্ম বোধ হইলেই ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকে। এই ব্যভি-চারিণীর তাহাই ঘটিয়াছিল। সে যখন বুঝিল যে, অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি, তখন সে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিল, তাহার হৃদয় কুঞ্চিত হইয়া আসিল, সে কাহার কাছে আসিয়াছে, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। উপপতি উহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভালবাসার ভাণ পূর্ব্বক কহিল যে, "তুমি যগুপি এইরূপ উতলা হও, তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব? তোমার ভরসায় আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম, শ্রীক্ষেত্রে না যাইয়া বরং কোন পল্লীগ্রামে একখানি মুদিখানা কিম্বা হাঁড়ির দোকান করিয়া দুইজনে পরমানন্দে দিনযাপন করিব। তোমার কি কুমতি হইল যে, তাহা তুমি অমত করিলে। আমি তোমার প্রেমে তখন অন্ধ হইয়া যগুপি না আসিতাম, তাহা হইলে অত সাধের নব মিলনের সূচনায় বিষাদ আসিয়া অধিকার করিত না। যাহা হইবার হইয়াছে, চল আমরা স্থানান্তরে প্রস্থান করি। যাত্রীদিগের অপরাধ কি? উহারা তীর্থ করিতে আসিয়াছে, আমাদিগের ভাব মনে আসিলে উহাদের অবশ্যই ধর্ম্মভাবের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং অভিশাপ দেয়। আমাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, জগন্নাথ দেখিবার সাধ নাই, তীর্থে বাস করিবার বাসনা নাই, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে আসি নাই, যে উদ্দেশ্যে আসিলাম, তাহা এখানে হইল না; বরং তাহার মূলোৎপাটন হইবার উপক্রম হইয়াছে, চল আর না। আর এমন কুৎসিত স্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই; চল আমরা এখনই প্রস্থান করি।" অজ্ঞান কামান্ধ পশুপ্রকৃতি নর কেমন করিয়া ভগবৎ কার্য্যের মর্ম্মোদ্ধার

করিতে সক্ষম হইবে? উপপত্নী স্থির হইয়া এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল। সে অতঃপর উহাকে বিনীতভাবে কহিল যে, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু এখনও কি তোমার ভ্রম বিদূরিত হয় নাই? এ কার্য্যের যে এমন পরিণাম, যদ্যপি অগ্রে জানিতাম, তাহা হইলে আমি কি কখন তোমার সেই প্ররোচন বাক্য শুনিতাম? কি ছিলাম কি হইয়াছি, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আসিয়াছিলাম আনন্দ করিতে—যে আনন্দ পাইলাম, ইহা কি তুমি চক্ষে দেখিতেছ না? অধিক আর কি বলিব, আমি এই মাত্র বলিতেছি যে, তুমি আমায় ভালবাস বলিয়া আনিয়াছ, এক্ষণে একটী ভিক্ষা দাও, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাও। এই বৃক্ষমূলে অনাহারে আমি রাত্রিকালে একাকিনী পড়িয়া থাকিব। কুক্কুর শৃগাল আমাকে ভক্ষণ করিলে বোধ হয় আমার এই অন্তর্জ্বালা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা।" উপপতি কহিল, "প্রাণ থাকিতে তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তোমার যে দশা, আমারও সেই দশা হইবে। তোমায় বলিলে তুমি শুনিবে না। কেনই বা এ দুর্গতি হইবে? কেহ কি এমন ভাবে দিন কাটাইতেছে না? আমরা কি এই কার্য্য নূতন করিয়াছি? পরকীয়া রসাস্বাদন করা, অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়, সে সকল কথা আমি অনেক দিন জানি। পরদার-গমনে অপরাধ হয়, একথা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার দিন শিক্ষা করিয়াছি, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে বলিয়া পরকীয়া প্রেম সম্ভোগের জন্য এই কলঙ্ক সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। এতক্ষণে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। লোকে মনে করে করুক্, তাহাতে তোমার চিন্তা নাই।" দুর্বৃত্তেরা নিজের অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য যখন যাহা মনে আইসে, যাহার সহায়তা লইলে সাময়িক সুবিধা হয়, তাহাই করিয়া থাকে। উপপতি

প্রথমে মুদি হইতেছিল, পরে পরকীয়া-প্রেম আনিয়া ফেলিল। যাহা হউক, ভগবানের মহিমার কার্য্য কতদূর, তাহা ক্রমে বর্ণনা করিতেছি।

ঐ রমণী উহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "কি করি, মরণই শ্রেয়ঃ! অল্প বয়সে কি জানি যদি আবার পদ-স্খলিত হয়, তাহা হইলে যে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। পাপ করিয়াছি, তাহার সংশয় নাই। এই পাপের এই শাস্তি, প্রাণে তাহা বুঝিয়াছি, আবার ইহাতে পাপের যোগ হইলে পরিণামে নরকেও স্থান হইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে কতকগুলি মাড়োয়ারী কামিনীরা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছিল। ঐ রমণী মনে করিল যে, ইহারা আমার অপরিচিত, আমার অবস্থা জানে না, ইহাদের সঙ্গে যাইয়া যগুপি জগন্নাথ দর্শন করিতে পাই, তাহা হইলেও বুঝিব যে, ঠাকুর দেখিতে পাইলাম। এই ভাবিয়া সে দৌড়াইয়া ঐ মাড়োয়ারী স্ত্রীলোকদের সহিত মিলিত হইল। তাহারা বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। উপপতিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে যখন উহারা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন পূর্ব্বপরিচিত যাত্রীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পাণ্ডার দ্বারা উহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ অপমান সহকারে মন্দিরের নিকট হইতে দূরে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

এতক্ষণে কুলটার সকল আশা ভরসা উড়িয়া গেল, সে আর তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, তাহার আর চিন্তা করিয়া দেখিবার আবশ্যক রহিল না, আর দিগ্বিদিক্ চাহিতে ইচ্ছা হইল না। সে আপন মনে পাগলিনীর ন্যায় লক্ষ্যবিহীন দৃষ্টিতে দৌড়াইয়া লোকালয় হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক সাগর-সলিলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। কিয়ৎ-পরিমাণে শান্তির ভাব আসিলে তথায় পৌছিয়া উচ্চৈঃস্বরে জগন্নাথ-

দেবের মন্দিরের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "হে জগন্নাথ! তোমাকে কে এ নাম দিয়াছে প্রভো? আমি আজ তোমার এ নাম খণ্ডন করিয়া দিলাম। তুমি কখনও জগন্নাথ নও, আমি কি জগৎ ছাড়া যে, আমার প্রতি দয়া হইল না। আমি অনাথা, পতি-পুত্রবিহীনা। উপপতির আকর্ষণে গৃহত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার স্থানে আসিয়াছিলাম। আমি জানি, তোমায় দর্শন করিতে আসি নাই। কিন্তু সন্তান কুসন্তান হইলেও যখন বিপদে পতিত হইয়া 'মাগো' 'বাবা গো' বলিয়া শরণাগত হয়, তখন কি দয়া হয় না? আমি 'বাবা' বলিয়া ছুটিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে তুমি আমার মুখের দিকে চাহিলে না। আমি পতিতা কুলকলঙ্কিনী বটে, কিন্তু প্রভু যে তুমি জগবন্ধু! আমি এই অকুল সাগরের তীরে একাকিনী, বন্ধুবিহীনা, আমার বলিবার কেহ নাই! একদিকে অকূল কলঙ্ক-সাগর, আর একদিকে অকূল লবণ-সাগর, প্রভু! এখন যে আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি, সাগরে ডুবিয়া কি প্রাণ যাইবে? কোথায় দীনবন্ধু জগন্নাথ! কোথায় অনাথবন্ধু জগন্নাথ! আজ তোমার অনাথা কন্যা অনাথিনী হইয়া, কুলকলঙ্কিনী হইয়া, লবণ সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে একথা বলিলাম, পবন তাহা তোমার কর্ণগোচর করুক্, পবন দেশ দেশান্তরে এই বার্ত্তা লইয়া যাক্। যদ্যপি কেহ অন্তরীক্ষে থাক, তাহা হইলে আমার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যাও।" এই বলিয়া সে যেমন সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিল, অমনি ঢেউ দ্বারা উপরে প্রক্ষিপ্ত হইল। সে তখন দেখে যে, সে মন্দিরের ভিতরে, সম্মুখে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কত কি বলিয়া কখন হাসিতে লাগিল, কখন প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে তাহার ভাবাবসান

হইলে, উপপতিকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিল। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া, উহারও প্রাণে অনুশোচনা আসিল এবং অপরাধের নিমিত্ত জগন্নাথের উদ্দেশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ঐ রমণী অতঃপর মনে করিল যে, "প্রভু! তোমার কৃপা অপার, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোকদিগকে অভিমানে সংগঠিত করিয়াছ। এখন মনে বড় খেদ রহিয়াছে যে, তোমার পাণ্ডারা আমায় মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, যদ্যপি তাহারা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়, তবে আমার সকল দুঃখ দূর হইবে।"

এই দুই নরনারী জগন্নাথের প্রসাদে পূর্ব্বের সংস্কার বিস্মৃত হইয়া, প্রভুর দাসদাসীর ন্যায় ভাব প্রাপ্ত হইল। তাহারা তখন সেই বালির উপরে জগন্নাথের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, বালির পুষ্প চন্দন বালির অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিল এবং তাহাই উভয়ে প্রসাদ-স্বরূপ ভক্ষণ করিল। তদনন্তর অপরাহ্নকালে বালির রথ প্রস্তুত করিয়া উভয়ে টানিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে দেখে পাণ্ডারা শিবিকা সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইল। পাণ্ডারা দেখিল যে, সেই বিতাড়িত নরনারীদ্বয় বালির রথ টানিতেছে। পাণ্ডারা ঐ রমণীকে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "মা! আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর। জগন্নাথের লীলা আমরা কি বুঝিব? স্থূল দর্শনের মীমাংসক হইয়া উপপতি ও উপপত্নী ভাব বুঝিয়া তোমাদের নিগ্রহ করিয়াছিলাম। কে জানে, প্রভুর মনে এত ছিল! শোন্ মা শোন্, প্রভুকে অনেক ক্লেশে রথোপরি সংস্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু রথ চলে না। মনুষ্য-চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। অতঃপর প্রভুর আদেশ হইল যে, "কাহার সাধ্য আমার রথ টানে? যদ্যপি পৃথিবী কৃত্রিম শক্তি একত্রিত করিয়া

তোমরা রথ টানিতে প্রয়াস পাও, তাহা নিশ্চয় বিফল হইবে। আমায় স্থূল শক্তিতে আকর্ষণ করিতে পারে, এ শক্তি শক্তিতে নাই। আমার অনাথিনী ভক্ত—হা পিতা! হা পিতা! বলিয়া সাগরকূলে রোদন করিতেছে। সে আমায় দেখিতে আসিয়াছিল, তোমরা তাহাকে দূরীভূতা করিয়া দিয়াছ, স্মরণ নাই? দেখ গিয়া, বালির রথ প্রস্তুত করিয়া আমার রথযাত্রা সম্পন্ন করিতেছে। যাও, তোমরা তাহাকে লইয়া আইস, তাহাকে আমার রথের রজ্জু স্পর্শ করাও, তবে আমার রথ চলিবে। মাগো! তুমি প্রভুকে ব্যস্ত করিয়াছ, প্রভুকে রথে বন্দী করিয়াছ, তুমি সামান্যা নও! দাও তোমার চরণধূলি, অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়া মানব-জন্ম সার্থক করিয়া লই।" অনতিবিলম্বে সেই ভাগ্যবতী রথ-সমীপে আসিল এবং স্পর্শ করিবামাত্র রথ স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল।

এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া অর্থাৎ যদ্যপি কেহ অকপটভাবে পরিহাসের নিমিত্তও ভগবানের নাম উল্লেখ করে, তাহারও ভগবান্ লাভ হয়।

ভাব-সমন্বয় দ্বারা আমরা এই বুঝিলাম যে, সকলের ভাবই এক অদ্বিতীয় ভাবময়ের, তাহা কাহারও ব্যক্তিগত নহে। ভাবের সমন্বয় তাঁহাতে হইয়া থাকে, তাহা ব্যক্তিবিশেষে হয় না। অথবা যদ্যপি ধর্ম্ম-সমন্বয় দেখিবার কাহারও সাধ থাকে, তাহা হইলে তিনি এই জগৎখানা দেখুন, যথায় ভাবের সমন্বয় হইয়া রহিয়াছে। দেখুন হিন্দুর দিকে, তাঁহারা সম্প্রদায়বিশেষের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া ভগবানে সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন। দেখুন খ্রীষ্টানদিগের সিদ্ধ-পুরুষদিগকে, তাঁহারা কি আনন্দে দিনযাপন করিতেছেন। দেখুন মুসলমানদিগের সাধকদিগকে, তাঁহারা শান্তভাবে ভগবান্‌কে সম্ভোগ করিতেছেন। সমন্বয় দেখিতে আর যাইব কোথায়? এই জগতই তাহার রঙ্গভূমি,

লীলাময় এইস্থানেই অভিনয় করিতেছেন। আমরা যেমন আপনাপন গৃহের ভিতর বসিয়া সূর্য্যালোককে মনে করি যে, আমার বাটিতে উহা আবদ্ধ হইয়া আছে, সেইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবরূপ প্রাচীর দ্বারা আমরা বাহিরের ভাব কোন মতে উপলব্ধি করিতে পারি না। নিজ বাটীর বাহির হইয়া প্রত্যেক বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক তথাকার রৌদ্র এবং সূর্য্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে; সর্ব্বশেষে তাহার সমন্বয় হইতে পারে। তখন তাহার এক সূর্য্য জ্ঞান ও তাহার রশ্মি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মসমন্বয়ও সেইরূপ। প্রত্যেক ভাবে সাধক হইয়া (পুস্তক পাঠে হয় না, কল্পনায় হয় না, কবিতায় হয় না, শুনিলে হয় না,) তাহাতে সিদ্ধ হইয়া, তদনন্তর তাহার সমন্বয়কালে তিনি দেখিতে পান যে, এক ঈশ্বর এবং তাঁহারই বহু ভাব। মনুষ্যের দ্বারা তাহা অদ্যাপি সাধিত হয় নাই; সেইজন্য দ্বেষভাবের—সম্প্রদায়িক ভাবের অবিরত অভিনয় হইতেছে। দয়াময় ভগবান্ রামকৃষ্ণ-রূপে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া, ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের দ্বারা যাহা হয় নাই, যাহা আর কখন হইবেও না, যাহা কেহ করিতে পারেন নাই এবং চেষ্টা করিলে কেহ পারিবেন না, তাহা রামকৃষ্ণের দ্বারা হইয়াছে, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অবতার বা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি।

রামকৃষ্ণদেব যে, বাস্তবিক ধর্ম্ম-সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহাকে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। পরম-হংসেরা তাঁহাকে 'পরমহংস' জ্ঞান করিতেন এবং তজ্জন্যই সেই নামে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' বলিয়া অদ্যাপি উল্লিখিত হইতেছেন। তান্ত্রিক কৌলেরা তাঁহাকে 'কৌল' বলিয়া মানিতেন, বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে

গৌরাঙ্গ স্বীকার করিতেন, শৈবেরা শিব বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, নানকপন্থীরা নানক, কর্ত্তাভজারা আলেখ, সহজেরা সহজ, বাউলেরা সাঁই, নবরসিকেরা অটুট বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। এমন কি বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মজ্ঞানীরাও তাঁহাকে জ্ঞান ভক্তির আদর্শ স্থান বলিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে যাইয়া আশ্রয় লইতেন। তাঁহার নিকট একদিকে সকল সম্প্রদায়ের সাধুরা উপবেশন করিতে পাইতেন, আর একদিকে সরল অকপট মাতাল, লম্পট, বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরাও স্থান পাইতেন। কেবল কপট আত্মাভিমানী ব্যক্তিরা এক মূহূর্ত্তকাল বসিতে পারিতেন না।

রামকৃষ্ণের নিকটে যখন সকল শ্রেণীর লোকেরা, সাধু, অসাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী, নরনারী, বৃদ্ধ, যুবা, বালক, সকলেই শান্তি পাইতেন, যখন তাঁহাকে নিজ নিজ ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেন, সকলে তাঁহাকে ইষ্ট বলিয়া বোধ করিতেন, এমন ব্যক্তি যিনি, তিনি কে? স্থির হইয়া, যত্তপি বুঝিব বলিয়া বুঝিতে কেহ চেষ্টা করেন, তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, রামকৃষ্ণদেব বাস্তবিক অবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মসমন্বয়-কাহিনী হইয়া আমরা যত্তপি একদণ্ড বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমাদের প্রাণে অসীম আনন্দোদয় হইবে, তাহার সংশয় নাই।

যিনি সিদ্ধ, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; যিনি সাধক, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যিনি ধর্ম্মে নব প্রবর্ত্তিত অথবা যিনি ধর্ম্মের কোন কথাই বুঝেন নাই, তিনি যখন সাম্প্রদায়িক প্রচারকদিগের বিভীষিকাপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করেন, তখন তাহার মনে কি হয়? যাঁহারা জীবনে এরূপ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়া লউন। মনে করুন, খৃষ্টানেরা বলিতেছেন, তোমরা যে পর্য্যন্ত যীশুখৃষ্টকে না ভজনা করিবে, সে পর্য্যন্ত নিস্তার নাই, পৃথিবীতে পরিত্রাতা তিনিই এক অদ্বিতীয়; এই বলিয়া আমাদের

প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যাদি নানা দোষ দেখাইতে লাগিলেন। একথা শ্রবণ করিলে কোন্ হিন্দুর প্রাণে শান্তি হয়? ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত কোন্ হিন্দুর হৃদয় না আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে? পরে কি হইবে, এক্ষণে কি হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া কে না ভাবিয়া দশদিক্ শূন্যময় বোধ করেন? ব্রাহ্মেরা যখন সাকার পূজা এবং হিন্দু-রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ করিয়া উপদেশ দেন, তখন কোন্ হিন্দুর প্রাণে হতাশ আসিয়া প্রত্যাঘাত করিতে না থাকে? এইরূপে প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক প্রচারকেরা যখন আপনার প্রণালীর প্রাধান্য দেখাইয়া অপরের নিন্দা ঘোষণা করেন, তখন প্রত্যেকের প্রাণে অশান্তির হুতাশন প্রজ্জলিত করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়ে তিনি কি বলিয়াছেন, একবার শ্রবণ করিয়া দেখুন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যে কেহ যেরূপে অকপটে ভগবান্ বলিয়া আরাধনা করিবে, তাহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। হিন্দু হউক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, বৌদ্ধ হউক, শিখ হউক, সন্ন্যাসী হউক, গৃহী হউক, বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, বৃদ্ধা হউক, যুবতী হউক, মাতাল হউক, লম্পট হউক, সতী হউক, বেশ্যা হউক, সাকারবাদী হউক, নিরাকারবাদী হউক, তান্ত্রিক হউক, পৌরাণিক মূর্ত্তিবিশ্বাসী হউক, কর্ত্তাভজা হউক, নবরসিক হউক, পঞ্চনামী হউক, যে কেহ হউক, সে যদ্যপি আপন ভাবে নৈষ্ঠিক ভাবের সাধক হইয়া থাকিতে পারে, ঈশ্বরপ্রাপ্তির সম্বন্ধে তাহার কখন প্রত্যবায় ঘটিবে না।"

আহা! এমন কথা কি স্বর্গীয় নহে? এমন আশ্বাস বাক্য কি দৈববাণী নহে? এমন প্রাণ-জুড়ান সংবাদ কি সুসংবাদ নহে? সাব-ধান! সাবধান! কেহ আর আত্মহারা হইবেন না; কেহ আর প্রচারক-দিগের বাক্যলালিত্যে আত্মপ্রতারিত হইবেন না। আপন গৃহ ত্যাগ

করিয়া অপর গৃহে যাইবেন না। চক্ষে দেখিয়াছেন যে, কত লোকে এক-দিন নারায়ণ মূর্ত্তির অবমাননা করিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন, দেখিয়াছেন কত লোক প্রলোভনে পতিত হইয়া কোথায় যাইয়া পতিত হইয়াছেন কিন্তু তাহারাই পুনরায় আবার কি বলিয়াছেন এবং কি হইয়াছেন। অতএব সাবধান! সাবধান!

অনেকের ভ্রম জন্মিয়াছে যে, আমরা সকল ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া রামকৃষ্ণের নামে একটা সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছি। একথা নিতান্ত অলীক। যাঁহারা আমাদিগের নিকট রামকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিতে আইসেন, তাঁহাদের বলিয়া থাকি যে, "যাহার যাহাতে অভিরুচি, তিনি তাহাই করিবেন, তাহাতেই তাঁহার মুক্তি হইবে। আমাদের যে সকল সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা তিনি নিজে সাধন করিয়া সকল মতেরই পোষাকতা করিয়া গিয়াছেন, কিছুই নষ্ট করেন নাই। কিন্তু একথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহার সাধন করিবার শক্তি নাই, যাহার কোন সাধনমতে প্রবেশ করিবার উপায় নাই, এমন ব্যক্তিদিগের জন্য অর্থাৎ উপায়বিহীন, পতিত, অনাথ, নিরাশ্রয় নরনারী যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহারা যদ্যপি আমাকে বকল্মা দেন, তাঁহাদের পরিত্রাণের ভার আমার।" এই শ্রেণীর যাঁহারা, তাঁহারাই রামকৃষ্ণকে আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করিতেছেন ও করিবেন, ইহা কাহারও বিপরীত বুঝিবার কথা নহে।

যদিও উপায় এবং সাধনবিহীনদিগের নিমিত্ত রামকৃষ্ণকে পরিত্রাতাস্বরূপ বলা হইল, কিন্তু তদ্ভিন্ন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তিনি পরম উপকারী বন্ধুবিশেষ, তাহার সন্দেহ নাই। সকলের কল্যাণ কামনা তাঁহার ব্রত ছিল, সকলের শান্তিলাভের জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন এবং যাহাতে সকলে পরস্পর দ্বেষভাব হইতে পরিমুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার কার্য্য ছিল। এ ক্ষেত্রে এমন হৃদয়শূন্য প্রেমবিহীন

কে আছেন যে, রামকৃষ্ণকে হৃদয় খুলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে না চাহিবেন? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, যে ব্যক্তি বাস্তবিক ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছেন, যে ব্যক্তি বাস্তবিক ধর্ম্মের বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের বাস্তবিক অভাব বোধ করিয়াছেন, তিনিই নিশ্চয় আমার সহিত সহানুভূতি করিতে পারিবেন। তিনিই আমার সহিত সমস্বরে রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতে পারিবেন। রামকৃষ্ণ শুষ্ক তর্কের নহেন, রামকৃষ্ণ শুষ্ক যুক্তির নহেন, রামকৃষ্ণ শান্তির বিধাতা। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তিনি পরম আদরের সামগ্রী। যেহেতু তিনি এই ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবের সময়, যখন কে কোন্ দিকে যাইবে, কাহার কথা শুনিবে, কোন্ ধর্ম্ম সত্য বলিয়া অবলম্বন করিবে, যে সময় পদপ্রদর্শকের নিতান্ত প্রয়োজন, উপদেষ্টার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সময়ে তাঁহার দ্বারা ধর্ম্ম সমন্বয় হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের দ্বারা ধর্ম্মবিবাদ মিটিয়াছে। এ কথা ধর্ম্মপথের প্রত্যেক লোক প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব সকল সম্প্রদায়কে সত্য বলিয়াছেন, অতএব তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, যাহার যে ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা, তাহা অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তমনে জীবনের দিনকটা আনন্দে কাটাইয়া যান।

গীত

(১)

কোন্‌টী তোমার আসল নাম সুধাই তোমারে।
তোমায় যে যা-বলে, তাতেই মিলে, বুঝ্‌তে নারি ব্যাভারে।
তুমি কারোর আল্লা, কারো বা হরি, কোথাও গণপতি মারুতি হেরি,

কোথাও সত্যনারা'ণ, মুস্কিল আসান, আলো কর আঁধারে ॥
উৎকলের জগন্নাথ, নদের দুভাই, গৌর নিতাই, রোগীর তারকনাথ,
তুমি দ্বাদশ গোপাল, জেলের মাকাল, বিধাতা আঁতুড় ঘরে ॥
কিবা মায়া চমৎকার, মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ আকার,
পুনঃ সিংহলে, কমল দলে, কামিনী করী করে ॥
তুমি প্রহ্লাদের হরি, নরসিংহ রূপধারী,
ছলি বলি হ'লে দ্বারী বামন ভিখারী,
কিন্তু অপার করুণা হেরি ক্ষত্র কুলের জড় মেরে ॥
ব্রহ্মা ব'লে পার্শী তোমায় চায়, বিষ্ণুরূপে কমলা সেবায়,
আবার দম্ মেরে ব্যোম্ ভোলা ব'লে ভক্ত দোক্তা ভুল করে ॥
তুমি ময়ূর চাপা কার্ত্তিকটী যার নাম,
নারী মাঝে বন্ধ্যা সাজে তুমি যারে বাম,
কভু টোলে বস বীণাপাণি বারোয়ারী বাজারে ॥
ওমা কসায়ের কালী, ভক্তি ভরে গোঁসাই ঠাকুর বলেন বনমালী,
পুনঃ তরুতলে ষষ্ঠী ব'লে বস বেরাল ভর ক'রে ॥
তুমি বুদ্ধদেবে হিংসা নিবারণ, শমনরূপে কিবা প্রয়োজন,
তাহে শীতলা মনসা দেবী স্মরিলে প্রাণ শিহরে ॥
তুমি সুবচনী খোঁড়া হাঁস চেপে, হ'য়ে হৃষ্ট যীশুখৃষ্ট পাদ্রীতে জপে,
আবার কারিকরের বিশ্বকর্ম্মা সাফ্‌রিদ পিলের জ্বরে ॥
তুমি পূর্ণব্রহ্ম অংশ সনে অবনীতলে,
মানি প্রজাবাণী প্রণয়িনী বনে পাঠালে,
কিনিলে কলঙ্ক সাধে অলক্ষ্যে বালি মেরে ॥
কহ সত্য বিবরণ, তুমি সিত পীত লোহিত কি হরিত বরণ,
কিবা অসিত বরণী, শুধু অসুর নাশিবারে ॥

তোমার কর সংখ্যা কত শুনি, কতই চরণ,
কতই শির, কতই লোচন,
তুমি পুরুষ প্রকৃতি কিবা নারিনু চিনিবারে ॥
কেহ সমাজ মাঝে চরণ পূজে নিরাকার পিতা
কেহ মা বোলে রোজনামা খোলে রোজগারের খাতা,
ছিলে নন্দালয়ে শিশু হ'য়ে জন্মদাতা ভুল ক'রে ॥
ব্রজ ধামে রাধা নামে প্রেমেতে মাতাল,
সখা বলে, কোলে তুলে তুষিলে রাখাল,
ক'রে ধ্বংস নিজ বংশ উল্টো লীলা দ্বাপরে ॥
এ যে বিষম কলিকাল, ভক্তি গেল যুক্তি এল তর্কেরি জঞ্জাল,
তাতে বাড়ছে ফ্যাসাৎ, তুমি তফাৎ, দলাদলির ঘোর ফেরে ॥
তোমার কোথা দেখা পাই, স্থলে জলে পাতালে বা থাক সর্ব্ব ঠাঁই,
মম শূন্য হৃদি এস যদি ডাকি তাই বারে বারে ॥
মিটি সকল সংশয়, বর্ণ রূপ অবয়ব নামের পরিচয়,
হ'ক পূর্ণ হৃদয়, রামকৃষ্ণময়, ভেদজ্ঞান রাখি দূরে ॥

(২)

যে ভাবে যে চায় তোমারে তাতেই দেখা হয়।
পূরোভাবে পূরে আশা, অভাব হ'লে নয় ॥
কাঁদে শিশু কোথা হরি, মরি তাহে নাহি ডরি,
বিপদকাণ্ডারী নামে কলঙ্ক না সয়,
ভকতে অভয় দিতে অনলে উদয় ॥
পিতা চাহে কোথা হরি, কোথা সেই চির অরি,
সুর অরি ডরে বুঝি ভুলালে তনয়,
রিপু ব'লে কোল দিলে তায় চরম সময় ॥

(৩)

আজ সবাই মিলি, রামকৃষ্ণ বলি, এস করি সংকীর্ত্তন।
ওরে হৃদয় ভ'রে ডাক দেখিরে, শীতল হবে প্রাণ মন॥
তোর দিন ব'য়ে যায়, ফিরবে না হায়, নাইক উপায় নাম বিনে—
তাই সময় কালে, রামকৃষ্ণ ব'লে, কর শমন শঙ্কা নিবারণ॥

—০—

তৃতীয় বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

২

চতুর্থ বক্তৃতা

—:*:—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

গুরুতত্ত্ব

—:*:—

১৩০০ সাল, ১৯শে আষাঢ়, রবিবার, প্রাতঃ
৮ ঘটিকায় ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

—:*:—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

গুরুতত্ত্ব।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

যে প্রস্তাবটি লইয়া অদ্য আমি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা বর্ত্তমানকালে আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যদ্যপি কাহার ভগবৎ-তত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা হয়, যদ্যপি কাহার ভবঘোর বিদূরিত করিতে বাসনার সঞ্চার হয়, যদ্যপি কাহার আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত স্পৃহা জন্মায়, তাহা হইলে গুরুকরণ ব্যতীত কখন তাহার কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। মনুষ্যদিগের যে সকল শারীরিক এবং মানসিক সংস্কার আছে, তন্মধ্যে গুরুকরণ করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সংক্ষেপে গুরুকরণের তাৎপর্য্য এই যে, সত্য লোক দ্বারা অজ্ঞানতিমির হইতে পরিমুক্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করাই গুরুকরণের উদ্দেশ্য।

কার্য্যবিচারে আমাদের তিন প্রকার গুরুকরণ হইয়া থাকে। যথা শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। যাঁহাদের উপদেশ মতে আপনাকে পরিচালিত করিলে শরীরে বলাধান হয় এবং সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে দিনপাত করা যায় এবং অসুস্থ হইলে তাহারও প্রতিবিধান করিতে পারা যায়, তাঁহাদের শারীরিক গুরু কহে। এই শ্রেণীর গুরু —চিকিৎসকগণ।

যাঁহাদের উপদেশ মতে আমাদের মানসিক উন্নতি সাধন হয়,

তাঁহাদের সকলকেই গুরু বলে। মাতা, পিতা, শিক্ষক, গ্রন্থকর্ত্তাগণ, ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই শ্রেণীর গুরু বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

যাঁহার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, যাঁহার কৃপায় সংসারক্ষেত্রের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায় ও যাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভগবান্‌কে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করা যায়, যাঁহার দ্বারা বাস্তবিক ভগবানের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে, তিনিই প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক গুরু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

যদিও কার্য্য হিসাব করিয়া, আমি গুরুতত্ত্ব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম, কিন্তু বাস্তবিক ইহা দুই ভাগে বিভাগ করিয়া, শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু বলিলে ভুল হয় না। শারীরিক এবং মানসিক শিক্ষা—শিক্ষাগুরু এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা—দীক্ষাগুরুর দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। শিক্ষা এবং দীক্ষা ব্যতীত কাহারও একটী বর্ণজ্ঞান কিম্বা কোনও কর্ম্মজ্ঞান অথবা তত্ত্ববোধ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ গুরু নিতান্ত প্রয়োজন। গুরু সাক্ষাৎ না হইলে, উদ্দেশ্যে সে কার্য্য সমাধা হইতে পারে না। যেমন গুরুমহাশয় ক, খ, শিক্ষা না দিলে, অথবা অন্য কর্তৃক তাহা উপদিষ্ট না হইলে, কাহারও ক, খ, শিক্ষা করিবার সাধ্য নাই, অন্যান্য বিষয়েও তদ্রূপ। যেমন 'ক' লিখিবার সময় গুরুমহাশয় বালককে হাতে ধরিয়া তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইরূপ অন্যান্য বিষয় হাতে ধরিয়া শিক্ষা না দিলে, কেহ তাহা শিক্ষা করিতে পারে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তির সমক্ষে একটী বায়ুমান যন্ত্র সংস্থাপিত থাকে, সে ব্যক্তি কি উহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে? বায়ুর বৃত্তান্ত শিক্ষা না করিয়া, কে তাহা জানিতে পারিয়াছে? শরীরতত্ত্ব গুরু ব্যতিরেকে কেহ কি আপনি শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? সেইরূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষাও সাক্ষাৎ গুরুর উপদেশ

প্রাপ্ত না হইলে, কস্মিন্‌কালে তাহার বর্ণমালা জ্ঞাত হইবার কাহারও এ পর্য্যন্ত অধিকার হয় নাই এবং হইবার নহে।

শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে আমাদের আপাততঃ কোন বিভ্রাট ঘটে নাই, আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছি ও অবনত মস্তকে তাঁহাদের চরণরেণু স্পর্শ করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমরা তথায় নিজের দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া থাকি এবং আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহাদের নিকট পরাজয় লাভ করে, সুতরাং আমাদের অভিনয়, জ্ঞান গরিমা, আত্মশ্লাঘা আর মস্তকোত্তলন করিতে সাহস করে না। শিক্ষা-গুরুর স্থলে কিছু শিক্ষা হয়, এই নিমিত্ত তথায় গুরু শিষ্যে শিক্ষার তারতম্য বা কম বেশী তুলনা করা যাইতে পারে।

দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। গুরুকরণ কথাটা আজ কাল কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুরুবিশ্বাস দেশ হইতে উঠিয়া যাইবার দশায় পতিত হইয়াছে। যে গুরুকরণ করা আমাদের দেশে সংস্কারবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত, গুরুকরণ না হইলে দেহ শুদ্ধ হইত না, গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া ধারণা ছিল, গুরুর কৃপা ব্যতীত ভবার্ণবে গত্যন্তর ছিল না, সেই দেশে গুরুকরণ করা রহস্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কি ?

কথিত হইয়াছে যে, শিক্ষাগুরুর স্থলে আমরা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি গুরুর সহিত তুলনা করিতে পারি, কিন্তু দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে তাহা হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সমুদয় বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বর্ত্তমানকালে নবরূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহা পাঠ করিবার প্রতিবন্ধক না থাকায় আমরা অনেক বিষয় আপনারাই অবগত হইয়া থাকি।

বিশেষতঃ কঠিন দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র সকল ভাষান্তর হইয়া যাওয়ায়, এমন কি অতি সামান্য ব্যক্তিও তাহার এক প্রকার মর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া

থাকে। যাঁহারা গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কেহ সাধনাদি কার্য্য প্রায় করেন না; অনেক স্থলে শাস্ত্রজ্ঞও নহেন। এরূপ অবস্থায় শিষ্য গুরুকে আপন অপেক্ষা মহান্ এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে না পারায়, গুরুভক্তি ও গুরুকরণ করা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা সেরূপ শিক্ষিত হন নাই, সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত গুরুকরণ চলিতেছে। কিন্তু ভরসা নাই যে, অধিক দিন তাহা থাকিবে।

একদা কোন গৃহস্থের বাটীতে গুরুঠাকুর কালী-পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। পূজান্তে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! কালীর এপ্রকার গঠন হইল কেন?" গুরুঠাকুর মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন, কি বলিবেন ভাবিয়া দিশেহারা হইলেন। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীর জিহ্বা বাহির হইল কেন?" গুরুঠাকুর কহিতে লাগিলেন, "দেখ, আগমবাগীশের মতে কালী-পূজা হয় কি না? আগমবাগীশ মনে করিলেন যে, কিরূপে জীবের কল্যাণ বিধান করা যায়? তিনি এই কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বপনে কে তাঁহাকে বলিল, কল্য প্রত্যূষে তুমি যাহাকে অগ্রে দেখিবে, তাহাকেই পূজা করিবার ব্যবস্থা করিও। তাঁহার সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন আহিরিণী বাম হস্তে গোময় রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে কিয়ৎ পরিমাণে লইয়া ঘুঁটে দিতেছে। আগমবাগীশ তাহার সম্মুখে যাইয়া মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গোয়ালিনীর মস্তকের কাপড় সরিয়া গিয়াছিল, অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া মস্তকের বস্ত্র টানিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, সুতরাং লজ্জায় জিব বাহির করিয়া ফেলিল।" কর্ত্রীঠাকুরাণী গুরুর কথা শ্রবণ করিয়া

ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আহিরিণীর দুই হাতের স্থলে চারিটী হাত বর্ণনা করিলেন কেন? মুণ্ডমালা, পদতলে শিব, এ সকল তিনি কোথায় পাইলেন?" গুরুঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোক, অত জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? ওরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপাপ হয়, বিশেষতঃ গৃহী তোমরা, স্বামী পুত্র লইয়া ঘর কর, কি জানি কি হইতে কি হইয়া যাইবে।" কর্ত্রীঠাকুরাণী এই কথায় নিরস্ত হইয়া যাইলেন এবং পাছে গুরুর ক্রোধে পারিবারিক অকল্যাণ হয়, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গুরুপত্নীর জন্য ভাল দেখিয়া একখানি বোম্বেসাড়ী প্রদান করিলেন। সে যাহা হউক, এইরূপ অবস্থায় দোষ কাহার? শিষ্যের না গুরুর? বিচার করিলে কাহারই দোষ দেওয়া যায় না, তাহা কালের উপর নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বকালে আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর যে প্রকার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহা সম্যকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গুরু পরিবর্ত্তিত হইবার প্রধান হেতু শিক্ষাপ্রণালীর বিপর্য্যয় হওয়া, তাহা হিন্দু রাজত্বাবসানকাল হইতেই সূত্রপাত হইয়াছে। যখন আমরা যেরূপ জাতির শাসনাধীনে পতিত হইয়াছি, তখনই আমাদের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিলে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন বিধায়, স্বভাব এবং সংস্কারাদি সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ স্বভাব এবং সংস্কার বহুদিন হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং পুরাকালীন ভাব বর্ত্তমান কালে কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। গুরু ও শিষ্য উভয়েই এক রাজার অধীন এবং একই নিয়ম উভয় ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাকালে যেরূপে বর্ণ বিচার দ্বারা বর্ণ-ধর্ম্মের ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে সে বর্ণ বিচার নাই, সুতরাং বর্ণ-ধর্ম্মের কার্য্যও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্য

ব্যতীত অন্য কিছু জানিতেন না, ধ্যান ধারণা, সমাধি লাভ করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তাঁহাদেরই একমাত্র কার্য্য ছিল, তাঁহারাই চিন্তাশীল মস্তিক লাভ করিতেন, সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিতে সম্ভাবনা ছিল না। তখন ব্রাহ্মণই সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ হইতেন। ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে জড়তত্ত্ব পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁহারা অধিকার বিস্তারিত করিতেন। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষা এবং দীক্ষা দিবার আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা আপনাপন বর্ণগত কার্য্য লইয়া দিনযাপন করিত। কিন্তু এক্ষণে সে নিয়ম কোথায়? ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য আর নাই, আর গুরুগৃহে বাস করিবার পদ্ধতি নাই, আর সংযমী হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিবার ব্যবস্থা নাই। এক্ষণে ইউনিভারসিটী আমাদের শিক্ষার স্থল। সাহেব আমাদের আচার্য্য, উপদেষ্টা ও গুরু। সকল বর্ণ এক স্থানে এক পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিতেছে, সকলের লক্ষ্য এবং ভাবী উদ্দেশ্য এক দাঁড়াইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রেও বর্ণ বিচার নাই। বর্ণ দূরে থাকুক, যবন এবং ম্লেচ্ছের পাদুকা বহন করিতেও হইতেছে। অনেক স্থলে শিষ্যের পদোন্নতি হইলে গুরুপুত্র বা তদ্‌পরিবারের ব্যক্তি-দিগকে তাহার অধীন হইয়া কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত থাকিতে হয়। এ অবস্থায় বর্ণের ইতর বিশেষ থাকিতে পারে না।

আজকাল প্রায় সকলের অবস্থা হীন হইয়া আসিয়াছে, অর্থের নিমিত্ত সকলেই লালায়িত, অর্থের নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা হাহাকার ধ্বনি প্রায় প্রতি গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সুতরাং অর্থের আনুকূল্য হওয়া যে স্থানে সম্ভাবনা, সেই স্থানেই সেই ব্যক্তি মস্তকাবনত করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকে। তাহা না হইলে গভর্ণমেণ্ট, গভর্ণমেণ্টের

কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণাদির নিকট কোনও বিষয়ে মতামত চাহিলে তাঁহারা কিজন্য শাস্ত্র ও সামাজিক ব্যবহার মতে তাহা প্রদান করিতে অশক্ত হইয়া থাকেন? কেবল অর্থই তাহার হেতুস্বরূপ। বাস্তবিক অর্থের নিমিত্তই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বকালীন অবস্থা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবার হেতুই অর্থ। বলিয়াছি যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের জীবনের একমাত্র কার্য্য ব্রহ্মচর্য্য ছিল, তাঁহারা সেই অবস্থায় গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন এবং তদবস্থায় প্রায় ষট্‌ত্রিংশ বর্ষকাল কাটিয়া যাইত। তদনন্তর তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দার-পরিগ্রহ করিতেন, না হয় সাধনাদিতেই জীবদ্দশা সমাপ্ত করিতেন। যাঁহারা ছত্রিশ বৎসরের সময় গুরুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দারপরিগ্রহ করিতেন, তাঁহারা তৎপরবর্ষেই সন্তানের মুখ দর্শন করিতেন না। তাহার হেতু এই যে, বালিকা স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা প্রবীণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিরা জানিতেন, সুতরাং প্রায় চল্লিশ বৎসরের নিম্নে তাঁহাদের অদৃষ্টে সন্তান লাভ হইত না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের প্রায় বিস্তীর্ণ সংসার হইতে পারিত না, সুতরাং অভাব জনিত তাঁহাদের অল্পই ক্লেশ হইত।

মানসিক উন্নতির যতই হ্রাস হইতে লাগিল, ততই ইন্দ্রিয়াসক্তি বাড়িতে লাগিল। মন চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া না গেলে তাহার আর যেন ভাবিবার কিছুই থাকে না। ক্রমে বালকের বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইল। মনুসংহিতা ভস্মীভূত করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। অল্প বয়সে সংসারক্ষেত্রে সংসারী হওয়ায় অর্থের অনাটন হইয়া উঠিল এবং অর্থের নিমিত্ত অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত হইল।

কাল সহকারে সেই ভূদেবতা অর্থের ক্রীতদাস হইয়া একেবারে নবরূপে পরিণত হইয়া আসিলেন। এ স্থলে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষকে যাঁহারা গুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন, এক্ষণে সেই বংশধরদিগকে কোট, হ্যাট পরা বেশে দেখিলে কিরূপে প্রণাম করিতে রুচি হইবে এবং কিরূপেই বা তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিতে শ্রদ্ধা হইবে? যে স্থলে অদ্যাপি সেরূপ হয় নাই, সে স্থলে তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যয়ন তত্ত্বজ্ঞান এবং আত্ম-দর্শনাদি সাধন পক্ষে দৃষ্টি না থাকায় তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ, অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া বলিতেছি যে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা পাণ্ডিত্যের ভান দেখাইয়া অনেক স্থলে সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকেন। গীতার উপদেষ্টাকে কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব করিতে দেখিলে, বিজ্ঞ শ্রোতার কি প্রাণে আঘাত লাগে না? গীতা আমাদের বৈরাগ্য শাস্ত্র। গীতার তাৎপর্য্য বুঝাইতে হইলে বাস্তবিক বৈরাগ্যের উত্তেজনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু নিজে ঘোর বিষয়ী হইলে বৈরাগ্য ভাব আসিবে কিরূপে? মোটের উপর এখনকার শাস্ত্রশিক্ষা অর্থের নিমিত্ত, সুতরাং তাঁহাদের শাস্ত্রশিক্ষা আমাদের অর্থকরী বিদ্যার ন্যায় পরিগণিত হইয়াছে।

যাঁহারা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বজ্ঞান নাই। মহামহোপাধ্যায় হউন, আর তর্কলঙ্কারই হউন, কিম্বা বাচস্পতিই হউন, তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারা কোথায় পাইবেন? ব্রহ্মবৃত্তান্ত তাঁহারা অধ্যয়ন করেন নাই, ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহারা সাধন করেন নাই, তাঁহাদের নিকটে সে তত্ত্ব দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং যাঁহারা ঐশ্বরিক নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে যান, তাঁহারা হতাশ হইয়া অশান্তির করগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কেবল শাস্ত্র শাস্ত্র বলিলে কি কার্য্য হয়? না, হইবার সম্ভাবনা? রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, "পাঁজিতে লেখা থাকে যে,

এবার বিশ আড়ি জল হইবে, কিন্তু পাঁজি নিংড়াইলে এক ফোঁটা জল বাহির হয় না।" অর্থাৎ কার্য্য চাই। আমাদের দেশে পণ্ডিত আছেন, সে কথা আমি নত শিরে স্বীকার করি, দশকর্ম্মান্বিত পণ্ডিত-গণও যথেষ্ট আছেন, তাহাও অবনত মস্তকে স্বীকার করি, কিন্তু কয়জনকে তত্ত্বজ্ঞানী দেখিতে পাওয়া যায়? আমি দেখিয়াছি যে, কোন কোন পণ্ডিত একটী শ্লোকের পঁচিশ প্রকার অর্থ করিতে পারেন, আমি দেখিয়াছি যে, কোন কোন ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মদর্শী ঋষিদিগের ভ্রম বাহির করিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। আমরা জানি যে, কেহ কেহ নকল শাস্ত্র লিখিতে পারেন, কিন্তু একজন অশান্তিগ্রস্ত তত্ত্বানুসন্ধায়ীর প্রাণ কি তাঁহাদের দ্বারা শীতল হইতে পারে? না তাঁহারা চৈতন্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কাহারও কোন সহায়তা করিতে পারেন?

যেমন বৈয়াকরণের নিকট ব্যাকরণ, নৈয়ায়িকের নিকট ন্যায়, স্মার্ত্তের নিকট স্মৃতি, দার্শনিকের নিকট দর্শন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিই প্রকৃত চৈতন্য-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার একমাত্র গুরু। তিনিই প্রকৃত গুরু। তাঁহার নিকট শিষ্য নতশির হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকে এবং তাঁহারই পাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিয়া সার্থক জীবনজ্ঞান করিয়া থাকে।

সামাজিক, শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়ম কখন এক নিয়মের অধীন থাকিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত সকলেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। বংশে যদ্যপি একজন পণ্ডিত হন, তখন তাঁহার মান মর্য্যাদা হয়। তাঁহার বংশ পরম্পরায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ পণ্ডিত হইবেন, তাহার অর্থ নাই। সেই বংশে যে পরিমাণে বিদ্যার হ্রাস জন্মায়, বংশমর্য্যাদাও সেই পরিমাণে হ্রাস হইয়া আইসে।

শক্তিতেই লোকে উন্নত, শক্তিতেই লোকে শ্রেষ্ঠ, শক্তিতেই লোকে লোকের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া থাকে। যাহার যে পরিমাণে শক্তি কমিয়া যায়, তাহার সেই পরিমাণে গৌরবও কমিয়া আইসে। মনে করুন, কোন স্থানে একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় অনেকে তাঁহার নিকট উপদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার পরলোকের পর নৈয়ায়িকের বংশপরম্পরায় ন্যায়শাস্ত্র কেহ জানুন বা না জানুন, কেহ কি শিষ্য হইতে আসিয়া থাকেন? কখন নহে। কিন্তু দীক্ষা-গুরু স্থলে সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। গুরুকুলে যিনি থাকিবেন, তিনি পণ্ডিত হউন, আর লম্পটই হউন, তাঁহার নিকট ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা করিতেই হইবে। গুরুকুলে পুত্র-সন্তান না থাকিলে স্ত্রীলোকেরাও শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে গুরুকরণ সম্বন্ধে যে বাস্তবিক বিশৃঙ্খল ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

আজকাল যেরূপ অবস্থা পড়িয়াছে, তাহাতে গুরুগিরি করা নিতান্ত হাসি তামাসার কথা নহে। অনেকে যুবকদিগকে দেবতা-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা করেন। তাঁহারা কথায় কথায় বাপ পিতামহের সহিত তুলনা দ্বারা একথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু যুবকেরা কেন যে দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না, তাহার কারণ কেহ অন্বেষণ করিয়া দেখেন না। যদ্যপি কেহ তাহা দেখিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই যুবকদিগের অবিশ্বাসের আদিকারণ বলিয়া বাহির হইবেন।

যুবকেরা ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা অন্য যে কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত হউক বা না হউক, কিন্তু বিচারশক্তি লাভ করিয়া থাকে। এ কার্য্য করিব কেন? তাহার ফল কি? ইত্যাকার বিচার ব্যতীত কোন কথা সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। শিক্ষার ফলস্বরূপ

সংস্কার জন্মিলে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া যাইবার কাহারও শক্তি থাকে না। অতএব যুবকদিগের তাহা দোষ বলা যায় না।

বর্ত্তমান কালের শিক্ষার দ্বারা সহসা কেহ ঈশ্বর মানিতে চাহে না। আমাদের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার না ধর্ম্মশাস্ত্র, না নীতি শাস্ত্র, কোন ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গালা পুস্তক যাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য, তাহা প্রায় ইংরাজীর তর্জ্জমা, সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে ইংরাজী ভাবই আমরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইংরাজী ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মত। কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং কেহ তাঁহাকে উড়াইয়া দিয়া স্বভাবের মস্তকে সর্ব্বকার্য্যের ভার নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদেরও সেইরূপ সংস্কার গঠিত হইয়া যায়। একে আমরা বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা নানাবিধ কুসংস্কারাবৃত, তাহাতে দীক্ষা গুরুর অভাব, সুতরাং প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ও শিক্ষা করিবার পাত্রের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া পড়িয়াছে। গুরুশ্রেণীর ব্যক্তি অপেক্ষা শিষ্য শ্রেণীর যুবকেরা বিচারপটু, তন্নিমিত্ত গুরুকরণ হইবে কি, তাঁহারাই গুরুর ন্যায় পরিচয় দিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব কহিতেন, "গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, চেলা নাহি মিলে এক" অর্থাৎ সকলেই উপদেষ্টা হইতে চাহেন, কিন্তু উপদিষ্ট হইতে কেহ ইচ্ছা করেন না।

বর্ত্তমান কালের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। গুরুদিগের কিম্বা শিষ্যদিগের স্বইচ্ছায় এরূপ অবস্থান্তর সংগঠিত হইয়াছে, তাহা কোন মতে বলা যায় না। কালনিয়মই তাহার কারণ স্বরূপ।

এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? ভগবান্ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার-স্বরূপা

গুরুকরণ সম্বন্ধে যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন, অদ্য তাহাই প্রচার করিতে আমি অগ্রসর হইয়াছি।

তিনি বলিয়াছেন যে, "গুরুকে বিশ্বাস না করিলে কস্মিন্‌কালে কাহারও পরিত্রাণ হইবার উপায় নাই। গুরুকে যে মনুষ্যবুদ্ধিতে দর্শন করে, তাহার সকল কার্য্য বিনষ্ট হয়। গুরু এবং ঈশ্বর অভেদ জ্ঞান করাই প্রকৃত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অভিপ্রায়।" রামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশ বর্ত্তমানকালে কিরূপে আমরা গ্রহণ করিতে পারি? গুরুদিগের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদিগকে গুরু বলিতে লজ্জা বোধ হয়, ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় কিরূপে? রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে——

"আমার গুরু যদি শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

ইহার অর্থ এই যে, গুরু যেরূপই হউন, তাঁহার চরিত্র দোষ থাকুক, তিনি লম্পটই হউন, আর সাধুই হউন, তিনি আমার গুরু, তিনি আমার ইষ্ট এবং তিনিই আমার পরিত্রাতা। এরূপ উপদেশ বাস্তবিক অতিশয় গুরুতর। লম্পটকে দেখিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলা যুক্তিসঙ্গত? কিন্তু তিনি আবার বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মরাজ্যে যুক্তি চলে না, ধর্ম্মরাজ্যে বিদ্যা বুদ্ধি চলে না। তথায় বোবায় বলে, কাণায় দেখে এবং কালায় শোনে।" এ কথার তাৎপর্য্য কি এই সাধারণ পৃথিবীতে বাহির করা যায়? অতএব যাহার তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার গুরুকে বিশ্বাস করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।

গুরুকে ভগবান্ বলিবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, ভগবান্ বলিয়া যদ্যপি সাধকের ধারণা সঞ্চার হয়,

তাহা হইলে ক্রমে সেই ভাব বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে ভগবানেই পরিণত হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি উঠিবে, তাহা আমি জানি। ইহার মীমাংসা সাকার নিরাকার বক্তৃতায় কথিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর আপত্তি এই যে, মনুষ্য কখন ভগবান্ হইতে পারে না এবং তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলে মনুষ্যপূজক হইতে হয়। এ আপত্তি যদিও স্থূল ভাবে দর্শন করিলে, হেতু শূন্য বলিয়া অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে স্বাভাবিক দোষ হয় না বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবান্‌কে যেরূপেই ডাকা হউক না কেন, ভগবান্ সম্বন্ধ থাকিলে, একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের ভাব থাকিলে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ অবশ্যই তাহা জানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যে কেহ সন্দেহ করেন, তাহাকে আমি বাস্তবিক অবিশ্বাসী শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। এ কথাটী নিতান্ত গুরুতর, নিতান্ত সূক্ষ্ম, স্থূল-দ্রষ্টা আত্মাভিমানীর মস্তিষ্কে কখন প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা তাহাদের অধিকার বহির্ভূত কথা। আমি উপর্য্যুপরি বলিতেছি যে, রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন, ভগবান্‌কে যখন যে কেহ, যেরূপে উপাসনা করে, সেইরূপে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয় এবং গীতায়ও তাহা কথিত হইয়াছে, তখন এ কথায় সন্দেহ জন্মাইবার কোন কারণ নাই। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সাংশ্লেষিক এবং বৈশ্লেষিক বিচার দ্বারা প্রত্যেক পদার্থে ভগবানের সম্বন্ধ আছে, অথবা তাঁহার অবয়ববিশেষ বলিয়া বৈজ্ঞানিক সাধকের প্রত্যক্ষ মীমাংসা হইয়া থাকে, তখন মনুষ্যকে ভগবান্ বলা বৈজ্ঞানিক মতে কখন অশুদ্ধ হইতে পারে না।

এ বিষয়টী প্রত্যক্ষ না করিলে, নিজে উপলব্ধি না করিলে,

শুষ্ক কার্য্যবিহীন তর্কে কখন জ্ঞান লাভ করা যায় না। যেমন প্রভু বলিতেন যে, "কেবল সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে কি হইবে? সিদ্ধি সিদ্ধি জপ বা ধ্যান করিলে সিদ্ধির ব্যবহার বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শরীরের ভিতরে সিদ্ধি কিরূপ কাজ করে, যে সিদ্ধির জল পান করে, সেই তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। যে সিদ্ধির বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সিদ্ধি ক্রয় করিতে হইবে। ক্রয় করিয়া বাক্সতে লুকাইয়া রাখিলে নেশা হইবে না। তাহাকে উহা পিষিতে হইবে, পরে ঘুঁটিতে হইবে, তদনন্তর কেবল মুখের ভিতর রাখিলেও হইবে না, উদরস্থ করা চাই, তথায় কিয়ৎকাল থাকিয়া শোষিত হইলে তবে সিদ্ধি-জনিত আনন্দোদয় হইবার সম্ভাবনা।" অর্থাৎ যে, যে বিষয়ের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে তাহার কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেন, "যে সূতার কর্ম্ম করে, সে সূতা দেখিবামাত্র কোন্ সূতার কত নম্বর তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে; একজন নৈয়ায়িক কিম্বা স্মার্ত্ত অথবা হাইকোর্টের জজের দ্বারা কখন তাহার নম্বর নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। সেইরূপ ভগবান্‌কে ডাকিলে কি হয় বা না হয়, তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন।"

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অনন্ত কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কি বুঝিয়া যে মতামত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়া থাকি, সর্ব্বশক্তিমানের সম্বন্ধ স্থলে আমরা যে কোন বালকের চন্দ্র ধরার ন্যায় বুদ্ধির পরিচয় দিতে অগ্রসর হই, তাহা বুঝিবার যখন অদ্যাপি শক্তি সঞ্চার হয় নাই, তখন অপার মহিমার্ণবের মহিমা ইয়ত্তা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

গুরু লম্পট হইলে শিষ্যের কোন ক্ষতি হয় না, তাহা ভাবে বুঝা গেল। অর্থাৎ শিষ্যের যদ্যপি নিজের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে

তাহার কার্য্য সাধন হইতে কখন বিঘ্ন বাধা ঘটে না। ধর্ম্মজগৎ তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতেছে।

কথিত হইল যে, শিষ্যের বিশ্বাসই মূল। ভগবান্ লাভ করা কিম্বা না করা, এক বিশ্বাসের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। বিশ্বাস বলিলে প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। যাহার বাস্তবিক ভগবানের আবশ্যক হইয়াছে, ভগবান্ ব্যতীত যাহার প্রাণ স্থির হইতেছে না, 'হা ভগবান্', 'হা ভগবান্', বলিয়া যে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ভগবান্ লাভ না হইয়া, শুষ্ক কুতার্কিক, ভগবানের স্বরূপন্বেষী, আত্মশ্লাঘাপূর্ণ যথেচ্ছাচারী তাঁহাকে লাভ করিবে? যাহার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুলিত হইয়াছে, যে "ঈশ্বর! কোথায় ঈশ্বর! কোথায় যাইলে, কে বলিয়া দিলে তোমায় প্রাপ্ত হইব!" এইরূপ করিয়া দৌড়াইয়া বেড়ায়, তাহাকে যে কেহ যাহা বলিয়া দেয়, তাহাতেই তাহার ভগবান্ লাভ হইয়া থাকে। একথা ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

বিশ্বাসী শিষ্য হইলে গুরু তাহার নিমিত্ত বা হেতুমাত্র হইয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্য করেন স্বয়ং ভগবান্। কারণ গুরুকে মনুষ্য বলিলে ভগবান্ ভাব বিচ্যুত হয়, সুতরাং তথায় ভগবানের কার্য্য হইতে পারে না। ভগবান্ ভাব না থাকিলে, ভগবান্ কি জন্য কার্য্য করিবেন? তাঁহাকে না ডাকিলে তিনি কি জন্য প্রত্যুত্তর দিবেন? এই নিমিত্ত যাহাকে ভগবান্ লাভ করিতে হইবে, তাহাকে ভগবান্‌কেই চিন্তা করিতে হইবে, ভগবানের ভাব সর্ব্বতোভাবে যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা হইলে, সেই সাধকের ভগবান্-দর্শন হইবার সম্ভাবনা। অতএব গুরুকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস না করিলে কস্মিন্‌কালে কাহারও ভগবান্ লাভ হইতে পারে না। গুরু যাহা

বলিয়া দিবেন, তাহাতে যুক্তি তর্ক বা অবিশ্বাস করিলে কখন কেহ সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে না।

কথায় বিশ্বাস করিলে কিরূপ সুফল লাভ হয়, তাহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। কোন স্থানে এক গোস্বামীর নিবাস ছিল। গোস্বামী ঠাকুর নিজে সাধক বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু মন্ত্র দেওয়াই তাঁহার ব্যবসা ছিল, সুতরাং তাঁহার শিষ্য সংখ্যার সীমা ছিল না। জনৈক গোয়ালিনী শিষ্যা তাঁহাকে প্রত্যহ দুগ্ধ দিয়া যাইত। কিন্তু তাহাকে নদী পার হইয়া আসিতে হইত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে কখন পৌছিতে পারিত না। সুতরাং গোস্বামী ঠাকুরকে দুগ্ধের নিমিত্ত অনেক বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। একদিন অতিরিক্ত বেলা হওয়ায় গোস্বামী ঠাকুর গোয়ালিনীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন যে, "আর তোকে দুগ্ধ দিতে হইবে না। তোর গুরুভক্তি আমি বুঝিয়াছি।" গোয়ালিনী নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিল, "প্রভো! আপনি সকলই জানেন। আমি সর্ব্ব প্রথমে দুগ্ধের অগ্রভাগ আপনার সেবার নিমিত্ত লইয়া আসি, কিন্তু কি করিব, খেয়াঘাটায় পৌছিয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে হয়। লোক না জুটিলে মাঝি আমায় পার করিয়া দেয় না, সুতরাং আমার বিলম্ব হইয়া যায়। যত বেলা বাড়িতে থাকে, আমার প্রাণের ভিতর ততই অস্থির হইয়া উঠে এবং কত ক্লেশ পাই, তাহা কি প্রভু জানেন না?" "কি বলিলি? তোকে ভবসমুদ্র পার হইবার উপায় বলিয়া দিয়াছি, তুই সামান্ত নদীর তীরে মাঝির কৃপাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিস্? তোর কি মনে নাই যে, রাম নামে শিলা ভাসে? রামনাম ভবজলধি পার হইবার তরণীবিশেষ। তুই সেই রাম নাম বলিয়া চলিয়া আসিবি, নদী পার হইবার নিমিত্ত আর চিন্তা

করিতে হইবে না।" এই কথা বলিয়া গোস্বামী ঠাকুর নিরস্ত হইলে পর গোয়ালিনী দণ্ডবৎ প্রণামান্তর কহিল, "ঠাকুর অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন। আমি স্ত্রীলোক জ্ঞানবিহীনা, কিরূপে রাম নামের মহিমা বুঝিব! প্রভো, আপনি তাহা জানিতেন, তবে কেন এত দিন বলিয়া দেন নাই? এ কথা অগ্রে জানিতে পারিলে আপনার ক্লেশ হইত না এবং আমাকেও চিন্তিত হইতে হইত না, অধিক কি বলিব প্রত্যহ একটী পয়সাও বাঁচিত।" এই বলিয়া গোয়ালিনী পুনরায় কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোয়ালিনীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তদবধি অতি প্রত্যুষে গোস্বামীকে দুগ্ধ দিতে লাগিল।

একদিন গোস্বামী গোয়ালিনীকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "আর যে এখন পার হইতে তোর বিলম্ব হয় না? পারঘাটায় বুঝি প্রাতঃকালে সকলে আসিয়া তোর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে?" গোয়ালিনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কি প্রভো! আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন? যে দিন হইতে নদী পার হইবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতে আর আমায় পারঘাটায় অপেক্ষা করিতে হয় না। কখন যে নদী পার হইয়া আসি, তাহাও আমি জানিতে পারি না।" গোস্বামী গোয়ালিনী প্রমুখাৎ এই কৌতুকাবহ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি অতঃপর গোয়ালিনীকে কহিলেন, "তুই কি আমার সহিত ব্যঙ্গ করিতেছিস্? আমি তোর কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যে হেতু, শাস্ত্রে কথিত আছে বটে যে, রামনামে ভব সাগর অতিক্রম করা যায়, কিন্তু নদী পার হওয়া যায় না, তাহা আমি প্রত্যক্ষ জানি। আমি তোকে রাম নাম দিয়াছি, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত নদী পার হইতে পারি নাই।" গোয়ালিনী পুনরায় বলিল, "সে কি প্রভো! আমাদের প্রতারণা করেন কেন? দয়া করিয়া উপায় বলিয়া

দিয়াছেন, আবার তাহাতে সন্দেহ জন্মাইতেছেন কেন?" গোস্বামী তখন হাস্যপূর্ণ বদনে কহিতে লাগিলেন, "বেশ বেশ, তোর বিশ্বাসের সীমা কতদূর, তাহাই আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম। সে যাহা হউক, তুই কেমন করিয়া নদী পার হইয়া যাস্, আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।" গোস্বামীর এখনও বিশ্বাস হয় নাই যে, রাম নামে নদী পার হওয়া যায়। তিনি তদনন্তর গোয়ালিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ক্রমে নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। গোয়ালিনী স্বচ্ছন্দে নদীর উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু গোস্বামী তাহা পারিলেন না। গোয়ালিনী কিয়দ্দূর গমনান্তর পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "ওকি প্রভো! রাম বলিতেছেন, আবার কাপড়ও তুলিতেছেন!" গোস্বামী অপ্রতিভ হইয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিলে মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অপরের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনাকে পবিত্রভাবে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু উপদেষ্টার তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। এ প্রকার উপদেষ্টাকে উপগুরু কহে। অনেক আচার্য্য উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন যে, "পুরুষ যেমন পরদারগমনে পাতকী হয়, স্ত্রীলোকেও পরপুরুষগমনে পাতকিনী হইয়া থাকে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" সেই স্থলে ঐ পণ্ডিতপ্রবরের উপপত্নীও উপস্থিত ছিল। উপপত্নী মহাপাতকের কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইল এবং এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না শ্রবণ করিয়া দশ দিক অন্ধকার বোধ করিল। সে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অবিরত ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং কি উপায়ে পূর্ব্ব অজ্ঞানকৃত পাপরাশি হইতে পরিমুক্তি লাভ করিতে পারিবে, তাহার চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময়ে ঐ আচার্য্য ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। উপপত্নী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর! রক্ষা করুন, আপনি আমার পিতা!" পণ্ডিত মহাশয় কর্ণদ্বয় হস্তাবৃত করিয়া কহিলেন, "আরে পাগলী, বলিস্ কি? ছি! ছি! আর অমন কথা মুখে আনিস্ নে।" উপপত্নী কহিল, "ঠাকুর! আপনি এখনই বলিয়া আসিলেন যে, পরপুরুষ গমনে মহাপাতক হয়, আবার কেমন করিয়া সেই পাপকার্য্যে আপনি আমাকে লিপ্ত করিতে চাহিতেছেন?" আচার্য্য উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুই নিতান্তই পাগলী হইয়াছিস্, তাহা না হইলে কথায় কথায় ব্যবসার অনুরোধে লোকের মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত বাঁধি গদ্ একটা বলিয়াছি, তাহা কি সত্য বলিয়া লইতে হয়? কথায় কত কথাই বলা যায়, উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা বলিয়া কি সমুদয় সত্য বলিয়া জানিতে হইবে? দেখ্ না, শাস্ত্রে পঞ্চম বর্ষীয় ধ্রুবের কত অমানুষ কার্য্যকলাপ কথিত আছে, তৎসমুদয় কি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে?" উপপত্নী সরোদনে কহিল, "যাহা হইবার হইয়াছে, তাহার যদ্যপি কোন উপায় থাকে বলুন। আমি আপনার কন্যা, আপনি আমার গুরু, সুতরাং পিতা। আর বিড়ম্বনায় ফেলিবেন না। এতদিনে আপনার কৃপায় আমার কর্ম্মজ্ঞান হইয়াছে, আজ আমার ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে।" আচার্য্য ঠাকুর নানাবিধ বৃথা উপদেশ দিয়া পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এই নিমিত্ত ঠাকুর বলিতেন যে, "গুরু যাহা বলিবেন তাহাই শিক্ষা করিবে, তাঁহার কার্য্যকলাপ লইয়া কখন আন্দোলন করিবে না।" যদ্যপি উপদেষ্টা নিজ কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা বিধান করেন, তাহা হইলে বাস্তবিক সুশিক্ষা হয়, তাহার ভুল নাই। 'মদ খাইওনা' বলিয়া আপনি যদ্যপি মদিরার পিপায় ডুবিয়া থাকি, তাহা হইলে সে উপদেশের মতে কার্য্য হওয়া অতীব কঠিন। কিন্তু এ প্রকার

উপদেষ্টা অতিশয় দুর্লভ। সু-উপদেষ্টার অভাবে কার্য্যের সুশৃঙ্খল হয় না সত্য, কিন্তু শিক্ষার্থীরা যদ্যপি আপনার কার্য্য সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা অনায়াসে সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেমন খেংরা নিজে অপবিত্র, কিন্তু তদ্দ্বারা যে স্থান পরিষ্কার করা যায়, তাহা শুদ্ধ হয়। সেইরূপ গুরু যেরূপই হউন, তিনি যাহা বলেন, তাহা ধারণ করিতে পারিলে শিষ্যের কার্য্য হইয়া যায়।" যেমন চিকিৎসক রোগীকে ঔষধ সেবন করিতে বলেন, রোগীর তাহাই ব্যবস্থা। কারণ সে রোগগ্রস্ত, তাহার রোগোপসম হওয়া প্রয়োজন। অতএব গুরু যাহা উপদেশ দেন, সেইরূপ কার্য্য করা শিষ্যের কর্ত্তব্য।

কথিত হইল, শিষ্যের বিশ্বাসই সর্ব্বপ্রধান। যদ্যপি স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকেন এবং শিষ্যের তাহাতে বিশ্বাস না থাকে, সে প্রকার ঈশ্বর-দর্শনের ফল কি? অবিশ্বাসীর নিকট যদ্যপি ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাহা হইলে অবতারেরা কি জন্য সর্ব্বত্র আসনচ্যুত হইয়া থাকেন? কিজন্য তাঁহাদিগকেও পরিচয় দিয়া ও আপনার শক্তি দেখাইয়া তবে স্বীয় পদ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইতে হয়? সেইজন্যই প্রভু বলিতেন যে, "শিষ্যের বিশ্বাসই মূল।"

শিষ্যের বিশ্বাস সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে। কোন স্থানে একটী ভক্ত বাস করিতেন। এই ব্যক্তির ভক্তি এবং বিশ্বাসের নিমিত্ত তথাকার প্রত্যেক নরনারী তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। একদা তাঁহার বাটীতে গুরুঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না। তিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে গুরুর সেবাদি করিতে লাগিলেন। একদিন এই ব্যক্তির একটী শিশু সন্তানকে লইয়া ভৃত্য বহির্ব্বাটীতে বেড়াইতে-

ছিল। গুরু ঠাকুর তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া আপনি আদর পূর্ব্বক সন্তানটীকে বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রোড়ে লইয়া নানাবিধ কৌতুক করিতে লাগিলেন এবং ভৃত্যকে দোক্তা তামাক আনিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য বাটীর বাহির হইবামাত্র গুরু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুষ্টকণ্ঠ শিশুর কণ্ঠদেশ টিপিয়া ধরিবামাত্র শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সে মরিয়া গেল। তাহার গাত্রের অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়া শবটীকে সিন্দুকের ভিতরে বস্ত্রাবৃত করিয়া বস্ত্রের সহিত লুকাইয়া রাখিলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন যে, কল্য প্রত্যুষে প্রস্থান করিবার সময়ে পথে ফেলিয়া দিয়া যাইব, তাহা হইলে আর কেহ জানিতে পারিবে না। কিয়ৎকাল পরে ভৃত্য প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গুরুঠাকুরকে দোক্তাদি প্রদান করিয়া শিশুর কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন যে, আমার বিছানার উপরে তাহাকে রাখিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর দেখিতে পাই নাই; বোধ হয়, কেহ বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছে? কাহাকেও দেখিতে পাই নাই, সেইজন্য এ পর্য্যন্ত সংবাদটাও লইতে পারি নাই। বাপু! তুমি একবার বধূমাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহা হইলে আমি সুস্থির হই। ভৃত্য বাটীর ভিতর যাইয়া শিশুর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল। সকলেই কহিতে লাগিল যে, তুই তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়াছিস্, আমরা সকলে নিশ্চিন্ত আছি। এই কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই, শিশুর মাতার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়া তাঁহাকে নিতান্ত চিন্তাকুলা করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ভৃত্যের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় আশায় প্রাণ বাঁধিয়া মনকে সান্ত্বনা করিতে-ছিলেন। ভৃত্যের কথা তাঁহার বজ্রাঘাত সমান বোধ হইল, তিনি "কি হ'লোরে' বলিয়া একেবারে" উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ক্রন্দনে সমুদায় পরিজনেরা হা হুতাশ করিতে লাগিল। এমন সময়ে শিশুর পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আরও ক্রন্দনের হিল্লোল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। শিশুর মাতা ছুটিয়া আসিয়া "কোথায় আমার হারানিধি এনে দাও" বলিয়া পতির চরণপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইলেন। শিশুর পিতা সকলকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শিশু শিশু বলিয়া ক্রন্দন করিতেছ, শিশুর হইয়াছে কি? ভৃত্য ভীতচিত্তে শিশুসম্বন্ধে গুরুঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিল। এই কথা শ্রবণান্তর তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গুরুঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পদসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুঠাকুর নিদ্রার ভাণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাচার কি? শিশুর কি কোন সংবাদ পাইয়াছ? আমি বাপু! কি কুক্ষণেই যে তোমার শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমি সত্য বলিতেছি, তুমি আমার শিষ্য, পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তম, আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না। এই বিছানার উপরে বসাইয়া আমি একবার বহির্দ্দেশে গিয়াছিলাম, আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। বাটীর ভিতরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, তাহা হইবারই বা আশ্চর্য্য কি? তুমি চুপ করিয়া রইলে যে?" শিষ্য হেঁট মস্তকে অতিশয় মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আজ আমার কি দুর্দ্দিন! আপনি সশরীরে উপস্থিত রহিয়াছেন, আপনি দাসের প্রতি এত দয়া করিয়াছেন, তথাপি এমন বর্ব্বর আমি, এমনি অবিশ্বাসী আমি, যে আমার নিমিত্ত প্রভুকে অস্থির হইতে হইয়াছে? যাঁহার প্রসন্নতাপ্রসাদে আমি শান্তি লাভ করিব, যাঁহার চরণ ছায়ায় আমার

ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ হইবে, যাহার সুদৃষ্টি বিতরণে এই দুঃখময় সংসার সুধাময় হইবে, সেই সর্ব্বশান্তিবিধাতা অস্থির, ব্যাকুলিত এবং অশান্তি-গ্রস্ত! আমার উপায় তবে কি হইবে? প্রভো! আপনি স্থির হউন, বৃথা রহস্য করিতেছেন কেন? আমি আপনার চিরদাস, দীনহীন, ভক্তিহীন, তাহা আপনি জানিয়া শুনিয়া যখন শ্রীচরণের দাস বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, তখন আর কেন আমায় পরীক্ষায় নিপতিত করেন?"

গুরুঠাকুর শিষ্যের কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়বৎ অপেক্ষা করিলেন, পরে মনের ভাব অতি ক্লেশে সাময়িক সাম্য করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার গুরুভক্তির তুলনা নাই, তাহা আমি জানি এবং সেইজন্য আমি তোমার বাটীতে দীর্ঘকাল বাস করিতে ভালবাসি। সে যাহা হউক, আজ কয়েকদিন বাড়ী ছাড়া হইয়া রহিয়াছি, বিশেষতঃ আসিবার সময়ে তোমার ইষ্টদেবীর শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেইজন্য মনটায় সুখ নাই; এইরূপ পাঁচ রকম ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। যাহা হউক, এখন আমি সুস্থ হইয়াছি।" শিষ্য কহিলেন, "মাতার সংবাদ গতকল্য আপনাকে আনিয়া দিয়াছি, তিনি শিশুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দয়া করিয়া এ বাটী পবিত্র করিতে আসিবেন, তজ্জন্য শিবিকাও পাঠান হইয়াছে, সেজন্য চিন্তিত হইবেন না। যদ্যপি সুস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অদ্য কি আহার করিবেন, কৃপা করিয়া আজ্ঞা করুন।" গুরুঠাকুর কি করিবেন, কেমন করিয়া আহার সম্বন্ধে আজ্ঞা করিবেন, ভাবিয়া পুনরায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে বাড়ীর ভিতরে পুনরায় রোদনের ধ্বনি উঠিল। গুরুঠাকুর একেবারে অস্থির

হইয়া কখন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কখন শয্যায় শয়ন এবং কখন উপবেশন করিতে লাগিলেন। শিষ্য তদ্দর্শনে গুরুর চরণধারণ পূর্ব্বক রোদন সহকারে বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়! দাসের কি অপরাধ মার্জ্জনা হইবে না? নিরপরাধী কবে ছিলাম যে, আজ আমায় এরূপ কঠোর পরীক্ষা করিতেছেন? আপনি জানেন যে, আমি অবিশ্বাসী, আমার স্ত্রী অবলা, সংসারকূপে নিমগ্না, কেমন করিয়া আমাদের নিকটে বিশ্বাসের কার্য্য দেখিতে পাইবেন? আমরা প্রত্যেক কার্য্যে আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছি, আপনি তাহা নির্ম্মূল না করিয়া দিলে কেমন করিয়া আমাদের দ্বারা তাহা সাধিত হইবে? অতএব ক্ষমা করুন, স্থির হউন, আমায় রক্ষা করুন।"

গুরু আর হৃদয়ের পৈশাচিক রঙ্গভূমি কপটতা-যবনিকাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারিলেন না, আর নিজ কীর্ত্তি লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। সরলতার এতই প্রতাপ, এতই বিক্রম যে, তাহার সমক্ষে কখন কেহ কপটতার আবরণে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। গুরুঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাপুরে! আমি তোমার পুত্রহন্তা, তোমার গুরু নই, তোমার প্রাণাধিক পুত্ররত্নের কালস্বরূপ, যমস্বরূপ, তুমি আমাকে পুলিশে দাও, নিগ্রহ কর, যাহা ইচ্ছা তুমি তাহাই করিয়া তোমার পুত্রবিয়োগ-শোক নিবারণ কর। তোমার শিশুকে আমি মারিয়াছি, ঐ সিন্দুকের ভিতরে তাহার দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়াছি, ঐ সিন্দুকে অলঙ্কারগুলিও লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমি এ পর্য্যন্ত তাহা স্থানান্তরে লইয়া যাই নাই।" শিষ্য প্রশান্তভাবে গুরুশ্রীমুখাৎ শিশুহত্যা বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভু! এই নিমিত্ত আপনি এতদূর বিষাদিত হইয়াছেন? এই নিমিত্ত আপনি এত ক্লেশ পাইতেছেন? এই নিমিত্ত আপনি এত ব্যাকুলিত

হইয়াছেন? ধিক্ আমাকে, সহস্র ধিক্ আমাকে! ঠাকুর! আমি বারবার বলিয়াছি যে, অবিশ্বাসীদিগের নিমিত্ত আপনাকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইবে! আমি আপনাকে বলিয়াছি যে, আমরা উভয়েই সমান, তাহা না হইলে উভয়ে একসূত্রে গ্রথিত হইব কেন? সে দোষ গুণ আমাদের নহে, প্রভু! আপনিই তাহা করিয়াছেন। এক্ষণে তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি, যাহা হইবার হইয়াছে, আপনি এক্ষণে আমায় ক্ষমা করুন। আপনি স্থির হউন, তাহা না হইলে কোনমতে আমার কল্যাণ নাই।"

গুরু, শিষ্যের ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তদনন্তর কহিতে লাগিলেন, "বাপু! আমার একটী কথা শ্রবণ কর। তোমার যত্থপি এতই গুরুভক্তি থাকে, তাহা হইলে আমায় বিদায় দাও, আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া শান্তি লাভ করি। তোমাকে দেখিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। আমি তোমার পুত্রঘাতী, তোমার সহিত আর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নাই। এক্ষণে যে সম্বন্ধ, তাহা তুমিই বুঝিয়া দেখ। তোমার হাতে ধরি, অধিক আর কি বলিব? বলিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি, আমায় ছাড়িয়া দাও। এই ভিক্ষাটী দিয়া আমায় রক্ষা কর।" শিষ্য কহিলেন, "প্রভু! এখনও কি আপনার এই কথা ভাল লাগিতেছে? এখনও কি এ দাসের যথেষ্ট দণ্ড হয় নাই? অপরাধ হিসাবে দণ্ডের শেষ হয় নাই, এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু দুর্ব্বল আধার সহ্য করিবে কতদূর? আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আপনি স্থির হউন। আমি বুঝিয়াছি যে, আপনি সংসারক্ষেত্রের অভ্যন্তরের ব্যাপার দেখাইতেছেন, কিন্তু আমি একেবারে দুর্ব্বল, সহ্য করিতে পারিব না, সেইজন্য ও চরণযুগলে আশ্রয় লইয়াছি। আপনি কেন আমায় লইয়া

বিষম পরীক্ষাক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছেন?” গুরু কহিলেন, “বাপুরে! আমি যে তোর পুত্রহন্তা! গুরুর কি এই ব্যবহার? আর পবিত্র গুরুনাম আমার স্থায় পিশাচে প্রয়োগ করিয়া কলঙ্কিত করিওনা।” শিষ্য কহিলেন, “ঠাকুর! আপনি বারবার ঐ কথাই বলিতেছেন। পুত্র কাহার? আপনার সামগ্রী আপনি লইয়াছেন, তাহাতে কথা কহিবার অধিকার কাহার? দাস দাসীকে একটা সামগ্রী কি বুঝিয়া দিয়াছিলেন, আবার কি বুঝিয়া লইয়াছেন, তাহার মীমাংসক আপনি। আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে, তাহার সেবাদির নিমিত্ত যে সকল ত্রুটি এবং অপরাধ হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বল বলিয়া ক্ষমা করুন। এখন আজ্ঞা করুন, আপনি কি আহার করিবেন।” গুরু কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, “তুমি বাপু নিতান্ত চতুর। তুমি নিশ্চয় ফাঁড়িতে সম্বাদ দিয়াছ, ফাঁড়িদারের অপেক্ষায় সময় লইতেছ। যদ্যপি তোমার এতই গুরুভক্তি হইয়া থাকে যে, পুত্র হত্যা হওয়া দোষের নহে, তাহা হইলে এই লাশের একটা ব্যবস্থা করিয়া আমায় যথোচিত ভক্তি প্রয়োগ করিও, আমি বাস্তবিক আনন্দিত হইব।” গুরুর এই আদেশ প্রাপ্তমাত্রে সেই তেজস্বী গুরুভক্তিপরায়ণ শিষ্য তৎক্ষণাৎ সিন্দুক হইতে মৃত পুত্রটীকে বাহির করিয়া তাহার মস্তকে গুরুর চরণ-ধূলি প্রদান করিবামাত্র অমনি শিশু উঠিয়া বসিল। গুরুঠাকুর একবার শিষ্যের দিকে, একবার শিশুর দিকে এবং একবার নিজের চরণের দিকে চাহিতে লাগিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, “আমার চরণধূলির এত মহিমা! মরা মানুষ বেঁচে যায়! আমার চরণের এত গুণ! হায়! হায়! আমি অগ্রে কেন তাহা জানিতে পারি নাই? তাহা হইলে অনর্থক এই বাক্-যুদ্ধ, মনস্তাপ এবং কলঙ্ক রটনা হইত না। যাহা হউক, আমার চরণের এত শক্তি, মরা মানুষ বেঁচে যায়!” এই

কথাই তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা ক্রমে তিনি অভিমানের মূর্ত্তি-বিশেষে পরিণত হইলেন। গুরুঠাকুর যথাসময়ে এই শিষ্যের নিকট বিদায় লইয়া কোন বিশেষ ধনাঢ্য শিষ্যের বাটীতে গমন করিলেন। এই স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া একদিন সুবিধামত শিষ্যের নানাবিধ অলঙ্কারবিভূষিত একটী সন্তানকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া অমনি তাঁহার পৈশাচিক বৃত্তির অভিনয় করিয়া বসিলেন। সন্তানটী হতচেতন হইলে তাহার অলঙ্কারগুলি সিন্দুকের ভিতরে সংস্থাপন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে আপন চরণরেণু উহার গাত্রে প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহার চৈতন্য সম্পাদন হইল না। গুরুঠাকুর বিষম বিভ্রাটে পতিত হইলেন। তিনি তদনন্তর চরণ দুইটী ধূলায় আবৃত করিয়া মৃত দেহটী উহা দ্বারা বিমণ্ডিত করিলেন, কিন্তু তথাপি সে জীবিত হইল না। এমন সময়ে তাঁহার শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য গুরুর ব্যবহার দেখিয়া অমনি চীৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে, তুই আজকাল এই ডাকাতি বৃত্তিতে সিদ্ধ হইয়াছিস্। সেদিন সে নিরীহ কাপুরুষের নিকট অব্যাহতি পাইয়া আসিয়াছিস্, কিন্তু আজ তোর নিস্তার নাই। পাষণ্ডের দণ্ডবিধান করা সাধারণের নিয়ম। আজ তোর এই পৈশাচিক ঘৃণিত কার্য্যের যাহা উপযুক্ত ব্যবস্থা, তাহাই আমি করিতেছি।" এই বলিয়া লগুড়োত্তোলন পূর্ব্বক যেমন গুরুঠাকুরের মস্তকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্তঃপুর হইতে 'কি কর,' 'কি কর' বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া লাঠি ধারণ পূর্ব্বক স্বামীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

গুরুঠাকুর তখন কৃতাঞ্জলিপুটে শিষ্য-পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আমার মা! আমি তোমার অবোধ সন্তান, অপরাধ করিয়াছি, উপায় নাই। আর কি বলিব! আমার চরণরেণুর দ্বারা মরা মানুষ

বাঁচে, এ কথা কি তোমরা আজও শ্রবণ কর নাই ? কেন যে আজ এমন হইল বলিতে পারি না। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, তুমি অমুক গ্রামের অমুক শিষ্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা কর।" শিষ্যপত্নী বিষম বিভ্রাটে পতিত হইয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তাহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে নিজ পুত্রের বিয়োগ, আর একদিকে নিজ কুলগুরুর নিগ্রহ, এরূপ দৃশ্য অতীব বিরল এবং নিতান্ত বিভীষিকাপ্রদ, তাহার আর সংশয় নাই। শিষ্যপত্নী গুরুর কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, গুরুঠাকুর সত্য মিথ্যা যাহাই বলুন, তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, বরং আরও গোলযোগই ঘটিবে, কিন্তু শুনিলাম যে, শিষ্যের মৃত সন্তানটী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। যদ্যপি কোনসূত্রে আমার জীবনসর্ব্বস্ব সন্তানের প্রাণদান হয়, তাহা হইলে উভয় দিকই রক্ষা হইবে। এই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত শিষ্যকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিবামাত্র তিনি অনতিবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গুরু এবং ভক্তদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

শিষ্যকে দেখিয়া গুরু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কহিলেন, "বাপু রে! এইবার আর আমার অব্যাহতি নাই। তুমি সত্য করিয়া বল যে, আমার চরণধূলায় তোমার পুত্র জীবিত হইয়াছিল কি না ?"

দ্বিতীয় শিষ্য গুরুকে রোদন করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনাকে রোদন করিতে দেখিলে আমরা কেমন করিয়া শান্তিলাভ করিব ? আপনার চরণরেণুতে আমার পুত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কাহার ? আপনার চরণের কত গুণ, আপনার চরণের কত মহিমা, আপনার চরণের কত শক্তি, বর্ণনা করিবার শক্তি অদ্যাপি আমায় দেন নাই, বলিব কিরূপে ?

যে চরণের মহিমা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে বর্ণনা করিতে অশক্ত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন, যে চরণের মহিমা পঞ্চানন পাঁচ মুখে বর্ণনা করিতে না পারিয়া উন্মাদবৎ হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন, সেই চরণের মহিমা কি সামান্য মনুষ্যের দ্বারা কৃপা ব্যতীত প্রকাশ পাইতে পারে ?"

গুরু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বাজে কথায় কেন সময় নষ্ট করিতেছ ? তুমি এক কথায় বল যে, আমার চরণধূলায় তোমার সন্তানটী বাঁচিয়াছিল কি না ? এই কথা বলিলেই আমি বাঁচিয়া যাই ।"

দ্বিতীয় শিষ্য কহিলেন, "প্রভু ! আমি স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছি। ঐ চরণের গুণে কেবল আমার পুত্র কেন, জগজ্জীব পুনর্জ্জীবিত হয়, মৃত তরু মুঞ্জরিত হয়, শুষ্ক জলাশয় জলপূর্ণ হয়, ফল রসাল হয়, অজ্ঞানীর জ্ঞান হয়, কাণার চক্ষু হয়, বধিরের কাণ হয়, খোঁড়ার পা হয়, বদ্ধজীব মুক্ত হয়, জ্ঞানী বিজ্ঞানী হয় এবং পাপী সাধু হয় ।" এই বলিয়া তিনি গুরুর কিঞ্চিৎ চরণরেণু গ্রহণ পূর্ব্বক 'জয় গুরু' বলিয়া মৃত সন্তানের মস্তকে অর্পণ করিবামাত্র অমনি সে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখে মাতাকে দেখিয়া দৌড়াইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দ্বিতীয় শিষ্যের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন্ ।

শিষ্যপত্নী এই ঘটনা দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া দ্বিতীয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ! আমি স্ত্রীলোক, আমার শাস্ত্র-জ্ঞান নাই, কর্ম্মবোধ নাই, কিছুই দর্শনও নাই, বিশেষ কিছু শ্রবণও করি নাই। দেখিতেছেন, এই আমার অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বর স্বামী। আমি ঐশ্বর্য্যেই ডুবিয়া আছি, কিন্তু এই ঘটনায় আমার কত কি মনে আসিতেছে, যদ্যপি অনধিকারিণী বলিয়া আমায় ঘৃণা না করেন,

তাহা হইলে আমি একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।”

দ্বিতীয় শিষ্য পরমানন্দে কহিলেন, “মা! আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন গুরুর চরণাশ্রিত আপনারা, আপনাদের আর জিজ্ঞাস্য কি আছে? তবে তত্ত্ব-রসাস্বাদনের নিমিত্ত পরস্পর বাক্য-বিনিময় করা প্রয়োজন, এই নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা আপনি জিজ্ঞাসা করুন।” শিষ্য-পত্নী কহিলেন, “মহাশয়! আপনি গুরুঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। দয়া করিয়া যদ্যপি বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।” দ্বিতীয় শিষ্য তখন পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, “মাগো! কি কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন! যদ্যপি আমাদের জিজ্ঞাস্য কিছু থাকে, তাহা হইলে গুরু ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমরা সংসারক্ষেত্রে আমি আমার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকি। এই অভিমানে নর-নারী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীগুরুর কৃপা না হইলে এই ভববন্ধন উচ্ছেদ হইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। গুরুর কৃপায় মোহতিমির বিদূরিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। গুরুর শ্রীপাদপদ্ম এই দুর্লঙ্ঘ্য ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র সেতু জানিবেন। গুরুর কৃপাদৃষ্টি না হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জন্মাইতে পারে না। গুরুর দয়ায় ব্রহ্ম-বোধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যে ভাগ্যবানের গুরু সহায় থাকেন, সে ত্রিলোক জয়ী হইবার একমাত্র অধিকারী। অতএব গুরুই আমাদের সর্ব্বস্বধন। গুরু আমাদের ধ্যান, গুরু আমাদের জ্ঞান, গুরু আমাদের শাস্ত্র, গুরু আমাদের মন্ত্র, গুরু আমাদের সহায়, গুরু আমাদের সম্বল, গুরু আমাদের ইহপরকালের উপায়, উদ্দেশ্য এবং অবলম্বন জানিবেন। সেই পরম গুরু আমাদের সমক্ষে

বিরাজ করিতেছেন, অতএব আমরা ইহজগতে বাস্তবিক ধন্য !" প্রথম শিষ্য এই কথা শ্রবণান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ! আপনি একটা অমানুষ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা যখন প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তখন আপনার কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে গুরু ঠাকুরের চরণরেণুর মহিমা স্বীকার করিব কেন ? আপনি কোন বিদ্যাবলেই হউক, অথবা তপঃপ্রভাবেই হউক, কিম্বা অন্য কোন যাদুবিদ্যার কৌশলেই হউক, আমার মৃত পুত্রের প্রাণদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার গৌরব বিস্তার করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহাতে গুরুর শক্তি প্রকাশ পাইবে কিরূপে ? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গুরু ঠাকুর যে চরণ ধূলায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, আপনি সেই ধূলায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ স্থলে ধূলার শক্তি মানিব না, কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে। অতএব এই অদ্ভুত ঘটনায় আপনিই নায়ক হইতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই।" দ্বিতীয় শিষ্য সহাস্যবদনে কহিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, গুরুর চরণরেণুর গুণে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়। প্রভু আমার সেই স্থানে অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন। উনি আমাদের গুরু, ও পাদপদ্ম আমাদের সর্ব্বস্ব ধন, আমরা ঐ চরণবলে না করিতে পারি কি ? কিন্তু উনি আপনার চরণরেণু লইয়া কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে প্রভুর কোন স্বত্ব নাই, কিরূপে কৃতকার্য্য হইবেন ? প্রভুর গুরু যিনি, যদ্যপি তাঁহার চরণধূলা ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক কার্য্য হইত।" এমন সময়ে ঐ স্থান দিয়া একটী সর্পাহত ব্যক্তিকে দাহ করিতে লইয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয় শিষ্যের অনুরোধে, প্রথম শিষ্য গুরুর চরণধূলি লইয়া তাহার গাত্রে স্পর্শ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে জীবিত হইয়া উঠিল।

এতক্ষণে গুরুর ভ্রম বিদূরিত হইয়া আসিল। গুরু ঠাকুর এতক্ষণে নিজের গুরু বুঝিয়া লইলেন। তখন তিনি দ্বিতীয় শিষ্যের চরণধারণ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, আমি তোমার গুরু, না তুমি আমার গুরু, তুমিই তাহা বিচার কর। অতএব অদ্য হইতে তুমি আমার গুরু জানিবে।" এই নিমিত্ত প্রভু আমার বলিতেন যে—

"সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

অজ্ঞানী গুরু এবং অজ্ঞানী শিষ্য উভয়েই অন্ধবিশেষ। যেমন একজন অন্ধ আর একজন অন্ধের হস্তধারণ পূর্ব্বক পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটা কূপ ছিল, তাহা কেহই জানিত না, উভয়েই তন্মধ্যে পতিত হইয়া জীবন হারাইয়াছিল। অজ্ঞানী গুরু-শিষ্য সম্বন্ধেও তাহাই জানিতে হইবে। জ্ঞানী গুরু-শিষ্যের এক অবস্থা হইয়া থাকে। কারণ গুরু নিজে যখন শিষ্যের ভাবে আপন গুরুকে স্মরণ করেন, তখন তাঁহার যে ভাব, তাঁহার শিষ্যেরও যখন সেই ভাব হয়, তখন উভয় স্থলে এক গুরুভাব উপস্থিত থাকে এবং গুরুকে ভগবান্ জ্ঞান করিলেও উভয় স্থলে এক ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ 'একমেবাদ্বিতীয়ং', এই জন্য তথায় কেহ কাহার গুরু হইতে পারেন না, ভগবানই সকলের অদ্বিতীয় গুরু হইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য বলিতেন যে, "চাঁদা মামা সকলেরই মামা।" সে যাহা হউক, নিজের বিশ্বাসই সকল কার্য্যের মূল-স্বরূপ।

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "গুরু যাহা বলেন তাহাই করিবে। ভাল মন্দ বিচার করা শিষ্যের অকর্ত্তব্য।" এই উপদেশের তাৎপর্য্য একটী গল্পচ্ছলে প্রকাশ করিতেছি।

কোন মুসলমান সাধু তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, গুরু যদ্যপি নমাজের আসন সুরায় নিমজ্জিত করিতে বলেন, শিষ্য দ্বিরুক্তি

না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিবে। মুসলমানদিগের সুরা অস্পর্শীয় এবং নমাজের আসন অতিশয় পবিত্র বস্তু; গুরুর আজ্ঞায় পবিত্র পদার্থকে অপবিত্র করা যায়, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দোষাবহ হইলেও গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা একেবারে নিষিদ্ধ। শিষ্য এ কথাটী কোন মতে বুঝিতে পারিল না। সাধু তখন এই বলিয়া রাখিলেন যে, সময় হইলে এই কথা তুমি আপনি বুঝিতে পারিবে।

কিছুদিন পরে কোন মেলা উপলক্ষে সাধু শিষ্যবৃন্দের সহিত তথায় গমন করিলেন। এই মেলায় নানা দিক্ দেশ হইতে নানাবিধ ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। সাধু যে স্থানে আসন গ্রহণ করেন, তাহার নিকটেই বেশ্যারা আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। একথা সাধু জানিয়াও স্থান পরিবর্ত্তন করেন নাই।

একদিন সাধু, শিষ্য এবং অন্যান্য দর্শকবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার জনৈক শিষ্যকে একটী ষোড়শী বারাঙ্গনার দিকে অনিমিষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি কি করিতেছ?" শিষ্য লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর রহিল। সাধু অতঃপর সেই বারাঙ্গনার মাতাকে ডাকাইয়া শিষ্যকে কহিলেন যে, "তুমি উহার সহিত তোমার অভিলষিত বারাঙ্গনার নিকট গমন কর, ব্যয়াদি আমি প্রদান করিতেছি", এই বলিয়া তাঁহার ঝুলি হইতে একটী স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিলেন। শিষ্য কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। সাধু ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন করিবার নিমিত্ত বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। শিষ্য অগত্যা বৃদ্ধা বারাঙ্গনার সহিত গমন করিল। উপর্য্যুপরি তিন দিবস ঐরূপ আজ্ঞাপ্রদান করিলে সমুদয় শিষ্য এবং যাবতীয় ভদ্রমণ্ডলী সাধুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলেই সাধুর সহবাস পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, সাধুর নিকটে স্বভাব সংগঠন করিবার নিমিত্ত সকলে আগমন করিয়া থাকে, সাধুর সহবাস দ্বারা নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা হইবার সুবিধা হয় বলিয়া সকলে সাধু অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, কিন্তু সাধুর নিকটে এপ্রকার কুনীতি শিক্ষা করিবার প্রশ্রয় হয়, একথা সাধুদিগের জীবনে এই নূতন ঘটনা। এইরূপ অনেকে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন"।

চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে ঐ শিষ্য বারাঙ্গনার আবাসস্থান হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সাধুকে প্রণাম করিলে পর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, দেখ মিথ্যা বলিও না। অদ্য তোমাদের বিচ্ছেদ কালে কি কি কথা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ কুতূহল জন্মিয়াছে।" শিষ্য কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আপনি গুরু, আপনার কথা শিরোধার্য্য। যখন সাধারণ নিন্দিত কার্য্য আপনার আদেশে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করিলাম, তখন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন বা লজ্জার বিষয় নহে।"

"অদ্য যখন আমি চলিয়া আসি, সেই রূপসী আমার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, 'তুমি কি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিবে?' আমি বলিলাম, 'তোমার অভিপ্রায় খুলিয়া বল, যদ্যপি প্রতিপালন করা শক্তি-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে কখনই অন্যথা হইবে না।' সে তখন ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, 'দেখ, আমি যদিও বেশ্যার কন্যা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু এপর্য্যন্ত বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত হই নাই। ঐ বৃদ্ধা আমার মাসী, শুভক্ষণে এবং শুভদিনে আমায় বেশ্যা করিবার জন্য এই মেলায় আনিয়াছিল। সাধুজীকে দর্শন করিয়া মনে হইয়াছিল যে, পেটের জন্য কেন ঘৃণিত বেশ্যার কার্য্য দ্বারা দিন যাপন করিব?

যদ্যপি সাধুজী আমায় দয়া করিয়া দাসী বলিয়া সমভিব্যাহারে রাখেন, তাহা হইলে পেট চলিয়া যাইবে। তবে কেন আমি মাসীর কথায় বেশ্যা হইব? কি করিব বেশ্যার কন্যা, বিশেষতঃ পূর্ণ যুবতী এবং মাসীর কাছে রহিয়াছি, কোন্ সাহসে সাধুর নিকট অগ্রসর হইব? এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে সাধুজী আমার মাসীকে ডাকিলেন। আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, যদিও তাহা সফল হয় নাই, কিন্তু আর এক হিসাবে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। দয়া করিয়া আমায় চিরদাসী করিয়া লও। যদিও আমি বেশ্যার কন্যা, কিন্তু বলিয়াছি যে, অদ্যাপি বেশ্যা হই নাই। তুমি সাধুর শিষ্য সাধু, পরের মঙ্গল সাধন তোমাদের কার্য্য। তোমরা সামাজিক ব্যক্তি নও যে, তোমাদিগকে সামাজিক রীতিনীতি প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব আমার এই মিনতি রক্ষা কর। আমি তোমায় একথা বলিতেছি না যে, আমাকে তোমার সমভিব্যাহারে রাখিতে হইবে, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমাকে লইয়া তোমাকে গৃহী হইতে হইবে, তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা তুমি করিও, ইচ্ছা না হয়, করিও না। আমি এ পর্য্যন্ত অনাথিনী সহায়বিহীনা রহিয়াছি। যখনই বেশ্যাদিগের কথা মনে হয়, যখনই তাহাদের যন্ত্রণার পারিপাট্য স্মৃতিপথে উদয় হয়, তখনই আমার বক্ষঃস্থল শুষ্ক হইয়া আইসে, তখনই আমি আতঙ্কে ডুবিয়া যাই।' প্রভু! এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্য বলিতেছি, আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। একবার মনে করিয়াছিলাম যে, এ কথা প্রভুকে বলিয়া আসি, কিন্তু জানি না, বলিতে পারি না, কি করিতে কি করিয়াছি। আমি বোধ হয় অঙ্গুরী পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তথাকার সমুদয় লোক একটা কোলাহল

করিয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, বেশ্যার মোহিনী জালে এই যুবক সন্ন্যাসী আবদ্ধ হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল! কেহ বলিল যেমন সাধু, তেমনি তাহার চেলা। বেশ্যাকে বিবাহ না করিয়া আর করিবে কি? সাধু তখন শিষ্যকে বলিলেন, "তুমি কি বাস্তবিক বিবাহ করিয়া আসিয়াছ, না কেবল প্রসঙ্গমাত্র হইয়াছিল?" শিষ্য অঙ্গুরী খুলিয়া গুরুকে অর্পণ করিয়া বলিল, "এই দেখুন, তাহার অঙ্গুরী।" সাধু অঙ্গুরী দেখিয়া উহা অপর শিষ্যের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা সকলে দেখ দেখি অঙ্গুরীতে কি লেখা আছে?" অঙ্গুরী দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল যে, ইহাতে একটী পুরুষের নাম অঙ্কিত আছে। সাধু অতঃপর বারাঙ্গনাদুহিতাকে ডাকাইয়া অঙ্গুরী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে তাহা স্বীকার করিয়া অঙ্গুরী প্রদান করিল। সাধু অঙ্গুরী দেখিয়া উচ্চহাস্যে কহিলেন, "অদ্য আমার নয়ন এবং শ্রবণ বিকৃত হইয়াছে; যাহা শ্রবণ করিতেছি, চক্ষে তাহার বিপরীত দেখি কেন? তোমরা সকলে দেখ দেখি, এ নামটী কি স্ত্রীলোকের নহে?" সকলে তাহাই সাব্যস্থ করিল। সাধু পুনরায় কহিলেন, "দেখ বৎস! আমার জ্ঞান হইতেছে যে, তুমি বাস্তবিক অঙ্গুরী পরিবর্ত্তিত কর নাই। ভাল আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার অঙ্গুরীতে কাহার নাম ছিল এবং কোথায় পাইয়াছিলে, সে কথা কিছু জান?" শিষ্য কহিল, "এ অঙ্গুরী আপনি সে দিন দিয়াছিলেন। উহাতে কিছু লেখা ছিল কি না, তাহা আমি দেখি নাই।"

সাধু তখন দণ্ডায়মান হইয়া সাধারণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "তোমরা এই শিষ্য সম্বন্ধে আমার কার্য্য দেখিয়া অবশ্যই মর্ম্মাহত হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই। গুরু হইয়া শিষ্যকে এ প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত করা নূতন ঘটনা। এ প্রকার দৃষ্টান্ত বোধ হয়

অদ্যাপি কোথাও আর হয় নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই রহস্য ভেদ হওয়া কর্ত্তব্য।"

সাধু তদনন্তর শিষ্য এবং শিষ্যপত্নীকে আপনার উভয় পার্শ্বে লইয়া কহিতে লাগিলেন। "কোন দেশে এক সম্রাট ছিলেন, তাঁহার পুত্র-সন্তান হয় নাই, তজ্জন্য তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইয়া একদিন আমার নিকট অনেক আক্ষেপ করেন। 'আমি ভগবানের নামে তাঁহার প্রধানা রাজমহিষীকে কবজ দিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে একটী সুকুমার জন্মিয়াছিল। রাজকুমারের শৈশবাবস্থায় বিবাহ হয়, শৈশব পুত্রবধূ লইয়া সম্রাট অনেক সময় আনন্দ করিতেন। কালক্রমে সম্রাট রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেন এবং শত্রু কর্ত্তৃক পারিবারিক নানা প্রকার দুরবস্থা সংঘটিত হয়। রাজকুমার ইতিপূর্ব্ব হইতে আমার নিকট সর্ব্বদা থাকিত এবং আমি স্থানান্তরে গমন করিলেও সে কখন কখন আমার সহিত যাইত, সম্রাট তাহাতে আপত্তি করিতেন না। এই দুর্ব্বিপাকের সময় সেই রাজকুমার আমার নিকটে ছিল, সুতরাং তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। রাজবধূ যদিও রাজ্যবিপ্লবের সময় রাজপ্রাসাদেই ছিল, কিন্তু তাহাকে অপগণ্ড দেখিয়া শত্রুরা তাহার দুর্গতি করে নাই। যে ধাত্রী তাহাকে লালন পালন করিত, সে তাহাকে আপনার বাটীতে লইয়া যায়। এই শিষ্য সেই সম্রাটকুমার এবং এই যুবতী সেই সম্রাটবধূ। ইহাদের পুনর্ম্মিলন করিবার জন্য আমি বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি। আমি জানিতাম যে, বিবাহের কথা সম্রাটপুত্রের কিছুই স্মরণ নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নহে, সম্রাট আনন্দে অন্ধ হইয়া শৈশবকালেই তাহা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

যুদ্ধ বিগ্রহের পর আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, বধূমাতা জীবিত আছে এবং এই মেলায় সেই ধাত্রী

তাহাকে বারাঙ্গনাশ্রেণীভুক্ত করিবে। আমি তজ্জন্য বারাঙ্গনা-পল্লীতে আসিয়া আসন করিয়া বসিয়াছিলাম। এই মিলন করিব বলিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে নমাজের আসন সুরায় নিমজ্জিত করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিতে পারিবে যে, গুরু যে কার্য্য করিতে বলেন, তাহা কখন হেতুশূন্য হয় না।" এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, তর্কযুক্তি কিম্বা বিচার না করিয়া গুরুর উপদেশ প্রতিপালন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গুরু এবং সাধারণ উপদেষ্টা এক নহেন। সাধারণ সাধু শাস্তেরা যে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা গুরুবাক্য নহে। এরূপ উপদেশ প্রতিপালন করিলে হানি হয় না, না করিলেও যে বিশেষ অপরাধ হয় তাহাও নহে, কিন্তু গুরুবাক্য অবহেলা করিলে অপরাধের সীমা থাকে না। কারণ গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান্। গুরুর অপমানে ভগবানেরই অপমান করা হয়, সুতরাং অমঙ্গল না হইয়া আর কি হইবে? রাজা যুধিষ্ঠির সত্য রক্ষার নিমিত্ত 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলায় জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যেমন মাতা বেশ্যা হউক, কিম্বা সতীই হউক, তাহাতে পুত্রের মাতৃভাবের বিপর্য্যয় হয় না, তেমনই গুরু সাধুই হউন কিম্বা অসাধুই হউন, শিষ্যের তাহাতে কখনই ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না। গুরুবাক্য সত্য, গুরু সত্য, এই ধারণা, এই জ্ঞান ব্যতীত শিষ্যের কখন অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যদ্যপি কাহার গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হয়, যদ্যপি কেহ বর্ত্তমানকালে গুরুদিগকে ভক্তি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপায় কি? বিশ্বাস বা ভক্তি শিখাইয়া বুঝাইয়া হয়

না, তিরস্কারে পুরস্কারে হয় না, তাহা হৃদয়ের ভাব আপনি হয়। কেন হয়, কখন হয় তাহার হেতু বাহির করা যায় না। আমার নিজ জীবনের গুরুকরণ বৃত্তান্তটি বর্ণনা করিলে বোধ হয় এ প্রশ্নটীর মীমাংসা হইয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমি একজন নাস্তিক ছিলাম। অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানিবার কিছুই প্রয়োজন বুঝিতাম না। যে সময়ে আমি সংসারক্ষেত্রের বিভীষিকায় অভিভূত হই, যে সময়ে সাংসারিক সুখে প্রতারিত হই, যে সময়ে সংসারের প্রকৃত ছবি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই সময়ে ভগবান্ বলিয়া, শান্তিবিধাতা বলিয়া একজনকে স্মরণ হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ একেবারে ভগবানকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এই সময়ে আমি উপদেষ্টা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যাইয়া হৃদয়ের অভিপ্রেত বস্তু লাভ করিবার জন্য সতৃষ্ণ হইয়া বাস্তবিক কত সময় বিনষ্ট করিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হয় নাই। অতঃপর একদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে তিনটী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচয় লইয়া জানিলাম যে, এক জন আমাদের কুলগুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, একজন তাঁহার মিত্র এবং আর এক জন তাঁহার পাচক। গুরু আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া আমার আশাতিরিক্ত আনন্দ হইতে লাগিল। মনে হইল, এইবার আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে তাহা মরীচিকার ন্যায় পরিণত হইয়া যাইল। আমি মন্ত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলাম যে, অগ্রে আমাকে তিনটী বিষয় আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ১ম, ঈশ্বর আছেন কি না? ২য়, তাঁহাকে লাভ করিবার উদ্দেশ্য কি? ৩য়, এই জীবনে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় কি না?

ভগবান্‌কে যত্তপি না জানা যায়, তিনি যত্তপি আমাদের সহিত কথাই না কন, তাঁহাকে যত্তপি দেখাই না যায়, তাহা হইলে এমন ভগবান্ থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি? আজীবন কঠোরতা করিয়া, আজীবন মালা জপিয়া, আজীবন জীবন্ত সুখে বঞ্চিত হইয়া কি কারণে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়া যাইব? তাহা হইবে না। সংসারে সুখ নাই, আনন্দ নাই, যত্তপি ভগবান্‌কে লাভ করিলে অবিচ্ছেদ সুখশান্তি লাভ হয়, তাহা হইলে যে কোন কার্য্য করিতে হউক, জীবনপণ করিয়াও সাধন করিব। গুরুঠাকুর কোন কথার উত্তর দিলেন না। তাঁহার পাচক ঠাকুর কহিলেন, এ প্রকার জিজ্ঞাসা পড়া করিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত মন্ত্র গ্রহণ করে নাই। উনি (গুরুঠাকুরকে দেখাইয়া) করণ কারণ সমস্তই জানেন, আর সঙ্গীত বিত্তায় নিতান্ত পটু। আমি নিস্তব্ধ হইয়া কি করিব চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ অবস্থায় দীক্ষিত হইয়া কি করিব? যাঁহার জন্ত দীক্ষিত হওয়া, তাঁহারই স্থির হইল না, তাঁহাকেই বুঝিতে পারিলাম না, মন্ত্র জপ করিয়া কি ফল হইবে? মনে হইল, উদ্দেশ্ত ব্যতীত কোন স্থানে গমন করা যায় না। লক্ষ্যহীন হইয়া কেহ কি কখন ভ্রমণ করিতে পারে? অতএব এরূপ মন্ত্র লইয়া কি ফল হইবে? যখন প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল না, মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না, তখন এরূপ গুরুকরণ করিয়া গুরুর অপমান এবং মন্ত্রের অমর্য্যাদা হইবে। তাহা আমি কিরূপেই বা করিতে পারি?

পরক্ষণেই মনে হইল যে কুলগুরু পরিত্যাগ করিই বা কিরূপে? গুরুত্যাগী হওয়া বিষম পাপের কথা বলিয়া প্রবাদ আছে। ইত্যাকার নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া আমায় আক্রমণ করিল।

আমাকে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে দেখিয়া গুরুঠাকুর কহিলেন যে, "তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আমি যদিও উত্তর দিতে পারিলাম

না, কিন্তু আমার পিতা তাহা পারিবেন। যত্তপি মত হয়, তাহা হইলে তিনি আসিয়া তোমায় মন্ত্র দিবেন।” আমি আনন্দসহকারে তাহাতে সম্মত হইলাম।

এই ঘটনার পরেই রামকৃষ্ণদেবের নিকট গমন করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাঁহাকে দর্শন করিয়াই আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি আপনি অলক্ষিত-ভাবে আমার ভগবানের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমার হৃদয়ানন্দ আপনি উথলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি কহিয়াছিলেন যে, “গুরুকরণ সংস্কারবিশেষ, তাহা না হইলে দেহ-শুদ্ধি হয় না। তোমাদের কি গুরু নাই, তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর নাই কেন?” এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি তাঁহাকে গুরু সম্বন্ধে সকল কথা বলিলাম, তখন তিনি কিছুই বলিলেন না। সেই দিন হইতে আবার অশান্তি আসিল। কি করিব, গুরু কোথায় পাইব এবং তাঁহার নিকট কি বা শিক্ষা করিব? যাহা শিক্ষা করিবার ছিল, যাহা জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তাহা পাইলাম; তবে মৌখিক গুরুকরণ করিয়া কি লাভ হইবে? রামকৃষ্ণদেবকে গুরু হইতে বলিলাম, তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি কহিলেন যে, “কে কার গুরু, ঈশ্বরই সকলের গুরু।” সুতরাং আমার অশান্তির আর সীমা রহিল না।

আমি তখন মনে মনে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে প্রার্থনা করিলাম যে, “ঠাকুর! অনেক ক্লেশ পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আপনার আশ্রয়ে শান্তি পাইয়াছিলাম, কি অপরাধে শ্রীচরণ হইতে বিদায় করিয়া দিতেছেন? যত্তপি অপরাধী হইয়া থাকি, দয়া করিয়া মার্জ্জনা করুন। দণ্ড দিবেন না। আমি দুর্ব্বল, তাহা সহ্য করিতে পারিব না।” এইরূপ সর্ব্বদাই

প্রার্থনা করিতাম। একদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে স্বপনে দেখিলাম যে, রামকৃষ্ণদেব আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী সরোবরের তীরে উপনীত হইলেন এবং আমাকে স্নান করিয়া আসিতে কহিলেন। স্নান করিয়া আমি যখন উপরে উঠিয়া আসিলাম, তিনি নিকটে আসিয়া কর্ণমূলে প্রণব সংযুক্ত অষ্টাক্ষরীয় মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে এই মন্ত্র একশত বার জপ করিবে। অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। যে মন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম, তাহা আমার অদৃষ্টগুণে লাভ হইল। তখন মনে হইল যে, বাস্তবিক গুরুকরণ যাহাকে বলে, যেরূপে পূর্ব্বে গুরুকরণ হইত, আমার তাহাই হইয়াছে। কিন্তু ধন্য সংস্কার! পরক্ষণেই মনে হইল যে, চিন্তার ফলে ঐ প্রকার দেখিয়াছি। যদ্যপি প্রভু নিজেই গুরু হইবেন, তাহা হইলে তাড়াইয়া দিবেন কেন? আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইলাম। এক দিকে সংস্কার বলিতে লাগিল, সাবধান! স্বপ্ন কখন সত্য হয় না। স্বপ্নে রাজা হইলে রাজা হওয়া যায় না, স্বপ্নে সন্দেশ খাইলে পেট ভরে না। প্রাণ সে কথায় ম্রিয়মান হইয়া বলিল, সাবধান! সকলই স্বপ্ন, আবার সকলই সত্য। জাগ্রতাবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহা নিদ্রাকালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধন জন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কোথায় থাকে, কেহ কি তাহার হিসাব রাখিতে পারেন? তেমনি স্বপ্নে যাহা সম্ভোগ করা যায়, সে সময়ে তাহা মিথ্যা বলিয়া কখন ভ্রম জন্মায় না। যে রাজার স্বপ্ন দেখে, তখন সে সেইরূপ আনন্দ লাভ করিয়া থাকে এবং আহারকালীন ভোজনের তৃপ্তির তারতম্য হয় না। জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থার কথা, অবস্থা বিচার করিলে উভয়ের সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। মন এবং প্রাণে এই প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ

চলিতে লাগিল, মীমাংসা করে কে? আমি তৎক্ষণাৎ প্রভুর নিকট গমন করিলাম। তখন বেলা প্রায় ৮টা, তিনি পঞ্চবটীর নিম্নে বেড়াইতে-ছিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র মৃদুহাস্যে কহিলেন, "কি গো, সকালেই যে? কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" আমি সমুদয় বলিলাম। আমার কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্য, এরূপ অবস্থা কৃপা ব্যতীত হয় না। তুমি এ কথা কাহাকেও বলিও না।"

এই স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র লইয়া আমি কিছুদিন জপ করিয়াছিলাম। পরে মনে হইল যে, মন্ত্র জপ করিয়াই কি জীবনাতিবাহিত করিয়া যাইব? ভগবানকে দেখিলাম কৈ? ইতিপূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তুমি আমায় কি মনে কর?" আমি বলিয়াছিলাম যে, "আপনাকে গৌরাঙ্গদেব বলিয়া মনে হয়, কারণ চৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে আপনাতে সমুদায় দেখিতে পাই। এরূপ মহাভাব ও সমাধি শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত কোন ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।" তিনি অতি প্রশান্ত-ভাবে বলিয়াছিলেন যে, বাম্‌নীও* ঐ কথা বলিত। আমার মন্ত্র জপ করিবার সময় মন্ত্রের সহিত স্থূলে তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায় মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসিত, আমি স্থূল শব্দের দ্বারা এই বলিতেছি, যেমন রাম বলিলে নবদূর্ব্বাদলশ্যামকে বুঝায়, কৃষ্ণ বলিলে বৃন্দাবন-সুন্দরকে বুঝায়, আমার মন্ত্রের দ্বারা সেইরূপে রামকৃষ্ণকে বুঝাইত না। মনের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্ব সংস্কার অমনি আসিয়া বলিত,

---

* বাম্‌নী অর্থাৎ জনৈক ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণদেবের সাধনাবস্থায় এককালীন একাদশ বৎসর নিকটে থাকিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত প্রভুর মুখে শুনিয়াছি, তাহা যথাস্থানে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন ! এখনও বুঝিয়া লও। কিন্তু সংস্কার আর অধিকার স্থাপন করিতে পারিত না।

একদা রজনীকালে প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার গৃহের বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া ফিরিয়া দেখি যে, আমার পশ্চাতে প্রভু ভাবাবেশে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিতেছেন, "রাম! কি চাও?" আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম! পুনরায় কহিলেন, "কি চাও?" আমি তখন চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, লইব কি ? কিসের অভাব আমার ? মনে করিলাম, ধন লইব ? প্রাণ অন্তর ভেদ করিয়া বলিল, ছি! ছি! কাঞ্চন লইবে ? যে কাঞ্চন প্রভু মৃত্তিকার সহিত একাকার করিয়াছেন, তাহা কি বলিয়া প্রার্থনা করিবে ? মনে হইল, ধনের গৌরব কতক বুঝিয়াছি। ধনের ধর্ম্মও কিছু বুঝিয়াছি। যে সুখের জন্য একদিন পথে পথে বেড়াইতেছিলাম, যে সুখের জন্য কত কাঁদিয়াছিলাম, ধন দ্বারা তাহা হয় নাই, সে কথাও প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি। ধনের পরিণাম প্রত্যহ দেখিতেছি। ধনে সুখশান্তি নাই, তাহা প্রভুর কৃপায় যথেষ্ট উপলব্ধি হইয়াছে। ধনোপার্জ্জন করিবার শক্তি লাভ করিবার সময় কত ক্লেশ, উপার্জ্জনের সময় কত ক্লেশ, তাহা রক্ষা করিতে কত ক্লেশ এবং ব্যয় করিতে কত ক্লেশ, তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝিয়া থাকি। তবে এমন ধন প্রার্থনা করিয়া লইব কেন ? প্রভু আবার বলিলেন, "কি চাও ?" আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, যদ্যপি কাহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে কি লইব, জিজ্ঞাসা করিয়া লই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কাহাকেও নিকটে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম পুত্র চাই, তখন সে ভাব চলিয়া গেল। বুঝিলাম যে, যাহা কখন যাইবে স্থির নাই, সে বস্তু প্রভুর নিকটে যাচ্ঞা করিব কেন ? মন এই প্রকার নানাবিধ

সঙ্কল্প করিতে চাহিল, কিন্তু প্রাণ আমার কিছুই স্বীকার করিল না। প্রভু পুনরায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি চাও, বলনা?" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, "প্রভু! কি লইব আপনি বলিয়া দিন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করিতে পারি, এমন কোন বস্তুই পৃথিবীতে দেখিলাম না।" করুণাময় রামকৃষ্ণদেব তখন আমার নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "আমায় দেখ। আমি যে মন্ত্র তোমায় দিয়াছি, তাহা আমায় প্রত্যর্পণ করিয়া যাও। অদ্যাবধি তোমার কর্ম্ম শেষ হইল।" আমি এতক্ষণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলাম। আমার সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত হইয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া মানসে মন্ত্র সমর্পণ করিলাম। তিনি আমার মস্তকে দক্ষিণ চরণ স্পর্শ করিয়া কিয়ৎকাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। সমাধি ভঙ্গের পর চরণ সরাইয়া লইলে আমি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি তখন পুনরায় কহিলেন, "আজি হইতে আর তোমায় কিছুই করিতে হইবে না, যখন আসিবে, এক পয়সার কোন জিনিষ কিনিয়া আনিবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন আমার হৃদয়ের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত, এক্ষণে তাহার এক পরমাণু ভাব আভাসে ব্যক্ত করিতেও অশক্ত হইতেছি। সে সময়ে মন বলিয়া কোন বিষয়ই আমার ধারণা ছিল না। প্রাণ রামকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। আমি প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি যে, সেইদিন হইতে আমার মন-প্রাণের বিবাদ মিটিয়াছে, সেইদিন হইতে মন আমার হইয়াছে, সেইদিন হইতে আমার প্রাণ শান্তিনিকেতনের অর্থ বুঝিয়াছে, সেইদিন হইতে স্বর্গীয় সুখের প্রকৃত আস্বাদন পাইয়াছি, সেইদিন হইতে আনন্দের মর্ম্ম বুঝিয়াছি, সেইদিন হইতে আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবেশ পথ পাইয়াছি, সেইদিন হইতে মানসক্ষেত্রে ভাবের ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন

হইতে বহির্জ্জগতের অভিনয় দর্শন করিতে অধিকার লাভ করিয়াছি, সেইদিন হইতে জড়জগতের নিগূঢ় রহস্য অহর্নিশি নয়নপথে নৃত্য করিতেছে, সেইদিন হইতে গুরু চিনিয়াছি, সেইদিন হইতে গুরু ইষ্টের একাকার হইয়াছে, সেইদিন হইতে আমি শমনের রাজ্য বহির্ভূত হইয়াছি, সেইদিন হইতে আমার জানিবার বুঝিবার যেন আর কিছুই নাই বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, বাস্তবিক সেইদিন হইতে আমার সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে।

আহা! গুরু কি বস্তু, তাহা বলিয়া জানান যায় না। তিনি উপমারহিত। যদ্যপি পৃথিবীতে আমাদের বলিয়া কেহ থাকেন, তাহা হইলে গুরুই একমাত্র আত্মীয়। মাতা দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া অনেক ক্লেশে আমাদিগকে লালনপালন করেন, সেইজন্য তিনি বাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। একথা মিথ্যা নহে। মাতার ন্যায় আপনার, বোধ হয়, ইহজগতে আর কেহ নাই, তাঁহার স্নেহের অবধি করা যায় না। মাতার নিঃস্বার্থ ভালবাসার নিকটে পিতা লজ্জিত হন, কিন্তু যদ্যপি গুরুর স্নেহের সহিত মাতার স্নেহ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

মাতার সম্বন্ধ মায়িক সূত্রে সংস্থাপিত হয়, আমার পুত্র বলিয়া তাঁহার ভালবাসার সঞ্চার হয় এবং সেই আমার ভাবেই চিরকাল বাৎসল্যভাব বলবতী থাকে। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতার বিশেষ স্বার্থ দেখা যায় না, কিন্তু সর্ব্ব সময়ে মায়িক কার্য্য হয় বলিয়া তাহা একেবারে নিঃস্বার্থ বলাও ন্যায়বিরুদ্ধ কথা। মাতা কখনও তাঁহার পুত্রকে ভগবানের শ্রীচরণে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। পুত্র সংসার ছাড়িয়া ঐশ্বরিক চিন্তায় আত্মোৎসর্গ করিলে কোন্ মাতা আনন্দিতান্তঃ-করণে তাহা অনুমোদন করিতে পারেন? কোন্ মাতা স্ব-ইচ্ছায়

স্বহস্তে নিজ পুত্রের সাংসারিক বন্ধন ছেদন করিতে অন্ততঃ যত্নবতী হইয়াছেন? মাতার এই মায়িক বা সাংসারিকসম্বন্ধপ্রধান ভাব আছে বলিয়া তাঁহার স্নেহকে স্বার্থযুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু গুরুর ভালবাসা কেন? তিনি শিষ্যের শুভাশুভের জন্য চিন্তিত কেন? আমি আধুনিক বিকৃত গুরুদিগের কথা বলিতেছি না। মাতার ন্যায় কেবল ঐহিক বা সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনি কখনই এক দণ্ড চিন্তা করেন না। শিষ্যের ধন হইল না বলিয়া কখন ব্যতিব্যস্ত হন না, শিষ্যের পদোন্নতি হইল না বলিয়া কখন ম্রিয়মাণ হন না, যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া শিষ্য জ্ঞানাপন্ন হইতে পারে, যাহাতে মায়াবরণ উচ্ছেদ করিয়া শিষ্য জ্ঞান-নয়ন লাভ করিতে পারে, যাহাতে ভগবানের অপূর্ব্বরূপ দর্শন করিয়া শিষ্য জীবন সার্থক করিতে পারে, গুরুর তাহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা। তাহাই গুরুর একমাত্র অভিপ্রায়, তাহাই সাধন করা গুরুর কার্য্য। শিষ্যকে সংসারে ডুবাইয়া দেওয়া গুরুর কর্ত্তব্য নহে, শিষ্যকে ভগবান্ হইতে পরিভ্রষ্ট করা গুরুর কর্ত্তব্য নহে, শিষ্যকে মায়াবৃত করা গুরুর কর্ত্তব্য নহে। অজ্ঞান শিষ্যকে জ্ঞান দান পূর্ব্বক ভগবান্ দেখাইয়া দেওয়া গুরুর কর্ত্তব্য। এই কার্য্য অন্য কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারে না এবং ইহাই গুরুকরণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কোন ব্যক্তি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়! গুরুর দ্বারা শিষ্যের কি লাভ হইয়া থাকে?" গুরু কহিলেন, "ভগবানের সহিত শিষ্যের আলাপ করিয়া দেওয়া গুরুর কার্য্য।" এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সে পুনরায় বলিল যে, "মহাশয়! আপনি যাহা বলিলেন, কার্য্যে কি তাহা বাস্তবিক হয়? না, কেবল সাপের মন্ত্র জপ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া যাইতে হয়?" গুরু হাসিয়া কহিলেন যে, তুমি একথা জিজ্ঞাসা

করিতেছ কেন? সে উত্তর করিল যে, আমার মনে এই কথাটা কয়েক দিবস আন্দোলন হইতেছিল, তাহা ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, ভগবান্ কে? এই ব্যক্তির আপাদ মস্তক গুরু অবলোকন পূর্ব্বক তাহার আন্তরিক অবস্থা বুঝিয়া লইলেন এবং তাহাকে সমভিব্যাহারে 'লইয়া একটী সুন্দর অট্টালিকাবিশিষ্ট উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। গুরু বাটীর ভিতরে যাইয়া ঐ ব্যক্তিকে কহিলেন, "বাপু! ভগবান্ কে তাহা অচিরাৎ বুঝাইব, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমি প্রত্যাগমন করি, সে পর্য্যন্ত তোমাকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে।" এই বলিয়া গুরু অদৃশ্য হইলেন। এক পক্ষ অতীত হইলে পর গুরু পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কয়েক দিন কিরূপে যাপন করিলে?" সে কহিল, "গুরুদেব! প্রথম কয়েক দিন প্রত্যহ উদ্যানের নব নব শোভা দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। অদ্য এ বৃক্ষটী পল্লবিত, কল্য ও বৃক্ষটী মুকুলিত দেখিয়া, কখন কোন পক্ষীর ঝঙ্কার, কখন কোন পক্ষীর কণ্ঠনিঃসৃত স্বরগ্রাম শ্রবণ করিয়া আপনাকে শত ধন্যবাদ দিতাম। আমি কোথায় ছিলাম, কি দেখিতাম, কি শুনিতাম, আর আপনি কোথায় আনিয়াছেন! কিন্তু এক্ষণে আর নূতন আনন্দ নাই। যে দিকে দেখি, যাহা শ্রবণ করি, সমুদয় পুরাতন বোধ হয়!" তখন গুরুঠাকুর তাহাকে গৃহবিশেষে লইয়া যাইবামাত্র এক পরমা রূপ-লাবণ্যসম্পন্না যুবতী সম্মুখে আসিয়া গুরুকে প্রণিপাত করিল। গুরু শিষ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! অদ্য তোমাকে আর একটী নূতন সামগ্রী দিলাম। তুমি ইহার সহিত কাননে বাস কর, পক্ষান্তে আমি পুনরায় উপস্থিত হইব।"

এই নরনারীদ্বয় এক পক্ষ কাল নানাবিধ রঙ্গরসে অতিবাহিত করিল। তদনন্তর গুরু আসিলে শিষ্য কহিল, "ঠাকুর! দিন কয়েক বেশ ছিলাম, কিন্তু তাহার পর আর ভাল লাগিত না। সে যাহা হউক, যাহাকে আপনি দিয়া গিয়াছেন, ইনি কে?" গুরু কহিলেন, "তোমার তাহা জানিবার প্রয়োজন কি?" শিষ্য ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না—তাহা আপনাকে অবশ্যই বলিতে হইবে।" গুরু কহিলেন যে, "ইহার নাম শ্যামা।" শিষ্য আনন্দিত হইয়া তাহাকে শ্যাম শ্যামা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। গুরু তখন সেই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বাম জানুর উপরে শিষ্যকে এবং দক্ষিণ জানুর উপরে শ্যামাকে বসাইয়া, শ্যামার হস্তধারণ পূর্ব্বক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! বল দেখি এ কি?" শিষ্য কহিল, "প্রভু! এ শ্যামার হাত।" মস্তক নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, এ শ্যামার মাথা; এইরূপে শ্যামার নাক, শ্যামার চক্ষু, শ্যামার কর্ণ, শ্যামার পদ, শ্যামার শরীর একে একে বলিতে বলিতে শিষ্য তখন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! শ্যামা কে? শ্যামার হাত, শ্যামার পা, শ্যামার দেহ বলিতেছি, শ্যামা কে? তাহাকে একবার দেখাইয়া দিন।" গুরু কহিলেন, "কি বলিতেছ? শ্যামা তোমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে, আবার তাহাকে দেখিতে যাইবে কোথায়?" শিষ্য সে কথা শুনিল না। সে বার বার বলিতে লাগিল যে, "যাহাকে দেখিতেছি, তাহা শ্যামার, শ্যামা নহে। ঠাকুর! আমি এ কথা উত্তম-রূপে বুঝিয়াছি। আমার মনে হইতেছে যে, যখন শ্যামা নিদ্রিত হয়, তখন তাহার দেহ পড়িয়া থাকে, কিন্তু দৈহিক কোন কার্য্য হয় না। আমি তাহাকে কত ডাকিয়াছি, সে কথা কহিতে পারে নাই, আমি উহার গাত্র স্পর্শ করিয়াছি, সে জানিতে পারে নাই, এই নিমিত্ত আমার মনে হইয়াছে যে, শ্যামা এবং শ্যামার দেহ স্বতন্ত্র। শ্যামার

দেহ দেখিয়াছি, এক্ষণে দয়া করিয়া শ্যামাকে দেখাইয়া দিন।” গুরু কহিলেন, “তুমি আপাততঃ এই উদ্যানে শ্যামার সহিত আর এক পক্ষ অবস্থিতি কর, তাহার পর যাহা হয়, আমি বলিব।” শিষ্য সে কথা কোন ক্রমে শুনিল না। সে কহিতে লাগিল, “ঠাকুর! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উদ্যান ভাল লাগে না, শ্যামার দেহ ভাল লাগে না, দয়া করিয়া আমায় শ্যামাকে দেখাইয়া কৃতার্থ করুন।” গুরু তখন শ্যামাকে পশ্চাতে রাখিয়া শিষ্যকে কহিলেন, “তুমি শ্যামাকে দেখিতে চাও, কি ভগবান্‌কে দেখিতে চাও? তোমার স্মরণ আছে কি—তুমি ভগবান্‌কে জানিতে আসিয়াছিলে? এখন বল, তুমি কাহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর?” শিষ্য কহিল, “শ্যামাকেই দেখিতে চাই, ভগবান্‌কে দেখিব কেন? তাঁহার কোন প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেছি না। লোকে ভগবান্ ভগবান্ বলে, সেই কথা শ্রবণ করিয়া মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ভগবান্ বলিয়া আমার কোন প্রকার ধারণা নাই।”

এমন সময়ে মনোহর বেশ ভূষায় বিভূষিত বামাদলে শিষ্যকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শিষ্য তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “প্রভু! এরা কে?” তিনি কহিলেন, “ইহাদিগকে শ্যামা বলিয়া কি জ্ঞান হইতেছে না?” শিষ্য তখন কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, “গুরুদেব! বলিয়া দিন ইহাদের মধ্যে শ্যামা কে? আমি শ্যামাকে দেখিতে চাই; যিনি থাকিলে হাত কার্য্য করে, পা চলিতে পারে, চক্ষু দেখিতে পায়, কর্ণ শুনিতে পায়, বদনে বাক্য নিঃসৃত হয়, ডাকিলে উত্তর দেয়, আমি সেই শ্যামাকে দেখিব, সেই শ্যামার জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়াছে।” গুরু তখন হাস্য সহকারে বলিলেন, “দেখ, উহারাই শ্যামা।” শিষ্য অতি কাতর ভাবে কহিল, “ঠাকুর! শ্যামাকেও জানিতাম না, শ্যামাসম্বন্ধীয়

কোন বস্তুও জানিতাম না, আপনি আমায় এই অবস্থায় আনিয়াছেন। আপনি বলিতেছেন যে, ইহারা শ্যামা। আমাকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। কিন্তু বলিতে কি, যাহা ইতিপূর্ব্বে শ্যামার বলিয়া বুঝাইয়াছেন, আমি ইহাদিগকে তাহাই দেখিতেছি। ইহাদিগকে দেখিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না, যে অভাব আমার পূর্ব্বে ছিল, শ্যামা দেখিব বলিয়া যে ভাব আমায় অধিকার করিয়াছিল, সে ভাব এখনও সমভাবে রহিয়াছে। প্রভু, শ্যামা কোথায়?" তখন গুরুঠাকুর আনন্দিত হইয়া শিষ্যর প্রতি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা স্বরবর্ণের 'এ' উল্লেখ করিয়া আপনি সরিয়া 'ঐ' বলিবামাত্র সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময়ী শ্যামারূপ শিষ্য দর্শন করিল এবং গুরু জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শ্যামার চরণে বিলয় প্রাপ্ত হইলেন। শ্যামাই তখন গুরু এবং ইষ্টে পরিণত হইয়া শিষ্যের সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা আপনি মিটিয়া আসিল, আর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, আর তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার রহিল না এবং আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার থাকিল না। সে অবাক হইয়া ব্রহ্মময়ীর রূপমাধুরী দর্শন করিতে লাগিল, আনন্দে তাহার হৃদয়ের শ্যামা বদনে মা পর্য্যন্ত আসিতে পারিল, সুতরাং প্রতিনিয়ত মা মা শব্দ তাহার মুখে বাহির হইতে লাগিল। শিষ্য মা মা বলিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, জগন্মাতা বাহুপ্রসারণ করিয়া "আয় রে, আয় আমার কোলে আয়, চিন্তা কিসের? এই যে তোর মা আমি" বলিতে লাগিলেন। শিষ্য লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক মাতৃ-ক্রোড়ে গমনকালে মাতার করস্পর্শে সেই জ্যোতিতে মিশাইয়া গেল। এই নিমিত্ত প্রভু আমার বলিতেন যে,

"সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

এই নিমিত্তই তিনি বলিতেন যে, গুরু ইষ্ট এক।

একণে আমরা বুঝিতে পারিব যে, গুরুর ভালবাসা, গুরুর স্নেহ এবং গুরুর সম্বন্ধ তুলনারহিত। যাঁহারা আত্মীয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের সহিত কতদূর সম্বন্ধ রাখিতে পারেন এবং কতদূরই বা সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া থাকেন? পিতামাতার সম্বন্ধ বিচার করিলে জড়দেহেও সুচারুরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও তাঁহাদের দেহ হইতে জড় এবং চেতন পদার্থ বাহির হইয়া স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে, কিন্তু তাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে, যে পর্য্যন্ত স্বার্থ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত স্নেহ বা ভালবাসা রাখিতে পারেন, তাঁহাদের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন হইলেই অমনি পুত্রের পুত্রত্ব বিলুপ্ত করিয়া অপুত্রক ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। কি জন্য পুত্রের পরমার্থ রক্ষার্থ পিতা-মাতা কখন প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন না, কি জন্য তাঁহারা কখন তাহাতে স্বইচ্ছায় যোগদানও করিতে পারেন না? আত্মার সদ্গতির জন্য সকলেই নিজে নিজে দায়ী। পিতা নিজ পরিত্রাণের নিমিত্ত নিজে দায়ী, মাতার পরিত্রাণের জন্য তিনি নিজে দায়ী, পুত্রের পরিত্রাণের জন্য পুত্রই দায়ী। এই দায়িত্ব গুরুকরণ হইলে কাটিয়া যায়, তখন গুরুই সে জন্য একাকী দায়ী হইয়া থাকেন। গুরুর দায়িত্ব শিষ্যের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যে দিন শিষ্য নিজে কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করে, সেই দিনই গুরুর দায়িত্ব বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

একদিন কোন ব্যক্তি নামরসে মাতাল হইয়া আনন্দে ঢলিতে ঢলিতে যাইতেছিলেন, পথের ধারে ধোপারা কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল। ভক্তকে তাহার উপর দিয়া যাইতে দেখিয়া ধোপারা অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু সে কথা শুনে কে? ধোপারা তখন ক্রোধান্বিত হইয়া লগুড় দ্বারা তাঁহার যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিল। পাপাত্মাদিগের সংস্পর্শে তাঁহার ভাবাবসান হইয়া যাইলে তিনি দেখিলেন যে, সর্ব্বশরীর

হইতে শোণিতধারা পতিত হইতেছে এবং তাহার কারণও তখন বুঝিতে পারিলেন। কি করিবেন ভাবিয়া কহিলেন, গুরুর ইচ্ছা সকলি, তিনি যাহা ভাল হয়, করিবেন। এই কথা তৎক্ষণাৎ নারায়ণের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল, ভক্তের বিপদে অধীর হইয়া অমনি তিনি ভোজন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মাতা নিকটে বসিয়া ছিলেন, প্রভুর সহসা ভোজন ত্যাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোজনে বিঘ্ন হইল কেন? নারায়ণ কহিলেন, আমার জনৈক ভক্ত নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়াছে, আমি তাহার শত্রু শাসন করিতে যাত্রা করিলাম। এই বলিয়া নারায়ণ প্রস্থান করিলেন। নিমিষ কাল অতীত না হইতেই তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া মাতা কহিলেন, তুমি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে? নারায়ণ বলিলেন, ভক্ত এখন ধোপা হইয়াছে। মাতা বিষাদিত হইয়া ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ ভক্তের নিগ্রহ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন যে, সে যখন গুরুকে স্মরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তখন আমি তাহার জন্য চঞ্চল হই, কারণ আমিই সকলের গুরু। গুরু বলিলে আমাকেই ডাকা হয়। গুরু আমারই নামবিশেষ সুতরাং আমিই তাহার প্রতিবিধান করিতে যাইতেছিলাম। ওদিকে ভক্ত কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে গুরুর প্রতি অবিশ্বাস করিল। সে ভাবিল, তাইত গুরু অনেক দিন পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি কি হইয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন, আমিই ধোপাদের একটু শাসন করিয়া যাই। দেখ লক্ষ্মী! তাহার গুরু স্থানে ধোপা ভাব আসিল, সুতরাং আর আমি যাইতে পারিলাম না। নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া মাতা কাতর হইয়া কহিলেন, "প্রভু! অজ্ঞান জীবের অপরাধ কি? প্রতি মুহূর্ত্তে মায়ার ছলনায় তাহা-দিগকে আত্মহারা হইতে হয়, সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদা ভাব রক্ষা

করিয়া যাইতে পারে না। মায়ায় পতিত না হইলে তাহারা কখন তোমায় বিস্মৃত হইত না। প্রভু! দয়া করিয়া একবার বিবেচনা কর দেখি, জীবের অপরাধ কি? তাহারা না, ঠাকুর! তোমার নিয়মাধীন? তোমার নিয়মে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে দোষগুণ কেন তাহাদের মস্তকে ফেলিয়া বিপদগ্রস্ত কর? ঠাকুর! জীবের প্রতি কঠিন হইলে আমার প্রাণ অধৈর্য্য হইয়া উঠে। কি করিব, তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করিবার আমার শক্তি নাই, তাহা না হইলে সমুদয় জীবকে আমি নিরাপদে রাখিতাম।" নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মী! তুমি সমুদয় জানিয়া শুনিয়া কেন বৃথা আমায় গঞ্জনা দিতেছ? আমি জীবের কল্যাণ হেতু না করিতেছি কি? মায়ায় ভ্রম জন্মায় বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম নহে, আমাকে বুঝিয়া লইবার জন্য, আমাকে চিনিবার নিমিত্ত, আমায় লইয়া সম্ভোগ করিবার জন্য মায়ার সৃষ্টি করিয়াছি। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া বুঝা যায়? অধম না থাকিলে উত্তমের মর্য্যাদা কিরূপে হয়? মূর্খ না থাকিলে পণ্ডিতের কি শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হয়? অসাধু না থাকিলে সাধুকে কে মান্য করিয়া থাকে? সেইরূপ জীবের জীবত্ব জ্ঞান থাকিলে তবে আমায় চাহিয়া থাকে। এইরূপ বিচার করিবার শক্তি লাভ করিবে বলিয়া মায়ার সম্বন্ধ রাখিয়া অহং ভাবের কার্য্য হইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। এই অহংকারে নিজের কর্ত্তৃত্ব আইসে। নিজের কর্ত্তৃত্ব যত বৃদ্ধি পায়, সে তত আমার নিকট হইতে দূরে পতিত হয় এবং কর্ত্তৃত্বের যত হ্রাস হয়, সে ততই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই কর্ত্তৃত্ব নাশের জন্য আমি গুরুকরণ প্রথা প্রচলিত করিয়া আপনি গুরুরূপে কার্য্য করিতেছি। গুরুতে বিশ্বাস না থাকিলে আমি কিরূপে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি? যাহার গুরুতে প্রয়োজন নাই, গুরু যাইয়া

তাহার কি করিবে?" লক্ষ্মী কহিলেন, "ঠাকুর! যাহাতে জীব গুরু বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয়, এ প্রকার ব্যবস্থা করিলে, আহা! দুর্ব্বলেরা অনায়াসে পরিত্রাণ পাইতে পারে। দুর্ব্বলেরা কি কখন পরীক্ষায় বাঁচে?" নারায়ণ কহিলেন, "তাহা আমি জানি, কিন্তু কি [illegible], সঙ্কল্পসূত্রে যাহারা গ্রথিত হয়, গুরু ব্যতীত কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে? তুমি চিন্তিত হইও না। আমার নিকটে আসিবার যাহার প্রয়োজন হইবে, সে নিশ্চয় গুরুবাক্য বিশ্বাস করিবে। যে গুরুবাক্য বিশ্বাস করিবে, তাহার সহিত সেইদিন আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, সে সেইদিন হইতে জীবনমুক্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে ধীরভাবে অবস্থিতি করিবে।"

রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় গুরুতত্ত্বের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলা হইল। এক্ষণে আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিব যে, এই প্রকার উপদেশের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল কি না? আমাদের বর্ত্তমান সমাজে গুরু সম্বন্ধে যে ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা অচিরাৎ নির্ম্মূল না হইলে কখনই কল্যাণের আশা করা যায় না। কে না একথা বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্য কখন মনুষ্য হইতে পারে না? মৃতজীবকে বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত করিলে তাহা যেরূপ কখন শোভান্বিত হয় না, ধর্ম্মবিহীন নরনারীরা তদ্রূপ। আহার বিহার সংসার বর্দ্ধনাদি করিতে পারিলেই মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। সে সকল শক্তি পশুদিগেরও কোন মতে ন্যূন নহে। পশুদিগের কার্য্য অপেক্ষা যদ্যপি আমাদের কার্য্যের শ্রেষ্ঠতা না থাকে, তাহা হইলে আমরা শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া অভিমান করি কেন? যেমন জন্তু অপেক্ষা মনুষ্য-জীব শ্রেষ্ঠ, মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ, নির্ধন অপেক্ষা ধনী শ্রেষ্ঠ, দুর্ব্বল অপেক্ষা বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, অজ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অধার্ম্মিক অপেক্ষা ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ,

অবিশ্বাসী অপেক্ষা বিশ্বাসী শ্রেষ্ঠ, নাস্তিক অপেক্ষা আস্তিক শ্রেষ্ঠ, তাহা সর্ব্বসাধারণে স্বীকার করিয়া থাকেন। যদ্যপি তাহাই হয়, তবে যাহা আমাদের শুভপ্রদ, যাহা আমাদের মঙ্গলপ্রদ, তাহা বিপর্য্যয় করা বাস্তবিক আমাদের দুঃসময়ের কার্য্য বলিতে হইবে। দুঃসময়ের আর বাকি কি? আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় লজ্জায় আত্মঘাতী হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না! আমরা বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকলে কামিনী-কাঞ্চনের ক্রীতদাস হইয়া অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় দিতেছি। আমাদের কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত কোন কথা নাই, কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত কোন ভাব নাই, কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত কোন কার্য্য নাই, কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত কোন ধর্ম্ম নাই, কামিনী-কাঞ্চন আমাদের জ্ঞান, কামিনী-কাঞ্চন আমাদের ধ্যান, কামিনী-কাঞ্চন আমাদের ইষ্ট হইয়াছে। যে ভাব ধর্ম্মপথের কণ্টক, যে ভাব ধর্ম্মপথের প্রতিকূল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমরা সার বস্তু বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করিয়াছি, তাহাই আমরা ইহ-পরকালের জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি, সুতরাং কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটিলে আমরা দশদিক শূন্যময় দেখি। ভাই হউন, মাতা হউন, পিতা হউন, বন্ধু বান্ধব হউন, প্রতিবাসী হউন, গুরু হউন, আর ইষ্ট হউন, যিনি আমাদের কামিনী-কাঞ্চন-ভাবে হস্ত প্রসারণ করেন, তাঁহাকেই আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি, সেই মুহূর্ত্তে আমরা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকি।

একদা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গুরু শিষ্যপত্নীর হস্তে বাউটী নামক অলঙ্কারবিশেষ দেখিয়া শিষ্যের নিকট উহা তাঁহার পত্নীর নিমিত্ত চাহিয়াছিলেন। শিষ্য এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই অলঙ্কারটী গুরুকে

তৎক্ষণাৎ প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনি আর এ বাটীতে আসিবেন না। আপনি গুরু, অধিক আর কি বলিব, অন্য কেহ হইলে ঘোড়ার চাবুকের দ্বারা এই প্রকার লোভীর প্রতিবিধান করিতাম। আজ আপনি আমার স্ত্রীর অলঙ্কারটীর উপর লোভ করিলেন, কল্য আমার স্ত্রীটীর প্রতিও লোভ জন্মিবে, জন্মিবে কি জন্মিয়াছে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আমার দৃশ্য বহির্ভূত হউন।"

আর একস্থলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার হইয়া গিয়াছে।

একদিন কোন ব্যক্তি বহির্ব্বাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহাদের গুরুঠাকুর গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গুরু উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ বাপু! আসিবার সময় আমি সহসা অন্ধকার দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি; জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলাম যে, একজন ব্রাহ্মণ আমায় ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় আমি তোমাদের কুলগুরু বলিয়া উল্লেখ করিলাম। তিনি তোমাদের নাম শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, অমুকের গুরু আপনি, আপনার পায়ে একজোড়া জুতা নাই?" শিষ্য গুরুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুচি ডাকাইয়া জুতা প্রস্তুত করিতে দিলেন। গুরুঠাকুর সেই সময়ে অপর বাটীতে দুর্গা পূজায় ব্রতী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দুইবেলা জুতার তাগাদা আরম্ভ করিলেন।

একদিন বেলা ১১টার সময় শিষ্য আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুরুর ভৃত্য আসিয়া জুতার তাগাদা করিল। শিষ্য বিরক্ত হইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর মহাশয় এখন কি করিতেছেন?" ভৃত্য কহিল, "তিনি পূজায় বসিয়াছেন।" শিষ্য ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "আজ মহাষ্টমী! তিনি পূজা করিতে করিতে কেবল জুতা ভাবিতেছেন! তুই তাঁহাকে বলিবি যে, জুতা হইবে কি, চাম্‌ড়া পাওয়া

যাইতেছে না। তিনি যখন মরিবেন, তখন সেই চামড়ায় জুতা প্রস্তত হইবে।”

তাই বলিতেছি, এমন সময় উপস্থিত না হইলে ভগবানের অবতরণ হইবে কেন? রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত গুরু এবং শিষ্যের প্রকৃত ভাব স্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এই নিমিত্ত নিজে ক্রমান্বয়ে সকল সম্প্রদায়ের গুরুর নিকট শিষ্য হইয়া সকল সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বার বার বলিতেন যে, “সখি! যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।” কাহারও শিক্ষার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সমাপ্তি হয় না। অভিমানের ক্ষয় না হইলে, কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি না যাইলে, কস্মিন্‌কালে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার লাভ হয় না। রামকৃষ্ণদেব তাহার উপায়ের নিমিত্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, যে গুরুকে বিশ্বাস করিতে পারিবে, যে গুরুবাক্য বিশ্বাস করিবে, যে গুরুতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে, সেই বিনা সাধনে, বিনা ভজনে, বিনা যোগে, বিনা তপশ্চারণে জীবনমুক্ত হইয়া আনন্দরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে। গুরু বিশ্বাস ব্যতীত কাহারও কল্যাণ নাই, গুরু বিশ্বাস ব্যতীত কাহারও গত্যন্তর নাই, গুরু বিশ্বাস ব্যতীত কাহারও কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে পরিমুক্তি পাইবার উপায় নাই, গুরু বিশ্বাস ব্যতীত ভগবানের দর্শন পাইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই।

রামকৃষ্ণদেবের স্বর্গীয় বাণী যখন প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে, প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক নর-নারীতে প্রবেশ করিবে, যখন সকলে গুরুতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ করিবে, তখন বাস্তবিক তাহাদের কল্যাণ হইবে, তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সেইজন্য বলিতেছি যে, রামকৃষ্ণদেব আমাদের সকলেরই প্রণম্য, আমাদের

সকলেরই পূজনীয়। তিনি সকলের নিমিত্ত কাতর হইয়া, সকলের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যিনি সকলের দুঃখে দুঃখিত হন, যিনি সকলের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি সকলের পরিত্রাণের জন্য চিন্তাকুল হন, যিনি সকলের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তিনিই সকলের গুরু, তিনিই সকলের ইষ্ট, তিনিই সকলের আরামের স্থল, তিনিই সকলের শান্তিবিধাতা।

গীত।

(১)

রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি না করি বিচার।
আমি না জানি সাঁতার কেবল ভরসা তোমার॥
অনুরাগে আপন হারা, না দেখি যে কূল কিনারা,
অকূল মাঝে ধ্রুবতারা তোমায় করি সার॥
নিজগুণে নামটী দিলে, প্রাণ মন কেড়ে নিলে,
এখন যা কর কিঙ্কর ব'লে আমি নই আমার॥

---

(২)

গুরু মতি গতি, গুরু জগপতি, গুরু পরাৎপর।
গুরু ইষ্ট অভেদ অন্তর॥
সরল অন্তরে হৃদয় মাঝারে ধরি সাধে শ্রীচরণ,
বিশ্বাস বাঁধনে বাঁধি সযতনে দিয়ে অভিমান বিসর্জ্জন।
সপ্রেম ভকতি, সেবক প্রণতি, ধর দেব নিরন্তর।
তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর॥

পরম রতন যে চাহে শরণ বাসনা তায় আপন পূরায়।
সে রাঙ্গা পায়, প্রাণ যে বিকায়, ঘোচে ভবের দায় তাঁর চরণ কৃপায় ॥
যে চায় তাঁরে, তারে আপনি মিলায় (হয়ে আপনি গুরু) ॥
গুরু নয়তো কেউ আর জগৎগুরু
বিনা গুরু সহায় নাইক উপায় ॥
বিভু দরশন অভিলাষী জন, গুরু আরাধন সার।
গুরু ইষ্ট নামের সুধা বিলায়,
বিনা গুরু কে আর ইষ্ট দেখায়,
তখন গুরু শিষ্যে না হয় দেখা
গুরু ইষ্ট দেখায়, ইষ্টে মিশায় ॥
(জ্যোতিঘন জ্যোতি খেলায়
জ্যোতিতে জ্যোতি মিশায় ॥)

---

(৪)

প্রাণে আশা সে পিয়াসা আর কে নিবারে।
ওহে জীবনসখা দাও হে দেখা অকূল পাথারে ॥
তোমার নামের গুণে নীরস প্রাণে আশার সঞ্চার,
(বকলমা নিয়ে)
আমার নাই তো কেউ আর আপন বলিবার ;
তাই সর্ব্বস্ব ধন, রামকৃষ্ণ চরণ, সার করেছি এবারে ॥

চতুর্থ বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

পঞ্চম বক্তৃতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

পরকাল

১৩০০ সাল, ২২শে শ্রাবণ, রবিবার, প্রাতঃ
৮ ঘটিকায় ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

---

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

পরকাল।

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

পরকাল প্রস্তাবটী অতিশয় কঠিন হইলেও, আমাদের পক্ষে যারপর-নাই প্রয়োজনীয় এবং সকলের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, কিন্তু বর্ত্তমান কালে, আমাদের যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার ধারাবাহিক মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব লইয়া মীমাংসার্থী হইয়াছেন, ভগবানের কৃপায় তাঁহারাই তাহা সময়ক্রমে বুঝিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, একদিন এই বিষয়টীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইবার নিমিত্ত, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলাম, এবং প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যদিও কুত্রাপি প্রাণের শান্তিপ্রদ প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু পরিশেষে সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে।

মানবসমাজে দৃষ্টিপাত করিলে কোন কোন ব্যক্তিকে পরকালের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়। কি উপায়ে তথায় শান্তি লাভ করিবে, কি উপায়ে তথা হইতে আর প্রত্যাগমন করিতে হইবে না, ইত্যাকার ভাবে কেহ কেহ ইহকালে অবস্থিতি করেন। কাহাকেও তদ্বিষয়ে একেবারে উদাসী দেখা যায়। এবং কাহাকেও পরকাল সম্বন্ধে একেবারে উপেক্ষা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেহ পরকাল বলিয়া

মানেন, কেহ তাহার জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন এবং কেহ কোনমতে পরকাল স্বীকার করেন না। এইরূপ ত্রিবিধ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ভাব বিচার করিয়া দেখিলে, কাহাকেও প্রশংসা এবং কাহাকেও নিন্দা করা যায় না। যে ব্যক্তি যে শ্রেণীতে পতিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিচয় দিতে কখনই সমর্থ নহেন। সে যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব মনুষ্যদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এই গুরুতর বিষয়ের যেরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, অদ্য তাহাই বর্ণনা করা আমার অভিপ্রায়।

তিনি বলিতেন যে, সাধারণ মনুষ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা— বদ্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত। এতদ্ব্যতীত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মনুষ্যগণ পৃথিবীর সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়ও অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই সকল মনুষ্যেরা কেহ শাপগ্রস্ত হইয়া এবং কেহ বা অন্য কারণে নিজ নিজ ধাম পরিত্যাগ করিয়া মানবাকৃতিতে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে আগমন করেন। সময়ে সময়ে নিত্য বা ব্রহ্ম কোটার জীবদিগকেও সাধারণ মনুষ্যাকারে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখন কখন স্বয়ং ব্রহ্মকেও নররূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই নিমিত্ত মনুষ্য বলিলে যদিও এক জাতি জীব বুঝায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। শক্তির অর্থাৎ কর্ম্মের তারতম্যে অবস্থাগত তারতম্য হয়, অবস্থাগত তারতম্য হইলে সুতরাং পরস্পর প্রভেদ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ কার্য্য হিসাবে সকলেই স্বতন্ত্র অবস্থার পরিচয় দিয়া থাকে।

কথিত হইল যে, বদ্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত বলিয়া তিন প্রকার মনুষ্য-দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে ইহাদের বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বদ্ধ শব্দের দ্বারা অবস্থাগত তাৎপর্য্য জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে।

মনুষ্যগণ দুইভাগে বিভক্ত ; শরীরাদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় পদার্থ এক ভাগ এবং চৈতন্য বা আত্মাকে দ্বিতীয় ভাগ কহা যায়। আত্মা দেহে অবস্থিতি কালে জীবাত্মা নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদিও জীবাত্মা এবং আত্মাকে অনেকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু সহজ কথায় দেহ-বুদ্ধি লইয়া আত্মার অবস্থিতি কালে জীবাত্মা এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইলে আত্মা শব্দে উল্লিখিত হন। দেহ এবং আত্মার সংযোগ হইলে জীবের সৃষ্টি হয়। এইজন্য মনুষ্য ও অপরাপর জীব-দিগকে জড় এবং চৈতন্যের যৌগিকবিশেষ বলা যায়। আত্মা যতক্ষণ নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া দৈহিক অর্থাৎ স্থূল কার্য্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন, স্থূল কার্য্যের নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার জৈবভাব এবং তদবস্থায় বদ্ধ উপাধি লাভ করেন। এই নিমিত্ত প্রভু কহিতেন,—"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

বদ্ধ-জীবেরা কয়েকটী সাধারণ লক্ষণদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন। প্রভু বলিতেন যে, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এবং অভিমান এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণা-ক্রান্ত জীবকে বদ্ধ কহা যায়। অর্থাৎ আমি এবং আমার জ্ঞানসম্পন্ন নরনারী প্রকৃত পক্ষে বদ্ধ-জীব শ্রেণীর অন্তর্গত। এক্ষণে সংসারক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া এই লক্ষণাক্রান্ত নরনারীদিগকে দেখিলেই বদ্ধ-জীব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইবে।

আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন নরনারী আমি আমি এবং আমার আমার করিয়া প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের কন্যা, আমার পিতা মাতার ন্যায় আর কাহারও পিতা মাতা হয় নাই। আমার পিতার ন্যায় পণ্ডিত আর পৃথিবীতে কেহ ছিলেন না এবং আর যে ভবিষ্যতে কেহ জন্মিবেন, তাহার সম্ভাবনাও নাই। আমার পিতা সাক্ষাৎ কুবেরের ন্যায় ধনী

ছিলেন, তাঁহার ধনের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই, এ কথা পৃথিবীর কোন লোক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদের কুলমর্য্যাদা প্রভাবে কত নর-নারী অকূলে কুললাভ করিয়া কৌলিন্যের শিরোমণি হইয়াছে। আমি নিজে রূপবান্, আমার রূপের নিকটে কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। আমার পাণ্ডিত্যের পরাক্রমে কে না পরাজিত? আমার স্ত্রীর ন্যায় সুশীলা সুরূপা সদ্গুণালঙ্কৃতা স্ত্রী আর কাহার আছে? আমার পুত্রের রূপ-গুণ দেখিয়া কার্ত্তিক লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিতে অবসর অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ফলে সর্ব্ব বিষয়ে আমি বড়; আমার অপেক্ষা সকলেই নিকৃষ্ট, বদ্ধ-জীবের এই অভিমানের ভাব সর্ব্বতোভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রে লজ্জা এবং ভয় পূর্ণ পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই কার্য্য করিতে পারিব না, তাহা আমাদের বংশের রীতিবিরুদ্ধ, সুতরাং লোকে আমায় বলিবে কি? অমুক কার্য্য করা আমাদের কুলপ্রথা নহে, তাহাতে লোকে আমায় লজ্জা দিবে। অমুকের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে আমাদের মর্য্যাদা ভঙ্গ হইবে। ইত্যাকার অভিমানসূচক কথা ব্যতীত বদ্ধ-জীবের মুখে অন্য কথা বাহির হইতে পারে না।

আমরা এই প্রকার স্বভাবের পরিচয় প্রত্যহই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কেহ বিদ্যার, কেহ ধনের, কেহ রূপের, কেহ বুদ্ধির, কেহ জ্ঞানের, কেহ পদমর্য্যাদার অভিমান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হইতে ধর্ম্মের অভিমান প্রকাশ পায়, যে ব্যক্তি হইতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিকাশ হয়, তাহাকেও বদ্ধজীব শ্রেণীর অন্তর্গত কহা যায়।

যেমন মাকড়সা নিজে জাল বিস্তারিত করিয়া তাহাতে আপনি আবদ্ধ হইয়া থাকে, বদ্ধ-জীবও সেইরূপে সঙ্কল্প করিয়া আপনি নানাপ্রকার ভাব দ্বারা আত্মা এবং দেহকে একেবারে নাগপাশে আবদ্ধ

করিয়া ফেলে। বাস্তবিক বদ্ধ হইব বলিয়া যদিও কেহ সঙ্কল্প করেন না বটে, কিন্তু কার্য্যের ফলে তাহাই ফলিয়া থাকে।

পার্থিব ভাব বিস্তৃত করিয়া দিন যাপন করা বদ্ধ-জীবের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। দৈহিক সুখ-সম্ভোগ করাই প্রধান উদ্দেশ্য এবং বাহ্যিক উন্নতিসাধন ব্রতই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ফলে, স্থূলের নানাবিধ ভাব বর্দ্ধিত হইলে তাহাতেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হয়, সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে কোন প্রকার কার্য্য করিবার আর সুবিধা হয় না।

জীবগণ কিরূপে আত্মহারা হইয়া বদ্ধাবস্থায় পরিণত হয়, প্রভু একটী উপাখ্যান দ্বারা তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন।

কোন গ্রামের প্রান্তভাগে এক সাধু বাস করিতেন। সাধু শিশুকালেই সংসারের বিভীষিকায় কাননবাসী হইয়াছিলেন এবং জনৈক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া পুণ্যধামাদি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হন, তখন তাঁহার মনের যথেষ্ট বলাধান হইয়াছে জ্ঞান করিয়া লোকালয়ের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সাধুর নিতান্ত ভোগ-স্পৃহা ছিল না, যে যাহা শ্রদ্ধা করিয়া দিয়া যাইত, তদ্দ্বারা তিনি তৃপ্তি লাভ করিতেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে গমনাগমন করিতে হইত, তন্নিমিত্ত লজ্জাবরণস্বরূপ কৌপীন ব্যবহার করিতেন। এই কৌপীনগুলি বৃক্ষশাখায় রাখিয়া দিতেন। কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। ক্রমে ইঁদুরের উৎপাত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রত্যহ কৌপীনগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে লাগিল। সাধু নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে কৌপীন রক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, "সাধুজী! অন্য উপায় আর কি করিবেন? একটী বিড়াল আনিয়া রাখুন, তাহা হইলে ইঁদুরগুলি আপনি পলায়ন করিবে।" সাধু এই কথা সৎপরামর্শ জ্ঞান পূর্ব্বক গ্রাম হইতে একটী বিড়ালশাবক

আনয়ন করিলেন এবং সেইদিন হইতে তাঁহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

বিড়াল পুষিয়া যদিও ইঁদুরের উপদ্রব স্থগিত হইল বটে, কিন্তু সাধুর আর একটী নূতন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধু কোনদিন ফল-মূল এবং কোনদিন অন্নভোজন করিতেন, কোনদিন বা উপবাস করিয়া কাটাইতেন। কিন্তু বিড়াল আনাবধি তাহার জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ অন্ন প্রস্তুত করিতে হইত। কেবল তাহা নহে, সে শুদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার জন্য তাঁহাকে লোকালয় হইতে দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে হইত। প্রত্যহ দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে দেখিয়া লোকেরা কহিল, "সাধুজী! বিড়ালের জন্য যখন নিত্য দুগ্ধের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া তাহা সঞ্চয় করা অপেক্ষা একটী গরু পুষিলে ভাল হয় না? বিশেষতঃ প্রত্যহ ভিক্ষাই বা দেয় কে?" সাধু এই পরামর্শটী অবস্থাসঙ্গত জ্ঞান করিয়া পরদিন একটী গাভী আনয়ন করিলেন এবং তদবধি দুগ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল। তিনি নিজে দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন এবং বিড়ালটীও প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে লাগিল। কিন্তু নব নব চিন্তা আসিয়া সাধুকে অধিকার করিল এবং নব নব কার্য্যের নিমিত্ত তাহাকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত হইতে হইল। কখন গরুর বিচালির জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া, কখন গরুর ভূষি ও খোলের ব্যবস্থা করা, কখন গোয়ালঘর পরিষ্কার করা এবং কখনও ঘুঁটে দেওয়া, এইরূপে সাধুজীকে অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতে হইত। ক্রমে গাভীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং দুই তিনটী এঁড়ে গরুও জন্মিল। তখন সাধুর এক গোয়াল গরু হইল। ইতিপূর্ব্বে গরুর সেবাদির নিমিত্ত তাঁহাকে ভৃত্য রাখিতে হইয়াছিল। গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ভৃত্যের সংখ্যাও

বাড়িয়া গেল। দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা সাধু গাভীর ও অন্যান্য ব্যয়াদি সঙ্কুলান করিতেন। একদিন গ্রামের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, "সাধুজী! আপনার যথেষ্ট লোকজন আছে, তিনটী এঁড়েও দেখিতেছি, আর এই জঙ্গল, আপনি কিছু কিছু চাষ করুন। তদ্দ্বারা প্রচুর ধান হইবে, আপনার খরচ বাদে তাহা বিক্রয় করিলে বেশ দশ টাকা লাভও হইবে এবং গরুগুলির বিচালিও কিনিতে হইবে না।" তিনি পরদিন হইতে চাষ আরম্ভ করিলেন। প্রথম বৎসরে চাষের ফল দেখিয়া পর বৎসর হইতে অধিক জমি আবাদ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তিনি একজন ধনী হইয়া উঠিলেন। তখন সেই বন গ্রামে পরিণত হইল। বৃক্ষ মূলে পরিণত হইল। বৃক্ষমূলে বাস করা রহিত হইয়া তাঁহার অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। ধনের সম্বন্ধ হইলে যে সকল আনুষঙ্গিক কার্য্য হওয়া অনিবার্য্য, তাহাও ক্রমে সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইল। সাধুর তখন লোক, জন, দাস, দাসী, হাতী, ঘোড়া, নানাবিধ উপসর্গ জুটিল। একদিন ঐ সাধুর গুরু দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে শিষ্যকে দেখিবেন ইচ্ছা করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে বন আর নাই, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার দিক্ ভ্রম হইল নাকি? রাজপ্রাসাদবিনিন্দিত এ অট্টালিকা কাহার নির্ম্মিত হইয়াছে? পূর্ব্বে এ প্রকার বসতি কি এস্থানে ছিল? কোথায় আসিলাম চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারীকে ঐ বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঁ্যা হে বাপু! বলিতে পার এ বাড়ীটী কাহার? আমার সংস্কার এই যে, এস্থানে বন ছিল এবং বনের ভিতরে একটী সাধু বাস করিতেন।" কর্ম্মচারী কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, সম্প্রতি সেই সাধু মহারাজ এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তিনিই এই নগর স্থাপন করিয়াছেন।"

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সাধু কোথায়?" কর্ম্মচারী কহিল, "তিনি এখন বৈঠকখানায় কাছারী করিতেছেন।" গুরু তাহাকে অন্য প্রশ্ন না করিয়া গম্ভীরভাবে বাটীর ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক শিষ্যের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। শিষ্য সহসা গুরুকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে আপন আসন ত্যাগ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। গুরু শিষ্যের অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! একি?" শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে অতি লজ্জিত হইয়া মস্তকাবনত পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভু! আর বলিব কি! এক কোপীন্ কো ৱাস্তে, আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে।"

সাধারণ সংসারী বদ্ধ-জীবের অবস্থা অবিকল এইরূপ। বন্ধনের উপর ক্রমান্বয়ে বন্ধন পতিত হইয়া পরিশেষে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাধীনাবস্থায় পতিত হয়। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত গৃহীত হউক। মনে করুন, এই বালক ভূমিষ্ঠ হইল। সে তখন বন্ধন বা উপাধি-বর্জ্জিত। তাহার মনে তখন কোন বস্তুর নিমিত্ত আসক্তির সঞ্চার হয় নাই। ক্রমে শরীরের জন্য অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদিতে কাতর হইলে তাহার মাতার মুখাপেক্ষী হইতে শিক্ষা করিল। মাতৃ-ভাব প্রথম বন্ধন স্বরূপ, ক্রমে পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব-রূপ বন্ধন পর্য্যায়ক্রমে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ বন্ধনের সহিত বাহ্য জগতের নানাবিধ ভাব শিক্ষাও বন্ধনস্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। শিশু বয়োবৃদ্ধি লাভ করার সহিত নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে কিশোরকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থায় উপস্থিত হয়। সেই সময় কামিনীকাঞ্চনের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় পূর্ব্ব বন্ধনের উপরে দৃঢ় বন্ধন পতিত হইয়া যায়। তখন তাহার কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু আমরা সকলেই প্রাণে প্রাণে তাহা বুঝিয়া থাকি। এই কামিনী-কাঞ্চনরজ্জুর স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। যত দিন যায়, ইহার বন্ধন-শক্তি ক্রমে

দৃঢ়ীভূত হইয়া আইসে। ক্রমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহারা বন্ধনের পুষ্টি-সাধক স্বরূপ। সন্তানদিগের বিবাহাদির দ্বারা সেই বন্ধন আরও বর্দ্ধিত হয়। পরে তাহাদের সন্তানাদি হইলে, বাস্তবিক বন্ধনের চূড়ান্ত হইয়া আইসে। ঠাকুর বলিতেন যে, যেমন ছেলেরা দোর কাটাকাটী খেলার সময়ে বলে, এ দোরটা কাটৃব, যাহারা হাত ধরাধরি করিয়া দ্বারস্বরূপ হয়, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠে, ঝাঁটা ফেলে মারৃব। সে পুনরায় আর একদিকে যাইয়া বলে, এ দোরটা কাটৃব, আর একজন অমনি বলিয়া উঠে, কাটারি ফেলে মারৃব—সেইরূপ বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। তাহার সে অবস্থায় বাস্তবিক কোনদিকে নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবার একেবারে শক্তি থাকে না। যেমন, শিশু আপনি কোনদিকে চলিয়া যাইতে চাহিলে পিতামাতা তাহার গতিরোধ করেন, অন্যান্য কার্য্যে তেমনি যাহার যে পরিমাণে সম্বন্ধ আছে, সে অবশ্যই তাহার সেই পরিমাণে প্রতিবন্ধক প্রদান করিয়া থাকে। একজন কামিনীকাঞ্চনসংযুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, কামিনীকাঞ্চন কি তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিবে? ছাড়িবে কি? একপদ অগ্রসর হইবার তাহার অধিকার থাকে না। সুতরাং বদ্ধজীবেরা যে ভাবরূপ সূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাহাদের নিকট সেইরূপ ভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোটের উপর কামিনীকাঞ্চনের দাসত্ব করাই বদ্ধজীবের কার্য্য। তাহারা কামিনীকাঞ্চন ব্যতীত সংসারে আর কিছু বস্তু বুঝিতে পারে না, কামিনী-কাঞ্চনই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান এবং ইষ্টবিশেষ। কামিনী-কাঞ্চন পৃথিবীর সার পদার্থ, যে তাহাতে বঞ্চিত হয়, বা যাহার অদৃষ্টে তাহার সম্বন্ধ স্থাপন না হয়, তাহাদের পশু বলিয়া গণনা করে। এই অবস্থা হইতে যাহাদের পরিমুক্তি লাভের জন্য ইচ্ছা হয়, যাহারা

সাংসারিক বন্ধনের ভয়ে দূরে পলায়ন করিতে যত্নবান্ হয়, তাহাদের মুমুক্ষু জীব কহে। মুমুক্ষু জীব বদ্ধজীবের দ্বিতীয়াবস্থা মাত্র। মুমুক্ষু জীবেরা স্থূল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অন্তর দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। যখন তাঁহারা আপনার ভিতরে কি হইতেছে দেখিতে যান, তখনই তাঁহারা আতঙ্কে উন্মাদবৎ হইয়া পড়েন। তখনই বন্ধনের উপর বন্ধন অন্তরদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন এবং তন্নিমিত্ত উহা ছেদনের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। পিতামাতাদির বন্ধন কিসের জন্য, তাহা তখন তাঁহাদের জ্ঞান হয়, কামিনীকাঞ্চনের বন্ধন কিসের জন্য, তাহাও তখন তাঁহাদের জ্ঞান হয়, সন্তানাদির বন্ধন কিসের জন্য, তাহাও তখন তাঁহাদের জ্ঞান হইয়া থাকে।

সংসারের রহস্য ভেদ করিবার জন্য যখন যাঁহার মনে বাসনার সঞ্চার হয়, তখনই তাঁহার এই অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই অবস্থা বদ্ধ হইলেও হয় এবং অনেক স্থলে তাহার পূর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায়। কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ হইবামাত্র কেহ তাহার রহস্য বুঝিয়া থাকেন এবং কেহবা অপরের দুরবস্থা দেখিয়া আপনাপনি তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করেন। এই নিমিত্ত কুমার সন্ন্যাসীরা মুমুক্ষু-জীব শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

কথিত হইল, বদ্ধ এবং মুমুক্ষু, জীবের অবস্থাবিশেষ মাত্র। এক ব্যক্তি এই বদ্ধ রহিয়াছেন, পরক্ষণেই তাঁহাকে মুমুক্ষু শ্রেণীতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিলে হয় না অথবা কাহারও দেখিয়া শুনিয়াও হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তির আপনাকে আপনি জানিতে ইচ্ছা হয়। অমুকের পুত্র আমি, অমুকের স্বামী আমি, কি অমুকের পিতা আমি, এপ্রকার জানা নহে। আমি কি, কে, জড় দেহ আমি, না এই দেহের চেতনস্বরূপ যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আমি,

অথবা অন্য কোন বস্তু আমি, এই প্রকার বিচার করিতে যখন কাহার মন ধাবিত হয়, তখন তাঁহাকে আর কিছুতেই বদ্ধ রাখিতে পারে না। তখন তাঁহার অন্তর্জ্ঞান সঞ্চার হইবারও সুরাহা হয়। যেমন বদ্ধ হইবার সময় লোকে অনায়াসে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, মুমুক্ষুর ভাব সঞ্চার হইলে তদ্বিষয়েও সেইপ্রকার সর্ব্ববিধায় সুবিধা হয়। বদ্ধেরা যেমন বদ্ধ হইবার কালে কামিনীকাঞ্চন ভাবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হন, মুমুক্ষুরাও তাহা হইতে মুক্ত হইবার সময়ে সেই ভাবের অপকৃষ্টতা দিব্যচক্ষে দর্শন করেন।

একদা কোন বদ্ধজীব এক সাধুর নিকটে ঐশ্বরিক কথা শ্রবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। সাধু তৎসময়ে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছিলেন। বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কখন সাধু নহেন। আপনি পরম পবিত্র সাক্ষাৎ দেবদেবীস্বরূপ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিতেছেন, ইহা যারপরনাই অন্যায়, অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক কথা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পিতামাতারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যাঁহাদের দ্বারা জগৎ দেখিলাম, যাঁহাদের যত্নে এবং কৃপায় জ্ঞানাদি উপার্জ্জন করিলাম, যাঁহাদের ন্যায় স্নেহবান ও স্নেহবতী আর ইহলোকে কেহ নাই, এমন পবিত্র পিতামাতাকে পর জ্ঞান করাইয়া দেওয়া কখন সাধুর কর্ত্তব্য নহে।" সাধু ঈষৎ হাসিয়া অতি মিষ্ট ভাষায় কহিলেন, "বাপু! তুমি যাহা বলিলে, সে সকল কথা আমি জানি। আমিও বাপু, পিতামাতার ঔরসজাত, বৃক্ষে ফলিত হই নাই, অথবা মৃত্তিকাগর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই। শাস্ত্রে মাতাপিতার সেবার উল্লেখ আছে, তাহাও সত্য, আবার বৈরাগ্য শাস্ত্রে তাহা পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহাও আমাদের কল্পিত নহে। যে শাস্ত্রে সংসার করিতে

বলিতেছেন, সেই শাস্ত্রে তাহা পরিত্যাগের ব্যবস্থাও আছে। ইহার অর্থ কি? অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা জানিবে। পিতামাতা কিম্বা স্ত্রী-পুত্র বদ্ধজীবের সর্ব্বস্ব, যেহেতু তাহারা তাহাদের ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া থাকে। সে ভাব অতিক্রম করিয়া যাইবার কাহারও শক্তি হয় নাই। শিক্ষক শিক্ষা দিতে পারেন বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। ছাত্র শিক্ষা না করিলে অথবা তাহার শক্তি না থাকিলে শিক্ষক কি করিবেন? সেই প্রকার বদ্ধাবস্থায় যে প্রকার কার্য্য করা প্রয়োজন, শাস্ত্রে তাহাদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার যাহারা মুমুক্ষু, তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে। কাহার কি ব্যবস্থা, তাহা গুরু বলিয়া দেন। যেমন ঔষধের পুঁথী দেখিয়া রোগী যদ্যপি ঔষধ বাছিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী; চিকিৎসক রোগীর ঔষধ ব্যবস্থা-কর্ত্তা। অতএব শ্রবণ কর, সংসারে কেহ কাহার নহে, সম্বন্ধসূত্রে যে যাহাকে যাহাই বলুক, তাহা মায়া মাত্র।" সেই ব্যক্তি অতঃপর কহিলেন, "মহাশয়! আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি জানি আমার পিতামাতাকে, তাঁহাদের ভালবাসা মনে হইলে আমি চতুর্দ্দিক অমৃতময় দেখি; আমি জানি আমার স্ত্রীর কতদূর স্বার্থশূন্য প্রণয়, সাধুজী! তাহার তুলনা নাই। আহা! বালক বালিকাদিগের কি অনুরক্ততা! আমায় দেখিয়া যখন অর্দ্ধস্ফুট-বাক্যে বাবা বলিয়া বাহু প্রসারণ করে, সে সুখের কথা সাধুজী কি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছেন? কখন না। এমন সংসার আপনি মায়া বলিয়া আমায় কুসংস্কারজালে আবদ্ধ করিতেছেন। আমি আপনার একথা মানিব না, কখন শুনিব না এবং আপনাকে অনুরোধ করি, এমন নিদারুণ কথা কখন আর কাহাকেও বলিবেন না। আপনারা সংসার-বিদ্বেষী, ভারতবর্ষের ইহা চিরকালের কুশিক্ষা, আপনারা শিক্ষা করিয়া

থাকেন এবং তাহাই প্রচার করেন। এ সকল শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? ভগবানের কথা বলিবেন, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিবেন, তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট হইবে। আমার একটা গল্প স্মরণ হইল। কলে পতিত হইয়া কোন শৃগালের লেজ কাটিয়া গিয়াছিল, সে অন্যান্য শৃগালের লেজ দেখিয়া বলিয়াছিল, 'ভাইরে, আহা! তোদের দুঃখে আর আমার নিদ্রা হয় না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোরা কত কষ্টে লেজ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিস্। অমন ক্লেশ আর নাই। আমার পরামর্শ শুন, এখনি সকলে লেজ কাটিয়া ফেল। তোরা না পারিস্, আমি দাঁত দিয়া তোদের লেজ কাটিয়া দিতেছি।' আপনার সংসার ছাড়ান উপদেশ তদ্রূপ হইতেছে।" সাধু তখন কহিলেন, "বাপু! তুমি সুরসিক-পণ্ডিত, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লও যে, বাস্তবিক আপনার কে?" সাধুর এই কথায় তিনি সম্মত হইলেন। তদনন্তর সাধু বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাপু! আমি যেরূপ আদেশ করিব, তুমি সেইরূপ করিবে প্রতিজ্ঞা কর।" তিনি তাহাই করিলেন। সাধু কহিলেন, "তুমি একটা ব্যাধির ভাণ করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক অচেতনবৎ পতিত থাকিবে; সাবধান! তোমার পিতার আর্ত্তনাদে, মাতার এবং স্ত্রীর হৃদয়ভেদী সকরুণ রোদনে যেন আত্মবিস্মৃতি না হয়। পরে যাহা হয়, আমি করিব।" এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ঐ বদ্ধজীব সাধুকে কহিলেন, "মহাশয়! আমি সত্যের দাস। সত্য কি তাহা আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি এবং অদ্য আপনাকেও তাহা বুঝাইব, এই নিমিত্ত আপনার কথাপ্রমাণেই আমি পরিচালিত হইব। আমায় যদ্যপি অদ্য নূতন কিছু না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে অদ্য আমার নিকটে কামিনীকাঞ্চনমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। একথা আপনি স্বীকার করেন কিনা?" সাধু তাহাতে সম্মত হইলেন।

এই ব্যক্তি অনতিবিলম্বে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক 'বুক্ যায়, বুক্ যায়' বলিয়া একেবারে স্পন্দনরহিত হইয়া পতিত হইলেন। এই বিভীষিকায় পরিজনেরা সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহসা মূর্চ্ছিতাবস্থা শ্রবণ করিয়া উন্মাদবৎ নিকটে আসিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে, মৃদু মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে বটে, কিন্তু একেবারে অচেতন। কতবার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা আসিয়া যখন 'কি হ'লোরে বাবা', বলিয়া মৃত্তিকায় আছাড় খাইয়া পড়িলেন, তখন বৃদ্ধও সেই সঙ্গে অনলে অনিল সহায়তার ন্যায় যোগদান করিলেন। অভাগিনী জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, স্বামীর বিয়োগবার্ত্তা কর্ণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র উন্মাদিনীর ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে 'আমায় রাখিয়া কোথায় গেলে,' বলিয়া স্বামীর চরণপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল ক্রন্দনের হিল্লোল চলিল। এমন সময়ে সাধুজী উপস্থিত হইলেন। সাধুকে দর্শন করিয়া সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না এবং তিনি কি বলেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য সকলে এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাধু কহিলেন, "আমি এই ব্যক্তির যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে ইহার জীবনের কোন প্রত্যাশা নাই।" অমনি সকলে অতি উচ্চৈঃস্বরে 'কি সর্ব্বনাশ হলো রে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সাধু সকলকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "একটী কথা আছে, শ্রবণ কর। আমি গুরুর কৃপায় মরা মানুষ বাঁচাইতে পারি, কিন্তু সাবধানে তোমরা আমার কথা বুঝিয়া লও। ইহার প্রাণ নাই, যদ্যপি তোমরা কেহ প্রাণ দিতে পার, তাহা হইলে আমি ইহাকে এক্ষণি বাঁচাইয়া দিতে পারি।" সকলেই জড়সড় হইয়া পড়িলেন। সাধু বৃদ্ধকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কর্ত্তা মহাশয়! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আর অধিক দিন যে ভবলীলা চলিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্পই বোধ হইতেছে, যদ্যপি পুত্রের হিতার্থে প্রাণ দিতে হয়, তাহা হইলে আপনি তাহা পারিবেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিরুত্তর থাকিলেন যে! অধিক সময় নাই জানিবেন। ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইলে আমার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িবে।" তখন বৃদ্ধ কহিলেন, "সাধুজী! কথাটা অতিশয় গুরুতর, সহসা কিরূপে প্রত্যুত্তর দিতে পারি? প্রাণ দেওয়া—তাইত, করি কি? সময় না পাইলে আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফলে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর দেখুন সাধুজী, সকলই মায়া, কেহই কাহার নহে।" সাধু কহিলেন, "মহাশয়! বলেন কি? এই যে একদণ্ড পূর্ব্বে আপনি পুত্রের নিমিত্ত কত হায় হুতাশ করিতেছিলেন! আর প্রাণ দেওয়ার কথা হইতেই অমনি সমুদায় মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেন? মহাশয়! কথাটা ভাবিয়া দেখুন, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র, পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনক্ষম যুবাপুরুষ, আপনার কুল-প্রদীপস্বরূপ, বিশেষতঃ আপনার বিশেষ বাধ্য; এমন সন্তানের জন্য আপনি প্রাণ দিতে অশক্ত হইতেছেন?" বৃদ্ধ আর কোন কথা না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর সাধুজী বৃদ্ধাকে কহিলেন, "বাছা! তুমি পুত্রের জন্য অবশ্যই প্রাণ দিতে পারিবে।" বৃদ্ধা পূর্ব্ব হইতেই এই কথা লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। তিনি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ছেলের জন্য মাতার প্রাণ দেওয়া—এ তো নূতন কথা। স্বামীর জন্য স্ত্রীলোকেরা প্রাণ দেয় বটে, তবে একথা বধূমাতাকে না বলিয়া আমায় বলিতেছেন কেন? আমি

মরিব কেন? আমার একটী পুত্র হইলে যাহা হয় একবার ভাবিয়া দেখিতাম। শত্রুমুখে ছাই দিয়া আমার সাতটী পুত্র, আমার চাঁদের হাট রহিয়াছে। দেখুন, আমি যদি প্রাণ দিয়া মরিয়া যাই, আমার স্বামীর নিতান্ত ক্লেশ হইবে। আমি কাছে না থাকিলে তাঁহার আজও আহার পর্য্যন্ত হয় না, আমি তাঁহাকে ক্লেশ দিয়া কেমন করিয়া মরিব? একথা আপনি বৌমাকে বলুন। বৌমা আমার বড় সতীলক্ষ্মী, অমন পতিভক্তি আজকালকার মেয়েরা জানে না।" সাধু মৃদু হাস্যে বধূমাতাকে কহিলেন, "হ্যাঁগা বাছা! তুমি তবে তোমার স্বামীর জন্য প্রাণ দাও।" বধূমাতা বলিলেন যে, "স্বামীর জন্য প্রাণ দেওয়া ভাগ্যের কথা। স্ত্রীলোকের বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে মঙ্গলদায়ক, কিন্তু তাহাতে আমার কি হইবে? আমি মরিয়া যাইব এবং আমার স্বামী জীবিত হইবেন। উনি কালই আবার বিবাহ করিবেন, আমার অলঙ্কার, আমার ঘর, আমার সামগ্রী তাহাকে দিবেন। আমার ছেলেরা বিমাতার চক্ষের শূল হইবে। উনিও ক্রমে ছেলেদের পর হইয়া যাইবেন। সাধুজী, আমি প্রাণ দিতে পারিব না। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে," এই বলিয়া তিনিও প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন সেই ব্যক্তির ভ্রম বিদূরিত হইল, তখন তিনি সংসারের আভ্যন্তরিক রহস্য বুঝিতে পারিলেন, তখন পিতা, মাতা, স্ত্রীর সম্বন্ধ কতদূর জ্ঞাত হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, কি সূত্রে এতদিন আবদ্ধ ছিলাম! তিনি তদনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া সাধুর চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু! আপনি আমার গুরু, আপনার কৃপায় আজ আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। যে সূত্রে, পিতা, মাতা, স্ত্রীর সহিত আবদ্ধ ছিলাম, অদ্য তাহা নিশ্চয় বিচ্ছিন্ন

হইয়াছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, পিতার সম্বন্ধ তিনি আপনি ছেদন করিয়াছেন, মাতার সম্বন্ধ—তিনিও আপনি ছেদন করিয়াছেন এবং স্ত্রীর সম্বন্ধও সে আপনি ছেদন করিয়াছে; সুতরাং আমি সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত, একথা না বুঝিব কেন? অতএব প্রভু, চলুন আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলিয়া তিনি সাধুর পশ্চাৎগামী হইলেন। এই ব্যক্তির প্রথমাবস্থা বদ্ধ, সাধুর কথায় তর্কচ্ছলে হইলেও পরীক্ষাবস্থা মুমুক্ষু, এবং শেষাবস্থাকে মুক্ত বলা যায়। এই প্রকার ছবি সংসারে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কেহ বন্ধনের উপর বন্ধন দিতেছেন এবং কেহ তাহা ছেদন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং কেহ মুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। যদ্যপি ইহাদের লইয়া বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা কি বুঝিব? এক জাতীয় নরনারীর এ প্রকার ভাব-বৈপরীত্য হয় কেন? একজনকে বৈরাগ্য বুঝান যায় না, বৈরাগ্যের কথা তাঁহার নিকটে বলিলে তিনি রহস্য করিয়া উড়াইয়া দেন, অথবা লগুড় লইয়া পশ্চাৎ ধাবিত হন এবং কেহ তাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। কেহ সংসার ছাড়িয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন এবং কেহ সংসারে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামিনী কাঞ্চনের পদসেবা দ্বারা দিনযাপন করেন, ইহার অবশ্যই আভ্যন্তরিক অর্থ আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

কথিত হইয়াছে যে, বদ্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত, জীবের অবস্থান্তরের কথা। কাহার কোন্ সময়ে এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তাহা জীবের অগোচর বিষয়। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় লালাবাবুর বৃত্তান্ত তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি একদিন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতি পরিবেষ্টিত

থাকিয়া বদ্ধ জীবের অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনিই এক কথায় সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের বনে বনে বিহার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এক পয়সার বন্ধন কতদূর তাহা বিষয়ীরা জানেন, এক টাকার বন্ধন তাহাপেক্ষা কত কঠিন, তাহাও বিষয়ীরা জানেন, একশত টাকার বন্ধনের কথাই নাই, হাজার লক্ষ হিসাবের অতীত বিষয়। লালাবাবুর বিষয়ের বন্ধন কি পরিমাণে ছিল, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে অর্থের জন্য বিষয়ীরা না করেন কি, যে অর্থের অনুরোধে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ হয়, যে অর্থের নিমিত্ত পিতা-পুত্রে বিরোধ হয়, যে অর্থের নিমিত্ত রাজায় রাজায় কলহ হয়, যে অর্থের নিমিত্ত রক্তারক্তি হয়, কাটাকাটি হয়, যে অর্থের নিমিত্ত বন্ধুত্ব বিলুপ্ত হয়, যে অর্থের নিমিত্ত আমরা পরপাদুকা বহন করি, যে অর্থের নিমিত্ত আমরা অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করি, সেই অর্থকে লালাবাবু কাকৃবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অর্থ হইতে তিনি নিঃস্বার্থ হইয়াছিলেন, সেই অর্থে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

বৃন্দাবনে যখন তিনি বাস করিতেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রজবাসীরা অধিক পরিমাণে ভিক্ষা দিতেন, তিনি তদ্দর্শনে বুঝিলেন যে, পূর্ব্ব বিষয়-সম্বন্ধ অদ্যাপি যায় নাই। আমি লালাবাবু, এই নিমিত্ত ইহারা আমায় অন্যান্য ভিক্ষুক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্ব ভাব বিশেষ রহিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিনান্তে গোময় ধৌত করিয়া অজীর্ণ শস্য যাহা কিছু পাইতেন, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তন করা যায়। লালাবাবুকে দেখিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, কাহার কখন্ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার কথা, তাহা কাহারও জ্ঞাতব্য বিষয় নহে। কিন্তু এ প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়া প্রত্যক্ষ বিষয়।

যেমন সুখ এবং দুঃখ মনুষ্যের অবস্থাবিশেষ, বদ্ধ এবং মুক্তও সেইরূপ জানিতে হইবে। সুখ এবং দুঃখের সময় যেমন সুখ ও দুঃখ ভোগ করা যায়, সেই প্রকার বদ্ধ এবং মুক্তাবস্থায় অবস্থাগত ভাবে সকলেই পরিচালিত হইয়া থাকে। যে যখন যে অবস্থায় থাকে, সে তখন সেইরূপই কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

কোন স্থানে একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহার অশেষগুণ-সম্পন্না সহধর্ম্মিণী ছিল। ভদ্রলোকটী ঘোর বিষয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর স্বভাব অতিশয় উদার এবং ধর্ম্মকর্ম্মে নিতান্ত অনুরাগ ছিল। স্বামীর জন্য যদিও সর্ব্বদা প্রাণ ভরিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না, কিন্তু সাধুভক্ত দেখিলে সুবিধামত তাঁহাদের সেবাদি করিতে ত্রুটি করিতেন না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বামীর নিকট কটুকাটব্যও শুনিতে হইত। কালক্রমে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মিল। পুত্র জন্মিবার পর উক্ত ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি আরও অধিক অনুরক্ত হইলেন। স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসার প্রশ্রয় লইয়া ইচ্ছামত দান বা সাধুসেবাদি করিতেন, ইহাতে স্বামী বিরক্ত হইলেও তিনি তাহা শুনিতেন না। দৈববশতঃ তথায় কোন সন্ন্যাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসিনী সর্ব্বদা ভজনাদি করিতেন। তাঁহার সঙ্গীত-শক্তি এবং ভক্তির প্রভাবে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। পাড়ার মহিলাগণ আসিয়া ক্রমে যোগ দিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে সঙ্কীর্ত্তনের হিল্লোলে রাজ-পথে লোকারণ্য হইয়া যাইত। ঐ ব্যক্তি এই সকল ঘটনা দেখিয়া একদিন তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন যে, "দেখ, তুমি কি মনে করিয়াছ? আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া কি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে? তুমি আর আমাকে সেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি কর না, আর আমার সেরূপ সেবাদি করিতে চাহ না, সন্ন্যাসিনী মাগী যে পর্য্যন্ত আসিয়া

জুটিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত তোমারও অবস্থান্তর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন ঘরের ভিতরে দুইজনে যাহা হয় করিতে, আমি কিছুই বলি নাই, কিন্তু পাড়ার যত পুরাতন দুশ্চরিত্রা, যাহারা আমার বাটীর নিকট দিয়া যাইতে পারিত না, তুমি তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া যাত্রার দল বসাইয়াছ। বেশ হইয়াছে, বাঙ্গালীর স্ত্রীলোকেরা এতদিনের পর একটা পন্থা শিক্ষা করিল। যাহা হউক, এখন আমি না হইলেও তোমার চলিবে, আমি তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। এক্ষণে তুমি পরিষ্কার করিয়া আমায় বল, আমায় চাও—কি ঐ বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনীকে চাও? অন্য কথা শুনিব না, এই দুইটীর যাহা হয়, বল। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, তোমাকে আমার স্ত্রী হইয়া থাকিতে হইবে। এক্ষণে চক্ষু ফুটিয়াছে, সাথী জুটিয়াছে, ভাবনা কি?" স্ত্রী অধোবদনে অশ্রুপূর্ণলোচনে পতির প্রমুখাৎ নিদারুণ বাক্যাঘাতে ক্লেশ পাইতেছিলেন, স্বামী নিস্তব্ধ হইলে তিনি অতি বিনয় সহকারে কহিলেন, "আমার প্রতি তুমি এত নিষ্ঠুর হইয়াছ কেন? তুমি আমার পতি, তোমার মুখে কি এই সকল কথা শোভা পায়? ছি! ছি! অমন কথা বলিও না। আমি যেমন ছিলাম, তেমনিই আছি, নূতন আর কি হইয়াছি? সন্ন্যাসিনী মা তোমায় বড় ভালবাসেন, তোমার ছেলে নন্দগোপালকে তিনি একদণ্ড না দেখিতে পাইলে বড় চিন্তিত হন। সে তাঁহার গীত শুনিতে ভালবাসে। তুমি বিশ্বাস করিবে না, সন্ন্যাসিনী মা যখন গান করেন, নন্দগোপাল তাঁহার কোলে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকে। তাহার দুই চক্ষে গঙ্গা যমুনা ভাসিয়া যায়। দুধের বালক, ঠাকুর দেবতায় এত ভক্তি! মা বলেন, তিনি কোথাও এমন ছেলে দেখেন নাই। ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা শাস্ত্রে আছে, আর নন্দগোপালকে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। তাই পাড়ার লোকেরা অবাক্ হইয়া দেখে, আর মার গান শুনে। মার গানে

বাস্তবিক প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যে শুনে, সে কাঁদে, আমিও কাঁদি। মাকে বাটীতে স্থান দিয়াছ বলিয়া সকলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করে।” স্ত্রীর কথা শ্রবণপূর্ব্বক স্বামী কহিলেন, “যাহা বলিলে, তাহার কিছুই অর্থ নাই। কপট ব্যক্তিরা গান শুনিয়া কাঁদে, আমি তাহা দেখিয়াছি। আমি তোমার কোন কথা শুনিব না, তুমি এখনি মাগীকে বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিবে কি না? তুমি জান, আমি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পুরুষানুক্রমে আমাদের বাটীতে কখন এ প্রকার অসভ্যতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদায় মিথ্যা এবং ভণ্ডামী। আমি বেদ পুরাণ পড়িয়াছি, তাহা কেবল কাল্পনিক বর্ণনা মাত্র। তবে তোমায় অতিশয় ভালবাসিতাম, তুমি আব্দার করিতে, সেইজন্য কিছু বলিতাম না। কিন্তু আব্দারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তাহা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব যাহা বলিতেছি, তাহার যাহা ইচ্ছা কর।” স্ত্রী পুনরায় কহিলেন, “তুমি কেন অমন হইয়াছ? আমাদের প্রতি ভগবানের অতিশয় করুণা, সেইজন্য মার মত ভক্তিমতীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বাস্তবিক কল্যাণ হইবে। তিনি যে সকল গূঢ় তত্ত্ব বলেন, তুমি যদ্যপি একবার শ্রবণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত ঠিক এই প্রকার বলিবে।” স্বামী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, “দেখ! তোমার অতিশয় স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছে। আমায় এই ঘৃণিত কথা বলিতে তোমার সাহস হইল? না হইবে কেন? দুষ্টার সহবাসে স্বভাব-ভ্রষ্ট হইতে কতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন? যাহা হউক, আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই; আর তোমার উপর দয়া থাকিতে পারে না, আমি তোমার স্বামী, আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতেছি।” এমন সময়ে নন্দগোপালকে ক্রোড়ে লইয়া সন্ন্যাসিনী গান করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসিনী

উহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "আজ আমি পবিত্র হইলাম। আহা বাবা! তুমি ধন্য! এই কলিযুগে তোমার ন্যায় সৌভাগ্যবান আর কেহ নাই। অনেকের অর্থ থাকে, অনেকের বিষয় থাকে, অনেকের স্ত্রী থাকে, অনেকের পুত্র থাকে, কিন্তু এমন স্ত্রী এবং এমন পুত্র কখন আমি কোথাও দেখি নাই। হরিনামে এই দুধের বালক মেতে উঠে, একি সামান্য কথা! তোমার স্ত্রী সাক্ষাৎ ভক্তির প্রতিমা! তোমার মত পতি যাহার, তাহার অভিমান রাখিবার স্থান থাকে না। যাহার স্বামী দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনে, তাহার স্ত্রী অহঙ্কারে পৃথিবীকে সরা দেখে, লঘু গুরু মানে না, কিন্তু তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তোমার স্ত্রীর যেন দীন হীনার স্বভাব। যেন উহার কিছুই নাই। আমি দেখিয়াছি যে, লোকের নিকটে আত্মাভিমান প্রকাশের জন্য অনেকে গিল্‌টীর অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে, কিন্তু দেখ দেখি তোমার স্ত্রী মনে করিলে স্বর্ণ তুচ্ছ করিয়া হীরা মুক্তায় বিভূষিতা থাকিতে পারে। এ সকল সত্ত্বগুণের লক্ষণ জানিবে। তোমার সংসার হরির সংসার হইয়া উঠিয়াছে, তুমি বাবা সেইজন্য ধন্য!"

সন্ন্যাসিনীর কথা সমাপ্ত হইলে ঐ ব্যক্তি ঘৃণার ভঙ্গিতে কহিলেন, "বাছা! আর কিছু বলিবার আছে?" সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আর কি বলিব! আমি এই কয়েকদিন তোমার বাটীতে থাকিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমি স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি এতক্ষণ চলিয়া যাইতাম, তোমার নন্দগোপাল আমায় কোন মতে ছাড়িতেছে না। তোমরা উহাকে ভুলাইয়া লও, আমি প্রস্থান করি।" এই বলিয়া নন্দগোপালকে তাহার মাতার ক্রোড়ে প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু সে কোন মতে সন্ন্যাসিনীকে ছাড়িল না। তাহার পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া উপর্য্যুপরি প্রহার করিয়া বলিলেন, "তুই

এখনি আমার নিকট আয়, যদ্যপি কথা না শুনিস্, আমি আরও প্রহার করিব। এত অল্প বয়সে এত অবাধ্য, এ পর্য্যন্ত এমন ছেলে কেহ কখন দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ!" সন্ন্যাসিনী কাতর হইয়া কহিলেন, "তোমার কি হৃদয় নাই? আহা! এমন ছেলেকে প্রহার কর, এমন পিতা কোথাও দেখি নাই! তিন চারি বৎসরের শিশুকে কোন্ প্রাণে মারিতে ইচ্ছা হইল?" সে অভিমানী ব্যক্তি, তখন চীৎকার পূর্ব্বক সন্ন্যাসিনীকে কহিলেন, "তুমি এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর্ হইয়া যাও, যদ্যপি আপনি না যাও, আমি দ্বারবান দ্বারা অপমান করিয়া রাজপথে বাহির করিয়া দিব। ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলে, নির্ব্বোধ হতভাগিনীর জন্য অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছ। দয়া করিয়া কিছু বলি নাই, তাহার প্রশ্রয় বিধিমতে লইয়াছ। কুহকিনী তোমরা, কি গুণে দুগ্ধপোষ্য বালককে আয়ত্ত করিয়া আমার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? কিন্তু আমি সে ব্যক্তি নহি। আমি ডাকিনী মারিবার ঔধষ জানি। এখনও বলিতেছি, সৌজন্যতার অনুরোধে বার বার বলিতেছি, আমার বাটীর বহির্ভূত হও।" তাঁহার স্ত্রী আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে গলায় বস্ত্র দিয়া কহিলেন, "প্রভু! আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার চিরদাসী, অনেক সময় অনেক কথা বলিয়াছি, তুমি অবাধে তাহা শুনিয়াছ। তোমার কৃপায় আমি মাকে বাটীতে রাখিয়া তত্ত্বকথা শুনিয়াছি, তোমার কৃপায় আমি মাতার সহবাসে সংসারক্ষেত্রের আভ্যন্তরিক ভাব বুঝিয়াছি, আমি তজ্জন্য তোমার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তুমিই বাস্তবিক সহধর্ম্মিণীকে যাহা করাইতে হয়, তাহা করাইয়াছ। লোকে স্ত্রীকে কেবল ইন্দ্রিয়সুখে সন্তরণ দিতে শিক্ষা দেয়, লোকে স্ত্রীকে বাহ্যরসে ডুবাইয়া রাখে, লোকে স্ত্রীকে

পশুবৎ ব্যবহার করে, কিন্তু তুমি কেবল তাহা কর নাই, এমন সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় মাতার দ্বারা আমার গুরুর কার্য্য করাইয়াছ, এ প্রকার স্ত্রীর কল্যাণ কেহ করেন কি না, আমি তাহা জানি না। এক্ষণে আমার এই মিনতি, তুমি আমায় বিদায় দাও। তোমার সন্তানকে তুমি লালন পালন কর বা না কর, সে ইচ্ছা তোমার। কিন্তু আমার এই ভিক্ষাটী তোমাকে অবশ্যই দিতে হইবে। দ্বিতীয় মিনতি এই যে, আমি তোমার অনেক ক্লেশের কারণ হইয়াছি, তোমার সুস্থ চিত্তকে ব্যস্ত করিয়াছি, তোমার শান্তির ব্যাঘাত করিয়াছি, লোকালয়ে তোমায় লজ্জা দিয়াছি, সেইজন্য আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া সাধ্বী নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিষয়ীর মন যেরূপই কঠিন হউক, যতই বিক্রমসম্পন্ন হউক, স্ত্রীর নিকটে পরাজয় স্বীকার না করে, এমন কেহ নাই। স্ত্রীর মুখে বিদায়ের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অমনি বিষাদিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমায় এমন কথা বলিতে তোমার প্রাণে কিছুমাত্র বেদনা বোধ হইল না? স্বচ্ছন্দে যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিলে! অজ্ঞ কবিরা স্ত্রীজাতিকে কোমল বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু তোমরা লৌহ অপেক্ষা কঠিন! যদ্যপি কোন পদার্থ কঠিনতম থাকে, তাহা তোমরা। তোমার একটু বিবেচনা হইল না যে, আমি এই সংসারে কাহাকে লইয়া রহিয়াছি? নন্দগোপাল পুত্র বটে কিন্তু তুমি তাহার আকর। তুমি জাননা জাননা আমি তোমায় কত ভালবাসি! তুমি জাননা জাননা আমি তোমার জন্য কত সময় চিন্তা করি! তুমি জাননা জাননা আমি তোমার অসুস্থতা শুনিলে দশদিক শূন্যময় দেখি! তুমি জাননা জাননা আমি তোমার সুস্থ দেহের নিমিত্ত কল্যাণময়ের নিকট অবিরত প্রার্থনা করি! তুমি কি জাননা যে, আমি ঈশ্বর মানি না, আমার গতি-মুক্তির জন্য ভাবি

না, তাহা স্বপ্নেও স্থান দিই না, কিন্তু তোমার জন্য আমি বলি, যদ্যপি কেহ থাকেন, যদ্যপি দয়াময় কেহ থাকেন, তাহা হইলে আমার স্ত্রীর শরীর সুস্থ রাখিবেন। কিন্তু হায়! তুমি এমনি মমতাশূন্যা, পাষাণ-বৎ হিয়া ধারণ করিয়াছ যে, আমার জন্য তোমার একবার দয়া হইল না! আদর করিয়া তিরস্কারচ্ছলে যদিই কিছু বলিয়া থাকি, আমি তোমার হাতে ধরি, পায়ে ধরি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। যাবে কোথায়? কথাটা কি বজ্রাঘাত অপেক্ষা কঠিনতম নহে? একবার মনে ভাবিয়া দেখ দেখি, আমি বাটীর ভিতরে আসিলে কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইব? কে আমায় আমার বলিয়া কাছে আসিবে? মাতার সম্বন্ধ অনেক দিন তোমার জন্য ছেদন করিয়াছি, তিনি তদবধি ভ্রাতাদিগের নিকটে থাকেন, কখন আমায় ভুলিয়াও মনে করেন না। ভ্রাতাদিগের কথাই নাই। তুমি একাকিনী সমুদয় বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া নন্দ-গোপালকে লইয়া আনন্দে দিন যাপন করিবে বলিয়া তাহাদের সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছি। কাহারও বিষয় বন্ধক রাখিলে আমি তাহা কৌশলে, বলে, যে কোন প্রকারে হউক, আত্মসাৎ করিয়া তোমাকে প্রদান করিয়াছি। আমি তোমার জমিদারীর কর্ম্মচারীবিশেষ হইয়া রহিয়াছি। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি কে? তোমাকে ইন্দ্রাণী বলিলে সাজে, তোমাকে রাণী বলিলেও শোভা পায়। তোমার বাটী, তোমার গাড়ী ঘোড়া, তোমার লোকজন, তোমার জমিদারী, তোমার নন্দগোপাল এবং আমি তোমারি; তুমি যাইবে কোথায়? কে তোমাকে বিদায় দিবে? আমার মিনতি এই, তুমি আমায় রক্ষা কর, তুমি আমার প্রাণদান দাও।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর চরণ ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। স্ত্রী কিঞ্চিৎ স্থানান্তরে যাইয়া কহিলেন, "আমায় আর মায়াপাশে আবদ্ধ করিও না। তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য।

এতগুলি পাশে তুমিই আমায় বাঁধিয়াছিলে এবং তুমিই দয়া করিয়া তাহা অভয়ার জ্ঞান-অসির দ্বারা ছেদন করাইয়াছ। আমি এখন তোমার সে স্ত্রী নহি।" "তবে কাহার স্ত্রী হইয়াছ?" এই কথা বলিয়া সেই ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। তখন সেই তেজস্বিনী কহিতে লাগিলেন, "আমি আর তোমার স্ত্রী নহি। যে তোমার স্ত্রী ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। তুমি কথাটা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি মনে কর কি আমার দেহ তোমার স্ত্রী, না আমার আত্মা তোমার স্ত্রী? আত্মাকে দেখিয়া বিবাহ কর নাই। স্থূল দেহকেই স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। বলিতে পার যে, সেই স্থূল দেহ রহিয়াছে, তবে স্ত্রীত্ব বিলুপ্ত হইল কিরূপে? তুমি বুঝিয়া লও। মনে কর, আত্মা বাহির হইয়া যাইলে কেহ কি স্থূল দেহ গ্রহণ করে? না তাহাকে মৃত বলিয়া জাহ্নবী তীরে অগ্নির সহিত ভস্মীভূত করে? অতএব তুমি বুঝিয়া দেখ, সম্বন্ধ কাহার সহিত? স্থূল দেখিয়া সম্বন্ধ হয়, কিন্তু তাহাকে আপনার বলে না। আত্মার সহিত কস্মিন্‌কালে দেখা সাক্ষাৎ কাহারও হয় না, কিন্তু দেহ হইতে আত্মা বাহির হইয়া যাইলে, সে দেহকে শব বলে, আমি সেই শবাবস্থায় পড়িয়াছি। আমার প্রাণ আর প্রবোধ মানে না। আমার প্রাণ মাতার সহিত মিশাইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। আর প্রবোধ মানে না, আর চিন্তা স্থান পায় না, আমি কি করিব? আমায় বিদায় দাও, মাতার সঙ্গে, মাতার নিকট যাই। কোথায় অভয়া! কোথায় এলোকেশী! কোথায় মা আনন্দময়ী! কন্যাকে আর কতদিন পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিবে মা! মা চল মা, আর ধৈর্য্য মানে না, আর কুল চাহি না, আর বিষয় বৈভব চাহি না, আর পুত্র চাহি না, আর পতি চাহি না, আর লোকলজ্জায় প্রয়োজন নাই মা! চল মা চল। পতি! আমার যাহা বলিবার, আমি বলিলাম। মনে

করিতেছ, আমি পাগলিনী হইয়াছি? তাহা তোমার ভ্রম। তুমি কি জান না যে, আমার বাপ শিব পাগল, আমার মা অভয়া পাগলী, আমিও পাগলী, আমাদের পাগলের সংসার। বাবার চেলারাও পাগল, সব পাগল, পাগলের হাট বাজার।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তির স্ত্রী উন্মাদিনীর ন্যায় মা, মা, বলিতে বলিতে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে অমুকের স্ত্রী পাগলিনী হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল।

এই প্রকার ঘটনা আমরা প্রায় প্রতিনিয়ত সংসারে প্রত্যক্ষ করিতেছি। রামকৃষ্ণদেব সংসারের এইরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কহিতেন যে, নরনারীদিগের এ প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের হেতু এই—যাঁহারা পরকাল বলিয়া ভাবেন, অথবা পরকালের নিমিত্ত যাঁহাদের সর্ব্বদা অস্থির করিয়া তুলে, তাঁহারাই সংসার ত্যাগ করিয়া কাননবাসী হইয়া থাকেন, যাঁহাদের পরকালের চিন্তা না থাকে, তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্ত্রীবিহীন হইলেও পুনরায় পাকা চুলে কলপ লাগাইয়া, পড়া দাঁত বাঁধাইয়া দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তিদিগের যদ্যপি পরকালের ভয় থাকিত, তাহা হইলে কখন আত্মবিস্মৃতি হইত না। সে যাহা হউক, এক্ষণে কথা হইতেছে যে, পরকাল কাহাকে কহে এবং বাস্তবিক পরকাল বলিয়া কোন স্থান আছে কি না? রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, যেমন ধান পুতিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় এবং কালসহকারে বর্দ্ধিত হইয়া উহা হইতে ধান্যাদি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যে ধান সিদ্ধ করা যায়, তাহা আর কখন অঙ্কুরিত হয় না, সেই প্রকার যে নরনারী জ্ঞানাগ্নি দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিতে পারে, তাহার আর জন্ম হয় না। জ্ঞান জন্মিলেই তাহার শেষ জন্ম বুঝিতে হইবে। তিনি আরও বলিতেন

যে, ভগবানের নামে যাহার প্রেমোদয় হয়, তাঁহার নামে যাহার শরীর কণ্টকিত হয়, তাঁহার নাম বলিতে বলিতে যাহার চক্ষে ধারা বহিয়া যায়, তাহাকে আর জন্মিতে হয় না, সেই তাহার শেষ জন্ম।

রামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশের তাৎপর্য্য বাহির করিলে আমরা কি বুঝিব? পরকাল বলিলে অন্যত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে না। এই পৃথিবী তাহার স্থান। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাই যে, পদার্থদিগের বিনাশ নাই। কাহারও মৃত্যু হইলে যদিও আত্মার পরিণাম আমরা দেখিতে পাই নাই বা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু দেহের পরিণাম আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাই এবং বুঝিতে পারি যে, শরীর ভস্মীভূত করা হউক, বা তাহা মৃত্তিকার সংস্রবে রাখিয়া কালে বিকৃত করাই হউক, শারীরিক পদার্থনিচয় যোগভ্রষ্ট হইয়া নব নব যৌগিকাকার লাভ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে মৃত্তিকার দ্বারা বৃক্ষাদিতে শোষিত হইয়া থাকে এবং কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্য ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমরা যখন মাতৃগর্ভে থাকি, তখন মাতার শোণিত দ্বারা আমাদের দেহ সংগঠিত হয়। মাতৃ-শোণিত আহারীয় পদার্থ হইতে জন্মিয়া থাকে। আহারীয় পদার্থসকল উদ্ভিদ এবং জান্তবরাজ্য হইতে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। মৃত্তিকা এবং বায়ু হইতে ইহাদের পুষ্টিসাধন হয়, ফলে জীবদেহের পদার্থসকল পুনরায় জীবদেহ সংগঠনের উপযোগী হইবার নিমিত্ত বিশ্বপিতার এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম চলিয়া যাইতেছে। আমরা ভূমিষ্ঠ হইলে আমাদের পক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আমাদের স্থূল শরীর যোগভ্রষ্ট হইয়া এই পৃথিবীতে থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আত্মা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আত্মা বিচার করিতে হইলে, কোন শক্তিবিশেষ লইয়া আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যেহেতু আত্মা স্থূলে দেখিবার সামগ্রী নহে।

যেমন জড় জগতে জড় পদার্থসকল জড় শক্তির দ্বারা অবস্থান্তর, রূপান্তর কিম্বা ভাবান্তর প্রাপ্তকালে শক্তিরও অবস্থান্তর বা ভাবান্তর হয়, কিন্তু তাহার বিনাশ হয় না; যেমন একখানি হাতা অগ্নিতে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া ধরিলে জল গরম হইয়া উঠে, কিম্বা ভাত রাঁধিবার সময় ঠাণ্ডা জল ঠাণ্ডা চাউল অগ্নির দ্বারা উষ্ণ হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা এক পদার্থের উত্তাপ অপর পদার্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে মাত্র; যেমন হাতার উত্তাপ জলে যাইলে তাহা ঠাণ্ডা হয়, কাষ্ঠ পুড়িয়া যাইলে তাহার উত্তাপে ভাত হয়; সেই প্রকার চৈতন্য-শক্তি দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমান্বয়ে গতিবিধি করিয়া থাকেন। যেমন জড়শক্তি পদার্থ হইতে বিয়োগ কালে নিকটে অপর পদার্থ পাইলে তাহা আশ্রয় করে, আশ্রয় ব্যতীত তাহা থাকিতে পারে কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই, সেই প্রকার চৈতন্য-শক্তি হয় জড় দেহরূপ পদার্থবিশেষে, না হয় পরম পদার্থ পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই চৈতন্য-শক্তি যতদিন জড়-পদার্থে জড়ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করেন, ততদিন ইহকাল; পরমেশ্বরে বা স্বস্বরূপে যাইলেই পরকাল কহা যায়।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আত্মা বিশ্বাস করিলে পরকালও বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহকাল ব্যতীত পরকাল বিশ্বাস করেন না এবং তাহার প্রয়োজনও হয় না। তাঁহারা ইচ্ছামত শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কারণ, শক্তিবিশেষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই শক্তিকে কেহ তড়িৎ বা তাহার রূপান্তরবিশেষকে নির্দ্দেশ করেন। কেহ বা বায়ুকে, কেহ বা শোণিতকে এবং কেহ বা যন্ত্রবিশেষকেও দেহের কর্ত্তা স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। জড় বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া আত্মা নিরূপণ করিতে যাওয়া

যারপরনাই বাতুলতার কার্য্য। মনুষ্যদিগের মনে সময়ে সময়ে অনেক প্রকার বাতুলতা আসিয়া অধিকার করে।

একদা ফরাসীদেশের কতিপয় বৈজ্ঞানিক একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, চন্দ্রলোক যখন আমরা দেখিতে পাই, তখন পৃথিবী হইতে যদ্যপি আলোক প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের লোকেরা তাহা দেখিতে পাইবে। আমরা ভরসা করি, তথাকার ব্যক্তিরা গণিত বিদ্যাদি অবশ্যই জানে। পৃথিবী হইতে আলোক দেখিতে পাইলেই তাহারা ঐরূপ কৃত্রিম আলোক দ্বারা আমাদের প্রত্যুত্তর দিবে। তখন আমরা আলোকের আকৃতিবিশেষের দ্বারা পরস্পর ভাব বিনিময় করিয়া উভয় লোকের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিব। এইরূপ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা রাজ-দরবার হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন এবং বিস্তীর্ণ অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা কাষ্ঠের দানসাগর শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রলোক হইতে আর কৃত্রিম আলোক বাহির হইল না। ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত পাগলামী হইয়া গিয়াছে।

একদা কোন পণ্ডিত মনে মনে স্থির করিলেন যে, শোণিতই দেহ-রক্ষার একমাত্র কারণ, আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা চক্ষু বুজিয়া কল্পনার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাহার মুখ বিগলিত কথা শুনিতে ভালবাসেন; কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষার নিতান্ত পক্ষপাতী। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য তিনি পরীক্ষা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ক্রমাগত সুযোগ অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শুনিলেন যে, দুইটী আসামীর প্রাণদণ্ড হইবে। তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার অভিপ্রায় নরপতির কর্ণগোচর করিলে, তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিতের আর আনন্দের সীমা রহিল না। অতঃপর

এই দুইটী ব্যক্তিকে ক্লোরোফরম ঔষধাঘ্রাণ দ্বারা অচেতন করিয়া তাহাদের ধামনিক শোণিত বহির্গত করিলেন। দেহ শোণিতবিহীন হইয়া যাইলে আর তাহারা পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিল না। পরীক্ষক মহাশয় এই দুইটী শবদেহ একটী কাচনির্ম্মিত গৃহের ভিতরে রাখিয়া দিলেন এবং যাহাতে উহারা বিকৃত হইয়া না যায়, এরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। ছয় মাস কাল এইরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু ধন্য বৈজ্ঞানিক কৌশল! শবদেহের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। পরীক্ষক মহাশয় তদনন্তর ঐ শবদেহের ভিতরে মনুষ্যশোণিত সঞ্চালিত করিয়া দিলেন এবং তড়িৎ সংযোগমাত্রে একজন নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় জাগরিত হইল, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন মতে পুনর্জ্জীবন লাভ করিল না।

এই পরীক্ষায় কি প্রতিপন্ন হইল? শোণিতকে জীবজীবনের আদি কারণ কহা যায় না, যেহেতু একজনের জীবন লাভ হইল এবং একজনের তাহা হইল না। জড় পদার্থের ধর্ম্ম সর্ব্ব সময়েই এক অবস্থায় একই ফল প্রদান করিয়া থাকে। তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, ইতিপূর্ব্বে জান্তবাদিঘটিত পদার্থসকল জীবদেহে চৈতন্য-শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হইত বলিয়া ধারণা ছিল, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের সুপ্রণালীর পরাক্রমে তাহাদিগকে এক্ষণে জড়পদার্থ হইতে নির্ম্মাণ করা যাইতেছে; এমন সময় আসিবে, যখন জড়পদার্থ হইতে মনুষ্যাদিও সৃষ্টি হইয়া যাইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই এবং সে বিষয় লইয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজনও বুঝি না। আত্মা লইয়া যে পর্য্যন্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে কেহ কৃতকার্য্য হন নাই। অনেকে মানসিক বলে যদিও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আত্মা অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে, কিন্তু প্রথমতঃ আমি তাহা একেবারে অবিশ্বাস করি।

সংসারের হিল্লোলে পতিত হইলে এমন বীরপুরুষ অতি অল্পই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বদ্ধ-জীবেরা আত্মা স্বীকার করিলেও তাঁহারা তাহার প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কামিনীকাঞ্চনের ক্রোড়ে দিনযাপন করিয়া যান। তাঁহারা পরলোক যাত্রাকালীন পারলৌকিক শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির কি হইবে, অর্থাৎ ইহকাল-সম্পর্কীয় ভাবনায় অভিভূত হন,• কখন বা তাহা নিজ মনের ভিতরে প্রচ্ছন্না-বস্থায় রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। যেমন কেহ অতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে পারে এবং কেহ ফুলের আঘাতে মূর্চ্ছা যায়, তেমনি মানসিক শক্তিরও সীমা আছে।

কোন বৈদান্তিক পণ্ডিতের পুত্রবিয়োগ হয়। যে পূর্য্যন্ত তাঁহার অন্তরে সংসারের কোন প্রকার নিরাশা প্রবেশ করে নাই, সে পর্য্যন্ত তিনি অতিশয় স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়া বেড়াইতেন যে, সকলই মায়া। কেহ পরিজনবিরহে ক্রন্দন করিলে তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "কে মরে, কেই বা বাঁচে, আর কাহার জন্য কেই বা পরিতাপ করে? কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার পতি?" যেদিন তাঁহার পুত্র মরিয়া গেল, সেইদিন তিনি মায়া কাহাকে বলে বুঝিলেন। সেইদিন হইতে কে বাঁচে, কে মরে, কথার তাৎপর্য্য বোধ করিলেন। তাঁহার হৃদয়-কন্দর শোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তিনি সংসারক্ষেত্র অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অস্থিগুলি যেন চূর্ণীকৃত হইয়া গেল, কিন্তু লোকলজ্জায় মানসিক বলে সমুদয় ভাব দমন করিয়া রাখিলেন। তিনি যদিও লোকের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে

পারিলেন। তিনি যেমন নিয়মিত অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, এখনও তাহা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একবারের অধিক কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিতেন এবং ছাত্র-দিগকে যারপরনাই তিরস্কার করিতেন। এইরূপে কয়েকদিন অতীত হইলে পর ছাত্রেরা পরামর্শ করিয়া একদিন আচার্য্যকে কহিল, "প্রভু! যদ্যপি আমরা বিরাগভাজন না হই, তাঁহা হইলে আমরা একটী মনের কথা ব্যক্ত করি।" আচার্য্য কহিলেন, "আমি তোমাদের পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া থাকি, যাহা ইচ্ছা হইয়া থাকে, অবাধে ব্যক্ত কর।" ছাত্রেরা কহিলেন, "আচার্য্যদেব! আমাদের প্রাণের ভ্রাতার বিচ্ছেদ-শোকানলে আমরা পাঠাভ্যাস করিতে কিম্বা আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে একেবারে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি। এতদ্ব্যতীত আপনি যে সংসারকে মায়া এবং ভেল্কীবাজী বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং আমরাও তাহা ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ ধারণা হইয়াছিল ও সময়ে সময়ে তাহা লইয়াও কত বিচার করিয়াছি, আপনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু যে দিন হইতে আমাদের আচার্য্যপুত্র ভাই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে আমাদের যেন নূতন চক্ষু খুলিয়াছে, আমরা যেন নূতন সৃষ্টিতে আসিয়াছি, বুকের ভিতরে যে কি হইতেছে, প্রভু! দেখাইবার কোন উপায় পাইতেছি না। আমাদের এতদিনের শিক্ষা, ধারণা, জ্ঞান, সমুদয় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!" এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া আচার্য্য আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আর মানসিক বলে শোকের তরঙ্গ প্রদমিত করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে "কোথায় সীতানাথ! কোথায় বংশধর আমার, কোথায় বাপ, একবার বৃদ্ধ পিতা ব'লে দেখিয়া যাও;" বলিয়া

মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া কিয়ৎকাল অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের আর আমি কি বলিব! যখন প্রাণে প্রাণে সুহৃদ্‌বিচ্ছেদ কি বুঝিয়াছ, তখন আর আমার বলিবার অপেক্ষা কি? তোমরা আপনার ভাবে আমার অবস্থা কি হইয়াছে, বুঝিয়া লও। আমি আর আমাতে নাই। কি ছাই শিক্ষা করিয়াছিলাম, কি ছাই মায়া মায়া বলিয়া কুসংস্কারাবৃত হইয়াছিলাম যে, এমন পুত্ররত্নের সম্ভোগ-সুখ আস্বাদন করিতে পারিলাম না। এই শোক সম্বরণ করিতে আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, মায়ার জন্য নহে, ধারণার জন্য নহে, শাস্ত্রবাক্য বলিয়া নহে, নিজের বিশ্বাস বলিয়া নহে, কেবল লোকলজ্জায়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কেবল লোকলজ্জায়, এই কয়েকদিন সীতানাথের বিরহানল লোকলজ্জারূপ ভস্মাচ্ছাদন দিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু অনল কি ভস্মাবরণে নির্ব্বাণ হয়? আমি গুপ্তভাবে রোদন করিয়া হৃদয়ভার লাঘব করিয়া লইতাম। অদ্য তোমাদের কথায় লজ্জাবরণ উড়িয়া গেল। তোমরা আমার ব্যথার ব্যথী, তাই আমার সহিত সহানুভূতি করিতে পারিয়াছ। অদ্য হইতে তোমরা এই শিক্ষা কর যে, মানসিক বল বলের মধ্যেই নহে।"

রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্তই বলিতেন যে, মনের অধিকার বাহিরে, প্রাণের অধিকার অন্তরে। যেমন পাড়ার কোন লোক লোকান্তর গমন করিলে পাড়ার লোকে, আহা লোকটা বেশ ছিল, কি মন্দ ছিল, যাহার যেমন ধারণা, সেইরূপ দুই একবার বলিয়া সকলে তাহাকে বিস্মৃত হইয়া গেল। কিন্তু যদ্যপি কেহ সহসা সম্বাদ পায় যে, তাহার পুত্র এলাহাবাদে বিসূচিকা রোগে মরিয়া গিয়াছে, তাহার সেই কথা কি মনে ক্রীড়া করিবে, না বজ্রনিপাতনের ন্যায় হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে? ইহাকে প্রাণের কার্য্য বলিয়া রামকৃষ্ণদেব উল্লেখ করিতেন। মানসিক বল

দেখাইয়া যিনি বলীয়ান বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহাকে ভাবী জগতের বাহিরের ব্যক্তি বলিয়া ব্যক্ত করা যায়। যেমন স্ত্রীশূন্য ব্যক্তির স্ত্রী ত্যাগ করা, অর্থশূন্য ব্যক্তির অর্থত্যাগ করা এবং অন্ধের দর্শন-সুখ ইচ্ছা করিয়া বিরত হওয়া রহস্য কথা, সেইরূপ আত্মার কার্য্যকলাপ অন্তর্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া বাহ্যাভাসসঙ্কুল মানসিক মীমাংসা একেবারে মীমাংসাই নহে।

কয়েদীদের পরীক্ষার ফলে শোণিতকে আদি কারণ বলিয়া কখনই সাব্যস্থ করা হয় নাই, যেহেতু শোণিত প্রদানের পর তড়িৎ-শক্তি সঞ্চালন করিতে হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা পদার্থ এবং শক্তির যৌগিক কার্য্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায়। কিন্তু জড়শক্তির চৈতন্যপ্রদায়িনী শক্তি এ পর্য্যন্ত কোন স্থানে প্রকাশ পায় নাই। জড়শক্তির চৈতন্য লইয়া বহুবিধ বিচিত্র প্রকার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, তাহা যেমন জড় তেমনি আছে।

আমরা দেখিতে পাই, যখন পদার্থ ও শক্তির কার্য্য হয়, তাহার ফলও তদনুরূপ ফলিয়া থাকে। জড় পদার্থ ও জড় শক্তি লইয়া জড়-জগৎ চলিতেছে, তথায় চৈতন্যের কোন সংস্রব নাই। ক্ষুদ্রতম প্রস্তরের প্রবর্দ্ধন হইতে পাহাড় পর্ব্বত জন্মিয়া থাকে, আনুবীক্ষণিক লবণের দানা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া লবণের প্রকাণ্ড পাহাড়ে পরিণত হয়, কিন্তু ইহারা কি চেতন পদার্থ? কে তাহা স্বীকার করিবে? মনুষ্যের সহিত কি লবণের পাহাড় কিম্বা প্রস্তরের পর্ব্বত তুলনা করা যায়? মনুষ্যদেহে জড়-পদার্থ, জড়শক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্র শক্তি আছে, যাহার ধর্ম্ম জড়ধর্ম্ম নহে। যে শক্তির গুণ দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান, পরবেদনা অনুভূতি ইত্যাদি, সেই শক্তিকে আত্মা কহে। সেই শক্তির প্রতাপে জীবগণ বদ্ধাবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। সেই শক্তির কৃপায়

শক্তিধরের সাক্ষাৎ পায়, সেই শক্তির সংস্পর্শে জড় চেতন হয়, সেই শক্তি প্রস্থান করিলে জীব জড়ত্ব দশায় পতিত হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, আত্মা এবং জড়-দেহের পরস্পর সম্বন্ধ যেমন তলবার এবং খাপ; তলবার আত্মাস্বরূপ এবং খাপ জড় দেহস্বরূপ। ঘর এবং ঘরণী; ঘর জড়পদার্থ, কিন্তু ঘরণী অর্থাৎ যে তাহাতে বাস করে, সে চেতন পদার্থ। যেমন আধার এবং আধেয়, আধার দেহ এবং আধেয় আত্মাস্বরূপ।

আমরা যখন যে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে উদ্যত হই, তখন অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যেমন কাশী যাইব বলিয়া মক্কায় যাইলে কি কাশী দেখা হয়? তেমনি আত্মা দেখিতে হইলে জড়পদার্থ ও শক্তি ধরিয়া টানাটানি করিলে কখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে না। আত্মাকে অবগত হইতে হইলে আত্মাকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেমন সাত মহলের ভিতরে রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরের লোকজনকে দেখিয়াই যে রাজা নাই বলিয়া চলিয়া যায়, তাহার ন্যায় বোকা ও নির্ব্বোধ আর কে হইতে পারে? তাহার কি করা কর্ত্তব্য? লোকজনকে রাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে সাত মহল পার হইলে তবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। এই আত্মা-রূপ রাজ-দর্শনের জন্য বিস্তীর্ণ যোগের পন্থারূপ সরকারী পথ পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেহ যোগাবলম্বন করিতে পারেন, তিনিই আত্মা দর্শন করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। এই আত্মা দর্শনকে স্ব স্বরূপ দর্শন কহা যায়। সাধারণ জৈবভাবে আত্মা এবং দেহ একত্রে জড়ীভূত থাকে, যোগের দ্বারা তাঁহাকে স্বতন্ত্র করা যায়। ঠাকুর বলিতেন, যেমন কাঁচা সুপারি কিম্বা কাঁচা নারিকেল। যতদিন কাঁচা রসযুক্ত থাকে, ততদিন

শাঁসে খোসায় জড়িত থাকে, কিন্তু রস শুখাইলে খোসা হইতে শাঁস স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। তেমনি কামিনীকাঞ্চন-রস শুষ্ক হইলে আত্মা দেহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে।

যোগে সিদ্ধ হইলে এই আত্মা সাক্ষাৎকার হয়, অর্থাৎ সেই সাধক নিজ প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পাইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ইহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলিয়াও কথিত হয়। যোগীরা যে ইচ্ছামত এ দেশে ও দেশে ভ্রমণ করেন, তাহা স্থূল দেহে হয় না, সূক্ষ্ম দেহে বা আত্মার দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া থাকে।

প্রভু কহিয়াছেন যে, জীবতত্ত্ব দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। হয় ভগবান্ আপনি লীলার নিমিত্ত বহুভাবে পরিণত হইয়াছেন, না হয় তিনি সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুইটী বিশুদ্ধ হিন্দুভাব বলিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, যেমন বালকেরা আপন চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া অন্ধের ক্রীড়া করে, ভগবান্ লীলাচ্ছলে আপনি জীবরূপ ধারণপূর্ব্বক আপন মায়ায় আপনি বিমুগ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যেমন অভিনেতারা কেহ রাম, কেহ লক্ষ্মণ, কেহ রাবণ, কেহ হনুমান, কেহ জাম্বুবান সাজিয়া অভিনয়াদি করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাঁহারা কেহ রামও নহেন, লক্ষ্মণও নহেন, আর হনুমানও নহেন, তেমনি ভগবানের লীলারহস্য জানিতে হইবে।

ভগবানের লীলা বিষয়ে তিনি বলিতেন যে, ভগবান্ বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সে সময়ের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য শূকরাদির সহিত আনন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল বৈকুণ্ঠ পরি-ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবতারা তাঁহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ

করিলেন। তাঁহাদের স্তব শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিলেন, "তোমরা কেন আমায় বিরক্ত করিতে আসিয়াছ, আমি ছানাপোনা লইয়া বেশ আছি।" ব্রহ্মা কহিলেন, "ঠাকুর! আপনার লীলা আপনাকেই সাজে, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু প্রভু! বৈকুণ্ঠ শূন্য, মাতা আপনার অদর্শনে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, আপনার সাধের সৃষ্টিতে নানাবিধ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, জীবগণ অনাহারে কাতর হইয়াছে। আপনার কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা ভাল দেখায়, না কখন তাহাতে সুশৃঙ্খল হয়?" নারায়ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমায় উপর্য্যুপরি বিরক্ত করিও না, আমি অতিশয় সুখে আছি।" ব্রহ্মা কহিলেন, "ঠাকুর! আপনার কার্য্য আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত বিষয়। বৈকুণ্ঠে কমলা-সেবিত হইয়াও আপনার ক্লেশ হইত, কিন্তু এই দুর্গন্ধময় পঙ্কিল কীটাদি-পরিপূর্ণ স্থানে শূকরশাবকাদি লইয়া আপনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন, এ কথার অর্থ ভেদ করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই স্থানের দুর্গন্ধে আমাদের যে পরিমাণে ক্লেশ হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। আর কেন রহস্য করিতেছেন, যে কার্য্যের অভিপ্রায়ে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা হইয়াছে, তবে প্রভু, আর কাল বিলম্বের হেতু কি?" বরাহরূপী নারায়ণ নিস্তব্ধ হইয়া শাবকগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেব এতক্ষণে ক্রোধান্বিত হইয়া ভীমগর্জ্জনে ত্রিশূল বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, "হয় আপনি বৈকুণ্ঠে যাত্রা করুন, না হয়, আমার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হউন।" নারায়ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রনাদে কহিলেন, "সাধ হইয়া থাকে আইস, আমিও তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।" এই বলিয়া হর হরিতে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিয়ৎকাল সংগ্রামে পৃথিবী রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল, দেবতারা সকলে উপস্থিত হইয়া উভয়ের স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন,

কিন্তু কিছুতেই কেহ নিরস্ত হইলেন না। অতঃপর বরাহ ঠাকুর দন্তাঘাতে শিবের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। শিব তখন ক্ষান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, পাঞ্চভৌতিক দেহই সকলের নিদান। এই দেহ অবলম্বনপূর্ব্বক নারায়ণের এই ভ্রম জন্মিয়াছে। অতএব যে কোন প্রকারে দেহ বিনষ্ট করিতে না পারিলে কোন কার্য্যই হইবে না। মহেশ্বর এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা ত্রিশূলের দ্বারা বরাহের উদর বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। শোণিতস্রাবে বরাহকলেবর অবসন্ন হইয়া আসিল এবং নারায়ণ চতুর্ভূজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী-রূপে বরাহ-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্যপূর্ণাননে দেবতাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, পাঞ্চভৌতিক দেহের অতিশয় বিচিত্র ধর্ম্ম। ইহাতে একবার প্রবেশ করিলে আর কোথাও গমনের ইচ্ছা থাকে না। তিনি বলিতেন যে, ভূত পেত্নীর কত বিক্রম, কিন্তু একবার মুড়ির কলসীতে প্রবেশ করাইতে পারিলে, তাহাদের সমুদয় বিক্রম কমিয়া যায়। তেমনি দেহ ধারণ করিলে ভগবানেরও নিজ অবস্থার সাময়িক বিস্মৃতি জন্মিয়া থাকে।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যেমন কাহার পিতল কি সোণা, সোণা কি পিতল বলিয়া ভ্রম হয়, জীবেরও সেইরূপ ব্রহ্ম কি জীব, জীব কি ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম জন্মায়। যে পর্য্যন্ত ভ্রম থাকে, সে পর্য্যন্ত জীব, ভ্রম বিদূরিত হইলে জৈব দশা আর থাকে না, তাহাকেই পরকাল কহে। সোহং ভাবে এই অবস্থা সংঘটিত হয়।

ভগবানের সৃজিত ভাবে জীবগণ যখন তাঁহার দর্শনাদি লাভ করে তখন পরকাল সম্বন্ধে আর চিন্তা থাকে না। এই ভাবের জীবদিগের অবস্থা উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদা বলিতেন ;—

"মুক্ত হ'বো কবে,
আমি যাব যবে।"

তিনি বলিতেন যে, আমি দুই প্রকার। 'কাঁচা আমি' এবং 'পাকা আমি'। 'কাঁচা আমি' দৈহিকভাবসংযুক্ত অবস্থাকে কহে। বদ্ধ জীবের অহং জ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে 'আমি এবং আমার' কার্য্য উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই তিনি 'কাঁচা আমি' কহিতেন। অর্থাৎ আমি এবং সমুদায় আমার, ইহাকেই মায়াসংযুক্ত জ্ঞান কহে। এই জ্ঞানে যতদিন সংসারে বাস করা যায়, ততদিন বিরহ বিগ্রহে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতে হয়। আজ আমার পিতার মৃত্যু হইল, আমি দশদিক শূন্য দেখিলাম, মাতার পরলোকে আর ধৈর্য্য রহিল না, স্ত্রীর বিয়োগবিষাদে জীবনকে একেবারে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করা, পুত্রের মৃত্যুতে দশদিক অন্ধকার দেখা, বিষয় নাশে অসীম মনস্তাপ পাওয়া, এ সকল 'কাঁচা আমি'র ফল।

'পাকা আমি'তে জীবের উপরোক্ত 'আমি এবং আমার' ভাব তিরোহিত হইয়া 'হে ঈশ্বর! তুমি এবং তোমার' ভাব আসিয়া সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিয়া থাকে। স্বজিত ভাবের মুক্ত জীবের এই লক্ষণ। তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে, আমাদের ইচ্ছায় কোন কার্য্যই হয় না এবং হইতে পারে না। 'কাঁচা আমি'র অবস্থায় সকল কার্য্যেই আপন কর্ত্তৃত্বের বিশ্বাস থাকে। এ কার্য্য আমি না করিলে কখন হইবার নহে, অমুক কার্য্য আমি কত ক্লেশে, কত যত্নে, কত চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। 'পাকা আমি'র স্থলে এরূপ কথা বাহির হয় না। তিনি বলেন যে, ভগবানের ইচ্ছায় আমায় যন্ত্রবৎ কার্য্য করাইতেছেন। আমাদের চেষ্টায় কি হইতে পারে? আমরা

মনে করিলে কি করিতে পারি? তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কার্য্যে ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দর্শন করেন। তাঁহারা আপনাকে কলের পুত্তলী মনে করেন। যেমন পুত্তলিকা নাচওয়ালারা কাঠের পুত্তলী ইচ্ছামত নাচাইয়া থাকে, ভগবান্‌ও সেইরূপ আমাদিগকে লইয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতেছেন। কখন কাহাকে হাসাইতেছেন, কখন কাহাকে কাঁদাইতেছেন এবং কখন কাহাকে স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে রাখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কাহার এক পদ অগ্রসর হইবার অধিকার নাই। 'পাকা আমি'র জীবেরা স্পষ্ট দেখিতে পান যে, এই শরীর, যাহাকে আমি আমার বলিয়া জীবেরা বদ্ধভাবের অভিনয় করেন, তাহা বাস্তবিক আমিও নহি, আমারও নহে। আমি সঙ্কল্প করিতেছি বটে, অমুক কর্ম্ম করিব বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতেছি বটে, সেই সঙ্কল্প কখন সিদ্ধ হয় এবং কখন তাহা অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। আমাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিলে অবশ্যই সর্ব্ব সময়ে সকল কার্য্যেই সিদ্ধ হইতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় না। যে দেহকে আমার বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, সেই দেহে আমাদের কতদূর কর্ত্তৃত্ব আছে? সঙ্কল্প করিলাম যে, আমি আজ কাশী যাত্রা করিব। সমুদয় আয়োজন হইল, যাত্রা করিবার সময়ে কোমরে একটা বেদনা জন্মিল, ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইয়া একেবারে শয্যাগত করিয়া ফেলিল, ক্রমে উত্থান-শক্তি রহিত হইল; আর পদশ্চালনা করিবার শক্তি রহিল না। পক্ষাঘাত রোগ উপস্থিত হইল। যে আমি কাশী যাইব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি, এখনও সেই আমি রহিয়াছে, সেই আমি উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পা চলে না কেন? আমার পা আমার কথা শুনে না কেন? যে পা ইতিপূর্ব্বে আমার আদেশমত গমনাগমন করিত, যে পা আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিত, সে পায়ের নিকটে আমি

পরাজিত কেন? আর আমার আজ্ঞা পালন করিতে চাহে না কেন? আমি রহিয়াছি, আমার পাও রহিয়াছে, কিন্তু আর উভয়ের সদ্ভাব নাই। 'পাকা আমি' তখনই বলিয়া দেয় যে, আমি ও আমার কথাটাই ভুল। কল দেখ নাই? কল জড় পদার্থ। জলের হাওয়ায় কল চলে, কলে লৌহ আছে, পিতল আছে, কাচ আছে, তামা আছে। ইহাতে জল দিতে হয়; জল অগ্নির উত্তাপে বাষ্প হয়, সেই বাষ্পদ্বারা ইঞ্জিনিয়ার কল চালায়। যতক্ষণ কলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক থাকে, যতক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ কল চলিতে পারে। কলের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত হইলে আর কল চলে না। ইঞ্জিনিয়ার কল চালাইবার কর্ত্তা বটে, কিন্তু কল বিকৃত হইলে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে হয়। সেই কল প্রকৃতিস্থ হইলে সে কার্য্য করিতে পারে। দেহ-কল সম্বন্ধেও অবিকল এই প্রকার ভাব দেখা যায়। দেহ-কল সুচারুরূপে যখন চলে, তখন ইহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাদি সমুদয় প্রকৃতিস্থ থাকে, সুতরাং সে সময়ে কলের কার্য্য সম্বন্ধে কোন বিপর্য্যয় ঘটে না, কিন্তু কোন স্থানের ভাবান্তর বা অবস্থান্তর ঘটিলে আর তাহাকে পরিচালিত করিতে কাহারও শক্তি থাকে না। কল চলা যেমন অবস্থার কথা, দেহ-কলও তদ্রূপ। ইহা অবস্থাবিশেষে আপনি চলে, অবস্থাবিশেষে আপনি বন্ধ হয়। এই নিমিত্ত 'পাকা আমি'রা বলেন যে, দেহ যখন অবস্থার দাস, তখন তাহাতে আমাদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা ভ্রমের কার্য্য। ঠাকুর বলিতেন, যেমন কাহার কর্ম্মচারীকে যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়! এ বাগানখানি কাহার? সে বলে, আমাদের। এ বাটীখানি কাহার মহাশয়? সে বলে আমাদের। কিন্তু এই কর্ম্মচারীর কোন বিষয়ে ত্রুটি হইলে যখন তথা হইতে সে বিতাড়িত হয়, তখন তাহার এঁবো সিন্দুকটীও লইয়া যাইবার সাধ্য

থাকে না। 'কাঁচা আমি'র অবস্থায় আমি ও আমার বলা তদ্রূপ। আমি আমি করিয়া বেড়াইতেছি, আমার আমার করিয়া সকলকে বন্ধন করিতেছি, কিন্তু কে কাহার? এই আমি আছি, এই আমার আছে, কিন্তু একবার চক্ষু বুজিলে আমি কোথায় থাকিব এবং 'আমার' কোথায় থাকিবে, তাহা কে না প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন? প্রতিদিন আমি এবং আমার বিলুপ্ত হইতেছে। 'কাঁচা আমি' রূপ ভ্রমে তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞান হইতেছে না, অনেক সময়ে বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। এই অবস্থা যাঁহার জ্ঞান হয়, তাঁহারই 'পাকা আমি' হয়। 'পাকা আমি' হইলে তাহার আর আসক্তি থাকে না, তিনি এই মানব-কলের কাণ্ডকারখানা বুঝিয়া থাকেন, তিনি তখন দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন যে, কল যেমন জড়, এই দেহ-কলও তেমনি জড়পদার্থসম্ভূত। যেমন কলের কর্ত্তা ইঞ্জিনিয়ার, তেমনি এই দেহ-কলের চেতনস্বরূপ সেই আত্মাকে জ্ঞান করা যায়। কল যেমন ইঞ্জিনিয়ারের অভাবে নিষ্ক্রিয় ও স্পন্দনরহিত হইয়া থাকে, দেহ-কলও ইঞ্জিনিয়ার-রূপ আত্মার অভাবে জড়বৎ পতিত থাকে। কলের কল বিকৃত হইলে যেমন ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থাকিলেও সেই কল কোন কার্য্য করিতে পারে না, দেহ-কল বিকৃত হইলে আত্মাও তদ্রূপ কার্য্যবিহীন হইয়া থাকেন। ইঞ্জিনিয়ার এক কল ত্যাগ করিয়া অপর কলে গমন করিলে তথায় পুনরায় কার্য্য করিতে পারে, আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ইঞ্জিনিয়ার কার্য্য ত্যাগ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে কল বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, আত্মাও সঙ্কল্পবিহীন হইলে ভবলীলা পরিসমাপ্তি করিয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যান। এই নিমিত্ত আত্মাকে বিস্মৃত হওয়ার সময় 'কাঁচা আমি' এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানিয়া, সমুদয়

তাঁহার কার্য্য, বোধ করিতে পারিলে, 'পাকা আমি'র অবস্থা বলিয়া ব্যক্ত করা যায়।

কথিত হইল যে, আত্মা দেহ অবলম্বন করিয়া যতক্ষণ কার্য্য করে, ততক্ষণ জীব বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ আত্মার দৈহিক কার্য্যকে বদ্ধ এবং নিজের স্বরূপ কার্য্যকালে মুক্ত জীব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

আমাদের আমি, এই সংস্কার অতীব কঠিন। যতই জ্ঞান সঞ্চার হউক, যতই আমি কিছুই নহি, আমার কিছুই নহে ভাব আমরা লাভ করি, কিন্তু আমি এবং আমার ভাব কখন একেবারে যাইবার নহে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল ভাব লইয়া আমাদের 'আমি এবং আমার' সংস্কার সঞ্চারিত হয়, তাহাদের সংস্রব থাকিলেই পূর্ব্ব ভাব উদ্দীপন না হইবে কেন? ঠাকুর বলিতেন, যেমন অম্বলগ্রস্ত রোগী জানে যে, অম্ল তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, সে উহা কখনই ভক্ষণ করিবে না, কিন্তু আচার তেঁতুল দেখিলে তাহার জিহ্বা রসাল হয়, তেমনি 'আমি এবং আমার' ভাবে কেহ কার্য্য করিতে না চাহিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার 'কাঁচা আমি' প্রকাশ পায়। তিনি আরও বলিতেন, যেমন কোন পাত্রে পেঁয়াজ কিম্বা রসুন পিশিয়া রাখিলে সেই পাত্রটী শত বার ধৌত করিলেও উহাদের গন্ধ একেবারে যায় না; তেমনি 'আমি এবং আমার' সংস্কার সংসারের বক্ষে বসিয়া থাকিলে একেবারে যাইতে পারে না, অথবা যেমন পদ্মের পাপ্‌ড়ী কিম্বা নারিকেল গাছের পাতা স্বতন্ত্র হইয়া যাইলেও তথায় চিরকাল তাহার দাগ থাকে, আমি এবং আমার ভাবও তেমনি থাকিয়া যায়। তিনি আরও বলিতেন, যেমন কেহ স্বপ্নে দেখিল যে, তাহাকে ডাকাতেরা আক্রমণ করিয়াছে অথবা তাহার সমক্ষে ভূত কিম্বা পেত্নী বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে, সে ভয়ে আঁ আঁ করিয়া উঠে। তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইলে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে বলিয়া

জানিতে পারিলেও কিয়ৎকাল তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পন হওয়া অনিবার্য্য। যেমন ছাগলকে বলিদান করিলে তাহার শরীরটা কিয়ৎ কাল ছট্‌ফট্‌ করে, তেমনি 'আমি এবং আমার' যাইয়াও যায় না। 'আমি এবং আমার' ভাব আমাদের এতদূর বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সহজে 'হে ঈশ্বর, তুমি এবং তোমার' এ কথা স্বীকার করা যায় না। যদিও কার্য্যচক্রে প্রাণ তাহা বুঝিতে পারে, কিন্তু মন তাহা পদে পদে ভুলিয়া যায়। আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী, আমার পিতামাতা, আমার অর্থ ভাবিয়া ভাবিয়া মনের তন্ময়ত্ব লাভ হয়, সুতরাং সেই ঘরে বসিয়া আমার ঘর নহে, সেই স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া আমার স্ত্রী নহে, এ কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেও কার্য্যক্ষেত্রে বিস্মৃতি আসিয়া অধিকার করে। এই নিমিত্ত যাঁহার ভবঘোর কাটিয়া সংসারের রহস্য-বোধ সঞ্চারিত হয়, তাঁহার বনবাসী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। 'আমি এবং আমার' ভাব কতদূর কার্য্য করে এবং তাহা কোথায় যাইয়া কিরূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া 'পাকা আমি' অর্থাৎ 'হে ঈশ্বর তুমি এবং এই সংসার তোমার, আমার নহে'—বোধ হয়, তাহা রামকৃষ্ণদেব একটী রহস্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ দিতেন।

তিনি বলিতেন, বাছুরেরা প্রথমে 'হাম্ হা' বলিয়া ডাকিতে শিক্ষা করে। হিন্দুস্থানী মতে 'হাম্ হা' অর্থে আমি বুঝায়। এই অহঙ্কারের নিমিত্ত তাহার দুর্গতির অবধি থাকে না। গাভী হইলে তাহাকে আপনার শোণিত হইতে দুগ্ধ প্রদান করিতে হয়। তাহা না দিলে ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। অনেক স্থানে হয় ত কশাইয়ের করগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যোদর দ্বারা বিষ্ঠায় পরিণত হইতে হয়। বলদ হইলে বিশিষ্টরূপে ক্লেশ পাইতে হয়। হয় ত দামড়া হইয়া লাঙ্গল কিম্বা গাড়ী টানিতে টানিতে অস্থি-চর্ম্ম সার হইয়া আইসে, না

হয় শ্রাদ্ধের সময় দাগা দিয়া ছাড়িয়া দিলে চিরকাল সহরের আবর্জ্জনা ফেলিতে ফেলিতে পরলোক প্রাপ্ত হইতে হয়। এক আমি বলায় এত দুর্গতি ভোগ করিয়াও তথাপি আমি বলা ছাড়ে না। আমির পরিণামের নিমিত্ত তাহাদের চর্ম্ম লইয়া জুতা প্রস্তুত হয়, তাহা সকলের পদতলে থাকে এবং ঢাক ঢোল নির্ম্মাণ করিয়া অনবরত আঘাত করা যায়। ইহাতেও আমির যথেষ্ট দণ্ড হয় না এবং এ পর্য্যন্ত আমির ভাবও যায় না। পরে অন্ত্র লইয়া তাঁত প্রস্তুত হয়। এই তাঁতে ধুনারিরা তুলা ধুনিবার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া যখন তাহাতে মুদ্গরাঘাত করে, তখন সেই তাঁত 'না না, তুঁহু তুঁহু' অর্থাৎ আমি নই, আমি নই, তুমি, তুমি, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। তেমনি 'আমি এবং আমার' জ্ঞান কিছুতেই যাইবার নহে। আমাদের যতই জ্ঞানোপার্জ্জন হউক না কেন, আমরা যতই বিচার দ্বারা 'আমি এবং আমার' জ্ঞান হইতে পরিমুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করি না কেন, আমরা যতই বিবেক-বৈরাগ্য আশ্রয় গ্রহণ করি না কেন, কিছুতেই 'কাঁচা আমি' যাইবার নহে। যখন বাস্তবিক অন্ত্রে আঘাত লাগে, পৃষ্ঠে হইলেও হয় না, তখনই আমি যাইয়া তুমি বাহির হয়। কার্য্যক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যে ব্যক্তি উপর্য্যুপরি সংসারে প্রতারিত হয়, যে ব্যক্তি সংসারের সুখে অবিরত বঞ্চিত হয়, যাহার বিষয় নাশ হয়, যাহার প্রাণসমা প্রিয়তমা স্ত্রীর শবাকার দর্শন হয়, যাহাকে পুত্রবিয়োগানলে দগ্ধীভূত হইতে হয়, তাহারই অন্ত্রে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। তাহারই মুখে একদিন, 'হে জগদীশ! হে করুণাময়! হে দয়াময় ভগবান্!' শব্দ নিঃসৃত হইবার সম্ভাবনা, তাহারই মুখে আমি কেহ নহি, আমার কেহ নহে, কথা বাহির হইবার সম্ভাবনা, তাহারই হৃদয় ভেদ হইয়া 'হে ঈশ্বর! সকলই তুমি এবং সকলই তোমার,' কথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা।

আমরা সকলে সুখের অন্বেষণে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই। কামিনী-কাঞ্চন অবলম্বন করি কেন? পুত্রাদি প্রার্থনা করি কেন? বন্ধু বান্ধব অন্বেষণ করি কেন? সুখের নিমিত্ত, আনন্দের নিমিত্ত, জীবনের দিনগুলি শান্তিতে কাটাইবার নিমিত্ত। অসুখী হইব বলিয়া কি কেহ দার-পরিগ্রহ করে? না, অসুখী হইব বলিয়া কেহ অর্থোপার্জ্জন করে? না, অসুখী হইব বলিয়া কেহ পুত্রাদি ক্রোড়ে লইয়া থাকে? কখনই নহে। কিন্তু তথায় সুখ কোথায়? এই কামিনীকাঞ্চন লইয়া আনন্দে দিনযাপন করিতেছে, সে আনন্দ তখনই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। এই যিনি রাজরাজেশ্বর রূপে পার্থিব সুখের সীমায় উপনীত হইয়া পরমানন্দে দিনাতিবাহিত করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া বন্দীর দশায় আসিতে হইল। এই অর্থোপার্জ্জন করিতেছি, আর তাহা নাই, এই পুত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দের হাট বাজার স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছি, পরক্ষণে তাহারা একটী একটী করিয়া মরিয়া গেল। স্ত্রীর বিয়োগ হইল, প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া পুনরায় সে অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে দেহ প্রতিবাদী হইল। ফলে সুখশান্তি প্রাপ্ত হওয়া গেল না। এইরূপে যখন সংসারে সুখান্বেষণ করিয়া ক্লান্ত হওয়া যায়, তখনই সুখের জন্য, শান্তির জন্য স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা হয়, তখনই ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত হয়। এই অবস্থায়, যে 'আমি এবং আমার' লইয়া জীবন-রঙ্গভূমিতে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে 'তুমি এবং তোমার' ভাবের কার্য্য হইতে থাকে। অতএব, যে পর্য্যন্ত অন্তরে আঘাত না লাগে, সে পর্য্যন্ত 'কাঁচা আমি' যাইতে পারে না। 'কাঁচা আমির' অধিকার এই পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। যদিও 'কাঁচা আমির' কাল নিরূপণ করা গেল, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের উপদেশানুসারে

তাহা কাহারও একেবারে যাইতে পারে না। তিনি তজ্জন্য বলিতেন যে, 'আমি' যদি একান্তই না যাইবি, তবে অমুক আমি, এরূপ ভাবে না থাকিয়া প্রভুর 'দাস আমি' হইয়া থাক্। এই দাস ভাবকে 'পাকা আমি' বলিয়া প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাঁচা 'আমি' অবস্থাকে ইহকাল এবং 'পাকা আমির' অবস্থাকে পরকাল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, "আত্মার দেহ-বুদ্ধিকে ইহকাল এবং তাঁহার স্বরূপ-ভাবকে পরকাল বলা যায়।

রামকৃষ্ণদেব ইহকালে জীব-জীবনের অবস্থার কথা বলিয়া নানাবিধ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, পাশবদ্ধ জীব এবং পাশমুক্ত শিব। এই উপদেশের ভাবে জীবের অবস্থা পাশদ্বারা নির্ণয় হইয়াছে। পাশ থাকিলে যাহাকে জীব উপাধি দেওয়া যায়, পাশ বিচ্ছিন্ন করিলে, সেই জীবই শিবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব জীবের জীবত্ব বা শিবত্ব হওয়া পাশ বা বন্ধন ব্যতীত অন্য কারণে হয় না। তাহা উপর্য্যুপরি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হইয়াছে। প্রভু জীবের এই ইহকাল এবং পরকাল বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা কালী-মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা বলিয়াছেন। যে কেহ যতদিন আমি এবং আমার-রূপ পাশদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহাকে জীব বলা যায়। এই জীবগণ যখন সংসারে কাতর হইয়া মা মা শব্দে আনন্দ-ময়ীর শরণাপন্ন হয়, যখন জীবগণ সংসারে অবিরত যন্ত্রণা পাইয়া কোথায় দয়াময়ী দীনবৎসলা বলিয়া আর্ত্তনাদ করে, যখন জীবগণ সংসারে আশ্রয়বিহীন হইয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে অগতির গতিদায়িনী কাত্যায়নী বলিয়া চীৎকার করে, যখন জীবগণ সংসারে কূল না পাইয়া দুস্তর ভব-জলধির হিল্লোলে নিমগ্নপ্রায় হইয়া কোথায় পতিতপাবনী, করাল-বদনী, একবার দীন ব'লে দয়া কর মা, একবার এই দাসের প্রতি

কৃপাময়ী! কৃপাদৃষ্টি কর মা, তোমার দয়া ব্যতীত আমার আর উপায় নাই মা বলিয়া আর্ত্তনাদ করে, তখন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক দয়াময়ী মা অভয়া অভয় দান করিয়া বলেন, "বাবা, ভয় কি তোমার! এই যে আমি তোমার জননী।" জননী অন্তরে অন্তরে এই আশ্বাস-বাণী বলিতে থাকেন। জীব তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কি হৃদয় তৃপ্তি মানে? তাহাতে কি শুষ্ক প্রাণ শীতল হয়? জীব পুনরায় বলিতে থাকে, "মা গো!" মা বলিয়া যদ্যপি কেহ থাক, একবার সন্তান বলিয়া ক্রোড়ে লও মা! সংসারের নানাবিধ আঘাত প্রত্যাঘাতে জলে মর্‌ছি, সর্ব্বশরীর জলে গেল মা, অন্তর জলে গেল, দয়া করিয়া আমায় এই জ্বালা হইতে রক্ষা কর মা!" মা পুনরায় তাহার হৃদয়ে আশ্বাসবাণী প্রেরণ করিলেন। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। আমি থাকিতে তোমার কিসের ভয়?" এই নিমিত্ত ভবভয়হারিণীর দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তটী অভয় দানের ভাবে শোভা পাইয়া থাকে। তথাপি জীবের প্রাণ শুনিল না, মাতার দৈববাণী বিশ্বাস করিল না, তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "কে তোকে দয়াময়ী বলে মা? কে তোকে দীন-তারিণী বলে মা? কে তোকে অভয়া বলে মা? কে তোকে পতিতপাবনী বলে মা? তোকে মা বলে কে? কেন তোকে মা বলে? এই কি মায়ের রীতি? এই কি মায়ের ব্যবহার? এই কি ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহ? মা গো! কোথায় রক্ষাকালী, রক্ষা কর মা!" যখন জীব তৃতীয় বার আর্ত্তনাদ করে, তখন মা বামহস্তে অসি লইয়া জীবের বন্ধনগুলি ছেদন করিয়া দেন। জীবরূপ মুণ্ডটী সেইজন্য মায়ের বামদিকের দ্বিতীয় হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের জীবত্ব নাশ হইবামাত্র তাহার মৃত্যু হয়, এই অবস্থাকে শিব

বলে। কারণ সে সময়ে জীবের কার্য্য থাকে না। জৈবভাবের কার্য্য অমঙ্গলজনক, সে সময়ে জীব মঙ্গলজনক কার্য্য করে, সে সময়ে তাহাকে তন্নিমিত্ত শিব অর্থাৎ মঙ্গল বলিয়া ব্যক্ত করা যায়। জীব শিবত্ব লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। তখন তাহার ব্রহ্মময়ী বলিয়া আরও অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সে সময়ে আত্মা অবলম্বনবিহীন হইয়া আইসেন, সুতরাং অন্য আশ্রয় নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত মা মা বলিয়া অবিরত রোদন করিয়া থাকেন। এইরূপে আত্মা পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইলে শিবের শবত্ব দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। শিব শবাকার হইবামাত্র আনন্দময়ী হৃদয়মাঝে স্বপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। জীবের এই অবস্থা সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

ইহকাল পরকাল যাহা বর্ণনা করা হইল, তদ্দারা আমরা এই বুঝিলাম যে এই পৃথিবীতেই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। এই পৃথিবী ব্যতীত স্থানান্তরে আত্মার উন্নতি সাধন করিতে যাইতে হয় না, এই পৃথিবী ব্যতীত স্থানান্তরে অবনতির যন্ত্রণা ভোগ করিতে যাইতে হয় না। পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখিলে আত্মার উন্নতি এবং অবনতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ভগবান্‌কে লইয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, কেহ রাজরাজেশ্বর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ ভৃত্য, কেহ সুস্থ, কেহ চিররুগ্ন, কেহ জ্ঞানী, কেহ বিজ্ঞানী, কেহ সভ্য, কেহ অসভ্য এবং কেহ মেতর রূপে শোভা পাইতেছেন। এই প্রকার কার্য্যবিভিন্নতা, কি কার্য্য দ্বারা সাধিত হয় না? কে না প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, কর্ম্মফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়? মেতরের ছেলে সুপণ্ডিত হইতেছেন, ধোপার ছেলে সুপণ্ডিত হইতেছেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলে মুচি হইতেছেন। কর্ম্মফলই

তাহার আদি কারণ। এই কর্ম্মফল বা সঙ্কল্পসূত্রেই অবস্থান্তর সংঘটিত হয়। যিনি কৌন্সলী হইতে সঙ্কল্প করেন, তিনি পরিণামে তাহাই হন, যিনি চিকিৎসক হইবেন সঙ্কল্প করেন, তিনি তাহাই হন, যিনি মাতাল হইবেন সঙ্কল্প করেন, তিনি তাহাই হন, যিনি সাহেব হইবেন মনে করেন, তিনি তাহাই হন, যিনি সাধু হইবেন মনে করেন, তিনি তাহাই হন, যিনি খুন করিয়া ফাঁসী যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাহাই ঘটিয়া থাকে; যিনি ভগবান্‌কে না মানিতে চান, তাঁহার তাহাই ধারণা হয় এবং যিনি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইয়া থাকেন।

আমরা যে দিকে দেখি, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি সকলকেই সঙ্কল্পের অনুগামী থাকিতে দেখিতে পাই। সুতরাং তদনুরূপ ফলও সকলকে প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এই সঙ্কল্প এই পৃথিবীতেই হয় এবং তাহার ফলও এই পৃথিবীতে ফলিয়া থাকে। ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে যদ্যপি স্থানান্তরে যাইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে উপর্য্যুপরি অবতীর্ণ হইতে হইত না। যদ্যপি ভগবানের সহবাসে থাকিয়া দর্শন স্পর্শন সুখ ভোগ করিতে বৈকুণ্ঠেই যাইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার লীলারূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন হইত না। মানুষ মনুষ্যের সহিত বন্ধুত্ব করে, ভালবাসার বিনিময় মনুষ্যের সহিত হইবার সম্ভাবনা, মনুষ্য না হইলে মনুষ্য বাঁচে না, মা বাপ মনুষ্য, ভাই ভগিনী মনুষ্য, বন্ধু বান্ধব মনুষ্য, প্রতিবাসী মনুষ্য, ভগবান্‌ও মনুষ্য না হইলে মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি হয় না, মন প্রাণ শীতল হয় না এবং শান্তি লাভ হয় না। এই নিমিত্ত ভগবানের লীলা শ্রবণ করিতে আমাদের ভাল লাগে, রামায়ণ শুনিতে ভাল লাগে, শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে ভাল লাগে, বাইবেল শুনিতে ভাল লাগে, কোরাণ শুনিতে ভাল লাগে। কৃষ্ণলীলা

বা রামলীলা শ্রবণে কাহার হৃদয় না মাতিয়া উঠে? রাধাকৃষ্ণ বা রাম সীতার যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিলে বিশ্বাসীর কথা দূরে থাক, অবিশ্বাসী, সাকারবিবাদীর প্রাণ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠে। একদা এই ষ্টার থিয়েটারে রূপসনাতন নামক নাটকের অভিনয় দেখিতে আমি আসিয়াছিলাম, আমার পার্শ্বে জনৈক প্রবীণ সুবিজ্ঞ সুপণ্ডিত হিন্দু, হিন্দু রীতি-নীতি, হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু বিশ্বাস, হিন্দু শাস্ত্র, হিন্দু দেবদেবী অবিশ্বাসী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রূপসনাতনে শ্রীগৌরাঙ্গাদির লীলা পারিপাট্য দেখিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন যে, "ব্যাপারটা মন্দ নয়, কিন্তু ভগবান্ কি এমন ক'রে আমাদের মত কার্য্য করেন? তিনি অনন্ত, ক্ষুদ্র মনুষ্য-রূপ ধারণ করিবেন কেন?" যাহা হউক, তিনি ক্রমে গৌরাঙ্গলীলায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে যখন শ্রীকৃষ্ণ রাধার যুগলমূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়, বাস্তবিক সে রূপের এমনি মোহিনী শক্তি, এমনি প্রাণমাতান শক্তি আছে যে, অভিনয় দর্শন করিলেও তাহা অভিনয় বলিয়া কাহারও মনে থাকে না। এই সুবিজ্ঞ ব্যক্তির সেই রূপ দর্শন করিয়া দুই চক্ষে বারি ধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি অনবরত চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "ছি! ছি! আমার আজ কি হইল? সাকারভাবে আমায় এমন হইতে হইল!"

ভগবানের নামের, তাঁহার ভাবের যদ্যপি এত মহিমাই না থাকিবে, তবে তিনি ভগবান্ হইবেন কেন? সে যাহা হউক, এই পৃথিবীই ইহকাল এবং এই পৃথিবীই পরকাল, এই পৃথিবীই স্বর্গ, এই পৃথিবীই নরক, মনুষ্যদিগের এই পৃথিবীতেই সকল কামনা চরিতার্থ হইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় আমরা দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। একদিন আমরা ইহকালের ভাবে অবস্থিতি করিয়া কামিনীকাঞ্চনের—কেবল কামিনীকাঞ্চনের দাসত্ব করিয়া দিনযাপন করিয়াছি, একদিন আমরা

পরকাল বলিয়া কিছুই জানিতাম না, একদিন পরকালের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিতাম, একদিন এমন গিয়াছে যে ভাবিতাম, ইহকাল ব্যতীত মনুষ্যদিগের আরামের আর স্থান নাই, একদিন ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, কামিনীকাঞ্চন ব্যতীত সুখ ও শান্তির দ্বিতীয় বস্তু নাই এবং একদিন দেখিয়াছি যে, তাহা বাস্তবিক প্রাণের শান্তিপ্রদ নহে। পরে রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় একদিন দেখিয়াছি, পরকাল কাহাকে কহে, পরকালের বন্ধু কে, পরকালের সঙ্গী কে? পরকালের আরাম-স্থান কোথায়? এখন দেখিতেছি, ইহকাল এবং পরকাল একাকার হইয়া গিয়াছে। এক দিকে ইহকাল কামিনীকাঞ্চন, আর এক দিকে প্রভু এবং তাঁহার ভক্তগণ, মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ক্ষেত্রের রহস্য সম্ভোগ করিতেছি। যে কামিনীকাঞ্চন ইহকালে ছিল, এখনও তাহারা রহিয়াছে, কিন্তু তথায় পরকালের সংস্রব হওয়ায় যৌগিক ভাবের কার্য্য হইতেছে। একদিন কামিনীকাঞ্চন কেবল কামিনীকাঞ্চনভাবেই সম্ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে তাহারাই প্রভুর কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। যে সংসার 'আমি আমার' ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সংসার প্রভুর কৃপায় প্রভুর হইয়াছে, যে আমি আমার ছিলাম, সেই আমি প্রভুর 'দাস আমি'তে প্রভু নিজে জোর করিয়া পরিণত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত বলিতেছি, যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম, সেই আমি এখনও রহিয়াছি, কিন্তু আমির স্থানে আর আমি কার্য্য করিতে পারে না। এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই। যদ্যপি জোর করিয়া তাহা করিতে যাই, তাহার বিপরীত ফল হয়। রামকৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, আমরা তাহাই কলের পুত্তলীর ন্যায় সমাধা করিয়া যাইতেছি। এইজন্য বলিতেছি যে, যত দিন সংসারে ভগবানের সম্বন্ধ না হয়, তত দিন ইহকাল এবং তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপন

হইলে পরকাল বলে। এই ভাব যাহার হয়, তাহাকে নির্লিপ্ত সংসারী কহা যায়।

নির্লিপ্ত সংসারী হওয়া নিজের শক্তিসম্ভূত নহে, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করিয়া ইহকাল এবং পরকালের মধ্যে সংস্থাপন করেন, তিনিই সেই ভাবে অবস্থিতি করিতে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাহা কস্মিন্ কালে হইতে পারে না। রাম-কৃষ্ণদেব একদিন সার্কাস দেখিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, ঘোড়ার উপরে চড়িতে হইলে কত শিক্ষার প্রয়োজন হয়, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা কৌশল শক্তির দ্বারা ঘোড়ার উপরে কেবল চড়া নহে, নৃত্য করিতেছে, ডিগ্‌বাজী খাইতেছে, তথাপি তাহাদের পদস্খলন হইতেছে না। ইহার তাৎপর্য্য কি? বাজীকরেরা ঘোড়ার পৃষ্ঠের দিকে পূর্ণ মন রাখিয়া আভাস মনে নৃত্যাদি করিতেছে। যেহেতু পৃষ্ঠদেশ হইতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে ভূমিতে পতিত হওয়া অনিবার্য্য। সেইরূপ, হে জীবগণ! সংসাররূপ, কামিনীকাঞ্চনরূপ, ইহকালরূপ, অশ্বপৃষ্টের উপরে পরকালরূপ শূন্যমার্গে যদ্যপি নৃত্য করিতে হয়, তাহা হইলে অশ্বপৃষ্ঠরূপ লক্ষ্যের ন্যায় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অনায়াসে উভয় দিকে সংধ্রব রাখিয়া নিলিপ্ত সংসারীর অভিনয় করিয়া যাইতে পারিবে। সাবধান! যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়।

তাই বলিতেছি, যদ্যপি কেহ পরকাল বলিয়া জানিতে চাহেন, যদ্যপি কেহ পরকালের রহস্য ভেদ করিতে ইচ্ছা করেন, যদ্যপি কাহার নির্লিপ্ত সংসারী হইতে বাসনার সঞ্চার হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ রাম কালী দুর্গা আল্লা যীশু প্রভৃতি যে নাম ইচ্ছা, পিতা মাতা ভাই ভগিনী রাজা, পতি যে কোন ভাবে আপনার 'আমি এবং আমার' ভাব বিসর্জ্জন দিয়া অকপটে, ভাবের ঘরে চুরি না রাখিয়া চলিয়া যাইলে এই জীবনেই

পরকাল কাহাকে বলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল, যাঁহারা অবিশ্বাসী, যাঁহারা পতিত, যাঁহারা মূর্খ, যাঁহাদের গুরু নাই, যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, যাঁহাদের মন্ত্র তন্ত্রের জ্ঞান নাই, তাঁহারা একবার রামকৃষ্ণ বলিয়া দেখুন, বাস্তবিক মনের আঁধার বিদূরিত হয় কি না, রামকৃষ্ণ নামে সংসারের অন্তর্ভেদ হয় কি না, কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি যায় কি না, ইহকালের অন্তর্ভেদ হয় কি না, পারলৌকিক পবিত্র ভাব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় কি না এবং ইহ পরকাল একাকার হইয়া দিব্য জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত সংসারী হইতে পারেন কি না। এ কথা কাল্পনিক নহে, সকলের মনোরঞ্জন করিবার জন্য বাক্যের ছটা নহে, আমার নিজের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

গীত

(১)

হতে ছেলেখেলা গেল বেলা, সাঁজের আঁধার সামনে এল।
খেলাঘরের ধূলোমাখা মলা গায়ে রয়ে গেল॥
শিশু সনে শিশু খেলা, যৌবনে যুবতী মেলা,
ধন-আশা যশতৃষা ভালবাসায় মন মজিল ;
খেলার ছলে আসল ভুলে বুড়ী ত না ছোঁয়া হল
রঙ্গরসে অঙ্গ ঢেলে, সাজান খেলেনা কলে
খেলিতে জীবন গেল খেলা রহিল ;
ফাঁকা খেলায় দিন ফুরাল॥

(২)

"শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে,
চৌদ্দ-পুয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে।
যে কলে চিনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে;
কোন কলের ভক্তি ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়;
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সে কলের কাছে॥"

(৩)

কবে আমার আমি যাবে।
তুমি উদয় হ'য়ে বিদায় দেবে॥
আমি জাগি আমি ঘুমাই, ঘুমালে আর আমিত নাই।
এমন কাঁচা আমি কাজ কি আমার, আমি গিয়ে তুমিই রবে॥
আমি থেকে তোমায় হারাই, এমন আমির মুখে দি ছাই।
(এবার) আমার আমি করে কমি, (তোমার) দাস আমি তুমি বলাবে॥

(৪)

ছাড়ব না তোর চরণ দুটী তুই যে মা আমার।
ভোলানাথের ভান বুঝেছি, ভুলবো না এবার॥
ছেড়ে অভিমানের ছলা, পা পেয়েছে পাগল ভোলা
ফণি সনে বিষ পানে শ্মশানে খেলা;—
মরা সেজে বুকের মাঝে ধরেছে চরণ ভার॥
নামটী মা তোর শবাসনা, পায় না চরণ মরা বিনা
হব মরা আমি হারা আমি রব না,
নাশি নিজ অভিমানে রব পদে শবাকার॥

(৫)

মাতরে রামকৃষ্ণ বলে জীবন ব'য়ে যায়।
ঐ চরণ তলে প্রাণ দে ঢেলে যে আছিস্ রে নিরুপায় ॥
সংসারের সুখ দেখলি কত,
মনের মতন রতন যত,
জ্বালায় তারাই অবিরত কেউত আপন নয় ;—
তোর মুখ পানে চায় কে আছে হায়,
জুড়াবি আয় রামকৃষ্ণ পায় ॥

পঞ্চম বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

ষষ্ঠ বক্তৃতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব

—:*:—

১৩০০ সাল, ১২ই ভাদ্র, রবিবার, প্রাতঃ
৮ ঘটিকায় ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

—:*:—

৫৭ রামকৃষ্ণাব্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব

—*—

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ লইয়া বিগত পাঁচ মাস আমি আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তাঁহার সরল তত্ত্বোপদেশের মধুরতায়, অজ্ঞান সংসারপ্রপীড়িত জীবগণ যে বাস্তবিক প্রাণে শান্তির মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির সন্দেহ নাই। তিনি গভীর ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব যে প্রকার সহজ উপমার ছলে সাধারণ নর-নারীর কল্যাণের নিমিত্ত বলিয়া গিয়াছেন, সে প্রকার বিজ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপায় এ পর্য্যন্ত পৃথিবীমণ্ডলে কোথাও প্রকটিত হয় নাই।

যদিও সভ্য এবং অসভ্য প্রভৃতি সর্ব্বদেশেই ধর্ম্মের ভাববিশেষ লইয়া কার্য্য হইয়া থাকে, যদিও প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও সকলেই ভগবান্ বলিয়া একজনকে স্বীকার করেন, যদিও পরিত্রাতা বলিলে এক সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তাকেই বুঝায়, তাহা হইলেও সকল ভাবের সামঞ্জস্য হইয়া কোথাও কার্য্য হয় নাই এবং সে প্রকার ব্যবস্থাও কেহ অদ্যাপি করিয়া যান নাই। একথা আমি ধর্ম্ম-সমন্বয় প্রস্তাবে বিশেষরূপে বিচার করিয়াছি।

যদিও সকল দেশেই সাধক এবং সিদ্ধ নর-নারী ছিলেন এবং অদ্যাপি আছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের বিচিত্র প্রকার সাধু ও সিদ্ধদিগের

ন্যায় কোথাও দেখা যায় না। সকল দেশেই প্রায় ধর্ম্ম-মত একপ্রকার, স্থানে স্থানে ভাবান্তর আছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই নিমিত্ত আমাদের মধ্যে একেবারেই সদ্ভাব নাই বলিয়া অনেক সময়ে স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম বিষয়ে পরস্পর মতান্তর থাকিলেও সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্য্য সম্বন্ধে সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের দেশে সে প্রকার ভাবের কার্য্য হওয়াই একেবারে অসম্ভব এবং ঘটনাতীত। ফলে সকল কার্য্যেই আমাদের না মনের, না প্রাণের যোগ হইবার সম্ভাবনা। যে প্রকার সময় পড়িয়াছে, আমাদের দেশে যে প্রকার দিন দিন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, সে প্রকার ভাবের অবসান না হইলে বাস্তবিক আমাদের নিতান্ত অকল্যাণ হইবে। আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের মর্য্যাদাপন্ন শাস্ত্রাদি সত্ত্বে, আমাদের মর্য্যাদাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ সত্ত্বে, আমাদের ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর মহাশয়গণ সত্ত্বে, দিন দিন দীনভাব আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যও চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে সুখও নাই, শান্তিও নাই।

কে না একথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন যে, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, কোন কার্য্যেই হৃদয় ভরিয়া প্রীতিলাভ করা যায় না। পরস্পর বাদানুবাদ, পরস্পর স্বার্থপরতা, বিগ্রহ, বিসম্বাদ, পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি এবং ভাগ্যকাতরতা ব্যতীত আমরা অন্য কিছু জানি না। পরস্পর সহানুভূতি আর নাই। অন্যের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে পারিলে কেহ ছাড়িয়া কথা কহিতে চাহে না, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এরূপ স্থলে আমাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সমাজে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধ থাকায় তথায় ধর্ম্মভাব ব্যতীত অন্য সূত্রে কখনই প্রীতি জন্মিতে

পারে না। এই নিমিত্ত যাহাতে সকলের সকল ভাব বজায় থাকিয়া সর্ব্বত্রে প্রেমের সঞ্চার হয়, রামকৃষ্ণদেব তাহারই ব্যবস্থাপকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমরা দেহ, দেহাত্মা এবং আত্মা, এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকি। এই কার্য্যত্রয় সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান আছে, আমরা তাহাকেই অভ্রান্ত জানিয়া অপরের সহিত মতান্তর বা ভাবান্তর হইলে তাহাকে অজ্ঞান এবং কুসংস্কারাদিপূর্ণ বলিয়া কোলাহলের ধ্বজা উড়াইয়া চলিয়া যাই। অর্থাৎ আমি ভাল বুঝি, যাহা কিছু করি, তাহাই কর্ত্তব্য ; অন্যে যাহা করে, তাহা সম্পূর্ণ ভুল এবং অন্যায়, এই নিমিত্ত আমরা সকলেই সকল বিষয়েই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকি। সুতরাং তাহাতে সর্ব্বদা বিশৃঙ্খল ঘটিয়া থাকে।

রামকৃষ্ণদেবের দ্বারা আমাদের এই ত্রিবিধ বিশৃঙ্খল হইতে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ লাভ করিবার বিশেষ উপায় হইতে পারে কিনা, তাহারই তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য আমি অদ্য সাধারণের সমীপে অগ্রসর হইয়াছি।

রামকৃষ্ণদেবকে আমরা অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। অবতার প্রতিপাদ্য শাস্ত্রাদি ও আমার নিজের জীবনের ফল দ্বারা তাহার যথাসাধ্য মীমাংসাও করিয়াছি। অনেকের সংস্কার যে, দশাবতার ব্যতীত আর অবতার হইতে পারে না, কিন্তু অনেকে গৌরাঙ্গদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। দশাবতার ব্যতীত আর অবতার হইতে পারে না, এরূপ যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনই অবতার বলিয়া বুঝিবেন না। তাঁহারা যদিও বুঝিতে না পারুন, তাঁহারা যদিও গৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার না করুন, তাহাতে গৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার মধুময় নামে শুষ্ক

প্রেমহীন ভক্তিবিবর্জ্জিত দুর্বৃত্তের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ কথা। চারি শত বর্ষ কাল অতীত হইল তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার নামে না হইতেছে কি? তাঁহার শ্রীপাদপদ্মশরণাগত জনের আশা পরিপূর্ণ হইতেছে কেন? কোটী কোটী নর-নারী তাঁহার নামরস পান করিয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, জীবের এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবোন্নতি হওয়া ভগবানের নাম ব্যতীত কখন সম্ভবে না। দশাবতারের মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের নামোল্লেখ নাই বলিয়া তিনি অবতার নহেন, একথা যিনি স্বীকার করেন, তাঁহারই নিজের ক্ষতি হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়েরা যদিও শ্লোকাদির ভাবান্তর করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতারবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদির মতে দশাবতার ব্যতীত অসংখ্যাবতার হইবার ভাব ব্যক্ত আছে। গীতার ভাব ইতিপূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়েই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই কথার দ্বারা অসীম অবতারের আকাঙ্ক্ষা আসিতেছে। পরে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, অবতারের সংখ্যা নাই। যেমন সমুদ্র হইতে অসংখ্যক নদী বহির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অসংখ্যক অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রে যে দশাবতার ব্যতীত অন্য অবতার হইবার এককালে উল্লেখ নাই, তাহা নহে। সে যাহা হউক, আমরা যদ্যপি যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবতারদিগের কার্য্য বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে ভূভার অপনোদনের নিমিত্ত দশাবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ তাঁহারা সময়ে সময়ে সাময়িক কার্য্যই সাধন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারেরা জীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত

যে কলেবর ধারণ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহার কোনও আভাস নাই। রাম, কৃষ্ণ, বামন প্রভৃতি অবতারেরাও শাস্ত্র হিসাবে পৃথিবীর সাময়িক কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। রাবন নিধন, কংশ বিনাশ এবং বলিকে কৃতার্থ করা তাঁহাদিগের এই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রাম, কৃষ্ণাদি অবতারের আধ্যাত্মিক ভাবের কার্য্যকলাপ বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দশাবতারের প্রত্যেকের সেইরূপ ভাবের বিকাশ হয় নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে, যদ্যপি দশাবতার ব্যতীত পৃথিবীতে আর অবতার হইতে পারে না বলিয়া সাব্যস্থ করা যায়, তাহা হইলে গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাদির বাক্য মিথ্যা বলিতে হয়। একটী শাস্ত্র সত্য এবং আর একটী শাস্ত্র মিথ্যা বলিলে কোন শাস্ত্রেরই আর মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। যে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়া সকলে স্বীকার করেন, সেই পূর্ণাবতার নিজ মুখে গীতা ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। অতএব ভগবানের কথা মিথ্যা বলিয়া যাহার ধারণা হয়, তাঁহার নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় তর্ক নাই।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ প্রকার শাস্ত্রবিভিন্নতার হেতু কি? সকল শাস্ত্রের এক প্রকার অভিপ্রায় নহে কেন? ভাব-বিশেষ লইয়া শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাব অনন্ত সুতরাং শাস্ত্রও অনন্ত প্রকার। শাস্ত্রের ভাব সামঞ্জস্য করিতে হইলে ভাবে অধিকার হওয়া আবশ্যক। ভাবের অভাব থাকিলে শাস্ত্রাদিরও পৃথক ভাব থাকিয়া যায়।

গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপক। এই শাস্ত্রের ভাব দ্বারা মহম্মদ ও খ্রীষ্টাদিকেও

অবতার বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। মহম্মদ ও খ্রীষ্ট অবতার ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের চরণাবলম্বন পূর্ব্বক সংখ্যাতীত জীব পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিতেছেন, সে স্থলে তাঁহাদিগকে সাধারণ জীব বলিয়া কখন পরিগণিত করা যায় না। মহম্মদ ও খ্রীষ্ট অবতার সত্য, কিন্তু তাঁহারা দশাবতারের শ্রেণীতে উল্লিখিত হন নাই। এই নিমিত্ত যে তাঁহারা অবতার নহেন, এ কথা বলিতে যাইলে নিতান্ত বালকবৎ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে। সেইজন্য আমরা কার্য্য দেখিয়া অবতার বিশ্বাস করিয়া থাকি।

যদিও গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীতে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে অনন্ত প্রকার অবতার হইবার সম্ভব বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু প্রত্যেক অবতারের পূর্ব্বে তাঁহার আগমনের সূচনা হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতকথিত শ্লোক দ্বারা যদিও গৌরাঙ্গাদি অবতারদিগকে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তদ্ব্যতীত বামদেব-সংহিতায় তাঁহার অবতরণের সূচনা হইয়াছিল। বামদেব-সংহিতায় কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস কালে একদা লক্ষ্মণ ঠাকুর ফলাদি আহরণের নিমিত্ত বনান্তরে গমন করিলে রঘুকুলপতি জানকীকে কহিতে লাগিলেন, "দেখ! যেমন গঙ্গাকে দেখিয়া পাপ জ্বলিয়া যায়, তেমনি তোমাকে দেখিয়া আমার সুখশান্তি জ্বলিয়া গিয়াছে।" জানকী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "কেন আমায় আজ এমন নিদারুণ কথা কহিলে? আমাকে দেখিয়া তোমার শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে?" রামচন্দ্র বলিলেন, "তোমার কি কিছু স্মরণ নাই? দেখ দেখি, তুমি আমার কতদূর অমঙ্গলকারিণী! বিবাহকালীন প্রথমেই আমার গুরুর স্বরূপ ধনুকের অপমান করিয়াছি, বিবাহান্তে তোমায় সমভিব্যাহারে আনয়নের সময় পরশুরামের মর্য্যাদা

ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, বাটীতে আসিয়া রাজা হইব, তাহা না হইয়া, তোমার জন্য আমায় বনে আসিতে হইল। অতএব মনে করিয়া দেখ যে, তুমি আমার দুঃখহারিণী কি দুঃখদায়িনী। তাই তোমায় দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে।" বার বার রামচন্দ্রের মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া জানকী অভিমানে মস্তকাবনত পূর্ব্বক কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে মহাশক্তি স্বরূপিণী শ্রীজানকী আপন শক্তির বিকাশ করিয়া সেই বনমধ্যে দ্বিতীয় গোলকধাম নির্ম্মাণ করিলেন। গোলকধাম সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যস্থিত বৃহৎ অট্টালিকার প্রত্যেক গৃহের সিংহাসনোপরি সীতাদেবী উপবেশন করিয়া রহিলেন। সকল গৃহেই সীতা। লক্ষ লক্ষ সীতা শোভা পাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বৃক্ষমূল হইতে সীতার এইরূপ শক্তির অভিনয় দেখিয়া তিনি প্রত্যেক সীতার দক্ষিণ পার্শ্বে রামরূপে উপবেশন করিলেন। সীতাদেবী তখন লজ্জিতা হইয়া ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! অপরাধ ক্ষমা করুন।" রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি অনুপল বিলম্ব না করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়া ফেল। তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে, আমরা মানব লীলা বিস্তার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছি? একথা লক্ষ্মণ যদ্যপি জানিতে পারে, তাহা হইলে নিতান্ত গোলযোগ উপস্থিত হইবে।" রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপ কহিয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা একটী বৃক্ষ লুকাইয়া রাখিলেন। রঙ্গময়ের রঙ্গে প্রবেশ করিতে রঙ্গময়ীও অসমর্থা হইয়া ঐ বৃক্ষটী ব্যতীত সমুদয় পদার্থ অন্তর্হিত করিলেন। পরে তাঁহারা যেমন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন, তেমনি রহিলেন।

অতঃপর লক্ষ্মণ ঠাকুর অতিশয় দূর বনাদি হইতে ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক সীতা-রাম গুণগানে বিভোর হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

কুটীরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একটী মনোহর বৃক্ষ সুপক্ক ফলদ্বারা সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ এই বৃক্ষ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমি কি মূর্খ! নিকটের ফল পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলাম। অগ্রে জানিতে পারিলে এতক্ষণে তাঁহাদের সেবা করিয়া আমি কৃতার্থ হইতাম।" বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা সন্দেহ হইল। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন যে, "কত বন, কত উপবন, কত দেশ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু এপ্রকার ফল কোথাও দেখি নাই। ইহা যেন আমার পরিচিত বৃক্ষ বলিয়াও বোধ হইতেছে।" অনন্তদেব তখন আপন স্বরূপে যাইয়া বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ বুঝিয়া লইলেন। তিনি অভিমানে অধীর হইয়া হেঁট মস্তকে কুটীরে গমন পূর্ব্বক ফলমূলাদি রাখিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা লক্ষ্মণের ভাবান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! আজ তুমি এমন হইয়াছ কেন? রোদন করিবার হেতু কি? বনে কি অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছ? অথবা কোন প্রকার বিভীষিকায় কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে শীঘ্র আমাকে বল। বাছা, তোমায় কাতর দেখিলে আমি অস্থির হই।" লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আর তোমায় শুষ্ক স্নেহ দেখাইতে হইবে না। তোমার ভালবাসা কতদূর, তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। তুমি যেমন মা, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জানাইয়াছ। আমি তোমার চরণাশ্রিত দাস। দাস বলিয়া গণনা করিয়াছিলে, সেইজন্য বলিতেছি, কিন্তু জননী! দাসের প্রতি কি তোর এই ব্যবহার সাজে? তুই রাসলীলা করিলি, কিন্তু সে রূপ, আমি দাস—একবার দেখিতে পাইলাম না, সেই যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে আমি বঞ্চিত হইলাম!" সীতা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ! তুমি আমায় অন্যায়

তিরস্কার করিতেছ কেন? তোমরা আজ আমায় কেন এইরূপে বিরক্ত করিতেছ বল দেখি? তোমার ভাই একবার কত কি বলিল, তুমি আবার যাহা ইচ্ছা বলিতেছ।" রামচন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া সীতাকে কহিলেন, "তুমি আমার প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা না করিয়া কটু বাক্য বলিতেছ কেন? এরূপ করিলে আমি তোমায় অভিশাপ দিব।" লীলাময়ী সীতাদেবী একেবারে অভিমানে যেন আত্মহারা হইয়া সরোদনে বলিলেন, "আমায় তুমি অভিশাপ দিবে, না আমি তোমায় অভিশাপ দিব?" লক্ষ্মণ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যেমন প্রভুকে বিরক্ত করিলে, আমি তোমায় অভিশাপ দিতেছি যে, ইহকালে তুমি প্রভুর সেবা হইতে বঞ্চিত হইবে।" সীতাদেবী অবিলম্বে লক্ষ্মণকে এইং বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, "আমাকে যেমন অন্যায় শাপ দিয়াছ, আমিও বলিতেছি যে, তুই রামপাদপদ্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবি।" রামচন্দ্র তখন সীতাকে কহিলেন, "তুমি আমার লক্ষ্মণকে যেমন শাপ দিয়াছ, আমিও তোমায় বলিতেছি যে, তোমাকে আমার জন্য উপর্য্যুপরি নরলোকে কাঁদিতে হইবে।" সীতাও তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "তোমাদি-গকেও আমার জন্য পৃথিবীর পথে পথে বার বার পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।"

দেবতারা ভগবানের এইরূপ রহস্য দেখিয়া সকলে তথায় আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মাতা! স্থির হউন। প্রভু! স্থির হউন। অনন্তদেব! স্থির হউন। আপনারা করিতেছেন কি? আপনাদিগকে বার বার পৃথিবীতে নরলীলা করিতে হইবে, তাহা কি স্মরণ নাই? লক্ষ্মণ বর্জ্জন, জানকীর বনবাস, যদিও এই লীলায় সমাপ্ত হইবে, কিন্তু প্রভু! মাতার অভিশাপমতে আপনাকে দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে রাধার জন্য বাস্তবিক ঘুরিয়া বেড়াইতে

হইবে। আপনার অভিশাপের জন্য মাতাকেও আপনার নামোচ্চারণ করিয়া উপর্য্যুপরি নরলীলা করিতে হইবে।" এই লীলায় রামকৃষ্ণদেব গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হওয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

বামদেব-সংহিতার মতে রামসীতার অভিশাপ দ্বারা গৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়া যদিও অবতারের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বভাবে বাস্তবিক আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। যেহেতু পুরুষ প্রকৃতির পর্য্যায়-ক্রমে লীলা বিস্তার না হইয়া উভয়ের মিলন ভাব প্রকটিত না হইলে বিরহাবস্থায় অবসান হইতে পারে না। রামরূপে রামসীতার আর পুনর্মিলন হয় নাই, কৃষ্ণাবতারেও রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন হয় নাই, গৌরাঙ্গাবতারে রাধার কান্তি ধারণপূর্ব্বক রাধা রাধা বলিয়া বিরহের ভাবই বিস্তার করিয়াছেন। যদিও গৌরাঙ্গদেবকে একেবারে রাধাকৃষ্ণের মিলন ভাব বলিয়া ভক্তেরা ব্যক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে বিরহাবসান হয় নাই। গৌরাঙ্গাবতারে রাধাকৃষ্ণের মিলনভাব স্বীকার করিয়া লইলেও তথাপি অভাব থাকিতেছে। অনন্তদেবের সহিত মিলন হয় নাই। তত্ত্বপক্ষে সমুদয় ভাবের মিলন প্রয়োজন, তাহা না হইলে ভক্তেরা কখনই স্থির হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সকল ভাবের মিলন হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিতেছে। যেমন জ্ঞান পক্ষে এক ব্রহ্মে সকল ভাবের পর্য্যবসান হইলে জ্ঞানীরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তেমনি লীলায় সকল ভাবের কার্য্য একাধারে পর্য্যবসিত না হইলে ভক্তদিগের জ্ঞান-ভক্তির ভাব সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। ভক্তিতে দ্বৈত ভাব, কিন্তু জ্ঞান-ভক্তিতে জ্ঞানের একাকার হয়। অতএব গৌরাঙ্গদেবের পরে ভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অবতারের অবশ্য প্রয়োজন দেখা যায়। এই নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেব লীলাবসানকালে কহিয়াছেন যে, "আমি চারিশত বর্ষ পরে

পুনরায় অবতীর্ণ হইব।" তাঁহার কথা প্রমাণ এবং কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া রামকৃষ্ণদেবকে সেই গৌরাঙ্গের দ্বিতীয়াবতার বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে। এ কথা তিনি আমাদের নিকটে স্বীকার করিয়াছেন এবং পুনরায় আর একবার আগমন করিবেন, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, রামকৃষ্ণাবতারে গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। বামদেব-সংহিতার ভাবে রামাবতার হইতে গৌরাঙ্গাবতার পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণাবতারে তাঁহারা একীভূত হইয়া একাধারে রাম বা অদ্বৈত ভাব, প্রকৃতি সীতা বা চৈতন্য ভাব এবং লক্ষ্মণ বা নিত্যানন্দ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

পুনরায় কথা হইতেছে যে, ভাব লইয়া অবতার মিলাইবার হেতু কি?

অবতারবাদ বিচার করিতে হইলে, আমরা প্রথমে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি যে, ভগবান্ অবতার হন কেন? উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য্য হয় না। যদ্যপি একথা বলা হয় যে, যে যে অবতার যে যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সেই সময়ে তাঁহার কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, শাস্ত্র তাহার মীমাংসার স্থল; যথা—রামচন্দ্র রাবণ-বধ করিয়াছেন, কৃষ্ণ কালীয় দর্পচূর্ণ করিয়াছেন। তাহা হইলে এ সকল লীলার দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় কি না? সাময়িক কর্ণসুখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা কি?

লীলায় বাহ্য কার্য্য ব্যতীত জীবশিক্ষার নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা থাকে, তাহাই আলোচনা করা প্রত্যেক জীবের কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত অবতারের কথা হইলেই তাঁহার লীলার তাৎপর্য্য বাহির করিয়া যদ্যপি

জীবশিক্ষার কোন সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে বাস্তবিক অবতার কহা যায়।

দৃষ্টান্তস্থলে কৃষ্ণাবতারের কালীয় দর্পচূর্ণ লীলা গৃহীত হউক। কালীয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণ হতচেতন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে কালীয়ের নয়শত নিরেনব্বইটী ফণা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে একটী ফণা অবশিষ্ট থাকিতে সে যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তখন সে অব্যাহতি পাইয়াছিল। এই লীলার দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তিনি বিষাক্ত জলে ডুবিয়া প্রবল বিক্রমশালী কালীয়কে তেজহীন করিয়াছিলেন, ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু একজন সংসার-প্রপীড়িত ব্যক্তি কি এই লীলা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে? একজন মায়ানিমগ্ন বদ্ধজীব এই লীলা-কাহিনী হইতে কি তাহার বন্ধন-মুক্তির কোন উপায় লাভ করিতে পারিবে? কিন্তু ভগবানের প্রত্যেক কার্য্যে নানাপ্রকার তাৎপর্য্য নিহিত থাকে। যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতে সে তাহাই লাভ করিতে পারে। সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখা হউক, কালীয়দমন লীলা হইতে আমরা কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি কি না?

বদ্ধ-জীবেরা কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুর বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই ছয়টী ভাব হইতে অসংখ্যক সঙ্কল্প বা বাসনার উদয় হয়। এক লোভের বিক্রম যে কতদূর, তাহা আমরা সকলেই বিশেষরূপে জানি। কামের কথাই নাই, মদ ও মাৎসর্য্যাদি সর্ব্বদা আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থার সহিত কালীয়ের সহস্র ফণার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কালীয়ের ফণার দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইত, আমাদের স্বার্থযুক্ত সঙ্কল্প মনে উত্থিত হইলে

অপরের ক্ষতি করিতে আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। সঙ্কল্প-রূপ ফণা হইতে কার্য্য-রূপ বিষ বহির্গত হইলেই তাহাতে যাহার সম্বন্ধ থাকে, সে সুতরাং অশান্তিতে নিপতিত হয়।

কালীয় যেমন বিষ উদ্গীরণ করিয়া কিছুকাল স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিয়াছিল, সেইরূপ আমরাও অবিরত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াও দিনকয়েক কাটাইতে পারি। আজ উহার ভদ্রাসন, কাল উহার জমিদারী হরণ, ইত্যাকার অত্যাচারের উপর অত্যাচার করিয়াও অনেককে বাঁচিয়া যাইতে দেখিতে পাই। কিন্তু সকলের সীমা আছে, চিরকাল একভাবে কাটাইয়া যাওয়া বিধাতার নিয়ম নহে। কালীয় কর্ত্তৃক যে পর্য্যন্ত রাখাল বালকদিগের জীবননাশ না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাহার নিজ হিংসা-বৃত্তির অভিনয় বন্ধ হয় নাই। সেইরূপ যখন আমরা সাধুভক্তের অবমাননা করি—এমন সাধুভক্ত, যাঁহাদের আত্মা ভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যাঁহারা রাখাল বালকদিগের ন্যায় অবস্থায় পড়িয়াছেন, যাঁহারা ভগবানের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা বাতাসের এঁটো পাতার ন্যায় অভিমানশূন্য হইয়াছেন, তাঁহারা যখন কাহার দ্বারা নিগৃহীত হন, সেই সময়ে ভাবরূপী ভগবান্ সেই দুর্বৃত্তের মানস ফণার উপরে যাইয়া দণ্ডায়মান হন। প্রকৃত সাধু অপমানিত হইলে কখন প্রতি-হিংসা করিতে চাহেন না। তিনি চুপ করিয়া চলিয়া যান, অত্যাচারী সেই সময় মনে মনে ক্লেশানুভব করিয়া থাকে। একবার এইরূপ ভাব মনে কার্য্য করিতে পারিলে তাহার মনে যখনই কোন অসৎ সঙ্কল্পের সূচনা হয়, অমনি ভাবরূপী ভগবান্ কর্ত্তৃক তাহা তৎক্ষণাৎ প্রদমিত হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মনের কুৎসিত সঙ্কল্প একে একে দূর হইয়া যায় এবং সাধুভক্ত সেবা ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ

করিয়া থাকে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আজ একজন কিছু মানে না, যথা ইচ্ছা আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছে, সেই ব্যক্তি কোন সূত্রে মর্ম্মাহত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে দিনযাপন করে। কালীয় দমন লীলার এইরূপ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়।

ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে তত্ত্ব-পক্ষে অবশ্যই স্বতন্ত্রভাব থাকিবে। মনুষ্যদিগের কার্য্যে সে প্রকার ভাব দেখা যায় না। অবতার এবং মনুষ্যে এই প্রভেদ। রামকৃষ্ণদেবকে ভাবে অবতার বলিয়া বুঝা গেল বটে, এক্ষণে তাঁহার নরলীলায় দেহ, দেহাত্মা এবং আত্মাসম্বন্ধীয় তত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রভু! বল দিন, আপনার তত্ত্ব আপনি ব্যক্ত না করিলে আমি তাহা কোথায় পাইব!

পূর্ব্ব প্রস্তাবমতে প্রথম দেহ সম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। ১৭৫৬* শকাব্দার ১০ই ফাল্গুন শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ায় রামকৃষ্ণদেব ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। রামকৃষ্ণদেব ক্ষুদিরামের তৃতীয় পুত্র।

রামকৃষ্ণদেব ক্ষুদিরামের পুত্র বলিয়া যদিও পরিচিত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কথাটা অতিশয় গুরুতর হইল বটে, কিন্তু কি করিব! সত্য ঘটনা কখন লুকাইয়া রাখা যায় না, বিশেষতঃ তদ্দ্বারা তত্ত্বপক্ষের দ্বারোদ্ঘাটিত হইবার একমাত্র উপায়।

যে সময়ে রামকৃষ্ণদেব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, সে সময়ে ক্ষুদিরাম গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ক্ষুদিরামকে নিতান্ত নৈষ্ঠিক ভক্ত বলিয়া সকলেই জানিত। নারায়ণকে পুত্ররূপে লাভ করিবার নিমিত্ত

* ১২৪১ সাল।

তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। গয়াধামে অবস্থিতিকালে তিনি গদাধরের নিকটে সর্ব্বক্ষণ ঐ প্রার্থনাই করিতেন। একদিন রজনী অবসানকালে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী নারায়ণ সমক্ষে উদিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্ষুদিরাম! আর তুমি চিন্তা করিও না, তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।" ক্ষুদিরামের পরমানন্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তদনন্তর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণের মাতা একদিন বাটীর সন্নিহিত শিবালয়ের নিকটে ধনী ও অপর একটী প্রতিবেশিনীর সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময়ে শিবালয়ের দিক্ হইতে ঘনীভূত বায়ু আসিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। সকলেই তাহা দেখিল। কেহ মনে করিল যে, হয়ত ভূত প্রেত এবং কেহ বলিল, কোন প্রকার ব্যাধি বায়ুরূপে আশ্রয় করিল, ইত্যাকার যাহার যে ভাব প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। ক্ষুদিরামের স্ত্রীর পেটের ভিতরে বায়ুপ্রবেশ করিয়াছে, একথা সকলেই শ্রবণ করিল। এইদিন হইতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। রামকৃষ্ণের মাতার বয়ঃক্রম তখন চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার রামেশ্বর এবং রামকুমার নামক দুইটী উপযুক্ত সন্তান ও কন্যাদিও ছিল। তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সুচতুরা ছিলেন না। অতিথি দেখিলে তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া সেবা করিতে ভালবাসিতেন। যখন তাঁহার পূর্ণ গর্ভ হইল, সেই সময়ে তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বলিত যে, "মাগীর হলো কি! যুবতীকালে যে রূপ ছিল না, বুড়ো বয়সে এমন হইল কেন? এইবার হয়ত মরিয়া যাইবে।" এই সময়ে লোকে এইরূপ নানাবিধ কথা বলিত। গর্ভ বলিয়া কেহ স্বীকার করিত না।

উদর স্ফীত দেখিয়া ব্রহ্মদৈত্য পাওয়াই সকলের সিদ্ধান্ত ছিল। ক্ষুদিরাম বাটীতে আসিয়া সকল কথাই শ্রবণ করিলেন এবং স্ত্রীর অবস্থাও নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া যদিও মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রাতঃকালের স্বপ্ন কখন মিথ্যা হইবে না কিন্তু এত শীঘ্র যে তাহা ফলবতী হইবে, একথা তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। ক্ষুদিরাম ব্যতীত কেহই গর্ভ বিশ্বাস করেন নাই। পরে রামকৃষ্ণদেব ভূমিষ্ঠ হইলে পুত্র জন্মিতে দেখিয়া যাহার যেরূপ সংস্কার, তাহার মুখে সেইরূপই কথা বাহির হইতে লাগিল। কেহ মনে করিলেন যে, সাধারণ নিয়মাতীত ভাবে পুত্রাদি হওয়া জীবে সম্ভবে না। ভগবান্ যখন অবতাররূপ ধারণ করেন, তখন এইরূপ শুনা যায়, শাস্ত্রেও তাহা উল্লেখ আছে। তবে কি ভগবান্ পুনরায় অবতীর্ণ হইলেন? কেহ কেহ সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। বুড়ীর শেষ দশায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়াও কেহ রটনা করিতে লাগিলেন এবং কেহ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণের এইরূপ জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে অনেকে উপহাস করিতে পারেন, অনেকে আমাদের পাগল বলিয়া গণনা করিবেন, কিন্তু এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণতত্ত্ব অনুশীলন করিবার নিমিত্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। পিতা মাতা ব্যতীত সন্তান হয় না, ইহা সাধারণ নিয়ম বটে, কিন্তু অবতারদিগের পক্ষে সে নিয়ম কোথাও নাই।

যাহার যেমন পূর্ব্বসংস্কার, বাল্যকালে তাহাতে সেই প্রকার আভাস দেখা যায়। কেহ খেলিতে ভালবাসে, কেহ পড়িতে চাহে, কেহ ঠাকুর দেবতার প্রতি অনুরক্ত হয়, কেহ বা চুরি করিতে অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়। রামকৃষ্ণদেব অন্য ক্রীড়া জানিতেন না, তিনি নিজে ঠাকুর হইতে চাহিতেন। পাড়ার ছেলেদের সহিত মাঠে কিম্বা নির্জ্জন উদ্যানে

গমন পূর্ব্বক কখন কৃষ্ণলীলা কখন রামলীলা কখন বা গৌরাঙ্গলীলা করিতেন। এই লীলা খেলার সময়ে তিনি কখন কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা শুনিতেন, তাইাই তাঁহার স্মরণ থাকিত। তিনি যখন গান করিতেন, তখন সকলকে উন্মাদ উন্মাদিনী করিয়া তুলিতেন। ঠাকুর বলিয়া তাঁহাকে সকল তত্ত্বদর্শী লোকেরা জানিতেন।

কামারপুকুরের লোহা উপাধিবিশিষ্ট একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের অতিথিশালা ছিল, এখনও আছে কি না জানি না। তথায় বহুবিধ সাধু শান্তেরা গমনাগমন করিতেন। এই সাধুরা রামকৃষ্ণকে চন্দন তিলকাদির দ্বারা সাজাইয়া রুটি ডাল প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনন্দে ভোজন করাইয়া সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইতেন। লাহা বাবুদের কর্ত্রী-ঠাকুরাণী ক্ষীর সর নবনী প্রস্তুত করিয়া অগ্রে রামকৃষ্ণকে খাওয়াইতেন, তাহা না পারিলে তাঁহার অতিশয় চিত্তচাঞ্চল্য হইত এবং তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন, "রামকৃষ্ণ! তোকে ঠাকুর বলিতে ইচ্ছা যায় কেন?" রামকৃষ্ণ হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

রামকৃষ্ণদেবের বাল্য-খেলার তাৎপর্য্যের দ্বারা তাহাকে সাধারণ জীব বলিয়া কখন বুঝা যায় না। যেহেতু ভগবানের লীলাখেলা বালকবুদ্ধির অতীত। কোন কোন বালকের ঐশ্বরিক তত্ত্ববিষয়ে মতি গতি থাকে বটে, কিন্তু এ প্রকার নহে। বিশেষতঃ সাধু মহাত্মারা রামকৃষ্ণের ন্যায় কোন্ বালকের বেশভূষা ও তাহাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন? অতএব রামকৃষ্ণদেব সাধারণ বালক ছিলেন না।

রামকৃষ্ণদেবকে যখন ক্ষুদিরাম পাঠশালায় প্রেরণ করেন, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "লেখা পড়া শিখিয়া কি করিব? বিদ্যা

শিক্ষা করা চাল কলার জন্য, সে শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।” সুতরাং তিনি অন্যান্য বালকের ন্যায় নিয়মিত শিক্ষা করিতেন না। লেখা পড়া শিক্ষা না করিবার হেতু তিনি বলিয়া গিয়াছেন, “যে লেখা পড়ায় চাল কলা লাভ হয়, তাহা আমি শিখিব না।” বর্ত্তমানকালে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যালাভ করা হয়, যদিও আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে মানসিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অর্থকরী বিদ্যার অধিক সংস্রব থাকায় তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সুবিধা হয় না। মানসিক উন্নতি হইলে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা একেবারেই স্বীকার করা যায় না। বরং সে পথের বিঘ্ন ঘটিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। মনের উপরে সংস্কার-রূপ আবরণ পতিত হইলে সে মনের অন্য কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না।

কাঞ্চন ঈশ্বর-পথের দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতবিশেষ, তাহা পরে তিনিই বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ বিদ্যায় লোককে অভিমানী করে, বাচাল করে, মাৎসর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষে পরিণত করে, সুতরাং সে বিদ্যায় ভগবান্-পথের অধিকারী হওয়া যায় না; তিনি লেখা পড়া না শিখিয়া এই শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

যদিও তিনি অর্থকরী বিদ্যার বিরোধী ছিলেন, সেইজন্য এমন কথা কেহ না মনে করেন যে, তিনি সকলকে মূর্খ হইতেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, শিক্ষা না করিলে বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় না এবং শিখিবার কাল নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সখী, যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি। এ কথা বলিবার হেতু কি? তিনি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি-শুদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যে সকলের বিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। অর্থকরী বিদ্যায় বুদ্ধির বিকৃতি জন্মায়, অতএব সেই বিদ্যা ত্যজনীয়। যে বিদ্যায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়, যে বুদ্ধি

ভগবানের দিকে ধাবিত করে, সেই বিদ্যা—সেই ব্রহ্মবিদ্যা আজীবনকাল শিক্ষা করাই প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য।

যদিও অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার অপকৃষ্টতা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অকর্ত্তব্য এবং মহাপাপ, এরূপ ভাব তিনি প্রকটিত করেন নাই। আমাদের দেশে সন্ন্যাস ভাব অতিশয় প্রবল। কাহারও মনে ভগবৎতত্ত্বের ভাব সঞ্চার হইবামাত্র তিনি গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তিনি এ প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত হন। এই সংস্কার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে, সর্ব্বত্রে প্রবল দেখা যায়। রামকৃষ্ণদেব এই ভাব অনুমোদন করা দূরে থাক, তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কমণ্ডলু লওয়া, গৈরিক পরিধান করা, লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আত্মসুখ ভোগ করা সন্ন্যাসের অভিপ্রায় নহে। ভগবানের জন্য যাহার মন ধাবিত হয়, সর্ব্ব বিষয়ে তাহার ঔদাস্য জন্মে, অর্থাৎ অবস্থায় তাহাকে যখন যে ভাবে লইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত ভাবের কথা। সেরূপ সন্ন্যাস বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব দিন কয়েক রাসমণির ঠাকুরবাটীতে পূজাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই অবস্থা হইতেই তাঁহার অবস্থান্তর হয়, সুতরাং আর তিনি পূজাদি করিতেন না। যখন এইরূপ অবস্থা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যাবজ্জীবন দৈহিক ব্যয়াদি মন্দির হইতে সঙ্কুলান হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা যেমন অর্থের দাস হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই, তিনি সেরূপ ছিলেন না। যাহার যত অর্থ হউক, রাজা হউন, সম্রাট হউন, আর ভিখারী হউন, কেহই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। আরও হউক, আরও হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সকলকেই ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়। রামকৃষ্ণদেবের অর্থোপার্জ্জন

সম্বন্ধে সেরূপ কোন প্রকার ভাব দেখা যায় না। কলিকাতার শম্ভুচরণ মল্লিক বলিয়া একজন ধনী ব্যক্তি রামকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞায় তিনি সকল কার্য্য করিতেন। রাসমণির কালীবাটীর নিকটে শম্ভু মল্লিকেরও একখানি অতি রমণীয় উদ্যান ছিল এবং অদ্যাপি আছে। এই উদ্যানে রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন এবং ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। শম্ভু মল্লিক মনে করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়া নিত্য সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। এই কথা রামকৃষ্ণদেবকে বলিলে তিনি বলিতেন, 'চলিয়া যাইতেছে, আর নূতন ব্যবস্থা কেন?' রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণদেবের পদাশ্রয় প্রাপ্ত হইবার পর একদিন গোপনে বলিয়াছিলেন যে, "বাবা! দিন দিন আমার যেরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে আর অধিক দিন বিষয়কার্য্যাদি দেখিতে পারিব না, ইহার পরে হয় ত ছেলেদের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে। এই সময়ে তোমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখি।" রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "মথুর! কালীর ইচ্ছায় সকলই হয় জানিয়া শুনিয়া তুমি পরিশেষে এই কথা কহিলে? কালীর ইচ্ছায় যাহা হয়, হইবে। তুমি কখনও এমন কথা আমায় বলিও না।"

মথুরবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, রামকৃষ্ণদেব ততদিন প্রতি মাসে কখন কখন দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। মথুরবাবু তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। শুনিয়াছি, কীর্ত্তন, যাত্রা কিম্বা চণ্ডীর গান শুনিতে বসিলে রামকৃষ্ণদেবের সমক্ষে রূপার থালা পূর্ণ

করিয়া টাকা রাখা হইত, তিনি যখনই গীত শুনিয়া প্রীতির ভাব প্রকাশ করিতেন, তখনই তাহাদিগকে অঞ্জলি পূর্ব্বক টাকা দেওয়া হইত। মথুরবাবু রামকৃষ্ণদেবের ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট বারাণসী চেলী প্রদান করিতেন, সেই সকল সামগ্রী তিনি, কীর্ত্তনীয়াদিগকে প্রদান করিতে বলিতেন। মথুরবাবুর পরলোকযাত্রার সহিত রামকৃষ্ণদেবের সেই আর্থিক সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং সে সংসার হইতে আর সেরূপ কাহাকে টাকা দিতে পারিতেন না।

একদিন রামকৃষ্ণদেবের বিছানায় ছেঁড়া চাদর দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ নামক জনৈক বড়বাজারের মাড়োয়ারী কহিয়াছিলেন, "মহাশয়! আমাদের দেশের রীতি এই যে, সাধু শান্তদিগের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ধনীরা অর্থ দিয়া থাকেন। অর্থ ভিন্ন কাহারও একদিন চলে না, কিন্তু সাধুকে অর্থ অর্থ করিয়া যদ্যপি চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার মন ভগবানে থাকিতে পারে না। অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনার নামে আমি দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ লিখিয়া দিই।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন যে, "টাকার কোন প্রয়োজন নাই। ঠাকুরবাড়ী হইতে আমার চলিয়া যাইতেছে।" লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন যে, "আপনার বিছানার চাদর ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহারা এ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় নাই। অতএব পরে শ্রদ্ধা করিয়া কখন কি দিবে, সে প্রত্যাশায় না থাকিয়া আপনার নিজের টাকা হইতে অভাব মোচন করা যুক্তিসিদ্ধ এবং সুবিধা। গৃহস্থের মনের অবস্থা কখন কিরূপ থাকে, ঠিক নাই, অতএব আপনি আদেশ করুন, আমি কল্যই টাকাগুলি লইয়া আসি। যেহেতু শুভ কার্য্যের অশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।" রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ? তুমি কি জান না যে, অর্থের সম্বন্ধ থাকিলে পরমার্থ হইতে

পরিভ্রষ্ট হইতে হয়?" লক্ষ্মীনারায়ণ কহিলেন, "সে কথা জীবের পক্ষে বটে, কিন্তু আপনার তাহাতে দোষ হইবে না।" লক্ষ্মীনারায়ণ কিরূপে জানিবেন যে, জীবশিক্ষার জন্য রামকৃষ্ণদেব অভিনয় করিতেছেন। তিনি পুনরায় কহিলেন, "যদ্যপি আপনার নামে না হয়, হৃদয়ের নামে লিখিয়া দিলে কোন ক্ষতি হইবে না।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন যে, "তাহাকে বেনামী বলে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কপটতা আর কি হইবে? আমি সাধু সাজিয়া জগতে কাঞ্চনত্যাগী বলিয়া প্রকটিত হইলাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার টাকা বেনামী করিয়া রাখিলাম, ইচ্ছামত আমি তাহা খরচ করিব। তুমি পণ্ডিত হইয়া আমায় এইরূপ ঘৃণিত কার্য্যের পরামর্শ দিতেছ, কেবল পরামর্শ নহে—প্রলোভন দেখাইতেছ! তোমায় জোড়হাত করিয়া মিনতি করিতেছি, এমন কথা আর বলিও না!" লক্ষ্মীনারায়ণ তাহাতেও শুনিলেন না। তিনি অতঃপর জোর করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি যখন দশ হাজার টাকা আপনাকে প্রদান করিব মনে করিয়াছি, তখন তাহা দেওয়াই হইয়াছে। সে টাকা আপনার, আমার আর তাহাতে কোন অধিকার নাই। আপনাকে আমি দিয়া যাইব, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন।" লক্ষ্মীনারায়ণের কথা সমাধা হইতে না হইতে অমনি রামকৃষ্ণদেব সিংহ-নাদে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন—"মা! এরূপ হীন বুদ্ধির লোক আনিয়া কেন আমায় যন্ত্রণা দাও? যাহারা তোমার পাদপদ্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে চাহে, যাহারা তোমায় স্থানচ্যুত করিয়া ছার কাঞ্চন বসাইতে চাহে, তাহাদিগকে এখনই দূর করিয়া দাও। যেন তাহাদিগকে আর আমায় দেখিতে না হয়। তাহাদের দেখিলে তোমায় হারান ভাব উদ্দীপন হইয়া আমাকে অন্যমনা করিয়া ফেলিবে।" লক্ষ্মী-নারায়ণ এতক্ষণ রামকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্ত

রোদন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইবা-মাত্র অমনি প্রভু ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কাঞ্চনের সম্বন্ধ যেরূপে রাখিয়াছিলেন, তত্ত্বপথাবলম্বী প্রত্যেক নরনারীর সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেন, যেরূপ এক মাঠের জল সাঁকো দিয়া অপর মাঠে যায়, সাঁকোর ভিতরে জল জমিয়া থাকে না, সেইরূপ টাকা যেমন আসিবে, অমনি ব্যয় করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কিছু সঞ্চয় হইলেই সর্ব্বনাশ। ইহার পক্ষ বিপক্ষ অনেক বিচার আছে, তাহা সময়ান্তরে আলোচনার বিষয়।

রামকৃষ্ণদেবের অর্থ সম্বন্ধে তাৎপর্য্য এই যে, দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন না হইলে দেহরক্ষা হয় না। অতএব তাহার সংস্থান করিয়া ভগবানে মন সংলগ্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার পরিবার আছে, তাহাদেরও ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি নিজে সে বিষয়ে দৃষ্টিবিহীন ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, শব সাধনার সময়ে চাল কড়াই ভাজার প্রয়োজন হয়। শব মধ্যে মধ্যে হাঁ করে, সেই সময় সাধক বাম হস্তের দ্বারা শবের মুখে চাল ভাজা দিয়া থাকে। যখন সংসার-রূপ শবের বক্ষে বসিয়া আমাদের সাধন করিতে হইবে, তখন সে যখন যাহার জন্য হাঁ করিবে, তখন তাহাকে তাহা না দিলে সে সাধনভ্রষ্ট করিয়া দিবে। অতএব যে কেহ ঈশ্বরারাধনা করিতে চাহেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে খাবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সংসারকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে তবে সে আমা-দের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দিবে। পিতা-মাতা পুত্রের নিকটে যাহা আশা করেন, তাহাদের তাহা পূর্ণ করিতে হইবে, স্ত্রী-পুত্র যাহা আশা করে, তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে, সমাজ যাহা আশা করে, তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্যক্ষম ব্যক্তির সাধনভজন সম্বন্ধে

সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে। কথাটা নিতান্ত গুরুতর কিন্তু তাহা বলিলে কি হইবে? মোটের উপর তাৎপর্য্য এই যে, অর্থের সহিত আত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করাই রামকৃষ্ণদেবের অর্থোপার্জ্জন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য।

দৈহিক তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ কামিনী। কামিনী বলিলে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্রাদি সমুদয় বুঝিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আলোচনা করিতেছি।

বাল্যকালেই তাঁহার পিতা পরলোক যাত্রা করেন, সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। মাতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। রামকৃষ্ণদেব যখন রাসমণির কালীবাটীতে কার্য্য করিতেন, সে সময় এবং তাহার পরেও তাঁহার মাতা প্রায় নিকটে থাকিতেন। ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নী, ভাগিনেয় ইত্যাদি সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিশোরকালান্তে তিনি পরিণয় সূত্রেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সাধারণ ব্যক্তিরা যেরূপে কামিনী লইয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে সেরূপভাবে দেখা যায় নাই। তিনি পাত্র বিচার করিয়া সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং স্নেহাদি করিতেন। সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। দেশের লোকেরা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাহাদেরও বিশেষ যত্ন করিতেন।

বিবাহের পর আর তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। যদিও সময়ে সময়ে শ্বশুরালয়ে গমন করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইত, কিন্তু কার্য্য-গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। যখন যুবাকালে পতিত হন, সে সময়ে তাঁহার আর বাহ্য জগতে দৃষ্টি ছিল না। তিনি সর্ব্বদা ঐশ্বরিক ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সে সময়ে তিনি কাহারও সহিত কোন বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না, এমন কি তাঁহার নিজের দেহের প্রতিও দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজে আহার করিতে পারিতেন

না এবং শৌচ প্রস্রাবাদি ত্যাগ করিবার সময়ও বুঝিতেন না। ফলে সকলের সহিত তাঁহার দৈহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীকে তন্ত্রমতে পূজাদি করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে স্ত্রীকে আমরা যেরূপ মনে করি, তিনি তাহা করেন নাই। তিনি তাঁহাকে মাতৃস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী-জাতিকেই তিনি মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি বলিতেন যে, মেছুয়াবাজারের বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে আমার অবিদ্যা মা দণ্ডায়মান থাকেন। গৃহস্থের অন্তঃপুরে ঘোমটা দিয়া আমার বিদ্যা মা অবস্থিতি করেন। স্ত্রীজাতিতে যখন মাতৃভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার স্ত্রীতে অপর ভাব থাকা সম্ভব নহে। তিনি বলিতেন যে, একদিন গণেশ ভগবতীর ললাটদেশে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার কপাল কাটিয়াছে কেন?" ভগবতী কহিলেন, "বাছা, একটী দুরন্ত ছেলে ইট মারিয়া বিড়ালের কপাল কাটিয়া দিয়াছে। আমি সর্ব্বত্রে প্রকৃতিরূপে বিরাজ করিয়া থাকি, সুতরাং বিড়ালকে আঘাত করায় আমারই নিগ্রহ করা হইয়াছে।" গণেশ এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে, তাহা হইলে সকলেই আমার মা, সেই নিমিত্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। রামকৃষ্ণদেবও এই গণেশ ভাবে সকলকেই মাতৃজ্ঞান করিতেন।

কামিনী সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব যে প্রকার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব?

মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, প্রতিবাসী, যে কেহ হউন, সকলকে সাধ্য-সঙ্গত শ্রদ্ধা ভক্তি, সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি যে ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণদেব তবে কিজন্য স্ত্রীকে মাতৃস্থানে উপবেশন করাইয়া অপূর্ব্ব ভাব ক্রীড়া করিয়া যাইলেন?

অতি ঘোরতর সময় আসিয়াছে। কালের প্রতাপে সকলেই হীন-বীর্য্য, মস্তিষ্ক চালনা ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে। কোন মতে শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা উদরান্নের সংস্থাপন করিতে পারিলে সকল কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়। কোন কার্য্য না থাকিলে কামিনী-চিন্তাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, সুতরাং আমাদের সেই অবস্থাই ঘটিয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিঁর নিকটে কোন বিঘ্ন বাধা স্থান পায় না, কোন সম্বন্ধ স্থান পায় না। যে স্থানে মাতৃ সম্বন্ধ থাকে, যাহাকে একবার মা বলিয়া সম্বোধন করা যায়, তাহার প্রতি ভাবান্তর আসা যারপরনাই বিরল। যে কেহ তাহার বিপর্য্যয় করে, সে ব্যক্তিকে মনুষ্যশ্রেণীতে গণনা করা যায় না। সে ব্যক্তিকে মনুষ্যাকারে গর্দ্দভ বা শৃগাল ও কুক্কুরবিশেষ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। • •

আমরা কামিনী ভাবে কতদূর বিকৃত হইয়াছি, তাহা আমরা আপনাপনি আপনাদের দৈনিক কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব। রাজপথে স্ত্রীলোক দেখিলে আর আমাদের ধৈর্য্য মানে না, গঙ্গাস্নান করিতে যাইলে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টি নাই, এমন ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানে গমন করিলে তাহাদের দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার নিমিত্ত অনেকে গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং কোন কোন বাবু বায়ু সেবনের ভাণ করিয়া গঙ্গাতীরে পদশ্চালনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ঘটনা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যেকেই প্রত্যেক স্থানে দর্শন করিতেছেন। স্ত্রী-সম্ভোগ অন্যান্য সুখভোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বত্রে কথিত হয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি একেবারে সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে? স্ত্রী-সহবাসে সুখোৎ-পাদন হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই জগতে প্রত্যেক কার্য্য পরস্পর বিনিময়ে চলিতেছে। কোন সামগ্রীর প্রয়োজন হইলে

তাহার বিনিময়ে আমাদের অবশ্যই কিছু প্রদান করিতে হয়। তেমনি কামিনীসম্ভোগের বিনিময়ে আর্থিক বিনিময় দূরে থাকুক, পরমার্থ ধনের সহিত বিনিময় হয়। যাহাদের মনে সর্ব্বদা পরদারগমন-রূপ স্পৃহা বলবতী থাকে, স্ত্রী দেখিলে বা কোনস্থানে তাঁহারা আছেন জানিতে পারিলে, তাহাদের মন একেবারে সেইদিকে ধাবিত হইয়া যায়, সুতরাং সে মনে আর কোন কর্ম্ম হইতে পারে না। মনের যদ্যপি এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার সমক্ষে আপন পরিজনেরাও দাঁড়াইতে পারে না। মন অধোগামী হইলে আর সেই ব্যক্তির মনুষ্যজন্মে মনুষ্যোচিত কার্য্য না হইয়া বাস্তবিকই পশুভাবে পশুক্রিয়া দ্বারা জীবনাতিবাহিত হইয়া যায়।

কামিনীভাবে কলুষিতমনবিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয় অন্ধকারাবৃত, মরুভূমিপ্রায়। বাহিরের চাকচিক্য, হাসিখুসি, সম্পূর্ণ বাহিরের কথা; কিন্তু সংস্কার অতিশয় ভয়ানক ব্যাপার; জানিয়া শুনিয়া, প্রাণে প্রাণে, অন্তরে অন্তরে, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিয়াও তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই।

এই ভাব আমাদের এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে এবং তাহা জীবনের অবশ্য সম্ভোগের বিষয় বলিয়া এতদূর বুঝিয়াছি যে, বালক বালিকাদিগকে সেই ব্রতে ব্রতী না করিতে পারিলে দুরদৃষ্ট বলিয়া শোক করিয়া থাকি। সকলের সংস্কার এই, তাহা যাইবার নহে।

রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য বিবাহ করিয়া স্ত্রী নিকটে রাখিয়া তাঁহার সহিত স্ত্রী-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বসাধারণকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রী নিকটে থাকিলে পশু ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আবার ভাবান্তরে রাখিয়া দিনযাপন করা কঠিন কথা নহে। এক ব্যক্তির নিকট মাতা ও স্ত্রী বসিয়া আছে। মাতাও

স্ত্রীলোক, স্ত্রীও স্ত্রীলোক, কিন্তু মাতার প্রতি এক প্রকার ভাব এবং স্ত্রীর প্রতি আর এক ভাব, এস্থানে কেবল ভাবেরই কার্য্য দেখা যাইতেছে। এই ভাব মনের আশ্রয়ীভূত। অতএব যগুপি মানসিক শক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে সে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

কথিত হইয়াছে যে, পরস্পর বিনিময়ে কার্য্য হয়, স্ত্রী-গমনে শোণিত বিনিময় হয়। তদ্দ্বারা ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া সাধারণ স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য আসিয়া অধিকার করে। মস্তিষ্কের বলহীন হইলে পার্থিব কার্য্যেই অপটু হইতে হয়, পরমার্থ চিন্তা করিবে কে? অন্তবিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সাংসারিক বিষয় চিন্তা করিতে যখন শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না, সংবাদপত্র পাঠ করিতে যখন মাথা ধরে, তখন অনন্ত বিশ্বপতির চিন্তা, তাঁহার ভাব ধারণা করিতে কি সেই বীর্য্যহীন মস্তিষ্ক কখন সমর্থ হয়? যাহার পরমার্থ চিন্তার প্রয়োজন, যাহার মনুষ্যোচিত অবস্থা লাভ করিবার প্রয়োজন, তাহার হীনবীর্য্য হওয়া কখন কর্ত্তব্য নহে। হীনবীর্য্য হইলে, কোন কার্য্যই হয় না, কেহ কোন কার্য্যই করিতে পারে না, একেবারে কাপুরুষ, পুরুষাধম হইয়া যাইতে হয়। আমরা বাঙ্গালীজাতি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পৃথিবীবক্ষে এমন হীনবীর্য্য জাতি আর দ্বিতীয় নাই। শৌর্য্যবীর্য্যশালী দিব্যাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি কি বাঙ্গালীর ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়? কেন দেখিতে পাওয়া যায় না? বালকের মস্তিষ্ক সুপক্ক ও সুবিস্তীর্ণ না হইতেই তাহাকে বীর্য্যহীন করিবার নিমিত্ত, তাহাকে চিররুগ্ন করিবার নিমিত্ত, মস্তিষ্ক চালনা হইতে তাহাকে বিরত রাখিবার নিমিত্ত, পশুবৎ আহারবিহারাদি কার্য্যে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঢাক ঢোল বাজাইয়া উদ্বাহশৃঙ্খলে তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া দিয়া থাকি। আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। কিন্তু এ দেশ ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে। ডায়াবিটীস্ নাই, এমন লোক অতি বিরল, ধাতু-

দৌর্ব্বল্য নাই, এমন লোক অতি বিরল; মস্তিষ্কের পীড়া, দৃষ্টিহীনতা, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য রোগ সকলের সঙ্গের সাথী হইয়া আসিতেছে। শরীর রুগ্ন, মন ভগ্ন, মনুষ্যের আর মনুষ্যত্ব কোথায়? এই সমূহ বিপদের পরিত্রাতা রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়া কামিনীতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আমি ষোলআনা বলিলে এক আনা যদ্যপি কেহ কার্য্যে করিতে পারে, তাহা হইলেও যথেষ্ট কল্যাণ হইবে।

স্ত্রীকে মাতৃভাবে জ্ঞান করিয়া রামকৃষ্ণদেব আরও এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যুবাকাল পর্য্যন্ত কামিনী হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইলে পাছে বিভীষিকায় পতিত হইতে হয়, বিশেষতঃ তাহার প্রচুর প্রলোভনও রহিয়াছে, সেইজন্য তিনি স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব শিক্ষা করিবার ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদ্যপি বাল্যকাল হইতে স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে দেখিতে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইলে কখন কাহার পদস্খলন হইতে পারে না। শিক্ষার দ্বারা অবশ্যই সুফল ফলে, তাহার অনন্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রামকৃষ্ণদেবের কামিনী সম্বন্ধে তাৎপর্য্য এই যে, সামর্থ্যলাভ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করিলে মনুষ্যজন্মের সাফল্য হয়। তিনি তজ্জন্য বলিতেন যে, যে প্রকার কাঁঠাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে হস্তে তৈল মাখিতে হয়, তাহা হইলে আর কাঁঠালের আঠা ধরিতে পারে না, সেই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া সংসারে অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনের সম্বন্ধ স্থাপন করিলে কোন দোষ হয় না; কিম্বা যে প্রকার, যতদিন কোন গাছ ছোট থাকে, ততদিন তাহাকে বেড়া দিয়া না রাখিলে ছাগল গরুতে পাতা খাইয়া ফেলিলে তাহাকে বাড়িতে দেয় না; গাছ বড় হইয়া যাইলে তাহাতে তখন হাতি বাঁধা সাজে। সেই প্রকার ছাগল-গরু-রূপ কামিনী দ্বারা তরুণ বৃক্ষরূপ বালকের নব পল্লবরূপ মানসিক বৃত্তি মুহুর্মুহু ছেদিত

হইলে, নির্য্যাসরূপ শুক্র পতনে বৃক্ষের শুষ্কতার ন্যায় সাধারণ দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। অথবা ধূলাপড়া মন্ত্র না শিক্ষা করিলে কেহ সাপ ধরিতে পারে না। ধূলাপড়া জানিলে সর্প ধরা দূরে থাকুক, সাতটা সাপ গলায় জড়াইয়া যাইতে পারে। সেই প্রকার আত্মজ্ঞান-রূপ ধূলাপড়া শিক্ষা করিয়া কামিনীর সম্বন্ধ স্থাপন করিলে তাহার কখন অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, রামকৃষ্ণদেব কি বাস্তবিক জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন? কিন্তু সে কথা সহসা বিশ্বাস হওয়া যারপরনাই কঠিন। কারণ আমাদের যে প্রকার সংস্কার, তাহাতে কামিনী ত্যাগ করা অসম্ভব কথা। যদিও আমরা চিরসন্ন্যাসী দেখিতে পাই, কিন্তু ভিতরের ব্যাপার কে জানে? অনেক স্থলে অনেক প্রকার কথা শ্রবণ করাও যায়। এক স্থলে কাহারও কামিনী গমন হয় নাই বলিয়া স্বীকার করিলেও কামিনী-দিগের সহিত বাক্যালাপ, সর্ব্বক্ষণ কথোপকথন, তাহাদের কর্ত্তৃক সেবাদি গ্রহণ করিলে মনের অবস্থা কি হয়, তাহা প্রভুর উপদেশের দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলিতেন,

কাজল্‌কি ঘরমে কেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে॥
যুবতী কি সাৎমে, কেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া কাম যাগে পরষাগে॥

এস্থলে তিনি যে নিজে জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি?

রামকৃষ্ণদেব কস্মিন্‌কালে যুবাবস্থায় স্ত্রীলোকের সংস্রব রাখেন নাই। বলা হইয়াছে যে, এমন কি তাঁহার স্ত্রীর মুখাবলোকনও করেন নাই, এবং যে সময়ে তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রথম গমন করেন, সে সময়ে তাঁহাকে ষোড়শীরূপে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব জ্ঞাত হইবার জন্য অনেকবার অনেকে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

একবার ঠাকুরবাটীর লোকেরা কোন বারাঙ্গনাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই স্ত্রীলোক উপর্য্যুপরি কয়েক দিন তাহার মোহিনী জাল বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। রামকৃষ্ণদেব কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন, "দেখ, তুমি আমার আনন্দময়ী মা, আমি তোমার সন্তান।" বারাঙ্গনা কোন মতে না শুনিয়া রামকৃষ্ণদেবকে বার বার উত্যক্ত করে। তিনি তদনন্তর সিংহনাদে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিলেন, তদ্দর্শনে সে প্রাণভয়ে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আর একদিন সন্ধ্যার সময় দুইজন স্ত্রীলোক কাহার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন কেহই নিকটে ছিলেন না। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া তাহারা একেবারে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করে। তিনি ভয়ে মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকদ্বয় নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা তাঁহার মনোমোহন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কাহার মন হরণ করিবে? কামোদ্দীপন করিবার জন্য তাহারা নানাবিধ বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি 'মা আনন্দময়ী রক্ষা কর" বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধি অবসান হইবার পর দেখিলেন যে, তাহারা চরণে পতিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা তাঁহাকে ভীষণাবস্থায় নিপতিত করিয়া জিতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

সেই সময়ে মেছুয়াবাজারে লছমীবাঈ নাম্নী একজন সুচতুরা বারাঙ্গনা ছিল। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন ভদ্রলোক রামকৃষ্ণদেবকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সে সময়ে পূর্ণ যুবা। বারাঙ্গনার গৃহে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া ভদ্রলোক তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। লছমী প্রায় ১৫।১৬টী পূর্ণ যুবতীকে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় বসাইয়া এবং গৃহটীও সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা সুবাসিত

করিয়া রাখিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে, যে মোহিনীর ফাঁদে মহা মহা যোগী, মহা মহা ঋষি পতিত হইয়াছিলেন, যে মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিরকুমার, মহাতাপস, বীর্য্যবান, শঙ্করাচার্য্য টলটলায়মান হইয়াছিলেন, যে মোহিনীর রূপ দর্শন করিয়া বৃদ্ধ পরাশরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, অদ্য সেই মোহিনীমূর্ত্তির বাজার বসাইয়াছি। এই মনে করিয়া লছ্‌মী রামকৃষ্ণদেবের চিত্ত হরণ করিবার নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, সে সকল কথা আপনারা বুঝিয়া লউন। রামকৃষ্ণদেব গৃহে প্রবেশ করিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলকে মা আনন্দময়ী বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাহাদের মধ্যস্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে মধ্যস্থানে উপবেশন করিতে দেখিয়া বারাঙ্গনা ভাবিল যে, এইবার আর কোথায় পলাইবে? আমরা অনেক সাধু দেখিয়াছি, আমরা অনেক ভদ্রলোক দেখিয়াছি, আমরা বহুবিধ সভ্য মহাত্মাকে দেখিয়াছি, সে হিসাবে ইঁহাকে অতি সামান্য, ক্ষুদ্রতম বলিলেও বলা যায়। বাবু নিতান্ত মূর্খ। এঁর সহিত সংগ্রাম করিতে এত আয়োজন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবিক মশা মারিতে কামান পাতা হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব সকলের দিকে একবার একবার চাহিয়া দেখিলেন এবং প্রত্যেককে মা আনন্দময়ী বলিতে বলিতে প্রেমে তাঁহার জিহ্বা জড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন লছ্‌মী চক্ষের ভঙ্গি দ্বারা বলিল— বা সাধুজী! এই যে তোমার লাল পানিও চলে। রামকৃষ্ণদেব কি পানি সেবন করিতেন, তাহা বারাঙ্গনা কেমন করিয়া বুঝিবে? লছ্‌মী উলঙ্গ হইয়া যেমন বাহু প্রসারণ করিল, রামকৃষ্ণদেব অমনি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে কালী কালী বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। সেই জ্যোতিঃ দর্শন পূর্ব্বক বারাঙ্গনারা ভীত হইয়া নিজ নিজ বস্ত্র

পরিধান পূর্ব্বক কেহ বাতাস করিতে লাগিল, কেহ জল আনিতে ছুটিল, কেহ কৃতাঞ্জলিপুটে গলায় বস্ত্রাঞ্চলাগ্রভাগ প্রদানপূর্ব্বক চরণে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল, কেহ অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। লছ্মী অবাক হইয়া তাঁহার চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গম্ভীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বলিল, "প্রভু! আমি অবলা, কিছুই জানি না, কিন্তু বারাঙ্গনা হইয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া ছার চাতুরালী শিক্ষা করিয়াছি। যাহাদের লইয়া আমরা ক্রীড়া করি, সেই বারাঙ্গনা-প্রিয় হীনচেতাদিগকে আদর্শ জ্ঞানপূর্ব্বক সমুদয় জগতের লোককে সেই চক্ষে দেখি এবং সেই জ্ঞানে সকলকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। প্রভু! কখন বারাঙ্গনার ভাগ্যে এ প্রকার ঘটনা হয় নাই। কেহ এ পর্য্যন্ত এমন অবস্থায় পড়ে নাই। কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? আমরা জানি প্রভু! যে, আমাদের জন্য জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধনী, নির্ধনী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সভ্য, অসভ্য সকলেই লালায়িত। সুবিধা হয় না, সকলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না, সেইজন্য তাহারা নিকটে অগ্রসর হইতে না পারিয়া পথে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। লোক-লজ্জার নিমিত্ত অনেকে কৌশলপূর্ব্বক গাড়ির ভিতর আপনাকে লুকাইয়া দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করে। অতি সভ্য যিনি, তিনি কখন পত্রের দ্বারা আমাদের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া থাকেন এবং কখন কুলবধূর ন্যায় আবদ্ধ শকটাদি দ্বারা আসিয়া মিলিত হন। এই অবস্থায় কেমন করিয়া আপনাকে বুঝিব? প্রভু! আপনি দয়াময়, পতিতপাবন! তাহা না হইলে বাবুর কি সাধ্য যে, আপনাকে আমাদের দ্বারা পরীক্ষার নিমিত্ত আনিতে পারেন। ইহা আপনার কৌশল। প্রভুর নিকটে আমাদের যাইবার ক্ষমতা নাই, সেইজন্য কৌশলপূর্ব্বক অনাথিনী

বারবিলাসিনীদিগকে আপনি আসিয়া কৃতার্থ করিলেন। আপনি পতিতপাবন না হইলে, এই পতিতাদিগের মুখের দিকে আর কে চাহিত? প্রভু! আমরা প্রাণে প্রাণে জানি যে, আমাদের ন্যায় মহাপাতকিনী আর সৃষ্টিতে দ্বিতীয় কেহ নাই। আমাদের ইহকাল যেমন তমোময়, পরকালও তদ্রূপ, সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। আমাদের কেহ নাই! কেহ নাই! কেহ নাই! দীনবন্ধু! আপনি পাতকীর ত্রাণকর্ত্তা! তাহা না হইলে হৃদয় ভেদ করিয়া একথা বাহির হইতেছে কেন? প্রভু! কি বলিয়া আপনাকে ডাকিব, কি বলিয়া আপনাকে ডাকিলে প্রাণের কথা বাহির হয়, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। দয়াময়! আমাদের অপরাধের সীমা নাই, পরিমাণ নাই, সেজন্য নরকেও স্থান নাই। কিন্তু আপনার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, তাহার জন্য যে কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা ভাবিতে পারি না। বলুন প্রভু, বলুন! আমরা আপনাকে কিরূপে বুঝিব? বুঝাইলেন, তবে বুঝিতেছি। যাহা হয় হউক, যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে, আয়, সকলে মিলিয়া চরণে পতিত হই। আয়, সকলে মিলিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, আয়, সকলে মিলিয়া রামকৃষ্ণচরণে আশ্রয় লই।" এই বলিয়া লছ্মী রামকৃষ্ণদেবের চরণ ধারণ করিল। ধন্য লছ্মী! ধন্য তোরা! প্রভুর চরণ লাভ করা সামান্য ভাগ্যের কথা নহে। বাস্তবিক বলিয়াছিস্ যে, প্রভু আমার পতিতপাবন। যে আপনাকে পতিত মনে করে, সেই প্রভুর বিমল চরণছায়া প্রাপ্ত হইবার একমাত্র অধিকারী। এই ভাবের দ্বারা আমরা এই বুঝিলাম যে, যাবৎ মনের বলাধান না হয়, যাবৎ মন আপনার আয়ত্তাধীনে না আইসে, যাবৎ মনের ছলনায় আমরা বিচলিত এবং পরিচালিত হই, তাবৎ কামিনী সম্বন্ধ হওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।

রামকৃষ্ণদেবের জীবনতত্ত্বে যে প্রকার দৈহিক বা কামিনীকাঞ্চনের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া গেল, দেহাত্মা বা সাধন পক্ষেও সেই প্রকার অতি অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, সাধনের নাম দেহাত্মা বলা হইল কেন? যে পর্য্যন্ত কেহ দৈহিক ভাবে অবস্থিতি করেন, সে পর্য্যন্ত দেহেরই পূজা করিয়া থাকেন। দেহের সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই কামিনীকাঞ্চনের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। দৈহিক ভাব চিরকাল থাকিলে কামিনীকাঞ্চন ভাবও চিরকাল থাকিবেই থাকিবে। আশ্রয় ভিন্ন মন থাকিতে পারে না, এ কথা আমরা সকলেই অনুভব করিতে পারি।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় কথিত হইয়াছে যে, আমরা দেহ এবং আত্মার যৌগিকবিশেষ। আত্মা যতদিন দৈহিকভাবে জড়ীভূত হইয়া থাকেন, ততদিন দৈহিক কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হয় না। যখন তাঁহার স্ব স্বরূপে অর্থাৎ পরমাত্মাতে যাইবার অভিপ্রায় হয়, তখন দৈহিক ভাবের ক্রীড়ায় আর আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় নর-নারীকে মুমুক্ষু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মুমুক্ষু জীবেরা বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কামিনীকাঞ্চন হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করেন, এই কার্য্যকে সাধন কহে। দেহাত্মা বলিলে সাধনাবস্থা অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ অথবা তাহার নিগ্রহ করিবার ভাব বুঝিতে হইবে। রামকৃষ্ণতত্ত্বে এ সম্বন্ধে কি শিক্ষা করিবার আছে, তদ্বিষয়ে এক্ষণে মনোনিবেশ করিতেছি।

কথিত হইল, দেহাত্মাভাবের তাৎপর্য্য বাহির করিলে আত্মা সাক্ষাৎ বা ভগবানের দর্শন করিবার নিমিত্ত যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাঁহাকে বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ সাধনের কথা হইতেছে।

রামকৃষ্ণদেবের সাধনাদি আলোচনা করিতে যাইলে আমাদিগকে

অজ্ঞান হইতে হয়। অনেকে অনেক প্রকার সাধন করিতেছেন, অনেকে সাধনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; কিন্তু রামকৃষ্ণের ন্যায় ধারাবাহিক সাধনপন্থা কেহ কখন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অহঙ্কার বা আত্মাভিমান সাধন-পথের আবরণস্বরূপ। অভিমান না যাইলে কস্মিন্‌কালে কেহ আত্মার সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। অভিমান-বর্জ্জিত ব্যক্তি ভগবানের সন্নিহিত হইবার একমাত্র অধিকারী। যে ব্যক্তি যে জাতিই হউন, যে ভাবেরই হউন, অভিমান পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার কখন কল্যাণ হইতে পারে না। এই সাধন শিক্ষার একমাত্র স্থল রামকৃষ্ণদেব।

অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি এরূপ ভাবে কার্য্য করিতেন যে, মন্দিরের প্রত্যেক লোকে এমন কি অতি সামান্য পরিচারক পর্য্যন্ত তাঁহাকে তিরস্কার করিত, তিনি তাহাতে পরমানন্দিত হইতেন। তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পাইখানায় গমনপূর্ব্বক কখন কখন মুখে সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহা পরিস্কার করিতেন এবং মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন যে, "মা! আমি ব্রাহ্মণ, সৎকুলোদ্ভব, ভূদেবতা, এ অভিমান চূর্ণ করিয়া দে মা! আমি দীনের দীন, হীনের হীন, হাড়ী মুচী অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এইরূপ জ্ঞান দে মা! আমার আমি দূর হইয়া যাক, আমার আমি থাকিতে তোমায় পাইব না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। যতদিন আমি থাকিব, ততদিন তোমার দর্শন পাইব না। আমি বুঝিয়াছি মা, যে তোমার আমার মধ্যে অভিমানই ব্যবধানস্বরূপ। কতদিনে এই ব্যবধান দূর হইবে, কি করিলে এই অভিমান যাইবে, আমায় বলে দে মা! আমি মূর্খ, আমি শাস্ত্র জানি না, আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি না, আমার কি উপায় হইবে?" এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। তিনি কখন

কালীর মন্দিরে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া মা মা বলিয়া রোদন করিতেন। কখন গঙ্গাতীরে ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া মাতৃহীন শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত। তাঁহার কাতরতা দেখিলে অতি মূঢ় পাষণ্ডের অন্তরেও আঘাত লাগিত। কথার লালিত্য এবং মন্ত্রের পারিপাট্য তাঁহার ছিল না, তিনি অন্তর ভেদ করিয়া প্রাণের সহিত কোথায় মা! কোথায় মা! বলিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতেন। কালীর সমক্ষে যাইয়া দেখা দে মা বলিয়া কতই রোদন করিতেন। তিনি কখন কখন বলিতেন যে, "মা আমি শুনিয়াছি, তোকে যে ভাবে যে চায়, যে তোর পদাশ্রয় গ্রহণ করে, যে মা বলিয়া তোর নিকটে যায়, তুই যে তাকে দয়া করিয়া থাকিস্! মাগো! তুই যে দীনবৎসলা ভবভয়হারিণী, জগৎ-নিস্তারিণী! আমি মরি মা! কোথায় ভবানী? কোথায় কাত্যায়নী? কোথায় আমার মা? মা! তুই পাষাণের মেয়ে তুইও কি পাষাণী? কে বলে পাষাণী? তুই আমার মা—আনন্দময়ী—ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মময়ী! দেখা দে। আমি অষ্ট সিদ্ধাই চাহি না মা! আমি লোকমান্য চাহি না মা! আমি ধন চাহি না, কিছুই চাহি না। আমায় দেখা দে! শুনিয়াছি, মা তোকে যে ডাকে, সেই ত দেখা পায়, তোর যে শরণ লয়, সেই ত চরণে আশ্রয় পায়। কেন আমার প্রতি বাম হইয়াছিস্?" এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতেই একদিন তাঁহার অবস্থান্তর হইয়া যায়। তিনি আর কাহার সহিত কথা কহিতেন না, ইচ্ছামত কোথাও গমনাগমন করিতে পারিতেন না, খাওয়াইলেও খাইতে পারিতেন না। এই অবস্থা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে পাগল বলিত। বিষয়-বাতুলেরা ইহা ব্যতীত আর কি বলিবে? কামিনীকাঞ্চনের উপাসনা করিয়া, হায়রে পয়সা! হায়রে পয়সা! বলিলে পাগল হয় না, কামিনীর পদসেবা

করিলে, তাহার চরণের কীট হইলে পাগ্‌লামী হয় না, ব্রহ্মময়ী বলিয়া, ভগবতী বলিয়া, মা বলিয়া, যে কামিনীকাঞ্চন হইতে মনপ্রাণ বিচ্যুত করিতে পারে, তাহাকে পাগল বলে। রামকৃষ্ণদেব এই ভাব অপনোদন করিবার নিমিত্ত, এইরূপ পাগলামীতত্ত্বের পরিণাম কি, তিনি আপনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের ব্যবস্থাস্বরূপ সাধারণ ভাবে মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় না লইয়া সাদা কথায় কেবল অনুরাগে পাগল হওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাই শিক্ষা দিবার তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। বিষয় পাগলের পরিণাম হতাশ, ভগবানের জন্য যাহারা পাগল হয়, তাহারা তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেবের এই অবস্থা ছয়মাস থাকিয়া তদনন্তর ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব ভাব উদয় হইতে লাগিল।

তিনি অতঃপর প্রকৃত সাধনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সাধন দ্বারা কিরূপে আসক্তিবিহীন হইতে হয়, তাহার সুন্দর প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নির্জ্জন স্থানে নয়ন মুদ্রিত করিয়া মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেন, মন! কামিনীকাঞ্চন সম্ভোগ করিবে? বুঝিয়া দেখ, কামিনীকাঞ্চন কি বস্তু। হাড়ের খাঁচায় মাংসের প্রলেপ, উপরে চামড়া ঢাকা। ক্লেদাদি বহির্গমনের নিমিত্ত কয়েকটা ছিদ্র আছে। যতক্ষণ চামড়াখানা ঢাকা থাকে, ততক্ষণ তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া লোকে সেইদিকে ধাবিত হয়। কিন্তু মন! চামড়াখানা ছাড়াইয়া রমণীর বদনকান্তি নিরীক্ষণ কর দেখি! আর কি উহাকে আলিঙ্গন করিতে পার? আর কি উহার বদনসুধাকরের সুধা পান করিতে পার? পার কি না ভাবিয়া দেখ। কাঞ্চন জড় বস্তু, উহাতে কাপড় চোপড় হয়, ধান চাল হয়, বাড়ী ঘর হয়, এবং তীর্থাদি ভ্রমণ ও দানাদি সৎকার্য্যও হয়; কিন্তু মাটিতে এবং টাকাতে বিশেষ প্রভেদ কি? ইহাতে পরমার্থ লাভ হয় না, পরমার্থ লাভের নিমিত্ত অর্থের সম্বন্ধ থাকিতে পারে

না। ইহার সকল অবস্থায় ক্লেশ। অর্থোপার্জ্জন করিবার শক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত কত ক্লেশ, তাহা সকলেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া থাকেন, অর্থোপার্জ্জন করিবার ক্লেশের অবধি নাই। অর্থ গৃহে রাখিলে চোরের ভয়ে নিদ্রা হয় না, ইহা ব্যয় করিবার সময় এক একখানি হৃদয়ের অস্থি বহির্গত হইয়া যাইবার যন্ত্রণা জ্ঞান হয়। অতএব টাকা মাটি, মাটি টাকা, একই পদার্থ বলিয়া তিনি উভয় পদার্থকেই জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কামিনীকাঞ্চনের নিগ্রহ করিয়া যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বাস্তবিক কামিনীর আয়ত্তাতীত এবং কাঞ্চনের অধিকারবহির্ভূত হইয়াছিলেন। কেবল কথায় নহে, কেবল মানসিকভাবে নহে, মনকে এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, দেহের এরূপ নিগ্রহ করিয়াছিলেন যে, কামিনীকাঞ্চনের নামে তাঁহার দৈহিক স্বাভাবিক কার্য্য স্থগিত হইয়া যাইত। তিনি কোন ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেন না। জোর করিয়া কোন কোন ধাতু তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া না দিলে, তাঁহার হস্ত বাঁকিয়া চুরিয়া যাইত। তিনি ইচ্ছা করিয়া বা লোকের নিকট বুজ্‌রুকি করিবার নিমিত্ত এ প্রকার ভাণ দেখাইতেন না, আমরা এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। লজ্জাবতী লতিকার নিকট তুড়ি দিলে যেমন কুঞ্চিত হয়, কামিনীর বাতাস লাগিলে তেমনি তাঁহার দেহ শিথিল হইয়া যাইত। অবস্থাক্রমে তাহা ক্রিয়াহীন হইয়াও আসিত। এ প্রকার দেহের নিকটে কামিনীকাঞ্চন থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, রামকৃষ্ণদেব এপ্রকার ভাব প্রকাশ করিলেন কেন? দেহের এরূপ নিগ্রহ করিবার অভিপ্রায় কি? আত্মার মুক্তি সাধন করিতে হইলে দেহের নিগ্রহ অনিবার্য্য। দেহ যদ্যপি

কামিনীকাঞ্চন হইতে একেবারে পৃথক না হয়, তাহা হইলে সময়ে পদস্খলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেপ্রকার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই।

মানসিক বলের দ্বারা দেহের প্রবল গতি কখন প্রতিরোধ করা যায় না। মনের কথা দেহ শুনে না এবং দেহের কথাও মন শুনে না, রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য মনের এবং দেহের নিগ্রহ সাধন করিয়াছিলেন।

দেহ এবং মন নিগৃহীত হইলে তবে আত্মা আবরণবিহীন হইবার সুরাহা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় আত্মার মুক্তি হওয়া সম্ভব। মুক্তির নিমিত্ত যে কার্য্য হয়, তাহাকেই তৃতীয় বা আধ্যাত্মিক ভাব বলা যায়।

রামকৃষ্ণদেব এই ভাব লইয়া যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মজগতে অদ্যাপি অপ্রকাশিত ছিল। আত্মার মুক্তির নিমিত্ত যে দেশে যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে, সেই সেই দেশে সেই সেই মতে সাধকেরা কার্য্য করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে নানাবিধ মত আছে. এই নিমিত্ত দুই জনকে এক ভাবে কার্য্য করিতে দেখা যায় না। যে ব্যক্তি যে ভাবে কার্য্য করেন, সেই ব্যক্তি সেই ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। যে সকল অবতারেরা ইতিপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজ নিজ সাময়িক ভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সময়ে নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের উপাসনা করা হয় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কার্য্য করিয়া তাহা জীবের বুদ্ধিগোচর করেন নাই। রামকৃষ্ণদেবের জীবনতত্ত্বে এই বিষয়ের সম্যক মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদান্তিক মতে তিনি গুপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করের শাখাবিশেষ পুরী শ্রেণীর অন্তর্গত তোতাপুরী নামক নেংটা সাধুর দ্বারা দীক্ষিত

হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য প্রবৃত্ত হন এবং সেই সাধনে তিনি তিন দিবসে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সাধনের পূর্ব্বেই তিনি কুম্ভকাদি যোগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। তোতাপুরী রামকৃষ্ণের সমাধি দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরোধে তিন দিবস অবস্থিতি করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর একক্কালীন এগার মাস স্থান পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। এত দিন থাকিবার হেতু এই যে, যাহা কখন কেহ করিতে পারে নাই, যে অবস্থার নিমিত্ত তিনিই চুয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই দুঃসাধ্য নির্ব্বিকল্প সমাধি রামকৃষ্ণ তিন দিবসে কেমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, ইহার কারণ বহির্গত করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণকে ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া পরিশেষে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে ডুব জল ছিল না, সুতরাং পুনরায় রামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া আত্মদৌর্ব্বল্য স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

তিনি শক্তি উপাসক হইয়া কালী সাধনা করিয়াছিলেন, পরে তন্ত্রাদি মত সাধন ব্যতীত সমুদায় সাধনগুলি নিজে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধমুখ তন্ত্রের সাধনা অতীব ভয়ানক এবং তাহা জীবের দ্বারা কস্মিন্‌কালে সাধিত হইতে পারে কি না তাহা সন্দেহ, তাহাও তিনি ব্রাহ্মণীর সহায়তায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সকল সাধনবৃত্তান্তের আভাস দেওয়া নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অনধিকারীদিগের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে, এই নিমিত্ত তাহা বলিলাম না। যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই।

বৈদিক মতে পঞ্চবটি প্রস্তুত করিয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন।

অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে সেই পঞ্চবটি এবং তান্ত্রিক সাধনের পঞ্চমুণ্ডী ও বেলতলার নিদর্শন পাওয়া যায়।

তিনি রাম মন্ত্র সাধন করিবার নিমিত্ত হনুমানের ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু হনুমানের ন্যায় বিশুদ্ধ ভক্ত বিরল।

কৃষ্ণোপাসনার সময় কখন গোপিকা ও কখন শ্রীমতীর ভাবে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে এ প্রদেশের প্রচলিত প্রাচীন সমুদয় ধর্ম্মভাব সাধনের প্রক্রিয়ানুসারে গমন করিয়া রামাৎ, নিমাৎ, বৌদ্ধ, নানকপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষেরও পূর্ব্বরূপ তিন দিন করিয়া সাধন করিয়াছিলেন। অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন দিন অতীত হইবামাত্র আর এক সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধপুরুষ আসিয়া অমনি উপস্থিত হইতেন। যখন প্রকাশ্য মতের কার্য্যাদি সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন গুপ্তমতের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পূর্ব্বমত সিদ্ধ-পুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তিন দিনের হিসাবে তদ্‌সমুদয় পন্থাগুলির চরমভাব আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

হিন্দুমতের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য মতগুলির নিদান নিরূপণানন্তর তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। ভাবময়ের এই অভিনব ভাব মানসক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবামাত্র গোবিন্দদাস নামক জনৈক ব্যক্তি সহসা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিল। তাঁহার এই সাধনায়ও তিন দিবসের অধিক সময় প্রয়োজন হয় নাই।

মুসলমান ধর্ম্মের সাধনার সময় তিনি ঠিক মুসলমানদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তকে টুপি দিতেন এবং ভুলিয়াও কালী দুর্গা কিম্বা রাধা কৃষ্ণ কোন দেব দেবীর নাম উচ্চারণ করেন নাই।

পরে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময়ে আর কোন সিদ্ধপুরুষ আসেন নাই। স্বয়ং খ্রীষ্টই সে কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি একদিন অপরাহ্নকালে যতুলাল মল্লিকের উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন, তথায় মেরীর ক্রোড়শায়ী বালক খ্রীষ্টের ছবি ছিল। সেই ছবি হইতে জ্যোতিঃ আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে। তিনি সর্ব্বদা গির্জ্জা দেখিতেন, যেন গির্জ্জার ভিতরে বসিয়া আছেন, ইত্যাকার ভাবে তাঁহার তিন দিন কাটিয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার বৈধ ধর্ম্ম সাধনান্তে তিনি ব্রাহ্মদিগের সহিত দিন কয়েক আলাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপ্রবর ঠাকুর মহাশয়, তদনন্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশববাবু এবং পরিশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গোস্বামী ও শাস্ত্রী মহাশয়দিগের সহিত আনন্দ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কি মনোহর তাৎপর্য্য, তাহা যে কেহ শ্রবণ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে যদ্যপি ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র সংস্রব থাকে, তাহা হইলে তিনি আপনিই তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিবেন।

তাঁহার এই আধ্যাত্মিক অভিনয়ের দ্বারা কি জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে? ভারতবর্ষ যে দোষে কলুষিত, যে ধর্ম্মবিদ্বেষভাব ভারতবর্ষকে সাধারণ লোকসমাজে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে, যে ভ্রাতৃ-বিদ্রোহীতা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, স্বদেশে, স্বগৃহে বিচ্ছেদানলের প্রবল শিখা প্রতিনিয়ত প্রজ্জলিত রাখিয়াছে, সেই চিরদিনের উত্তাপ বিমোচনের নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব এই ধর্ম্মসমন্বয়ের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি তজ্জন্য বার বার বলিতেন যে, কাহাকে লইয়া কলহ? কাহাকে লইয়া মতভেদ? কাহাকে লইয়া বিদ্রূপ? কাহাকে

লইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ? এক অদ্বিতীয় ভগবান্ সকলের বন্ধু, সকলের পরিত্রাতা, সকলের আরামস্থল। উর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, এক আকাশ সকলের উপর অবস্থিতি করিতেছে। যাহার উর্দ্ধদৃষ্টি নাই, যে উর্দ্ধে চাহিতে জানে না, যে আপন কৃত্রিম প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে, সে কেমন করিয়া এক আকাশের জ্ঞানলাভ করিবে? নিম্নে, আমরা সীমাবিশিষ্ট বাটীতে বাস করি, সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানে পরিচালিত হই, উর্দ্ধে সেরূপ হয় না, হইবারও নহে। তেমনি অজ্ঞানে আমার তোমার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, জ্ঞানে সর্ব্বত্রে একাকার। রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ শিক্ষা এই যে, আপন বাটীর সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান রাখিয়া সর্ব্বত্রে একাকার বোধ করিতে পারিলে বিবাদ মিটিয়া যায়। অর্থাৎ আপন ভাব বজায় থাকিবে এবং সেইভাব এক অদ্বিতীয় ভাবময়ের বুঝিয়া লইতে হইবে। যেমন সকলকে এক প্রভুর ভৃত্য-জ্ঞান, এক রাজার প্রজা-জ্ঞান থাকিলে, মনিব বা রাজায় ভ্রম হয় না, মনিব বা রাজা লইয়া পরস্পর বিবাদ হয় না, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সকলেরই উপাস্য বলিয়া বোধ হইলে বিবাদ মিটিয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকটিত করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালী দ্বারা রামকৃষ্ণদেব আর একটী তত্ত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল মতে দীক্ষিত হইয়া দীক্ষানুসারে পরিচালিত হইয়াছিলেন। ইহা বর্ত্তমানকালে আমাদের শিক্ষার সামগ্রী; যে মতের যে ভাব, সেই মতের সমুদয় অনুষ্ঠান না করিলে তাহা কখনও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

ভগবান্ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া নূতন নূতন ভাব প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভাববিশেষ লইয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে।

যে ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ভূক্ত হউন, তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ের বিধি-ব্যবস্থা সম্যকরূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। তাহা না করিলে কস্মিন্‌কালে ভাবের জ্ঞান হইতে পারে না।

বর্ত্তমানকালে আমরা অতিশয় সুচতুর এবং বুদ্ধিমান হইয়াছি। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সাধনাদি ব্যতীত সহজে তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আভাস জ্ঞান জন্মিতে পারে, কিন্তু সে ভাবের বিজ্ঞান হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য সর্ব্বদা বলিতেন, বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ করা কোন কার্য্যেরই নহে। যেমন নিকটে বেলকাঁটা রাখিয়া বিচার পূর্ব্বক তাহাকে ভস্মীভূত করিলাম। মনে হইল যে, উহা আর নাই, ছাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার উপরে হস্তার্পণ করিবামাত্র অমনি বিদ্ধ হইয়া যায়। তেমনি ধর্ম্মভাবে প্রবেশ করিতে হইলে বাহ্যিক বিচারের কর্ম্ম নহে। প্রকৃত কার্য্যের প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণদেব এইরূপে সর্ব্বজীবের কল্যাণের নিমিত্ত দৈহিক, দেহাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া সাধারণের পরিত্রাণের সহজ উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বল নর-নারী দেখিলে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত এবং তাহাদিগকে বকল্‌মা দিতে বলিতেন। যাঁহারা ততদূর বিশ্বাস করিতে না পারিত, তাহাদের নিজ নিজ স্বভাবানুসারে মতবিশেষে উপাসনাদি করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন। রামকৃষ্ণদেবের এই বকল্‌মা ভাবের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, একথা বলিবার বাস্তবিক তাঁহারই অধিকার ছিল।

সকল কার্য্যের ফল আছে। সাধন-ভজনেরও প্রচুর ফল আছে। সাধারণ জীবেরা সাধনদ্বারা সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলে তাঁহারাই অদ্ভুত

কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাঁহারাই লোকের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, রামকৃষ্ণদেব সে হিসাবে যে বিপুল শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সমুদয় সাধন ফল তাঁহাতে নিহিত ছিল, তিনি তাহা হইতে অন্যের মঙ্গল করিতে পারিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যেমন আমাদের কোন ব্রতাদির ফল নিজে গ্রহণ না করিয়া বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে অর্পিত হয়। তেমনি রামকৃষ্ণদেব সমুদয় সাধন-ফল জীবের কল্যাণার্থে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানকালে জীবের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এক বেলা ভোজন না করিলে আর তাহার নাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কলির জীবের অন্নগত প্রাণ, ইহা আমাদের শাস্ত্রবাক্য। অন্ন ভিন্ন যখন জীবন কণ্ঠাগত হয়, তখন সে সাধন করিবে কি? সাধন কথা শুনিতে অতি মধুর। ষ্টুডেণ্টসিপ্ পাস করিয়া দশহাজার টাকা পারিতোষিক পাওয়ার কথা প্রত্যেক ছাত্রের যারপরনাই প্রলোভনের বিষয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কি গুরুতর ব্যাপার, তাহা মনে করিলে বুক শুকাইয়া যায়। দশ হাজারের মধ্যে একজন তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। সাধন কথাটা কথার কথা নহে। রামকৃষ্ণদেব মনুষ্যজীবনের ত্রিবিধ বিভাগের যে প্রকার ছবি দেখাইয়াছেন, তাহার ভগ্নাংশবিশেষ লইয়া যদ্যপি কেহ জীবনে প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি বীরপুরুষ, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইবার নহে। একজন দুইজন দশজন কিম্বা সহস্র জন সেরূপ হইলে কি হইবে? কোটী কোটী জীবের কল্যাণ প্রয়োজন, কোটী কোটী জীবের সদ্গতির প্রয়োজন, তাহারা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যের কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা সাধন জানে না, তাহাদের ভজন ভাল লাগে না, ভগবানের দিকে চাহিতে রুচি হয় না, তাহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত,

তাহাদিগকে এই সংসারনিরয় হইতে পরিমুক্ত করিবার জন্য রামকৃষ্ণদেব আপনি সমুদয় সাধন করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার সাধন করায় তাঁহার দিকে সর্ব্বশ্রেণীর জীবেরা ধাবিত হইতে অবশ্যই বাধ্য হইবে। যে স্থানে যে অভাব বিমোচন হয়, লোকে সেই স্থানেই গমন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকে ধর্ম্মের পিপাসা মিটাইতে রামকৃষ্ণে ধাবিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, রামকৃষ্ণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নহেন, কোন সম্প্রদায়ের নহেন, কোন জাতিবিশেষের নহেন, কোন দেশবিশেষেরও নহেন। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রার্থী, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য লালায়িত, যাঁহারা ভগবানের জ্ঞান লাভ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদেরই। আমি জোর করিয়া বলিতেছি না, তাঁহারা আপনারাই এই কথা বলিতে বাধ্য হইবেন। এইরূপ ঘটনা হয় কি না, তাহা অনেকে এই জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণতত্ত্বে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে তাঁহাকে মনুষ্য বলা যায় না। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত হইতে আধ্যাত্মিক সাধন পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিলে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া তাঁহাকে কখনই বুঝা যায় না, যেহেতু এরূপ মনুষ্য মনুষ্যসমাজে অদ্যাপি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

প্রথম। তিনি মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের রীতিবিরুদ্ধ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

দ্বিতীয়। তিনি বাল্যকালে নারায়ণ বলিয়া সাধু শান্ত কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

তৃতীয়। তিনি লেখা পড়া না শিখিয়া সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহার একটী পরিচয় দিতেছি। একদা কলিকাতার মৃত ডেপুটি কালেক্টার অধরলাল সেনের কাশিপুরনিবাসী মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সহিত তন্ত্র

সম্বন্ধীয় কোন শ্লোকের অর্থ লইয়া মতান্তর হইয়াছিল। অধরবাবু রামকৃষ্ণদেবের উপাসক ছিলেন। তিনি মহিমবাবুর বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট মহিমবাবুর সহিত যে মতভেদ হইয়াছিল, তাহা বলিবেন বলিয়া মনে করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব আপনি ঈষৎ হাস্যে সেই শ্লোকটী অন্বয় করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

চতুর্থ। তিনি কালীর পূজাকার্য্যে বেতনভোগী হইয়া মথুরবাবুর ইষ্টদেবী হইয়াছিলেন, ইহা সাধারণ মনুষ্যে কি কখন সম্ভবে? না, কেহ কখন কোনকালে এ কথা শ্রবণ করিয়াছেন? মথুরবাবু রাসমণির জামাতা এবং তাঁহার বিষয়কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিই লছ্‌মী বাঈয়ের দ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। তাঁহার সহিত ঈশ্বরের নিয়ম সম্বন্ধে একদিন বিচার হয়। মথুরবাবু এই বলিয়া তর্ক উত্থাপন করেন যে, ভগবান্ যাহা একবার করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আর তিনি কিছুই করিতে পারেন না। রামকৃষ্ণদেব তাহার উত্তর করিয়াছিলেন যে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে আর অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিও না। তিনি ইচ্ছাময়, মনে করিলে না হয় কি? মথুরবাবু পুনরায় কহিলেন, মহাশয়! এই দেখুন দেখি, লাল জবা-ফুলের গাছে লাল ফুল ফুটিবার তাঁহার নিয়ম, উহাতে কি সাদা ফুল হইতে পারে? রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। মথুরবাবু বলিতে লাগিলেন যে, আপনার বিশ্বাস এক প্রকার, আমাদের বিশ্বাস আর এক প্রকার, বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। পরদিন প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণদেব সেই জবা গাছের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া মথুরবাবুকে দেখাইলেন যে, এক বোঁটায় একটী লাল এবং আর একটী সাদা জবা ফুটিয়া রহিয়াছে। মথুরবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন যে, হয়ত দুইটি

ফুলকে কৃত্রিম কৌশলদ্বারা একত্রিত করা হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির পরাক্রমে রামকৃষ্ণের বুজরুকি বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন মথুরবাবু কহিলেন, বাবা! ইহা ভগবানের নিয়ম নহে, তাহা এখনও বলিব, কিন্তু স্বীকার করিলাম যে, ইহা আপনারই মহিমা।

কখন কখন ভোগের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণদেব তাহা ভোজন করিয়া ফেলিতেন। মন্দিরের কর্ম্মচারীরা এ বিষয় মথুরবাবুর কর্ণ-গোচর করিলে তিনি তাহাদের শাসন করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন, তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। এইরূপ স্থলে রামকৃষ্ণদেবকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

পঞ্চম। কামিনীকাঞ্চনের সংশ্রবে থাকিয়া যেরূপ তাহাদের নিগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ জীবে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না।

ষষ্ঠ। অভিমানশূন্য অর্থাৎ নির্ব্বিকার হওয়া সাধনের উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে যথেষ্ট হইবে। বিকারহীন না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, সুখ দুঃখ, চন্দন বিষ্ঠা একাকার হইলে তবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়, ইহাই শাস্ত্রের অভি-প্রায়। রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত একহস্তে চন্দন এবং একহস্তে নিজ বিষ্ঠা লইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। চন্দনের সুগন্ধে অথবা বিষ্ঠার দুর্গন্ধে মনের স্থৈর্য্যচ্যুতি হইত না। তিনি স্বচ্ছন্দে সমাহিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

একদিন মন্দিরের জনৈক কর্ম্মচারী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! (মন্দিরের লোকেরা তাঁহাকে ভট্টাচার্য্য বলিত) আপন বিষ্ঠায়

সকলেই নির্ব্বিকার, ব্রহ্মজ্ঞানী। সে কার্য্য প্রতিদিন প্রত্যেকেই করিয়া থাকে। ভট্টাচায্য মহাশয়! তুমি বেশীর মধ্যে চন্দন লইয়া থাক।” রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে, আমায় উত্তম কথাই বলিয়াছে। আপন বিষ্ঠা লইয়া সাধন করায় অভিমানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি গম্ভীরভাবে গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন। তথায় সদ্যত্যক্ত বিষ্ঠা দেখিতে পাইয়া তিনি উহা জিহ্বা দ্বারা পর পর স্পর্শ করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়া লইলেন। বিষ্ঠা বলিয়া তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হইল না। এ প্রকার নির্ব্বিকারী মনুষ্য সাধারণ জীবশ্রেণীতে কখন দেখা যায় নাই, এইজন্য তিনি সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

সপ্তম। লোকে একটী সাধন করিতে অপারক হইয়া থাকেন। যোগের অঙ্গবিশেষ লইয়া সাধন করিতে যাইলে যুগযুগান্তর কাটিয়া যায়। হটযোগের আসন করিতে করিতে অনেকের জীবনান্ত হইয়া থাকে, হরিনামের মালা জপ করিতেই সময় সঙ্কুলান হয় না, ধ্যান করিবার সময় কোথায়? এমন দুরূহ সাধন তিনি একটী দুইটী নহে, সমুদয় মতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পূর্ব্ব বক্তৃতা-দিতে দিয়াছি। এ প্রকার শক্তিমান ব্যক্তি কি কস্মিন্‌কালে কেহ দেখিয়াছেন না শ্রবণ করিয়াছেন? ঐইজন্য তিনি সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

অষ্টম। তিনি অসমর্থ দীন পতিতদিগের পরিত্রাণের ভার নিজে গ্রহণ করিতেন, ইহা মনুষ্যে সম্ভবে না, এইজন্য তিনি সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

নবম। বামদেব-সংহিতাকথিত একাধারে পূর্ণভাবের বিকাশ সম্বন্ধে যে আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা রামকৃষ্ণে দেখা যায়। তিনি

বৈশ্লেষিকের প্রক্রিয়ায় অদ্বৈত ভাব দেখাইয়াছেন, সাংশ্লেষিক ভাবে সেই অদ্বৈতের বহু বিকাশ হয় বলিয়া চৈতন্য ভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং সর্ব্বত্রে তাহার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তকালীন নিত্যানন্দের ভাব আসিতেছে। রাম ব্রহ্ম, সীতা শক্তি, এবং লক্ষণ জীব। ব্রহ্ম নিজ শক্তির দ্বারা যখন প্রকটিত হন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতি কহে এবং প্রকৃতি হইতে যে অনন্ত সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাঁহা জীবশ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ ব্রহ্ম, শক্তি এবং জীব, বা রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ। রামাবতার হইতে পরবর্ত্তী অবতারে এই ভাব পৃথক পৃথক ছিল, যথা—কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণ, রাধা এবং বলরাম, গৌরাঙ্গাবতারে রাধাকৃষ্ণ একাধারে এবং বলরাম নিত্যানন্দ রূপে, রামকৃষ্ণাবতারে এই তিনভাব একাধারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অবতারে লীলার সম্পূর্ণ হইয়াছে।

একদিকে কামিনীকাঞ্চন, আর একদিকে বিবেক-বৈরাগ্য, একদিকে যোগ, আর একদিকে ভোগ, একদিকে ভাবের খেলা, আর একদিকে একাকার রামকৃষ্ণের জীবনে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এরূপ ঘটনা জীবে দেখা যায় না, অতএব রামকৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না।

রামকৃষ্ণদেবের যে প্রকার কার্য্য বর্ণিত হইল, তাহাতে তাঁহাকে অবতার ব্যতীত মনুষ্যশ্রেণীতে কখন নিবদ্ধ করা যায় না।

সর্ব্বপ্রথমে রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণী ব্যক্ত করেন। পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। রামকৃষ্ণদেবের সাধনাবস্থায় এই স্ত্রীলোকটী আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী আমাদের এই দেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় ছিলেন। তিনি কাহার স্ত্রী, কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস, ইহা কেহ জানিত না। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র

এবং যাবতীয় গুপ্ত সাধনাদি তাঁহার আয়ত্তে ছিল। তিনি রামকৃষ্ণের সাধনকার্য্যে সহায়তা করিতেন। ব্রাহ্মণীর রামকৃষ্ণের সহিত গোপাল-ভাব ছিল। তিনি কখন কখন যশোদার ন্যায় বেশভূষা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত রূপার থালায় ক্ষীর সর লইয়া তাঁহার নিজের বিরচিত গোপালবিষয়ক গীত গান করিতে করিতে রামকৃষ্ণের গৃহাভিমুখে গমন করিতেন। গৃহের নিকটস্থ হইবামাত্র প্রায় তিনি মূর্চ্ছিতা হইতেন। তখন তাঁহার শ্রবণবিবরে গোপাল নাম উচ্চারণ না করিলে কখন সংজ্ঞা হইত না। কালীর সম্মুখে বলিদান হইলে সেই রুধিরের সরায় ছাগশোণিতাক্ত রম্ভাদি তিনি আপনি ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন। ব্রাহ্মণী কালীর স্বরূপ বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। রামকৃষ্ণদেবের নিকটে তিনি ক্রমান্বয়ে একাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণী যখন রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করেন, মথুরবাবু তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কলিকাতায় তৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈষ্ণবচরণকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। সেই সময়ে ইঁদেশের অদ্বিতীয় দিগ্‌বিজয়ী গৌরী নামক পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব মহাভাবের লক্ষণ পরম্পরা অবলোকন পূর্ব্বক ভগবান্ সম্ভাষণে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ও গৌরী, ব্রাহ্মণীর কথা অনুমোদনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণের অবতারত্ব বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণাদিসহ একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই গ্রন্থ এক্ষণে কোথায় এবং কাহার কাছে আছে, তাহার কোন নিদর্শন নাই।

রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে পণ্ডিত সাধুভক্তদিগেরই সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতেন। তাঁহাকে অবতার বলিয়া সাধারণ লোকেরা জানিতেন না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় বিজ্ঞানী সাধু ভক্তেরা তাহা জানিতেন। যখন গুপ্তভাবে রামকৃষ্ণ অবতার বলিয়া পরিচিত হইলেন, সেই সময় সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। ব্রাহ্মণী নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব হিসাবমত কেশববাবুর দ্বারা প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। কেশববাবু রামকৃষ্ণদেবের ভাবপূর্ণ উপদেশাদি মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে ছাপাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে সাধারণে জানিতে পারিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি আমাদের শত শত ধন্যবাদের পাত্র।

কেশববাবু ও তাঁহার মতাবলম্বীরা যে সময়ে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে গমনাগমন করিতেন, সে সময়ে তিনি নিজ ভাব সম্যকরূপে প্রদান করেন নাই, তজ্জন্য কেহ নির্দ্দিষ্ট উপাসকও হন নাই। তিনি কি জন্য যে, সে সময়ে ভাব সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সহজে অনুধাবন করা যায় না। বোধ হয়, সময় হয় নাই, ইহা ভিন্ন অন্য কথা আর কি বলা যাইবে? পরে ইংরাজী ১৮৭৯ সাল হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপাসকের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই উপাসকেরা ক্রমে ক্রমে দল পুষ্টি হইয়া এক্ষণে প্রায় এই ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই কার্য্য করিতেছেন এবং তাহারা গণনার অতীত হইয়া গিয়াছেন।

উপাসকবৃন্দ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া রামকৃষ্ণদেব কণ্ঠদেশে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য

তাঁহার উপাসকেরা তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। কলিকাতায় আসিলে চিকিৎসার জন্য সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়েরা চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতে আসিয়া তত্ত্ব নিরূপণে কখন কখন সমুদয় দিবা, কখন কখন রাত্র দশটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া যাইতেন। লোকে লোকারণ্য হইত। এই সময়ে কালীপূজার দিন উপস্থিত হয়। তিনি সেইদিন প্রাতঃকালে জনৈক ভক্তকে ডাকিয়া বলেন যে, অদ্য মহামায়ার পূজার দিন, তোমরা পূজার আয়োজন করিও। ভক্তেরা তাহাই করিলেন। সন্ধ্যার পর জনাকীর্ণ হইয়া গেল। পূজার সামগ্রীসকল তাঁহার সম্মুখে সাজাইয়া সকলে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার দুইদিকে দুইটী সুবৃহৎ মোমের বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দুই দিকে দুইটী সুবৃহৎ ধূপ হইতে সুগন্ধ ধূমোত্থিত হইতেছিল, সে সময়ে তিনি কি অপূর্ব্ব ভাবে শোভা পাইতেছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে বাক্য পরাজয় হইয়া যায়। অপূর্ব্ব রূপ বলিলে যদ্যপি কোন ভাব লাভ করা যায়, তদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন। কিয়ৎকাল সকলে অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তিনি পূজা করিলেন না। তখন এই দাস গিরিশবাবুকে কহিল, তুমি কি বুঝিতেছ? প্রভু অদ্য আমাদের এই মানব-জীবন সার্থক করিবার জন্য এই আয়োজন করাইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা রামকৃষ্ণের পূজা করি। এই কথা আমার মুখবিনিঃসৃত হইবামাত্র সিংহনাদে সমুদয় ভক্ত "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প বিল্বদল তাঁহার পাদপদ্মে দিতে লাগিল। রামকৃষ্ণনিনাদে দিক কম্পিত হইতে লাগিল, সকলে উন্মাদবৎ হইয়া পড়িল। রামকৃষ্ণদেবের চরণে পুষ্পাগুলি দিবা-মাত্র তিনি আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার উভয়

হস্ত বরাভয় ভাবে পরিণত হইল। আনন্দময়ী, ব্রহ্মময়ী রোলে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ উৰ্দ্ধবাহু হইয়া, কেহ করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভুর ভাবাবসান প্রায় বুঝিয়া আমি ভোজ্যপাত্রগুলি একে একে তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলাম। দয়াময় দয়া করিয়া দুই হস্তদ্বারা তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কণ্ঠের পীড়ার জন্য প্রভু আমার অন্য কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। অদ্য সে ব্যাধি কোথায় গেল! যে গলদেশ দিয়া ক্লেশে দুগ্ধ প্রবেশ করিত, সেই গলদেশে লুচি প্রভৃতি চলিয়া গেল। পরে সুজির পাত্র ধরিলাম, তিনি তাহাও প্রীতিপূর্ণভাবে ভক্ষণ করিলেন। পরিশেষে তাম্বূলগুলিও দুই হস্তে উত্তোলনপূর্ব্বক বদনে প্রবিষ্ট করাইলেন। আনন্দের আর অবধি রহিল না। সেই মূৰ্ত্তি, সেই দিনের ঘটনা, এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই রূপ কি ইহজগতে কেহ দেখিয়াছেন? সেই আনন্দময়ীর ভাব কি সুন্দর! যে দেখিয়াছে, সেই জানে, তাহা বলা যায় না, বুঝান যায় না।

অতঃপর কলিকাতা হইতে তাঁহাকে কাশীপুরের উদ্যানে পরিবর্ত্তন করা যায়। এইস্থানে আটমাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কাশীপুরে তিনি যে কত রঙ্গ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে যুগপ্রমাণকাল কাটিয়া যায়। যদ্যপি তাঁহার ইচ্ছা হয়, ক্রমে তাহা প্রকাশ করিব।

তাঁহার ব্যাধির কোনপ্রকার উপকার না হওয়ায় কোন কোন ভক্তেরা তারকনাথের উপবাস করিত, কেহ বা তাঁহাকেই তাঁহার কল্যাণের জন্য জানাইত। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, একদিন কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহিল, "প্রভু! কি জন্য এরূপ ব্যাধির ভাণ করিয়াছেন? আমরা বিধিমত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কেহই রোগের কিছু করিতে পারিলেন না। আমরা এক্ষণে

বুঝিয়াছি যে, আপনি নিজে আপনার ব্যবস্থা না করিলে আর উপায় নাই।" তিনি নানাবিধ রহস্য করিতে লাগিলেন। যখন ভক্তেরা বার বার তাঁহাকে অনুরোধ করিল, তখন তিনি কহিলেন যে, "ব্যাধির হেতু তোমরা এখনও বুঝিতে পার নাই। প্রত্যেক কার্য্যের ফল আছে। সৎকার্য্যের সুফল, অসৎ কার্য্যের কুফল, কার্য্যানুসারে ফলাফল ভোগ করিতে হয়। তোমরা যে সকল অসৎ কার্য্য করিয়াছ, যে সকল পাপ করিয়াছ, যদ্যপি তোমাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ অতিশয় ভয়ানক হইবে। কিন্তু কার্য্যের ফল ভোগ করা ভগবানের নিয়ম, সুতরাং তোমাদের সেই পাপরাশি আমি অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যেদিন বকল্মা দিয়াছ, সেইদিন হইতে তোমাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ। পাপ বিমোচন না হইলে, শরীর শুদ্ধ না হইলে, ভগবানের সম্বন্ধ হইতে পারে না। মানবদেহে পাপের ভোগ ভুগিতে হয়, এই নিমিত্ত আমার শরীরে ব্যাধি হইয়াছে। আমার এই ব্যাধি দ্বারা তোমরা পাপ বিবর্জ্জিত হইয়াছ এবং যে কেহ আমাকে আত্মসমর্পণ করিবে, তাহারাও পরিমুক্ত হইবে। অতএব তাহাদের পাপের ভোগও আমি সম্ভোগ করিয়া যাইলাম।" আমরা তখন যদিও এই সকল কথা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তাহা উপলব্ধি হইল না। মনে হইল যে, কি রহস্য করিতেছেন।

রামকৃষ্ণদেব এইরূপে ব্যাধির ছলনায় দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসক, নানাপ্রকার সাধু, নানাবিধ সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তিনি কোনদিন নির্ব্যাধি হইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, কোনদিন তাঁহার কণ্ঠস্থিত ক্ষতস্থান হইতে কলসী কলসী শোণিত বহির্গত হইত; রহস্যের

বিষয় এই যে, চিকিৎসকেরা যেদিন যে উপসর্গ প্রতিকার করিবার জন্য যে ঔষধ প্রদান করিতেন, সেদিন সেই উপসর্গই বৃদ্ধি হইত। তাঁহার শরীরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ পর্য্যন্ত সহ্য হইত না। একটী দানা সেবন করিলে সর্ব্বশরীর বিকৃত হইয়া উঠিত। এই নিমিত্ত কোন চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করিতে সাহস করিতেন না।

বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নিকটে নানাপ্রকার লোকের সমাগম হইত এবং প্রায় সকলেই কৃতার্থ হইয়া যাইত। পরে ইংরাজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে তিনি কল্পতরু হইয়াছিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় আমরা সকলে উদ্যানের প্রান্তবিশেষে পরস্পর নানাবিধ প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে তাঁহাকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম। সকলে এক দৃষ্টিতে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত ছিল, সুতরাং বদন ব্যতীত দেখিবার আর কিছুই ছিল না। সেদিন তাঁহার কি শোভাই হইয়াছিল, তাঁহার কি অপূর্ব্ব রূপই দেখিয়াছিলাম, সে রূপ বর্ণনাতীত। তিনি ক্রমে ক্রমে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমাদের আমি আর কি বলিব! আমি বলিতেছি যে, সকলের চৈতন্য হউক!" এই কথা বলিয়া তিনি এক এক জনের বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। সকলেই উন্মাদবৎ হইয়া পড়িল; সেদিন আমরা যাহাকে দেখিলাম, তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিলাম, তাহাকেই তিনি কৃপা করিতে লাগিলেন। প্রভু কল্পতরু হইয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দে মাতিয়া উঠিলাম। এমন জীবদুর্লভ দিন আর হইবে না বলিয়া, কে কোথায় আছে ভাবিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। রামকৃষ্ণের

জয়ধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ভক্তেরা অবিরত পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন, আনন্দের পারাবার উথলিয়া উঠিল। তিনি এতাবৎ-কাল ভাবাবেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তদনন্তর ভাবাবসান হইলে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর একদিন নিভৃতে এই ভৃত্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বল দেখি, আমাকে তোমরা কত কি বলিয়া থাক, কিন্তু আমি যদ্যপি তাহাই হইব, তবে আমার এ দুর্দ্দশা কেন? গলায় ঘা, শরীর রুগ্ন, ইহার হেতু কি? গৌরাঙ্গের কত রূপ ছিল, বিদ্যা ছিল, অলৌকিক শক্তি ছিল, আমার সে সকল শক্তি নাই কেন? সেরূপ রূপ নাই কেন? সেরূপ বিদ্যা নাই কেন? আরও বলিতে পার, দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিবার কারণ কি?" প্রভুর এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, "প্রভু! এ আবার আপনার কি রহস্য? আপনার কার্য্যের কারণ বাহির করা কি একজন দাসানুদাসের সাধ্য হইতে পারে? কিন্তু আপনি যখন আদেশ করিয়াছেন, তখন আপনার চরণযুগল স্মরণ করিয়া বলিতেছি, যদ্যপি বলিবার শক্তি দেন, তবে অবশ্যই বলিতে পারিব। আপনি আমায় বুঝাইয়াছেন যে, স্থূলে লীলার কার্য্যে কস্মিন্‌কালে এক প্রকার হয় না। যখন যেমন সময়, তখন সেই কালোপযোগী কার্য্য করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গদেব যেরূপ প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই অবতারে সেরূপ ভাবে কার্য্য চলিতে পারে না। প্রভু! বলিতে কি, যদ্যপি রূপ এবং অলৌকিক শক্তি জীব উদ্ধারের একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে আমরা বহুদিন পূর্ব্বে সাধুত্তম হইয়া যাইতাম। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, খৃষ্ট ইত্যাদি সমুদয় অবতারদিগের অসীম শক্তি ও রূপলাবণ্যাদি লইয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সে সকল কাহিনী বালককাল হইতে শুনিয়া

আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই কেন? আপনি সাধু এই শুনিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন, আপনি বলিতে পারেন। যে স্থানে ভগবান্‌কে বসাইব মনে করিয়াছিলাম, সেই স্থানে আপনি যাইয়া বসিয়াছেন। আপনাকে দূরীভূত করিয়া পরমেশ্বরকে তথায় বসাইব বলিয়া কত চেষ্টা করিয়াছি, কত বিচার করিয়াছি, পণ্ডিতের নিকট আপনাকে ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাদের দ্বারা আমাদের এই দৌর্ব্বল্য বিনাশের নিমিত্ত কত বাদানুবাদ করিয়াছি, কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত আপনাকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন নাই। কাহারও বিদ্যা, বুদ্ধি এবং মীমাংসায় তাহার অপ্রমাণ হয় নাই। সুতরাং কি করিব! কাজেই আপনাকে ভগবান্ বলিতে বাধ্য হইয়াছি।"

"আপনি বলিয়াছেন, যেমন বিষয়সম্পন্না স্ত্রীলোকেরা চিক আশ্রয় করিয়া বিষয়কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, আপনিও সেইরূপ ভাবে লীলা করিতেছেন। আপনার বাহিরের আবরণ, বাহিরের লোকেরা ব্যাধি দেখিয়া পলায়ন করিবে; কিন্তু যে ভাগ্যবান আপনার কৃপাকণা লাভ করিবে, সেই আপনার লীলারহস্য বুঝিয়া যাইবে। প্রভু! আপনি বাহিরের কয়েকটী কথা বলিয়া আমাদের ভুলাইতেছেন, কিম্বা তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন, তাহা আপনিই জানেন, তবে আমার মনে হইতেছে যে, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা কিম্বা গৌরাঙ্গলীলায় যে সকল বিরহকাহিনী উল্লিখিত আছে, তদ্দ্বারা ভগবানের ভাব কি প্রাপ্ত হওয়া যায়? হাসা কাঁদা মনুষ্যের লীলা, তাঁহারা সেই লীলার দ্বারা যখন ভগবান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তখন আপনার এই ব্যাধি কি লীলার হিসাব নহে? বিশেষতঃ তাহার কারণ আপনিই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।"

"দক্ষিণেশ্বর হইতে যেদিন বাহির হইয়াছেন, প্রভু! সেইদিন সাধারণ জীবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। ব্যাধির ছলনায় সহস্র সহস্র নরনারী আপনার চরণ দর্শন লাভ করিল।" রামকৃষ্ণদেব অতঃপর কহিলেন, এ সকল তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত বলিতেছ। প্রভু-প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলাম যে, "ঠাকুর! আর কথা বাড়াইবেন না। আমার বিশ্বাসকে আপনি গণনা করিলেন, এইজন্য আপনাকে ভগবান্ বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমি পাষণ্ড, বর্ব্বর এবং অবিশ্বাসীর শিরোমণি ছিলাম, মনুষ্যকে ভগবান্ বলিব! হৃদয়ে কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য ভগবান্ নিজেই অনুসন্ধান করিতেছিলেন, আমি বিশ্বাসী হইয়া অদ্য আপনাকে ভগবান্‌পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম! প্রভু! ভাল, সেই বলই দিন, সেই শক্তিই দিন, যেন তাহাই করিতে পারি। আমার বিশ্বাসে যদ্যপি আপনি মনুষ্য হইয়া ভগবান্ হইয়া যান, ইহা আপনার সামান্য লীলা নহে। ঠাকুর! ভগবান্‌কেই কত পরিচয় কত প্রমাণ দিয়া তবে মনুষ্যের নিকটে দাঁড়াইতে হয়, আর মনুষ্যে মনুষ্যকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করিলে সকলেই তাহা স্বীকার করিবে? আপনি সকল কথাই বলিতে পারেন। যাহা বলেন, তাহাই শোভা পায়।" রামকৃষ্ণদেব তথাপি বলিতে লাগিলেন যে, "আমার কি সাধ হয় না যে, একটু স্বচ্ছন্দে থাকি?" আমি বলিলাম যে, "আর আপনার কথার উত্তর দেওয়া আমাদের বিড়ম্বনা। তবে একটী কথা স্মরণ হইতেছে, বলিয়া চুপ করি। ঠাকুর! আপনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যার সময়ে আপনার গৃহের পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'যে কেহ কিসে ভগবান্‌কে জানিতে পারিব, কিসে জ্ঞান হইবে, কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া আসিবে, তাহারই বাসনা সিদ্ধ হইবে।' আপনি পুনরায় জোর করিয়া বলিয়াছেন, 'ওগো

বাবুরা, তাহারই বাসনা সিদ্ধ হইবে।' একথা ঠাকুর! কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারে? কে এমন সিদ্ধপুরুষ আছেন, যাঁহার এই কথা বলিতে সাহস হয়? আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, সাধনহীন, ভজনহীন, পাষণ্ড লোকগুলো দিন দিন কি হইয়া যাইতেছে, এ সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়াও আপনাতে ভ্রম জন্মিবে? যদ্যপি আপনি তাহা কহেন, উপায় নাই। আর আপনি বার বার রোগের কথা উল্লেখ করিতেছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি, বৃন্দাবনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দশম দশায় পতিত হইয়া ক্লেশের অবধি রাখেন নাই। তাঁহার একদিনের ক্লেশ কি জীব সহ্য করিতে পারে? রাধা এইরূপ নরলীলা করিয়াছিলেন বলিয়া কি তিনি কৃষ্ণছাড়া ছিলেন? আপনিই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ।" এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার বদন আরক্তিম হইয়া উঠিল, ভাবাবেশের লক্ষণ প্রকাশিত হইবামাত্র কথা সমাপ্ত হইয়া যাইল।

ভক্তদিগের নিকটে এইরূপে নানাপ্রকার ভাবের ক্রীড়া করিয়া ১৮০৮ শকের (১২৯৩ সাল) ৩১শে শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ তিথির সঞ্চার হইবামাত্র তিনি লীলারঙ্গভূমির যবনিকা নিপতিত করেন। হায়! অদ্য সেই কাল প্রতিপদ তিথি আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, সেই দিনের ভীষণ ছবি হৃদয়ে ঘন ঘন নৃত্য করিতেছে। সেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ আমাদের রামকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছে! প্রতিপদের সহিত যে আমাদের কি শত্রুতা ছিল যে, সে আমাদের পরম রতন অমূল্য নিধি হইতে জন্মের মত বঞ্চিত করিয়াছে! আর তেমন মধুমাখা কথা শুনিবার উপায় নাই! আর তেমন করিয়া নয়ন ভরিয়া দর্শন সুখলাভ করিবার উপায় নাই! মনে বড় আক্ষেপ রহিল যে, এমন দেবদুর্লভ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যদিই কলির জীবের ভাগ্যে অবনী-

মণ্ডলে আসিলেন, কিন্তু জীব তাহা দর্শন করিয়া মানবজীবন সার্থক করিতে পারিল না! প্রভু! আমার বড় সাধ ছিল যে, আজকাল লোকে যেমন ভগবান্ মানিতে চাহে না, যেমন ভগবান্‌কে নিরাকার বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তেমনি প্রত্যেক জনকে ডাকিয়া আনিয়া, না আসিলে অনুরোধ করিয়া, তাহাতেও না আসিলে হাতে ধরিয়া, তাহাতেও অগ্রাহ্য করিলে পায়ে ধরিয়া আনিয়া ভুবনমোহন রূপ দেখাইব! হায়! সে আশায় বঞ্চিত হইলাম! এই বড় দুঃখ রহিল যে, এত শীঘ্র পলায়ন করিবেন, তাহা একদিনও ভাবি নাই। তাহা হইলে প্রাণপণে আরও চেষ্টা করিতাম। অনেক দুঃখে ভগবানের কৃপা পাইয়াছিলাম। ভগবান্‌কে জানিবার জন্য যে কি ক্লেশ পাইয়াছিলাম, তাহা আমি প্রাণে প্রাণে জানি। ভগবানের তত্ত্বলাভ করিতে যে কত আঘাত পাইয়াছি, তাহা আমার প্রাণে অদ্যাপি রহিয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকে সাধারণে জানাইবার জন্য আমার অত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু কি করিব, ভগবানের ইচ্ছার উপরে আমাদের ইচ্ছা কার্য্য করিতে পারে না।

প্রভুর লীলাবসান হইলে তাঁহার অস্থিগুলি এক সপ্তাহকাল কাশিপুরের উদ্যানে রাখিয়া, পরে জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে তাহা সমাহিত করিয়া তথায় নিত্য পূজাদি হইতেছে এবং প্রতি বৎসর এই প্রতিপদ তিথি হইতে জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত তথায় বিশেষ পূজাদি হয় ও শেষ দিবসে তথায় প্রভুর **নিত্যাবির্ভাব** নিমিত্ত **রামকৃষ্ণোৎসব** হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব যদিও মানবলীলা পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কার্য্য হইতেছে। আমরা যদিও তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া সময় সময় কাতর হইয়া থাকি, কিন্তু এক্ষণে তিনি যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তদ্দ্বারা আক্ষেপ

করিবার কিছুই নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমা অপেক্ষা আমার নাম বড়। নামেই সকল সাধ মিটিবে। সেই রামকৃষ্ণ নামের যে মহিমা, তাহা প্রাণে প্রাণে সম্ভোগ করিতেছি এবং যাঁহারা বাস্তবিক ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহারাও বুঝিয়া লইতেছেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পাইয়াছি এবং পাইতেছি।

রামকৃষ্ণতত্ত্ব অসীম এবং অনন্ত। বলিয়াছি যে, রামকৃষ্ণ সকলের, কি গৃহী কি সন্ন্যাসী, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি সাধু কি অসাধু, রামকৃষ্ণ সকলেরই পরম আদরের বস্তু। কেমন করিয়া গৃহী হইলে প্রকৃত সাংসারিক সুখে সুখী হওয়া যায়, রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত, কেমন করিয়া যোগ করিলে যোগী হওয়া যায়, রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত, কেমন করিয়া সাধন করিলে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়, রামকৃষ্ণ তাহার আদর্শ, কেমন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে হয়, রামকৃষ্ণ তাহার গুরু, কেমন করিয়া সকলের সহিত মিলিত হইতে হয়, রামকৃষ্ণই তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থান।

রামকৃষ্ণকে যখন আমরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব, যখন আমরা রামকৃষ্ণের রহস্যভেদ করিব, তখনই আমাদের দুঃখ বিমোচন হইবে, তখনই আমাদের মধ্যে সদ্ভাব উপস্থিত হইবে, তখনই আমাদের পরস্পরের দ্বেষাদ্বেষী বিদূরিত হইয়া এই দুঃখময় সংসার আনন্দের হাট হইয়া যাইবে। ভাইরে! কে কয় দিনের জন্য সংসারে আসিয়াছি, কখন আছি কখন নাই, বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? ভালমন্দ লইয়া বিচারের প্রয়োজন কি? আপনার কি হইল, কেমন করিয়া দিন কাটাইলাম, পরিণামে কি হইবে, তাহার চিন্তা করিবারই সময় নাই, অনর্থক পরচর্চ্চার প্রয়োজন কি? অভিমান চূর্ণ করিয়া আপনাকে ভগবানের দাস জানিয়া দিনকটা কাটাইয়া যাইতে পারিলে ইহজগতে ধন্য হইয়া যাইব।

রামকৃষ্ণদেব অবতার এবং তাঁহার ভাবই ভবিষ্যৎ কালের ধর্ম্মভাব হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা অন্যভাবে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও রামকৃষ্ণের সহায়তা লইয়া ইষ্টদর্শন করিতে হইবে। যেহেতু তিনি বর্ত্তমান কালের একচ্ছত্রী রাজা। যেমন গোপাঙ্গনারা কাত্যায়নী ব্রত করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেবের শরণাগত হইলে তেমনি সহজে মনোসাধ পূর্ণ হইবে। যাঁহারা কর্ম্মী সাধক, তাঁহাদিগকে আমি একথা বলিতেছি না। যাঁহারা অসমর্থ, যাঁহারা সাধনভজনবিহীন, যাঁহারা ইষ্টমন্ত্র লইয়া তাঁহাকে বিষয়ে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা সুপরামর্শ, তাহার সন্দেহ নাই। অভিমানে গঠিত হইয়া যাঁহারা একথা তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিবেন, পরিণামে তাঁহারা ঠকিয়া যাইবেন। যেমন অনেকে সুবিধাসত্ত্বে তাঁহাকে দর্শন করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা অনুশোচনা করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকেও পরিতাপ করিতে হইবে। যাঁহারা আমাদের ন্যায় দীনহীন, যাঁহারা আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল, তাঁহারা রামকৃষ্ণকে অবলম্বন করুন, দেখিবেন, নামের গুণে কি হয় বা না হয়। কথার কথা নহে, বাক্‌চাতুরীর কর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম প্রাণের জিনিস, উপলব্ধির বিষয়। রামকৃষ্ণ নাম একবার বলিয়া দেখ, মনের শান্তি হয় কি না? রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাক, মনের অভিলাষ পূর্ণ হয় কি না? রামকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ, তাঁহার দর্শন লাভ হয় কি না? তিনি এখনও দেখা দেন ও ভক্তেরা এখনও দেখা পান। যে কাঁদে, যে রামকৃষ্ণ বলিয়া কাতর হয়, যে রামকৃষ্ণ বলিয়া জলে ঝাঁপ দিতে যায়, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দেন। এই যে যুবকবৃন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী হইয়া রামকৃষ্ণের দাস হইয়াছে, ইহারা কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত, কেবল কথায় উহারা এরূপ হয় নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী ফল লাভ করিয়া তবে রামকৃষ্ণ নামের

মহিমা প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাই বলিতেছি, আইস, আমরা আজ বিশেষ দিনে প্রভু রামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি।

গীত

(১)

চরণে শরণ চাহি বিষম এ দায়।
তোমার মহিমা গান তুমি হে সহায়।
তব তত্ত্ব নিরূপণ, মোরা সে শকতি হীন,
বিনা কৃপা বরিষণ বিফল উপায়॥
জীব দুঃখ বিমোচন, যুগে যুগে আগমন,
আছি হে পতিতজন তোমার আশায়॥

(২)

বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল।
তত্ত্ব লাভের বিড়ম্বনা দ্বৈতভাবের বিবাদ গেল॥
রামকৃষ্ণ একাকার, এ নব ভাবে প্রচার, এক অনন্ত সবার মূলাধার,
যে যা বলে তাতেই মিলে এক জনার খেলা সকল॥
যে কালী সে বনমালী, হরি বলি ঈশাই বলি,
আল্লা ব'লে মোল্লা ভজায় কর্ত্তাভজায় সেই কেবল,
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল॥

(৩)

দেখি মা তোর রূপের ছবি এমন রূপ ত আর দেখিনি।
ভয়ঙ্করা রুধিরধারা নয় অসিধরা ত্রিনয়নী॥
রণবেশে ডরে ছেলে, সে সাজ কি তাই লুকাইলে,
সন্তানে অভয় দিলে বরাভয় প্রদায়িনী॥
কি দোষে ভোলারে ভুলে, রাখনি আজ পদতলে,
শিবকে ফেলে বুঝি শিবে দিলে আমায় চরণখানি॥

(৪)

হাসিমুখ ভুলি নাই ভুলিবনা জীবন থাকিতে।
পড়ে মনে সেদিনের কথা, যে দিন দীন ব'লে চরণ দিলে ॥
হায় সেই এক দিন আর এই এক দিন হে,
আঁখিবারি নারি নিবারিতে ॥
শত অপরাধী পদে না হলে কি বিপদে
ফেলিয়ে যে গেলে চলে, মুখ না চাহিলে।
ব'লেছিলে আমা হ'তে, নামের মহিমা ভারি,
রামকৃষ্ণ নাম (জীব তরাতে) রেখে গেলে হে,
হয়ে নিদয় কাঁদাও কেন আশ্রিতে ॥

(৫)

এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের তরে।
আয় ভিখারী, ত্বরা করি, প্রেম নিবি আয় প্রাণ ভরে ॥
দীনের মাঝে দীননাথ দীনে নাম বিলায়,
দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে মুখের পানে চায়,
পাপী তাপী কে আছিস রে আয়, (বলে),
ভয় কিরে আর আমারি ভার, বকল্‌মা দে আমারে ॥

(৬)

জীবের তরে বারে বারে শরীর ধারণ।
দীনের দুঃখে সদাই দুঃখী দুঃখনিবারণ ॥
সংসার সন্তাপে সদা রয়েছ যে নিমগন,
নামটী স্মরণ কররে ভাই নাই সাধন ভজন,
পাওনি যেজন ইষ্টধনে কররে রামকৃষ্ণ শরণ—
রামকৃষ্ণ ব'লে ইষ্ট মিলে, হবে সফল জীবন।

ষষ্ঠ বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

সপ্তম বক্তৃতা

ব্রহ্ম-শক্তি

১৩০০ সাল, ১৬ই আশ্বিন, রবিবার, প্রাতঃ
৮ ঘটিকায় ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

---

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

(৪)

হাসিমুখ ভুলি নাই ভুলিবনা জীবন থাকিতে।
পড়ে মনে সেদিনের কথা, যে দিন দীন ব'লে চরণ দিলে॥
হায় সেই এক দিন আর এই এক দিন হে,
আঁখিবারি নারি নিবারিতে॥
শত অপরাধী পদে না হলে কি বিপদে
ফেলিয়ে যে গেলে চলে, মুখ না চাহিলে।
ব'লেছিলে আমা হ'তে, নামের মহিমা ভারি,
রামকৃষ্ণ নাম (জীব তরাতে) রেখে গেলে হে,
হয়ে নিদয় কাঁদাও কেন আশ্রিতে॥

(৫)

এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের তরে।
আয় ভিখারী, ত্বরা করি, প্রেম নিবি আয় প্রাণ ভরে॥
দীনের মাঝে দীননাথ দীনে নাম বিলায়,
দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে মুখের পানে চায়,
পাপী তাপী কে আছিস রে আয়, (বলে),
ভয় কিরে আর আমারি ভার, বকল্‌মা দে আমারে॥

(৬)

জীবের তরে বারে বারে শরীর ধারণ।
দীনের দুঃখে সদাই দুঃখী দুঃখনিবারণ॥
সংসার সন্তাপে সদা রয়েছ যে নিমগন,
নামটী স্মরণ কররে ভাই নাই সাধন ভজন,
পাওনি যেজন ইষ্টধনে কররে রামকৃষ্ণ শরণ—
রামকৃষ্ণ ব'লে ইষ্ট মিলে, হবে সফল জীবন।

ষষ্ঠ বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

সপ্তম বক্তৃতা

ব্রহ্ম-শক্তি

১৩০০ সাল, ১৬ই আশ্বিন, রবিবার, প্রাতঃ
৮ ঘটিকায় ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত।

---

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

ব্রহ্ম-শক্তি

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম্।

অদ্য যে প্রস্তাব লইয়া আমি আলোচনা করিতে আসিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মনুষ্যের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হইলেও উহা অতিশয় গভীরতম এবং সাধারণের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নহে। ব্রহ্ম-শক্তি সম্বন্ধে চিরকাল বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ ব্রহ্ম, কেহ শক্তি এবং কেহ ব্রহ্ম-শক্তির যৌগিক ভাব স্বীকার করেন। যাঁহারা যে মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা সেই মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে পরস্পরের সম্পূর্ণ মতান্তর এবং ভাবান্তর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ব্রহ্মবাদীরা শক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা সচ্চিদানন্দের সৎকেই নিত্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে ব্রহ্ম শব্দ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চিদানন্দকে মায়া বলিয়া পরিত্যাগ করেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানীরা সাকার রূপাদি মানেন না এবং ভক্তির উচ্ছ্বাসাদি যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। চিদানন্দ বা সাকারবিশ্বাসীরা সাকারেই ব্রহ্ম-শক্তি একাকার করিয়া থাকেন। যেমন শিব দুর্গা, শিব পুরুষ বা ব্রহ্ম, দুর্গা প্রকৃতি বা শক্তি, অথবা কৃষ্ণ পুরুষ বা ব্রহ্ম, রাধা প্রকৃতি বা শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। শিবদুর্গা বা রাধাকৃষ্ণে পুরুষ-প্রকৃতি বা ব্রহ্ম-শক্তি ভাব

থাকিলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি দেখা যায়। যেহেতু শিবদুর্গা বা রাধাকৃষ্ণ স্ত্রীপুরুষ ভাবে সংগঠিত হইলেও উপাদান কারণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যেমন, সাধারণ নরনারী, ভাবে পৃথক্ হইলেও দৈহিক গঠন সম্বন্ধে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। উভয় স্থলেই শোণিত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতি গঠনাদির ও মানসিক বৃত্তিদিগের তারতম্য থাকে না। সেই প্রকার এক চিৎ-শক্তি শিবদুর্গা বা রাধাকৃষ্ণের আদি কারণ। চিৎশক্তি হইতেই রূপাদি সৃষ্টি হয়, সুতরাং সৎএ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমুদয় দেবতাদিগের বিনাশ হয় বলিয়া ক্ষয় বৃদ্ধি বিবর্জ্জিত সর্ব্বাদি সর্ব্ব মূলাধার ব্রহ্ম বস্তুতে মনোনিবেশ করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাধারণ চলিত মত এই যে, তিনি নির্গুণ, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অতীত, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষীস্বরূপ, জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত, এক, অদ্বিতীয়, সত্য, নিত্য, পরাৎপর, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন এবং সর্ব্বাত্মা। তিনি মহাকারণস্বরূপ, তাঁহার অগ্রে অন্য কেহ ছিলেন না এবং অন্য কিছুই ছিল না। তিনি স্বয়ম্ভূ, তাঁহা হইতে জগৎ সৃজিত হইয়াছে, ইত্যাকার নানাবিধ ভাবনির্দ্দেশক শব্দের দ্বারা তাঁহার অবস্থা পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যে সকল ভাব দ্বারা ব্রহ্মবস্তু নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ নরনারীর বাস্তবিক সন্দেহ দূর হইতে পারে না। যে শাস্ত্রে তাঁহাকে ইন্দ্রিয়াদি ও বাক্য মনের অতীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই তাঁহার ভূরি ভূরি উপাধি বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত বস্তু যিনি, তাঁহার উপাধি হওয়া নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কথা। কারণ শাস্ত্রে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহাকে

কেহ জানিতে পারে না। যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তাঁহার উপাধি আসিল কিরূপে? যদ্যপি একথা স্বীকার করা হয় যে, শিব যোগপ্রতাপে সমুদয় অবগত হইয়াছিলেন, অথবা ভগবান্ নিজে সময়ে সময়ে রূপে তাহা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা হইলেও ভাবান্তর আইসে। কুলার্ণবে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির বিনাশ আছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদ্যপি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের বিনাশ হওয়া শাস্ত্র-বাক্য হয়, তাহা হইলে তাহারাও অনিত্য সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্গত হইয়া যাইলেন। অনিত্য সৃজিত জীব কখন নিত্য ইন্দ্রিয়াতীত সত্য রূপ ধারণা করিতে সক্ষম হইতে পারে না। এইজন্য শিববাক্য স্বীকার করিতে যাইলে শাস্ত্রান্তরে দোষ ঘটিয়া যায়। হয় শাস্ত্র, না হয় শিববাক্যে অবিশ্বাস করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু শিববাক্য যদ্যপি পরিত্যাগ করিতে হয়, অথবা তাহার নেজা মুড়ো বাদ দিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে আর থাকিবে কি? শাস্ত্রবিশেষ সত্য এবং শাস্ত্রবিশেষকে অসত্য বলিলে কোন শাস্ত্রেরই মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। একথা আমি বার বার বলিয়া আসিতেছি, অতএব এ প্রকার ভাবান্তর সংশোধন করিয়া দেয় কে?

কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্ম শক্তির সহিত অভেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক সে বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং এই নিমিত্ত আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্রহ্ম ও শক্তি লইয়া বিগ্রহ বিবাদে পতিত হইতে হয়।

এই গুরুতর ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা আলোচনা করিবার নিমিত্ত অদ্য সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামকৃষ্ণদেব বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবকালে মীমাংসকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সর্ব্ব

সাধারণের সাধারণ সন্দেহ ভঞ্জন ও সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বাহির করিয়া সর্ব্বত্রে সামঞ্জস্য ভাব সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই নিমিত্ত কোন শাস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ এবং কোন শাস্ত্রকে নিকৃষ্ট বলেন নাই। তাঁহার মতে শাস্ত্রবাক্য সমুদয় অভ্রান্ত এবং সত্য। তিনি বলিতেন যে, ভাববিশেষে, উদ্দেশ্যবিশেষে, অবস্থাবিশেষে এবং কালবিশেষে তাহা প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং স্থূলে তাহাদের ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হয় না। সে যাহা হউক, ব্রহ্ম-শক্তি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যাঁহাকে ব্রহ্ম কহে, তাঁহাকেই শক্তি কহা যায়। ব্রহ্ম শক্তি দুইটী স্বতন্ত্র শব্দ হইলেও তাহা এক। দুইটী শব্দের দুইটী ভাব হইলেও তাহা এক। তিনি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিয়া গিয়াছেন, "যেমন গঙ্গা এবং গঙ্গার ঢেউ।" গঙ্গা এবং গঙ্গার ঢেউ—দুই নহে। ঢেউ গঙ্গার অবস্থান্তরবিশেষ। কিন্তু গঙ্গা এবং ঢেউ বলিতে গেলে দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, যেহেতু ঢেউ-বিহীন বা স্থির গঙ্গার এক অবস্থা এবং ঢেউ উঠিলে তাহার পূর্ব্বের অবস্থা থাকে না, সুতরাং এক বস্তুর দুই প্রকার অবস্থা প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

গঙ্গা এবং গঙ্গার ঢেউ যে প্রকার, ব্রহ্ম এবং শক্তির অবস্থাও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব স্থির গঙ্গার সহিত ব্রহ্মের এবং ঢেউএর সহিত শক্তির উপমা দিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিতেন যে, ব্রহ্মের কোন কার্য্য নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, অচল, অটল, সুমেরুবৎ, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা তাঁহার অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। স্থির গঙ্গা নিষ্ক্রিয়, অচল, অটল, এই নিমিত্ত তাহার সহিত ব্রহ্মের তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন গঙ্গার ঢেউ উঠিলে কার্য্য আসিয়া

থাকে, তখন অচল গঙ্গা সচল হয়; তেমনি ব্রহ্ম যখন কার্য্য করেন, তখনই তাঁহাতে শক্তির ভাব আসিয়া থাকে। অতএব ব্রহ্ম বলিলে তাঁহাতে কোন কার্য্যের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কিন্তু কার্য্য আসিলেই শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেমন গঙ্গা এবং তাহার ঢেউ বলিতে গেলে দুই হইয়া পড়ে, তেমনি ব্রহ্ম এবং শক্তিকেও দুই বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে একেরই অবস্থাবিশেষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকল শাস্ত্রের মত এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মই একাকী ছিলেন, পরে তিনি সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিশ্ব-সংসার তাঁহার সৃজিত। ব্রহ্ম হইতে যখন সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার ইচ্ছাকে অথবা যে কারণ দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। রামকৃষ্ণদেব এই স্থানে বলিতেন, যেমন কোন ব্যক্তি কার্য্যাদি কিছুই করিতেছে না, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে; পরে সে গান করিতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে এই ব্যক্তির অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যতক্ষণ সে নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার সঙ্গীত-শক্তির বিকাশ হয় নাই। সে ব্যক্তি গায়ক কি না তাহা কেহ জানিত না, সঙ্গীত দ্বারা তাহার কার্য্যবিশেষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই সঙ্গীত-শক্তি সেই ব্যক্তি ছাড়া নহে। ফলে সেই ব্যক্তি এবং সঙ্গীত-শক্তি অভেদ। যদিও সঙ্গীতশক্তি এবং ব্যক্তি অভেদ বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে পরস্পরের প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। যদিও ব্যক্তি ব্যতীত সঙ্গীত-শক্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু সঙ্গীত-শক্তি ব্যতীত ব্যক্তি থাকিতে পারে। এই স্থানে সঙ্গীত-শক্তি ব্যক্তির আশ্রয়ীভূত, সেই প্রকার ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মকে অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

আমরা দেখিতে পাই যে, এক ব্যক্তি হইতে নানাপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যের স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তিতে কথা কহা যায়, সে শক্তিতে লেখা যায় না ; অথবা যে শক্তিতে নৃত্য করা যায়, সে শক্তিতে প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যায় না, এই নিমিত্ত কার্য্য হিসাবে শক্তির স্বতন্ত্র ভাব আসিয়া থাকে এবং শক্তি ও শক্তিমান বলিয়া দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হয়, সুতরাং তাঁহাকে শক্তি এবং শক্তিমান না বলিলে গত্যন্তর থাকে না। শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ ; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম এবং শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম-শক্তির অভেদ ভাব রামকৃষ্ণদেব আর একটী অতি সুন্দর এবং সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে আমাদের কি জ্ঞান হয়? পদার্থবিশেষের অবস্থাবিশেষকে অগ্নি কহে। অথবা অগ্নি বলিলে পদার্থের লোহিত বর্ণ, উত্তাপ ও দাহিকা গুণযুক্ত বুঝা যায়। এই গুণত্রয় পরিত্যাগ করিলে অগ্নি থাকিতে পারে না, যেহেতু ত্রিবিধ গুণযুক্ত বস্তুকেই অগ্নি বলে। অগ্নি এবং বস্তু যেরূপ স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম-শক্তিকেও বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্ম-শক্তি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের যে দুইটী উপদেশ প্রদত্ত হইল, তাহার স্থূল ভাব দ্বারা যদিও শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ ভাব স্পষ্টাক্ষরে প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা তাহার আরও সুন্দর মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জড়-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদার্থ এবং শক্তি বলিয়া দুইটী কথা প্রচলিত আছে। আমরা পদার্থ বলিয়াও বুঝি এবং শক্তি বলিয়াও বুঝি। যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে

পদার্থ কহা যায়। যেমন, ঘর, বাড়ী, মানুষ, গরু ইত্যাদি সমুদয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত।

যে যে কারণে পদার্থনিচয় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে শক্তি কহে। যেমন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে, তাহাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তির শক্তির বিকাশ কহা যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যদিও প্রথম ব্যক্তির অবস্থান্তর ঘটাইবার কারণস্বরূপ বলা গেল, প্রকৃতপক্ষে তাহার শারীরিক বল বা শক্তিকেই নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। অথবা যেমন কামারেরা হাতুড়ির আঘাতে লৌহখণ্ডকে লোহিতোত্তপ্ত করিতে পারে। এ স্থলে কর্ম্মকারের শক্তিই লৌহকে লোহিতোত্তপ্ত করিবার কারণস্বরূপ। পদার্থগুণ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু শক্তি ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া কথিত হয়। শক্তির অস্তিত্ব পদার্থে তাহার কার্য্যকালীন উপলব্ধি হয়। যেমন পদার্থে উত্তাপ প্রকাশ পাইলে আমরা উহা বুঝিতে পারি, তদ্ব্যতীত উহার অন্য অবস্থা আছে কি না, তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত বিষয়।

যদিও পদার্থ এবং শক্তি বলিয়া আমাদের দ্বিবিধ জ্ঞান আছে, কিন্তু বিচার করিতে যাইলে উহাদের আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। পদার্থই বা কি এবং শক্তিই বা কি? পদার্থ এবং শক্তি বাস্তবিক দুইটী পৃথক পৃথক বস্তু অথবা তাহারা অভেদ? এই প্রশ্ন মানস-ক্ষেত্রে উদিত হইয়া থাকে। পদার্থ এবং শক্তি লইয়া বিচার করিলে উহাদিগকে একাকার ভাবে জ্ঞান করা যায়। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হউক। যেমন জল। ইহা পদার্থবিশেষ। ইহা কি পদার্থ? তরল পদার্থ। তরল পদার্থ কাহাকে কহে? যখন কঠিন পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়, তখন উহা তরলাকারে

পরিণত হয়। জল জমিয়া কঠিন হইলে বরফ বলে, বরফ গলিয়া জল হয়। যত্তপি জলে উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এই জলীয় বাষ্পে শৈত্য প্রদান করিলে উহা পুনরায় জলীয়াকার ধারণ করে এবং জলে শৈত্য সংস্পর্শ করিলে উহা কঠিন হইয়া আইসে। উত্তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থমাত্রেই তরল হয় ও তরলাবস্থায় উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বাষ্প হয় এবং উত্তাপ হরণ করিলে বাষ্প তরল ও তরল কঠিন হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, উত্তাপের ন্যূনাধিক্যে জলের অবস্থান্তর সংঘটিত হয় বলিয়া বুঝা গেল বটে, কিন্তু জল কি পদার্থ এবং উত্তাপই বা কাহাকে কহে? জল কি পদার্থ নির্ণয় করা যার-পরনাই কঠিন কথা। জলকে জলই বলিতে হয়। যত্তপি জলের উপাদান কারণ লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে উহা দুইটী বাষ্পের যৌগিক এবং উত্তাপের বিকাশবিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উত্তাপের বিকাশবিশেষ বলিবার কারণ এই যে, যে দুইটী বাষ্পের দ্বারা জল উৎপন্ন হয়, তাহারাও উত্তাপের অধিকারসম্ভূত। তাহারা উত্তাপবিবর্জ্জিত হইলে তরলাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহাদের সংযোগের সময়ে জলীয় বাষ্প হইবার উত্তাপ উপস্থিত থাকিলে তাহাদের বাষ্পাকার বিদূরিত হয় না। অতএব উত্তাপ বা শক্তিই পদার্থের অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিদান স্বরূপ। এক্ষণে পদার্থ কি, বিচার করা হউক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পদার্থ ও শক্তি অভেদ। কারণ বরফই হউক, কিম্বা জলই হউক, অথবা বাষ্পই হউক, ইহা-দিগকে পদার্থ এবং শক্তি যুগল-মিলন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। যদিও শক্তির কম বেশী হইলে তাহাদের অবস্থান্তর হয় বটে, কিন্তু উহাদের শক্তি ছাড়া করা কাহার সাধ্যসঙ্গত নহে। কঠিনাবস্থার

নিম্নে পদার্থের আর অবস্থা নাই, বাষ্পাবস্থার পরেও আর অবস্থা নাই। কঠিনের কাঠিন্য হইতে পারে এবং বাষ্পের অতি বিকীর্ণতা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহাদের তথাপি শক্তিরই বিকাশমাত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মায়; অতএব পদার্থ এবং শক্তি অভেদ। রামকৃষ্ণদেব এইজন্য উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ জ্ঞান বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম-শক্তির সহিত অগ্নির উপমা কতদূর সঙ্গত, তাহা এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কথিত হইয়াছে যে, কামারেরা হাতুড়ির আঘাত দ্বারা লৌহখণ্ডকে লোহিতোত্তপ্ত করিতে পারে। এ কথাও আমরা জানি যে, চকমকির দ্বারা অগ্নি জন্মায়, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্ন্যুৎপন্ন হয় এবং হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিলেও উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তাপ জন্মিবার কারণ ঘর্ষণ।

পদার্থ-বিজ্ঞান মতে প্রত্যেক পদার্থ অণুর সমষ্টিবিশেষ। এই অণুসকল পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয়। এক জাতীয় পদার্থদিগের অবিভাজ্য অতি সূক্ষ্মাংশকে পরমাণু বলে। অণুদিগের স্পন্দনের ন্যূনাধিক্যে উত্তাপাদি শক্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন লৌহে আঘাত করা যায়, তখন লৌহাণুসমূহ অতিশয় তীব্র বেগে স্পন্দিত হইয়া ক্রমে লোহিতবর্ণভাবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব লৌহকে লোহিতোত্তপ্ত করিতে হইলে তাহা লৌহেরই দ্বারা সাধিত হয়। লৌহ এবং ইহার অবস্থান্তর হওয়া যেমন অভেদ, ব্রহ্ম-শক্তিও সেইরূপ অভেদ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, লৌহকে উত্তপ্ত করিতে হইলে তাহাকে আঘাত করিতে হয় এবং কাষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাদন করিতে হইলে তাহাকে ঘর্ষণ করিতে হয়। যদ্যপি পদার্থদিগের অণুর স্পন্দন দ্বারা উত্তাপের জন্ম হয়, তাহা

হইলে অপর কারণের প্রয়োজন কি? তবে লৌহ আপনি উত্তপ্ত হউক? কাষ্ঠ আপনি জ্বলিয়া উঠুক? কিন্তু তাহা কখন হয় না। হেতু ব্যতীত অণুরা স্পন্দিত হয় না। কাষ্ঠফলক কিম্বা লৌহখণ্ড চিরকাল একস্থানে পড়িয়া থাকিতে পারে, তাহারা আপনি স্থানান্তরে যাইতে পারে না, অথবা নিজ নিজ অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। ইহা পদার্থদিগের বিশেষ ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত পদার্থদিগকে জড় বা অচল বলা যায়। পদার্থদিগকে সচল করিতে হইলে অচলতার পরিমাণানুসারে বহির্ব্বল প্রয়োগ করিলেই তাহারা সচল হইয়া থাকে। পাহাড় অচল পদার্থ, কিন্তু কামান অথবা ডাইনামাইট নামক পদার্থ দ্বারা তাহাকে স্থানভ্রষ্ট করা যায়। এই বহির্ব্বলকে হেতুস্বরূপ কহা যায়। উল্লিখিত হইয়াছে যে, পদার্থসকল অণুর সমষ্টিবিশেষ। এই অণুসকল দুই প্রকার লক্ষণযুক্ত। তাহারা পরস্পর আকর্ষণ ও পৃথক হওয়ার ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। অণুদিগের স্পন্দনের ন্যূনাধিক্যে এই লক্ষণদ্বয় প্রকাশ পায়। যখন অণুদিগের আকর্ষণী শক্তি অধিক থাকে, তখন স্পন্দন কমিয়া যায়, সুতরাং অণুসকল পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া আইসে। পদার্থের এই অবস্থাকে কঠিন বলে। অণুরা স্পন্দিত হইলে তাহাদের আকর্ষণী শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পৃথক-করা শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং অণুসকলও পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে, ইহাকে পদার্থের তরলাবস্থা বলে। যখন অণুরা অতিশয় স্পন্দিত হয়, সে সময়ে তাহাদের আকর্ষণী শক্তি একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, সুতরাং পৃথক-করা শক্তির প্রাবল্য হয় এবং তন্নিমিত্ত অণুসকল নিতান্ত দূরবর্ত্তী হইয়া আইসে। ইহা পদার্থের বাষ্পাবস্থা।

পদার্থদিগের যে দুইটী লক্ষণ কথিত হইল, তাহা আমরা অসম্ভব

বলিয়া হয় ত মনে করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। আমরা যদ্যপি নিজ নিজ ধর্ম্মগুলি আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে এইরূপ বিরুদ্ধভাববিশিষ্ট দ্বিবিধ শক্তির দৃষ্টান্তের অপ্রতুল হইবে না। আমরা কাহার সহিত কখন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আত্মীয়তা করি এবং কখন সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথকভাবে দিন যাপন করিয়া থাকি। অদ্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সহিত একত্রিত হইয়া বাস করিতেছি, কল্য আর পরস্পর মুখ দেখাদেখি থাকিবে না। অতএব এ প্রকার বিরুদ্ধ লক্ষণযুক্ত ভাব একস্থানে থাকা কোনমতে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই নিমিত্ত পদার্থেরা জড় বা অচল এবং আকর্ষণী ও পৃথককারিণী শক্তিযুক্ত বলিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এক্ষণে পদার্থদিগের এই অবস্থা লইয়া রামকৃষ্ণ-দেব কথিত উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয় দ্বারা ব্রহ্ম-শক্তি মিলাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে। রামকৃষ্ণদেব যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কথা। কারণ স্থির গঙ্গা ও গঙ্গার ঢেউ, ব্রহ্ম-শক্তির ভাব বলিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। স্থির গঙ্গা ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ঢেউযুক্ত গঙ্গা ব্রহ্মশক্তি। পদার্থবিশেষে শক্তির বিকাশ হইবার সময়েও হেতু সাপেক্ষ, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। গঙ্গার ঢেউ সম্বন্ধেও সেইরূপ হেতু প্রত্যক্ষ করা যায়, কারণ বায়ু না থাকিলে ঢেউ হয় না। গঙ্গার অবস্থান্তরকেই ঢেউ বলে, কিন্তু তাহা বায়ুরূপ হেতু ব্যতীত কখন সংঘটিত হয় না। অগ্নি সম্বন্ধেও হেতুর অপেক্ষা দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছারূপ হেতু হইলেই অচল ব্রহ্ম সচল হন, সুতরাং সুমেরুবৎ ব্রহ্ম স্থানান্তরিত হন, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কার্য্য করেন। এইরূপ কার্য্যকালীন কার্য্য দেখিয়া শক্তি স্বীকার করিতে হয়। লৌহ লোহিতোত্তপ্ত হইলে বা কাষ্ঠ অগ্নিময় হইলে উত্তাপ শক্তির

যেমন অনুমিত হয়, তেমনি ব্রহ্মের কার্য্য প্রকাশ পাইলেই শক্তির ভাব আসিয়া থাকে।

যদিও ব্রহ্ম এবং শক্তি বাস্তবিক অভেদ বলিয়া উল্লিখিত হন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, ভাবে তাঁহাদের বিভিন্নতা দেখা যায়। "সচ্চিদানন্দ" ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষ। এই শব্দের দ্বারা একসময়ে ব্রহ্ম এবং সময়ান্তরে ব্রহ্ম শক্তির স্বাতন্ত্র্য ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করিলে "সৎ+চিৎ+আনন্দ" শব্দত্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৎ শব্দের অর্থ সত্য বা নিত্য, চিৎ—চৈতন্য বা জ্ঞান বা ইচ্ছা এবং আনন্দ শব্দে পুলক বুঝা যায়। সৎ ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শব্দ, যেহেতু উহা ক্ষয় বৃদ্ধি বিবর্জ্জিত ভাব; চিৎ এবং আনন্দকে বিবিধ কার্য্যকারিণী শক্তি বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। চিৎশক্তি হইতে জগৎ সৃজিত হইয়া আনন্দ শক্তির দ্বারা সর্ব্বত্রে শান্তি বিধান হইয়া থাকে। চিৎ এবং আনন্দ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে। এই শক্তিদ্বয়ের অবলম্বনস্বরূপ সৎ শব্দের প্রয়োজন হওয়া ন্যায়সঙ্গত কথা। সচ্চিদানন্দ শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে তথায় শক্তির উপস্থিত থাকা সম্বন্ধে ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। তখনই ব্রহ্ম-শক্তির অভেদ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সৎ শব্দের অর্থ সদাস্থায়ী বা নিত্য এবং চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য বলিলে, সচ্চিদ্ দ্বারা নিত্যচৈতন্য ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় শক্তির আভাস থাকিতে পারে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মের শক্তি অস্বীকার করিবার ব্যবস্থা আছে। সচ্চিদ্ শব্দে নিত্যচৈতন্য বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হইতেছে না। এই মতাবলম্বীরা নিত্য চৈতন্যকে স্বীকার করেন। এবং তাঁহার আভাসে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, একথাও স্বীকার করিয়া থাকেন। যখন সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃজিত দুইটী ভাব রহিল, তখন শক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সৃজিত পদার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে

জন্মিয়াছে, তখন তাহাদের সৃষ্টি করিবার শক্তি তাঁহার অবশ্যই আছে, তাহা না হইলে সৃষ্টি করিলেন কিরূপে? এই নিমিত্ত তাঁহার এই উৎপাদিকা ভাবকে শক্তি কহা যায়।

সে যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব ব্রহ্ম শক্তির অভেদ ভাব সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারা যে প্রকারে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সৎকেই ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। তিনি বলিতেন যে, সৎ বা নিত্যসত্য বুঝিবার নিমিত্ত চিৎএর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চিৎ শব্দে, তিনি জ্ঞান বলিতেন। কোন বস্তু সত্য কি না তাহা কে মীমাংসা করে? জ্ঞানই বাস্তবিক মীমাংসক। সত্য বা নিত্য বলিলে আমরা বুঝি কি? অনিত্যের বিরহাবস্থাকে নিত্য কহে। অসত্যের বা মিথ্যার অভাবকে সত্য বলিয়া ধারণা হয়। এই নিমিত্ত সৃষ্টি দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অবস্থা স্থির হইয়াছে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে জগৎকে মায়া বলিয়া ইহার আদি মহাকারণকে সত্য ও নিত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

যাঁহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়া নিরস্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টির অসত্যতার জন্য ইহার উৎপাদিকা শক্তিরও অনিত্যতা স্বীকার পূর্ব্বক সৎকে শক্তি বিবর্জ্জিতভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং কেবলাত্মা, শুদ্ধ চৈতন্য, নিত্য শুদ্ধ, বোধরূপ ইত্যাদি ভাবব্যঞ্জক শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম বস্তু উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ একপক্ষীয় বিচার দ্বারা অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু স্থির করা উচিত কি অনুচিত, তাহা পরে বিচার করিতেছি।

আমি বলিয়াছি যে, প্রভু আমার সমুদয় শাস্ত্রকে সত্য বলিতেন। শাস্ত্রেই বলেন জগৎ মিথ্যা, জগৎপ্রসবিত্রী শক্তিও মিথ্যা, কেবল শক্তি-মানই সত্য। সেই সত্যই ব্রহ্ম। একথা শাস্ত্রবাক্য, সুতরাং মিথ্যা

বলা যায় না। কিন্তু এই মত সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে অন্য মত খণ্ডন হইয়া যায় এবং অন্য শাস্ত্রের সহিত অনৈক্য হয়।

কোন অজ্ঞাত বিষয় জানিতে হইলে তাহার সহিত জ্ঞাত বিষয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক বিচার দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বস্তু যদ্যপি স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞাত বস্তু অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এই নিমিত্ত জগৎ ধরিয়া ব্রহ্ম নিরূপণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

জগতের স্থূলভাব বাস্তবিক অনিত্য বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। মনুষ্য জন্মায়, মনুষ্য মরে, জন্তু জন্মায়, জন্তু মরে, গাছ জন্মায়, গাছ মরিয়া যায়, জলাশয়ে জল থাকে, আবার শুকাইয়া যায়, এইরূপ পদার্থের অনিত্যতা প্রতি মুহূর্ত্তে দেখা যাইতেছে। সুতরাং পদার্থনিচয় অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াবিশেষ; এরূপ মীমাংসা অবশ্যই সকলের মনে স্থান পাইয়া থাকে। কিন্তু পদার্থ লইয়া সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জগতের কেহই বিনষ্ট হয় না এবং কোন বস্তুর ধ্বংস নাই। মানুষ মরে বটে, কাষ্ঠ পুড়িয়া ছাই হয় বটে, জল শুকাইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের বিনাশ হয় না, কেহ বিলুপ্ত হয় না, পদার্থ-বিজ্ঞান তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছে। পদার্থের রূপান্তর হয়, অবস্থান্তর হয়, ভাবান্তর হয়, কিন্তু তাহার কখন কোন কারণে কোন অবস্থায়, কোন ভাবে, কোন হেতু দ্বারা ধ্বংস হয় না। মনুষ্য মরে, একথা সকলেই জানে বটে, কিন্তু মরে কে? কাহার ধ্বংস হয়? শরীরের রূপান্তর হয়, কিন্তু শারীরিক পদার্থনিচয় বিনষ্ট হয় না। যেমন সোণার বালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বালার ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু সোণার কি ধ্বংস হয়? বালা ভাঙ্গিলাম, বালা থাকিল না, কিন্তু তাহার সোণা রহিল, সেই সোণায় অন্য অলঙ্কার প্রস্তুত হইতে পারে;

সেই প্রকার দেহের পদার্থ সকল পুনরায় অন্য প্রকার গঠনে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কথিত হইল যে, বালা ভাঙ্গিলে বালার ভাব আর থাকে না, এই জন্য সেই রূপের বিনাশ কহা যায়। কিন্তু তাহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ বালার ভাব যদ্যপি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আর বালা সংগঠিত হইতে পারে না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় না। ইচ্ছা করিলেই বালা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, অতএব বালার ভাবও বিনষ্ট হয় না। কথা হইতে পারে যে, যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে, কেহ মরিয়া যাইলে তাহাকে আর আমরা দেখিতে পাই না, আর তাহাকে ইচ্ছা করিলে ফিরাইয়া আনিতে পারি না, তখন সেই ব্যক্তির মৃত্যু বা বিনাশ না বলিয়া জীবিত বা চিরস্থায়ী আছে বলিলে কি বাতুলতা হয় না? কথাটি স্থিরচিত্ত হইয়া বুঝা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে নানাস্থানে বলিয়াছি যে, মনুষ্য দুই ভাগে বিভক্ত, দেহ এবং আত্মা। যেমন "ঘর এবং ঘরণী," ঘরণী অর্থাৎ যে ঘরে বাস করে। ঘরণী কখন ঘরে থাকে এবং কখন স্থানান্তরে চলিয়া যায়। সে স্থানান্তরে যাইলে অপরে সেই ঘর অধিকার করিতে পারে, ঘর হইতে ঘরণী স্থানান্তরে গেল বলিয়া কি তাহার অস্তিত্ববিহীন হইবে? যেমন একজন বিদেশে গমন করিলে পূর্ব্বস্থানে বিরহ হয় বলিয়া তাহার ধ্বংস স্বীকার করা যায় না। সেইরূপ আত্মা দেহরূপ ঘর ত্যাগ করিয়া অপর দেহরূপ গৃহে প্রবেশ করেন অথবা অন্যভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত কোন বস্তুর বিনাশ স্বীকার করা যায় না। যেমন গঙ্গায় ঢেউ উঠিলে তাহার কম বেশীর ফলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য হয়, পদার্থ স্পন্দিত হইলে তাহার তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল দেখা যায়, সেই প্রকার পদার্থেরা অনন্তকাল ব্যাপিয়া প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এই

রূপ পরিবর্ত্তনই বিশ্বপতির বিশেষ লক্ষণ; তদ্দ্বারা তাঁহার অনন্তভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। পদার্থের পরিবর্ত্তন হইলে তাহাকে ধ্বংস বলে না, চারিদিকে তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বরফ জল হয়, জল বাষ্প হয়, বাষ্প জল হয়, জল বরফ হয়। এই পরিবর্ত্তনে যদিও পদার্থের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয়, তাহাদের কার্য্যের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু পদার্থের কি কোন ইতর বিশেষ হয়? না তাহার ক্ষয়বৃদ্ধি হয়? এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তনে ভাবান্তর রূপান্তর এবং অবস্থান্তর দেখা যায়, কিন্তু পদার্থের নিত্যত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। মাটি হইতে ভাঁড়, খুরি, জালা, হাঁড়ি, কলসী, ঘর, বাড়ী, পুঁতুল, ঠাকুর গড়া যায়। ইহাতে মাটির অবস্থান্তর হইলেও মাটির সমভাব সম্বন্ধে দোষ ঘটে না। মাটিকে যদ্যপি পুড়াইয়া ফেলা যায়, যদ্যপি জলে গুলিযা ফেলা যায়, তথাপি যে মাটি, সেই মাটিই থাকিবে। অতএব পদার্থ সকল অনিত্য নহে। যেমন পদার্থ এবং তাহার রূপান্তর বা অবস্থান্তর দ্বারা পদার্থের নিত্য এবং অনিত্য বিষয়ে ভ্রম জন্মায় এবং তদ্দ্বারা পদার্থের নিত্যত্ব স্থিরীকৃত হয়, সেইরূপ জগৎ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়া থাকে। পদার্থগণ যেমন আণবিক স্পন্দন দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ইচ্ছার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হইয়া থাকেন। পদার্থের রূপ যেমন পরিবর্ত্তনশীল, ব্রহ্মের রূপও তেমনি পরিবর্ত্তনশীল। পদার্থ সকল যেমন পরিবর্ত্তিত হইলেও ধ্বংস হয় না, ব্রহ্মও তেমনি রূপান্তর হইলে বিলয় প্রাপ্ত হন না। এই মীমাংসার আপত্তি এই যে, ব্রহ্মকে সচ্চিদ শব্দের দ্বারা নিত্য চৈতন্য বলা হইয়াছে। তাঁহার সহিত জড়ের উপমা ঘটিতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব যখন জড়ের উপমা দ্বারা ব্রহ্ম পদার্থ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহার অভ্যন্তরে অবশ্যই গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অতএব এই ক্ষেত্রে আমাদিগকে জড় পদার্থ লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিতে হইবে।

পদার্থমাত্রেই জড় এবং এ কথা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান শাস্ত্রানু-মোদিত। পদার্থ সকল ইনার্সিয়া (Inertia) বা জড়ধর্ম্মযুক্ত, তাহা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই জড় পদার্থ হইতে যে সকল শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও শক্তি বলিয়া দেখা যায়। উত্তাপ, তড়িৎ, চুম্বক এবং রাসায়নিক শক্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার শক্তির উল্লেখ এবং কার্য্য আছে। এই সকল শক্তিরা জড় পদার্থ হইতে প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকেও জড় শক্তি কহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্যাদি জীবগণ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহ জড়পদার্থসম্ভূত এবং আত্মা চৈতন্য বস্তু। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেহাদির পরিবর্দ্ধন এবং সংরক্ষণাদি জড় পদার্থের দ্বারাই করিয়া থাকি। আহারাদি করিলে শরীর পুষ্টিলাভ করে ও বলাধান প্রাপ্ত হয় এবং মানসিক ও শারীরিক বল বীর্য্যাদি জন্মিয়া থাকে, ইহা প্রত্যেকের জ্ঞাত বিষয়। দুর্ব্বল হইলে বলকারক ঔষধ ও পথ্য সেবন ও ভক্ষণ করিতে হয়, তাহা কে না জানেন? ঔষধ ও পথ্য জড়পদার্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্দারা বল পাওয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, চৈতন্যশক্তি বা আত্মা অথবা জড় পদার্থ, কাহাকে আমাদের শক্তি প্রদান করিবার কারণস্বরূপ বলিয়া কহা যাইবে? প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, দুর্ব্বলাবস্থায় আত্মার বিরহ বুঝা যায় না যে, তাঁহার অভাবে শক্তির অভাব জ্ঞান করা যাইবে। তাঁহার উপস্থিত সত্বে যখন শক্তিহীন হওয়া যায় এবং তাহা জড় পদার্থ দ্বারা সম্পূরণ হয়, তখন জড় পদার্থের চৈতন্য-শক্তিও স্বীকার করিতে হইবে। অনাহারে জীব মরিয়া যায় এবং আহার দ্বারা তাহারা জীবন লাভ করে, তখন জড় পদার্থের চৈতন্যশক্তি ও কার্য্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদার্থবিশেষের কুব্যবহারে তাহার বিপরীত

ফল হইয়া থাকে, বিষাদি তাহার দৃষ্টান্ত। বিষের দ্বারা হতচেতন হইতে হয় এবং বিষগ্নদিগের চৈতন্য লাভ করা যায়। অতএব পদার্থদিগের শক্তির তারতম্যে চেতন এবং অচেতনের ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ব্যাধি হইলে আমাদের চৈতন্যশক্তির বিপর্য্যয় হয়, তথায়ও পদার্থদিগের কার্য্য ব্যতীত অন্য কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শরীরের গঠনাদি অস্বাভাবিকাবস্থায় পরিণত হইলে তাহাদের অস্বাভাবিক কার্য্য হয়, ইহাকেই ব্যাধি কহে।

আমাদের দেহ এবং আত্মা লইয়া এইরূপে আলোচনা করিলে আত্মাকে কেবল স্বাক্ষীস্বরূপ বা শুদ্ধচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। দৈহিক কার্য্যাদি পদার্থের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত পদার্থ সকল জড় এবং চৈতন্য শক্তির নিদানস্বরূপ। " এই নিমিত্ত ব্রহ্ম-শক্তির সহিত জড়পদার্থ ও শক্তির উপমা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কথা। কেবল উপমা নহে, ইহাই ব্রহ্মশক্তি বুঝিবার একমাত্র উপায়।

জড়পদার্থ ও শক্তি বা সংক্ষেপে এই জড়জগৎ বলিয়া যাহাকে কহা যায়, তাহা বাস্তবিক পরিত্যাগের বিষয় নহে। ব্রহ্ম জানিবার বুঝিবার যদ্যপি কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে এই জড়-জগৎকে অদ্বিতীয় কারণ-স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

ব্রহ্ম নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রে দুইটী লক্ষণের উল্লেখ আছে। যথা, স্বরূপ এবং তটস্থ। স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত করা যায় এবং কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক কারণ-বোধক লক্ষণকে তটস্থ লক্ষণ কহে। যথা জগৎপাতা, জগৎত্রাতা ইত্যাদি।

স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা একপ্রকার ভাবই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদিও স্বরূপ ভাব বলিলে ব্রহ্মের একদেশী লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে

হয়, যেমন সত্য স্বরূপ, কিম্বা জ্ঞান স্বরূপ। সত্য কিম্বা জ্ঞান বলিলে দুই বা ততোধিক কোনপ্রকার ভাব বুঝাইতে পারে না। যেমন স্বর্ণ বলিলে স্বর্ণ ই বুঝায়, স্বর্ণের স্বরূপ স্বর্ণকেই কহে। কিন্তু স্বর্ণ শব্দের দ্বারা যেমন অন্যান্য ধাতুর তুলনায় তাহার একদেশী ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়, সত্য বা জ্ঞানাদি তেমনি অসত্য বা অজ্ঞানের তুলনায় তাহাদের ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। অসত্য বা মিথ্যা বোধ না জন্মিলে সত্য বুঝিবার উপায় নাই। যেমন আলোক ও অন্ধকার, ভাল ও মন্দ, মূর্খ ও পণ্ডিত, ধনী ও নির্ধন ইত্যাদি পরস্পর সম্বন্ধসূচক শব্দ। আলোক না থাকিলে অন্ধকার বুঝা যায় না এবং অন্ধকার ব্যতীত আলোক উপলব্ধি হইতে পারে না। তেমনি সত্য ও জ্ঞান শব্দের দ্বারা অসত্য ও অজ্ঞান ভাবের বিরহাবস্থা না ভাবিলে উহাদের তাৎপর্য্য-বোধ কখনই বোধে উদয় হইতে পারে না।

স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়। নির্গুণ শব্দের দ্বারা গুণের বিরহাবস্থা লক্ষ্য করিয়া দিতেছে। অর্থাৎ যাঁহাতে কোন গুণ নাই, এই প্রকার ভাববোধক জ্ঞানকে নির্গুণ কহা যায়। নির্গুণ ভাবের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব নির্গুণ বুঝিতে হইলে গুণ বোধ থাকা অবশ্য প্রয়োজন। গুণ জ্ঞান না থাকিলে নির্গুণ বুঝা যায় না, সুতরাং সগুণ নির্গুণের কারণস্বরূপ।

স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণ যেরূপই হউক, আমরা রামকৃষ্ণদেবের মতে উহাকে সাংশ্লেষিক এবং বৈশ্লেষিক লক্ষণ বলিয়া বুঝিয়াছি। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে আমাদিগকে কি অবলম্বন করিতে হইবে? বহির্জগৎ ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। ব্রহ্ম সাধনের ইহাই একমাত্র পন্থা। আমরা যাহা বুঝিতে পারি, যাহা আমাদের উপলব্ধি হয়, আমাদের তাহাই করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত জগৎ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্ম নিরূপণ

করিতে হয়। ইহাকে কার্য্য-কারণ বা বৈশ্লেষিক প্রক্রিয়া কহে। ইহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

জগৎ বিশ্লিষ্ট করিলে আমরা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সোপান দ্বারা ব্রহ্মে গমন করিতে পারি। স্থূলে পদার্থ জ্ঞান হয়। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই পদার্থদিগের ভাব-বৈচিত্র্য দর্শনপথে পতিত হইয়া থাকে। আমরা মনুষ্যাদি দেখিতেছি—প্রত্যেক নরনারী বালক বৃদ্ধাদি অবিরত অনন্ত ভাবের অভিনয় করিতেছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা আকাশাদির তত্ত্বের কথাই নাই। এই স্থূলভাব দর্শন করিলে জগতের অনন্তভাবের আভাস জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থূল জ্ঞান যে পর্য্যন্ত কাহার সঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। অনন্ত শব্দ কেবল শব্দবিশেষ নহে, ইহা দ্বারা ভাববিশেষ উপলব্ধি করিবার কথা; স্থূলেই ভাবের খেলা হয়, সুতরাং তথায় অনন্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা আছে। মনুষ্য বলিলে আমাদের একপ্রকার ভাব বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই। যদ্যপি মনুষ্য মনুষ্য বলিয়া চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যশ্রেণীর সীমা করা যাইতে পারিবে না। অবিরত অনন্তের ভাব আসিতে থাকিবে। যত মনুষ্য ভাবনা করা যাইবে, ততই আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যাইবে, এইরূপ ভাবকে অনন্ত জ্ঞান কহা যায়। স্থূল জগতে পদার্থের সীমা নাই, সুতরাং ভাবেরও সীমা নাই। প্রত্যেক পদার্থ লইয়া স্বতন্ত্র প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্র জন্মিয়াছে, প্রত্যেক শাস্ত্র অনন্তের পরিচায়ক, কোন শাস্ত্র কোন পদার্থের ইয়ত্তা করিতে পারে নাই, এই নিমিত্ত তাহা অনন্ত। যদিও আমরা স্থূলে পদার্থ বিশেষের জ্ঞানকে সীমাবিশিষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা অসীম এবং অনন্ত। পদার্থ সীমাবিশিষ্ট বা অসীম, তাহা পদার্থগত

ভাব না হইলেও দ্রষ্টার সম্পূর্ণ অবস্থাগত কথা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্থূল জগতের একটী তৃণ, স্থূল জ্ঞানে সম্যকরূপে সীমাবিশিষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহার স্থূল সূক্ষ্মাদি দৃষ্টি করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার চক্ষে উহা অনন্ত ভাবের ক্রীড়া করিয়া থাকে। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা তৃণকে তৃণই দেখি, এ দেখা চক্ষের দেখা মাত্র। তৃণতত্ত্ব কি চক্ষের দেখায় ফুরাইয়া যায়? স্থূল দর্শনও তথায় ফুরাইতে পারে না। তৃণের আকার, প্রকার, বর্ণ, ভাবগতি, দেখিতে গেলেই বাক্য বুদ্ধি পরাজয় লাভ করিয়া থাকে। তৃণের স্বরূপ লক্ষণ প্রদান করা মনুষ্যশক্তির অতীত কথা। যাহা বলা যায়, তাহাও নিতান্ত স্থূল। তৃণের আকার কি প্রকার তাহা বলা যায় না। সরু নহে, মোটা নহে, পাতলা নহে। ঈষৎ সরু মোটা বা পাতলা নহে। তৃণের দৃষ্টান্ত তৃণ, ইহার দ্বিতীয় স্বরূপ কিছুই নাই। তৃণের বর্ণও তদ্রূপ। বর্ণ বলিয়া যাহা বর্ণিত হয়, তাহাও তৃণের অদ্বিতীয় লক্ষণ। কারণ তাহাকে সবুজ কহা যায় না, তৃণ যেরূপ সবুজ, তাহা তৃণগত। স্থূলেই তৃণ অদ্বিতীয়, ইহার স্বরূপ আর কিছুই নাই। এইরূপে জগতের প্রত্যেক পদার্থ স্থূল হইয়াও অদ্বিতীয় ভাবের প্রচুর সাক্ষ্য দিয়া থাকে। যদ্যপি প্রত্যেক পদার্থ অদ্বিতীয় হয়, তাহা হইলে ইহাদের সমষ্টি করিতে যাইলে অনন্ত ব্যতীত আর কি প্রকার জ্ঞান লাভ হইবে? অনন্ত জ্ঞান বলিলে আমরা যখন সে বিষয়ের অবধি করিতে পারিতেছি না, বুঝিতেছি, কিন্তু বুঝিবার যেন কত অবশিষ্ট রহিয়া গেল, এইরূপ জ্ঞানকে অনন্ত কহা যায়।

স্থূলের স্থূল জ্ঞানও অনন্ত। স্থূলের স্থূল বিচার বৈশ্লেষিক মীমাংসার প্রথম সোপান।

স্থূল সম্বন্ধীয় স্থূল বিচার পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মে গমন করিলে

দ্রষ্টার স্বতন্ত্র চক্ষুর প্রয়োজন। স্থূল চক্ষে স্থূল দেখা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মাদি স্থূল দর্শনের অধিকারবহির্ভূত। অর্থাৎ তাহা এ চক্ষে দেখা যায় না। তাহা দেখিতে হইলে তৃতীয় চক্ষুর প্রয়োজন। সে চক্ষুটী ললাট ফলকের নিম্নে আছে। শিবের যে চক্ষু ললাটে সপ্রকাশ দেখা যায়, সেই চক্ষু, সেই জ্ঞান-চক্ষুর প্রয়োজন। জ্ঞান-চক্ষু বিকশিত হইলে তাহার সাহায্যে আমাদের এই চক্ষে স্থূল পদার্থের সূক্ষ্মাদি অনায়াসে অনুধাবন করিতে পারি।

অতএব স্থূলে যাহা আমরা চক্ষুর দ্বারা দর্শনাদি করিয়া থাকি, তাহাকে স্থূল পদার্থ কহা যায়। এই স্থূল পদার্থগুলি অন্যান্য স্থূল পদার্থের সম্মিলনে আকৃতি প্রকৃতি ভেদে বহু ভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। স্থূল পদার্থগুলি বিচার করিলে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এক প্রকার পদার্থ কতিপয় পদার্থের যোগে সৃষ্টি হয় এবং যাহাদের যোগে এবম্বিধ পদার্থ জন্মিয়া থাকে, তাহারা রূঢ় পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত। রূঢ় পদার্থ বলিলে, যে পদার্থ দ্বিতীয় প্রকার পদার্থে পরিণত হয় না, তাহা রূঢ় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রূঢ় পদার্থেরা যদিও সীমা-বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাদের যৌগিক ভাবের ইয়ত্তা নাই। এই সূক্ষ্ম বৈশ্লেষিক বিচারের দ্বারা ব্রহ্মের এক এবং বহু ভাবের জ্ঞান সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। এক অদ্বিতীয় পদার্থ কিরূপে বহুভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, তদ্‌সম্বন্ধে জ্ঞান আর কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। যেমন কয়লা তৃণে থাকে, কয়লা বৃক্ষে থাকে, কয়লা ফল ফুলে থাকে, কয়লা মনুষ্যে থাকে, কয়লা গরুতে থাকে, কয়লা কীট পতঙ্গে থাকে, কয়লা চিনিতে থাকে, কয়লা কাগজে থাকে, কয়লা বস্ত্রাদিতে থাকে, কয়লা পশুপক্ষীতে থাকে এবং হীরক খণ্ডে থাকে, কয়লা এক অদ্বিতীয়, সে সম্বন্ধে কাহার সন্দেহ হয় না এবং সেই অদ্বিতীয় কয়লা

অনন্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারে। এই জ্ঞানের সঞ্চার হইলে ব্রহ্ম জ্ঞানের সুবিধা হয়।

এক পদার্থের বহুভাব বুঝিয়া ঐ পদার্থদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন রূঢ় পদার্থ সকল যদিও পরস্পর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বিচার করিতে যাইলে তাহাদিগকে আণবিক অবস্থান্তর বলিয়া স্থির করা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পদার্থগণ অণুর সমষ্টি। এই অণুগণ স্পন্দিত হইলে পদার্থের রূপান্তর হয় এবং স্পন্দনের ন্যূনাধিক্যকে শক্তি বলিয়া উল্লেখ করা যায়। শক্তি নানা প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট। কাহাকে উত্তাপ, কাহাকে তড়িৎ, কাহাকে চুম্বক এবং কাহাকে রাসায়নিক শক্তি কহে। এই শক্তিদিগকে একসময়ে স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে পদার্থদিগের আণবিক স্পন্দন দ্বারা কিরূপে জন্মিয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এক শক্তি অপর শক্তির হেতুবিশেষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তাপের দ্বারা রাসায়নিক, তড়িৎ ইত্যাদি রাসায়নিক শক্তি হইতে উত্তাপ ও তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিদিগের কার্য্য হইতেছে। শক্তি যেমন বহু হইয়াও এক ভাবের পরিচয় দিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন রূঢ় পদার্থগণও এক পদার্থের অবস্থান্তরবিশেষ বলিয়া আমার নিতান্ত বিশ্বাস ও ধারণা। যেমন সা রি গা মা পা ধা নি নামক সপ্ত স্বরের ব্যবহার আছে। সা হইতে নি পর্য্যন্ত ধ্বনির শ্রুতি অথবা কম্পনের উচ্চতা বা আধিক্যতার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্বর জন্মিয়া থাকে। শব্দ পদার্থ-দিগের কম্পনের ফলবিশেষ, স্বর সপ্তকের স্থিতিকাল তুলনা করিলে কম্পনের ন্যূনাধিক্য প্রতীয়মান হয়। এই ন্যূনাধিক কম্পনের জন্য সা হইতে নি পর্য্যন্ত শব্দের পার্থক্যানুভব করা যায়। এক সপ্তক

অর্থাৎ সা হইতে নি পর্য্যন্ত স্বরের পর পুনরায় দ্বিতীয় সপ্তক স্বরের বর্ণনা আছে। যাহাকে গ্রাম বলে। দ্বিতীয় গ্রামের সা এবং প্রথম গ্রামের সার সহিত কম্পনের প্রভেদ থাকে না, দ্বিতীয় গ্রামের সা হইতে নি পর্য্যন্তও ঐরূপ কম্পনের তারতম্য হইয়া থাকে না। স্বর গ্রাম যেমন স্পন্দনের তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে পরিণত হয়, রূঢ় পদার্থ সকলও সেই প্রকার স্বর সপ্তকের নিয়মাধীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন স্পন্দনের দ্বারা স্বরের গুরু লঘু বা কোমল ও কড়ি হয়, অণুদিগের স্পন্দনের দ্বারা পদার্থদিগেরও তেমনি অবস্থান্তর হইয়া থাকে। যদিও এই মতটী সম্যকরূপে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, কিন্তু তাহা ভবিষ্যতে বোধ হয় সর্ব্বত্রে অনুমোদিত হইবে।

রূঢ় পদার্থেরা একের বিকাশবিশেষ, এ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার হেতু এই যে, হাইড্রোজেন নামক রূঢ় পদার্থটীকে আদর্শ ধরিয়া রসায়ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে আর শাস্ত্রটী এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে পারে না। অন্যান্য রূঢ় পদার্থেরা যখন একের আশ্রয়ীভূত, তখন একের অবস্থান্তর দ্বারা যে উহারা জন্মায় নাই, তাহা অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

রূঢ় পদার্থ লইয়া এই প্রকার আলোচনা করিলে একের দিকেই আমাদিগকে লইয়া যায়। তখন এক পদার্থ এবং তাহার স্পন্দনে বহু পদার্থের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্থির ধারণার সঞ্চার হইতে থাকে। পরে জ্ঞানচক্ষুও পদার্থ-বিচার অতিক্রম করিয়া যায়। সে সময়ে সমুদয় একাকার বোধ হইতে থাকে। এই একাকার বোধকে বিজ্ঞান কহে। জ্ঞান বিচার পরাজিত হইয়া যাইলে যে বিজ্ঞান বা বোধস্বরূপ ভাব মনোমধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহা ব্যোম শব্দে অভিহিত। এই ব্যোমকে

চিরস্থায়ী ইথার কহা যায়। বৈশ্লেষিক ক্রিয়ার ব্যোম পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়ার নাম কারণ। স্থূল জগৎ হইতে কারণ পর্য্যন্ত পদার্থ ও শক্তির অধিকার। বিজ্ঞানের অবস্থায় অর্থাৎ ব্যোম পর্য্যন্ত গমন করিলে মন আশ্রয়বিহীন হইয়া পড়ে। বুঝিবার, ভাবিবার, জানিবার, বলিবার আর কিছুই থাকে না। তথায় কথা থাকে না, তথায় ভাব থাকে না, তথায় আমি তুমি থাকে না, তথায় পশু পক্ষী ঘর বাড়ী নাই, জল মাটি নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই ; তাহা এক অব্যক্ত অচিন্তনীয়, অপূর্ব্ব স্থান ও অবস্থাবিশেষ মাত্র। সেই অবস্থার পরে ব্রহ্ম বস্তু। তাহাই মহা-কারণ স্বরূপ। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ব্রহ্ম বলিলে বলিবার জানিবার যাহা কিছু আছে, তাহার অতীত তিনি, সত্য অসত্যের অতীত তিনি, ধ্যান ধারণার অতীত তিনি, জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতার অতীত তিনি, তিনি সর্ব্ব-উপাধিবিবর্জ্জিত। তিনি এই নিমিত্ত তৎ সৎ না বলিয়া কেবল তৎ বলিতেন। সৎ শব্দের দ্বারা অসৎ ভাব আনিয়া দেয়। অসৎ বোধ না থাকিলে সৎ বোধ হইতে পারে না ও হইবার নহে। তিনি এমন কি প্রণব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তৎ শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইতেন। তৎ অর্থাৎ তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই ও কোন উপাধি দ্বারা উল্লেখ করা যায় না। রামকৃষ্ণদেব সৎ ত্যাগ করিয়া তৎ বলিতেন বলিয়া সৎএর কোন অর্থ নাই, এ কথা কেহ না মনে করেন। তিনি যে সময়ে তৎ বলিতেন, সে সময়ে বহির্জগতের জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার আর সদসৎ বিচার থাকিত না। এই নিমিত্ত সৎ শব্দের প্রতি আস্থা রাখিতে পারিতেন না, তৎ বা তুমি বলিয়া তন্ময়ত্ব হইয়া যাইতেন। ইহা তাঁহার অবস্থার কথা, কিন্তু আমাদের পক্ষে সৎই মহাকারণস্বরূপ। কারণ, কারণে ব্যোম বুঝিয়া তাহার অবলম্বনস্বরূপ সৎই একমাত্র বস্তু

আছেন বলিয়া ধারণা হয়। এই পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ ক্রিয়া আসিয়া তটস্থ লক্ষণের পরিসমাপ্তি হয়। তখন আমরা তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া, জগদীশ্বরাদি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিতে পারি। তখনই তাঁহাকে স্বরূপ বলিয়াও বুঝিতে পারি। এই লক্ষণদ্বয় যদ্যপি তটস্থ লক্ষণের ফলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রকারেরা স্বরূপ লক্ষণের অন্তর্গত করিলেন কেন? তাঁহারা ভুলিয়াছেন, এ কথা বর্ব্বর ব্যতীত অন্য কাহার মুখে বহির্গত হইতে পারে না। স্বরূপ লক্ষণের প্রমাণ জন্য সাংশ্লেষিক বিচার প্রয়োজন। তিনি সৎ বা সত্যস্বরূপ কেন? ইহার হেতু প্রদর্শনের নিমিত্ত অবরোহণ প্রথানুসারে কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলে আসিয়া সৎএ মীমাংসা করিতে হয়। মহাকারণ সৎস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য বা সত্য; এই জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত, কারণ ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানা যায় না, কিন্তু কারণ দ্বারা তাঁহাকে এক সত্যস্বরূপ বলিয়া বুঝা যায়, যাহাকে জ্ঞান কহে। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। কারণ হইতে সূক্ষ্মে অবরোহণ করিলে একের বহুভাব আরম্ভ হয়, সেই ভাবসমূহ থাকে এবং যায়, কিন্তু যাহা হইতে তাহারা উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না। রূঢ় পদার্থেরা শক্তির যোগে নানারূপে পরিণত হয়। নানাবিধ রূপ কখন এক সত্য হইতে পারে না। এ স্থানে সত্যের সহিত রূপের তুলনা হইতেছে। এইরূপ তুলনায় সৎ স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছেন এবং রূপ অসৎ বলিয়া কথিত হইতেছে। স্থূলে রূপের আধিক্যতা জন্মায়, সুতরাং সৎএর সহিত আর তুলনা হইতে পারে না, কিন্তু যখন সৎ এবং রূপাদির আভ্যন্তরিক সংযোগ দেখা যায়, অর্থাৎ রূপান্তর সংঘটিত হইবার কারণ কে? সেই সৎ কিম্বা অসৎ? অসৎ বলিয়া যাহাদের কহা যাইতেছে, তাহারা কি সৎ অতিক্রম করিয়া অন্য কারণ দ্বারা জন্মিয়াছে? তাহা কখন নহে। যেমন আরোহণে

সা রি গা মা পা ধা নি এবং অবরোহণে নি ধা পা মা গা রে সা, যেমন থোড়ের মাঝ এবং মাঝের থোড় আরোহণে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং মহাকারণ ও অবরোহণে মহাকারণ, কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল ; তেমনি সৎ এবং অসৎ অর্থাৎ রূপাদি এক সত্যের রূপান্তরবিশেষ বলিয়া কথিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিলে এক অদ্বিতীয় সত্য বুঝিবার পক্ষে বাস্তবিক গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। যেমন চার এক এক বলিলে বালকের বুঝিবার দুর্নিবার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়, সেই প্রকার রূপাদিকে সত্য বলিলে বুঝা যায় না, কিন্তু চারি বারে এক চারি হয়, তাহা বলিলে এক জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার প্রত্যবায় ঘটে না। ব্রহ্মের এক জ্ঞান লাভ করিয়া বহু রূপে অবরোহণ সূত্রে আসিলে একের যোগে বহু হয়, সুতরাং তাহাও এক, এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে কাল বিলম্ব হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং মহাকারণ ও মহাকারণের কারণ সূক্ষ্ম এবং স্থূল বিচার করিয়া বলিতেন, যেমন কলাগাছের খোসা ছাড়াইয়া মাঝে আসিয়া এবং মাঝ হইতে খোসায় গিয়া খোসারই মাঝ এবং মাঝেরই খোসা বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ আরোহণ ও অবরোহণ প্রক্রিয়ানুসারে ব্রহ্ম বিচার করিলে তবে তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা। স্বরূপ ও তটস্থ অথবা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ কিম্বা আরোহণ ও অবরোহণ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম বিচার করিলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রকৃত পক্ষে শক্তির জ্ঞান বলিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, যেরূপ জল বরফ ও জলীয় বাষ্প যদিও এক বস্তুর তিনটী অবস্থা বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা শক্তিরই অবস্থাবিশেষ।

পদার্থের স্বরূপাবস্থা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তাহারা শক্তি-বিহীন হইলে কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে, তাহা আমরা

বুঝিতে অক্ষম। পদার্থ-বোধ যেরূপই হউক, তথায় শক্তির সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য প্রকারে তাহা সাধিত হইতে পারে না।

পদার্থদিগের ত্রিবিধাবস্থা উল্লিখিত আছে। যথা কঠিন, তরল এবং বাষ্পীয়। এই ত্রিকালই শক্তির অভিনয়। অতএব পদার্থ-বোধ যেমন শক্তির বিকাশে জন্মিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মবোধও শক্তি ব্যতীত হইতে পারে না।

পদার্থ ও শক্তি সম্বন্ধে যে কোন প্রকার মতভেদ হউক, কিন্তু মোটের উপর আমরা পদার্থ ও শক্তি বলিয়া দুইটী ভাব অনুধাবন করিতে পারি। ব্রহ্ম-শক্তিও সেইরূপে উপলব্ধি করা যায়। পদার্থ-বিশেষ বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শক্তিই বুঝিতে হয় এবং তদাভাসই চক্ষে পতিত হইয়া থাকে। পরে তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক পদার্থের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্ম বিষয়েও শক্তি বা ব্রহ্মের কার্য্য দেখিয়া তাঁহার অবস্থা জ্ঞান হইয়া থাকে। ফলে, যেমন পদার্থ ও শক্তি অভেদ, তেমনি ব্রহ্ম শক্তিও অভেদ। যাহাকে পদার্থ কহে, শক্তিও তাহাকে কহা যায়, ব্রহ্মও যিনি, শক্তিও তিনি, পদার্থ ছাড়া শক্তি থাকে না, শক্তি জন্মায় না, শক্তির কার্য্য হয় না, শক্তির গতিবিধি দেখা যায় না, ব্রহ্ম শক্তিও অবিকল সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন বরফ বলিলে পদার্থ ও শক্তির যৌগিক ভাব বুঝা যায়। তথায় পদার্থ ও শক্তিকে স্বতন্ত্র করা হয় না, তেমনি শক্তি বলিয়াই হউক কিম্বা ব্রহ্ম বলিয়াই হউক, যাঁহাকে উল্লেখ করা যায়, তাঁহাকে ব্রহ্ম-শক্তির যৌগিক বুঝিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান কহে। ব্রহ্মজ্ঞান বলিলে যাহা উপলব্ধির অতীত, তাহাকে কখন ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় ব্রহ্ম-শক্তির ভাব অবশ্যই থাকিবে। সত্য জ্ঞান অনন্ত ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের ভাবই প্রকাশিত হইতেছে।

শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্বরূপ লক্ষণের দৃষ্টান্তস্বরূপ রজ্জুতে সর্প ভ্রমের উপমা প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে সর্প বোধ জন্মায়, বাস্তবিক রজ্জু সর্প নহে, তেমনি জগতে সত্যজ্ঞান হওয়া, কিন্তু বাস্তবিক জগৎ সত্য নহে। কিন্তু সর্প আছে বলিয়া রজ্জু দেখিলে তৎ জ্ঞান হয়, তেমনি সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জগৎ সত্যবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে মিথ্যার সহিত সত্যজ্ঞান দেখান হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান বলিলে ব্রহ্মশক্তি বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্ম ও শক্তি লইয়া চিরকালই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ। শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা যেরূপ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিলে সহসা ভ্রমে পতিত হইয়া যাইতে হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম দৃষ্টান্তে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্থ করা হইয়াছে। জগৎ মিথ্যা এবং মায়া, ইহা আমাদের দেশের চিরসংস্কার, এই সংস্কারহেতু শক্তিকেও মিথ্যা বলিয়া ধারণা আছে। এ নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও মিথ্যা বলিয়া উল্লিখিত এবং সাকার রূপাদিও সমুদয় মায়ার অন্তর্গত বলা হয়। এই সংস্কার কেবল আরোহণ বা বৈশ্লেষিক প্রক্রিয়ার একপক্ষীয় ফলবিশেষ। শাস্ত্রে স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণ দিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে হইলে সেইজন্য কেবল এক শ্রেণীর বিচার দ্বারা চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। শাস্ত্রকারদিগের সে প্রকার কখন অভিপ্রায় ছিল না। তাহা হইলে স্বরূপ লক্ষণে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, এ কথা প্রয়োগ করিতে পারিতেন না, কারণ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে সর্প জ্ঞান থাকা উচিত। যাহার সর্পজ্ঞান নাই, যে সর্প দেখে নাই, রজ্জু দেখিলে তাহার সর্প জ্ঞান হইবে কিরূপে? তেমনি যাহার ব্রহ্ম জ্ঞান হয় নাই, যাহার সত্য বোধ হয় নাই, তাহার মিথ্যা জ্ঞান হইবে

কিরূপে? কিন্তু ব্রহ্ম বোধ লাভ করিতে হইলে আরোহণ সূত্রে স্থূল সূক্ষ্মাদি অতিক্রম করিয়া মহাকারণে গমনপূর্ব্বক পুনরায় অবরোহণ কালে সত্যকে ধারণ পূর্ব্বক স্থূল জগতের ভাববৈচিত্র্যের সহিত মিলাইলে তবে সত্যাসত্য জ্ঞান হইবার কথা, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ব্রহ্ম বলিলে, ব্রহ্ম ধ্যান করিতে যাইলে, ব্রহ্ম পূজা করিতে যাইলে, ব্রহ্ম শক্তিরই পূজা করা হয়। শুদ্ধ ব্রহ্মের পূজা নাই, তাঁহার অবস্থা বাক্য মনের অতীত। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, যদিও ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত, কিন্তু তিনিই বাক্য মনের গোচর। বিষয়াত্মক মনের অতীত বটে, কিন্তু বিষয়বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ মনের গোচর। ইহার তাৎপর্য্য এই—যেমন কোন স্থানে কোন পদার্থ থাকিলে তথায় অন্য পদার্থ সংস্থাপন করা যায় না, অন্য বস্তু রাখিতে হইলে পূর্ব্বের পদার্থকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হয়, সেইরূপ আমাদের মনে প্রথমেই সাংসারিক ভাবই অধিকার করে, সুতরাং তথায় অন্য বস্তু রাখিবার স্থান থাকে না। ব্রহ্ম ভাব লাভ করিবার সময় বৈশ্লেষিক বিচারের দ্বারা মনের স্থান পরিষ্কার করিয়া মহাকারণে উপস্থিত হইবামাত্র মন শূন্য হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় ব্রহ্ম ভাব আসিয়া প্রবেশ করে, তাহাকে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বলিয়া আমি উল্লেখ করিয়াছি। প্রভুর এই দৃষ্টান্ত এবং শাস্ত্রের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণাদির তাৎপর্য্য বাহির করিলে সকলই অবস্থার কথা বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। অবস্থায় এক পদার্থ কঠিন, সেই পদার্থ তরল এবং সেই পদার্থ বাষ্প, অবস্থায় যে ব্যক্তি বিষয়ী, সেই ব্যক্তিই বিষয়বিরহিত এবং সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানী, অবস্থায় যে বালক, সেই কিশোর, সেই যুবা, সেই প্রৌঢ়, সেই বৃদ্ধ, অবস্থায় সেই মূর্খ, সেই পণ্ডিত, অবস্থায় সেই দরিদ্র, সেই ধনী, অবস্থায় ব্রহ্ম, অবস্থায় শক্তি এবং অবস্থায় ব্রহ্ম-শক্তি এবং জগৎ। ব্রহ্ম যাঁহাকে কহে,

শক্তিও তাঁহাকে কহে এবং জগৎও তাঁহাকে কহে। তিনি এক এবং তিনিই বহু।

কথিত হইল, অবস্থা বিশেষে কার্য্যের তারতম্য হয়। যে কার্য্যের যে কারণ, তাহা অতিক্রম করিয়া অপর কারণের সহিত তাহার তুলনা করিতে গেলে বিভীষিকা উপস্থিত হয়। যেমন কসাই গো-হনন করিতেছে এবং সাধু "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" জ্ঞানপূর্ব্বক পিপীলিকাদিগকে চিনি প্রদান করিতেছে; দুই ব্যক্তির কার্য্য দুই প্রকার। এই কার্য্য দেখিয়া কি কসাই এবং সাধুকে এক মনুষ্যজীব জ্ঞান করিয়া সমজ্ঞান করা যাইবে? না একের অবস্থার তারতম্য স্বীকার করিতে হইবে? এইস্থলে উভয়ে এক মনুষ্য, তাহার ভুল নাই এবং উভয়ে পৃথকও বটে, তাহারও ভুল নাই। অতএব অবস্থাই সকল বিষয়ের নিদান।

ব্রহ্ম-শক্তিতে প্রভেদ এবং উভয়ের একাকার বোধ হওয়া আমাদের অবস্থার কথা। একাকার ভাব কেবল মনের কথা নহে। ইচ্ছা করিয়া একাকার জ্ঞান করিতে পারিলে বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না। একাকার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব একটী গল্প বলিয়াছেন।

কোন দেশের রাজা ও রাজ্ঞী অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই নিমিত্ত নানাপ্রকার সাধুশান্ত মহাত্মার সর্ব্বদাই তথায় গতিবিধি হইত। রাজ্ঞী ঠাকুরাণী নিজে তাঁহাদের সেবাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সাধুসেবা ব্যতীত রাজ্ঞী অন্য কোন পারিবারিক কার্য্য করিতেন না। প্রাতঃকালে পূজাদি সমাপনান্তে তিনি সাধু অতিথি-দিগের পান ভোজনের ব্যবস্থাদি করিয়া পরে কিছুকাল তাঁহাদের সহিত তত্ত্বালাপন করিতেন। সর্ব্বদা সাধুদিগের সহিত সাধু প্রসঙ্গের দ্বারা তিনি নিতান্ত জ্ঞানসম্পন্না হইয়া উঠিলেন। রাজার এইরূপ

তত্ত্বালাপনের ইচ্ছা সত্ত্বেও রাজকার্য্যের নিমিত্ত রাজ্ঞীর সহিত সর্ব্বদা যোগ দিতে পারিতেন না, সুতরাং রাজা অপেক্ষা রাজ্ঞীর ঐশ্বরিক জ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়া আসিল। রাজ্ঞী যদিও পূর্ব্বে নিতান্ত ভক্তিমতী ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান-পন্থী সাধুদিগের সহবাসে তাঁহার ভক্তির ভাব কমিয়া গিয়া জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি হইল। যেন দেবতা ঠাকুরদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন, ব্রহ্মকেই সত্যস্বরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ধ্যান করিতেন; তিনি ক্রমে বুঝিলেন যে, ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয় বলিয়া যাহা কিছু বুঝা বা কহা যায়, তাহা ভ্রম বা মায়া। স্ত্রী পুরুষ বলিয়া যে জ্ঞান জন্মায় তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম, যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, কহা যায়, সমুদয় ভ্রম। দুই নাই, দুই হইতে পারে না, এক ব্রহ্মই ঊর্দ্ধ, অধো, দক্ষিণ, বাম, সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার এইরূপ নিশ্চয় ধারণা হইয়া যাইলে রাজার ভক্তিভাব থাকায় রাজ্ঞীর সহিত সর্ব্বদা মতভেদ হইত। রাজা সীতারাম বলিয়া প্রণাম করিলে রাজ্ঞী হাসিয়া বলিতেন, যেমন তুমি আমি পুরুষ প্রকৃতি, ব্রহ্মকেও কি সেইরূপ বুঝিয়াছ? তাহা নহে, পুরুষ প্রকৃতি এক, দুই নহেন। তুমি আমি বা অহং জ্ঞান ভ্রমের কথা। তুমি আমি এক। রাজা কোন উত্তর করিতেন না।

কিরূপে রাজার ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, এই নিমিত্ত রাজ্ঞী নিতান্ত চিন্তিতা হইলেন এবং তাহারই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা জনৈক সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি কুমারসন্ন্যাসী এবং প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ। সাধু কিয়দ্দিবস রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া রাজা এবং রাজ্ঞীর আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিয়া রাজাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি তদবধি প্রত্যহ সমুদয় জগৎ মায়া, তাহা কিছুই নহে, এক ব্রহ্মই সত্য, ইত্যাকার

উপদেশ দিতে লাগিলেন। একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! বাহ্য জগৎ মায়া বলিয়া আপনি সর্ব্বদা বলেন এবং শাস্ত্রাদিরও তাহাই মত, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আপনি সাধু এবং আমি বিষয়ী, ইহাও কি ভ্রম? আমার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, রাজ্য, প্রজা, এ জ্ঞানও কি ভ্রম? সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, এও কি ভ্রম?" সাধু কহিলেন, "প্রকৃত পক্ষে ভ্রমই বটে। কারণ শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, এস্থলে বহু ঈশ্বর হইতে পারে না। রামসীতা, রাধাকৃষ্ণাদিকে কেমন করিয়া ব্রহ্ম কহা যায়? ব্রহ্ম ত্রিকাল একভাবে অবস্থিতি করেন, এই নিমিত্ত তিনি নিত্য এবং সত্য, সীতারামাদির পূর্ব্ব পশ্চাৎকাল অনিত্য, পূর্ব্বে ছিলেন কি না কেহ জানেন না, পরে তাঁহারা কেহ নাই, তাহা সর্ব্বজনজ্ঞাত বিষয়, অতএব এ প্রকার বস্তু অনিত্য, সুতরাং তাঁহারা কখন ব্রহ্ম হইতে পারেন না। ব্রহ্ম ত্রিকালীন সমভাবে থাকেন, তাঁহার ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই।" রাজ্ঞী কহিলেন, "একাকার জ্ঞান না হইলে কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় না?" সাধু কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, একাকার ভাবই ব্রহ্মজ্ঞান।" রাজা হাসিয়া বলিলেন, "সমুদয় একাকার বোধ করিলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়? কোন ভেদাভেদ থাকিবে না?" সাধু কহিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানীর ঐরূপই ভাব বটে।"

রাজা আর কোন কথা না বলিয়া তখন রাজকার্য্যে প্রস্থান করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, রাজ্ঞী অনেক দিন হইতে আমায় ব্রহ্মজ্ঞানী করিবে বলিয়া চেষ্টা করিতেছে। কত কথাই আমায় বলিয়াছে, কিন্তু এবারে এই সন্ন্যাসীর দ্বারা আমায় ব্রহ্মজ্ঞানার্ণবে নিক্ষেপ করিতে নিতান্ত উদ্যোগী হইয়াছে। এতদিন কিছু বলি নাই, আপাততঃ রাজ্ঞীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া

বিশ্রাম-মন্দিরে গমন করিলেন। রাজ্ঞী পূর্ব্ব হইতেই তথায় রাজার অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা গৃহে প্রবেশ করিয়াই কহিলেন, "দেখ রাজ্ঞী! তোমার একাকার ভাব আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, বাস্তবিক মনকে বহুভাবে বিচ্ছিন্ন করিলে এক জ্ঞান সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ভাবটী এক দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি সুন্দর বুঝিয়াছি। স্ত্রীজাতি এক অদ্বিতীয়। তাহাদের গঠন প্রকৃতি সমুদয় এক, কিন্তু ছার ভ্রমের দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাদিগকে দেখিয়া থাকি। এই বিভিন্ন ভাব ভগবানের রচিত নহে, কোন্ পাষণ্ড বর্ব্বর এইরূপ ভাবের কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল বলিতে পারি না। স্ত্রীমাত্রেই একাকার, আহা! এই জ্ঞান কি সুমধুর, কি আনন্দপ্রদ, সব একাকার! রাজ্ঞী! তুমি আমায় অতি উত্তম শিক্ষা দিয়াছ! সে যাহা হউক, এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, আমার একাকার ভাবের জ্ঞান হইয়াছে কি না? আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, তুমিও যেমন, আমার কন্যাও তেমন, কারণ তুমিও স্ত্রীজাতি, সেও স্ত্রীজাতি, সর্ব্ব সম্বন্ধ একাকার করিয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও এবং তোমার স্থানে কন্যাকে আসিয়া উপবেশন করিতে বল। সাবধান! আমার এই এক জ্ঞান বহু ক্লেশে সঞ্চারিত হইয়াছে।" রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইল। তিনি অবাক্ হইয়া কি করিবেন চিন্তা করিতে করিতে দিশেহারা হইলেন। রাজা বার বার কন্যাকে আনিয়া দিতে কহিতেছেন, কেমন করিয়া তিনি এই ভীষণ কার্য্য করিবেন, তাহার কূল-কিনারা পাইলেন না। তিনিই সর্ব্বদা একাকারের কথা কহিয়াছেন, কেমন করিয়া কি বলিয়া খণ্ডন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর নানাবিধ চিন্তা করিয়া

কহিলেন, "মহারাজ! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু অধিনীর নিবেদন এই যে, কন্যার শারীরিক অসুস্থতার নিমিত্ত তাহাকে অদ্য বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রমোদকাননে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়?" রাজা রাজ্ঞীর মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে, "ভাল, অদ্য অপেক্ষা করিলাম।" পরদিবস প্রাতঃকালে সাধুকে ডাকাইয়া রাজ্ঞী সমুদয় কথা কহিলেন। সাধু শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এতদূর হইয়া গিয়াছে? আমি তখন সাদা কথায় ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছি, পাত্রাপাত্র বিচার করি নাই। যাহা হউক, ইহা অতিশয় বিভ্রাটের কথা, তাহার সন্দেহ নাই।" রাজ্ঞী কহিলেন, "মহাশয়! মহারাজের এই সংস্কার সংশোধনের কি উপায় নাই?" সাধু বলিলেন, "আমি তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। দেখ, অদ্য মহারাজের সহিত আমি একত্রে ভোজন করিব। ভোজ্য সামগ্রীর সহিত কিঞ্চিৎ বিষ্ঠা প্রদান করিবে।"

মধ্যাহ্নে রাজা ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সাধু তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি কিঞ্চিৎ সৌজন্যতা দেখাইয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিষ্ঠার দুর্গন্ধে ক্রোধে আসন পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কি এ? রাজ্ঞী! তুমি কি আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছ? ভোজ্য সামগ্রীর সহিত বিষ্ঠা! এ কৌশল করিবার হেতু কি?" সাধু কহিলেন, "মহারাজ! ক্রোধান্বিত হইও না। তোমার একাকার জ্ঞানের পরীক্ষা হইতেছে। কন্যা এবং স্ত্রীতে যদ্যপি ভেদাভেদ না থাকে, অন্নাদি এবং বিষ্ঠায় ভেদাভেদ থাকিবে কেন?" রাজা কহিলেন যে, "এ উপমা প্রয়োগ হইতে পারে না। অন্ন ভোজনের দ্রব্য, বিষ্ঠা পরিত্যাগের বস্তু, ইহাদের একাকার করা যায় না।" সাধু কহিলেন, "অন্ন বিষ্ঠা একাকার করা যায় না, কিন্তু কন্যা স্ত্রী একাকার

হইতে পারে, ইহার অর্থ কি? যদ্যপি একাকার জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে জ্ঞান সর্ব্বত্রে সমভাবে প্রকাশ পাইবে। সুবিধা এবং অসুবিধামতে একাকার জ্ঞান করা দুষ্টবুদ্ধির পরিচয়। যাহার একাকার জ্ঞান হইয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র অবস্থা।" রাজা কহিলেন, "আপনি একাকারের গুরুমহাশয়, আপনি তাহা বুঝাইয়া দিন।" সাধু সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও বিষ্ঠা রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত উদ্যানস্থিত সরোবরের তটে রাখাইয়া ডুব দিয়া এক দিব্য স্থূলাকার শূকরমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উপরে উঠিয়া আসিয়া অন্নাদির সহিত বিষ্ঠা ভোজন করিয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় জলে প্রবেশান্তে পূর্ব্ব রূপে পরিণত হইলেন। তখন সাধু কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! মনুষ্যরূপে বিষ্ঠা ভক্ষণ করা যায় না বটে, কিন্তু শূকররূপে তাহা সম্ভবে, সেইরূপ পিতাভাবে কন্যাগমন করা যায় না, যদ্যপি তোমার জামাতার কলেবর লাভ করিতে পার, তাহা হইলে কোন কথাই নাই।"

রাজা এই কথা শ্রবণান্তে রাজ্ঞীকে কহিলেন, "রাজ্ঞী! তুমি কিছু বুঝিলে? তোমাকে একাকার বুঝাইবার জন্য আমার এই কৌশল। সাধুজী অগ্রপশ্চাৎ না বুঝিয়া তোমার একাকার জ্ঞান অনুমোদন করিয়াছিলেন। একাকার শব্দ বলিবার নহে, চিন্তা করিবার নহে এবং যুক্তি বা বিচারের বিষয় নহে। উহা অবস্থার কথা। ভাবে বহু, ইহা সৃষ্টির নিয়ম, সেই এক ব্রহ্মের নিয়ম, ব্রহ্ম এক, ব্রহ্মই অনন্ত, অনন্তভাব হইতে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। এক তিনি, অনন্তও তিনি, অনন্তে এক জ্ঞান হইতে পারে না। অনন্তে বহুজ্ঞান না থাকিলে অনন্ত ভাব কখনই লাভ হইতে পারে না। অনন্ত ভাব জগতে দেখা যায়, তাহা চূর্ণ করিতে যাওয়া বাচালতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনন্ত ভাব তাঁহার স্বরূপবিশেষ, অতএব তাঁহাকে

একাকার করিতে যাওয়াকে ব্রহ্মজ্ঞান বলি না। ব্রহ্ম এক এবং ব্রহ্মই বহু, ইহাকেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কহে।”

রাজ্ঞীর ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া সর্ব্বদা বিসম্বাদ করিয়া থাকি। ব্রহ্মজ্ঞান কথার কথা নহে। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি বলিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না, কাঠ মাটি মানি না বলিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না, দেবদেবীর অপমান করিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না, পুরাণ তন্ত্রাদির নিন্দা করিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না, ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া অতীব কঠিন, অতীব আয়াসসাধ্য, মনুষ্যের ভাগ্যে তাহা ঘটনা হওয়া অতিশয় বিরল। অনেক ক্লেশে অনেক সাধনায় সৌভাগ্যরাশি সঞ্চিত হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানীর বাস্তবিক একাকার জ্ঞান হয়। সে একাকার বিষ্ঠাচন্দন একাকার নহে। যদ্যপি বিষ্ঠাচন্দন একাকারকে ব্রহ্মজ্ঞান কহা যাইত, তাহা হইলে মেথরেরাই সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মজ্ঞানীর আসন প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইত। যদ্যপি বিকারবিরহিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া কথিত হয়, তাহা হইলে ধাঙ্গড় ডোম ইত্যাদি ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞানীর উপযুক্ত পাত্র হইত, তাহার সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণদেব সাধন দ্বারা নির্ব্বিকার ভাব কিরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার বুঝিয়া দেখিলেই হয়। তিনি চন্দন বিষ্ঠার একাকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারের দ্বারা নহে।

মনের দ্বারা বিচার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সাধনা মনের অতীত নহে। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু মনের অতীত বিষয়, এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব এক হস্তে বিষ্ঠা এবং এক হস্তে চন্দন লইয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। সমাধি কালে বহির্জগতের দিকে আর দৃষ্টি থাকিতে পারে না, সুতরাং সে অবস্থায় চন্দনই বা কি আর বিষ্ঠাই বা কি! এই

একাকার অবস্থার কথা, বিচারের কথা নহে। যেমন আমাদের জাগরূকাবস্থায় সকল বস্তুর পৃথক জ্ঞান থাকে, কিন্তু নিদ্রাকালে সেই জ্ঞান আপনি চলিয়া যায়। নিদ্রাকালে সমুদয় একাকার হইয়া থাকে। তথায় স্ত্রী কন্যা নাই, তথায় মাতা মাতামহী নাই, তথায় ঘর বাড়ী নাই, তথায় আত্মীয় শত্রু নাই, তথায় ভাল মন্দ নাই, তথায় বিষ্ঠা চন্দন নাই। রামকৃষ্ণদেব এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিষ্ঠাচন্দন লইয়া সাধন করিয়াছিলেন। অতএব একাকার জ্ঞান সাধকের অবস্থার কথা। নিদ্রাবসানকালে আর একাকার থাকিতে পারে না। তখন পৃথক পৃথক ভাবে কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, এক জ্ঞান ব্রহ্ম স্বরূপ, তাহা যেমন অবস্থার বিষয়, ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনি অবস্থার বিষয়, তাহাও ব্রহ্ম স্বরূপ। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, তবে শাস্ত্রে মায়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে কেন? তবে কি জন্য রামকৃষ্ণদেবই এক জ্ঞান জ্ঞান এবং বহু জ্ঞান অজ্ঞান কহিতেন? কি জন্য জগৎকে মায়া বলিয়া শাস্ত্রবিশেষ ভূরি ভূরি সাবধান করিয়া দিয়াছেন? ইহার কি কোন অর্থ নাই? শাস্ত্রবাক্যের অর্থ নাই বলে কে? রামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচারী হইবে কে? অতএব শাস্ত্র এবং রামকৃষ্ণের উপদেশের তাৎপর্য্য বাহির করিতে হইবে।

আমরা আরোহণ এবং অবরোহণ প্রক্রিয়ায় ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়াছি। কিন্তু শাস্ত্র দ্বারা তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত বলা হইয়াছে। যদ্যপি আমরা এই তিনটী শব্দ লইয়া বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে উল্লিখিত প্রশ্ন আপনি মীমাংসা হইয়া যাইবে। একদিকে সত্য, মধ্যে জ্ঞান এবং আর একদিকে অনন্ত। সত্য অনন্তের সহিত জ্ঞান দ্বারা

আবদ্ধ। অর্থাৎ সত্যের বিকাশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড, ইহা জ্ঞানেই বলিয়া দেয়। যাহার জ্ঞান নাই, সে সত্য এবং অনন্ত কিরূপে বুঝিবে? সত্যভাবও জ্ঞানপ্রসূত, সুতরাং উভয় স্থলে জ্ঞানে যোগ রহিয়াছে। যদ্যপি সত্য বোধ করিতে হয়, যদ্যপি অনন্ত বোধ করিতে হয়, তাহা হইলে তদ্‌বোধক শক্তি বা জ্ঞান লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই জ্ঞানকে রামকৃষ্ণদেব এক জ্ঞান কহিতেন। কারণ এই জ্ঞানই, এই ব্রহ্মজ্ঞানই উভয় ভাব প্রদান করিবার একমাত্র হেতুস্বরূপ।

অনন্ত ভাব ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা শাস্ত্রবাক্য, অনন্ত ভাব জগতের ভাব। জগতের ভাববৈচিত্র্য অনন্তের লক্ষণবিশেষ। এক পদার্থের নানাভাবে পরিবর্ত্তন হওয়া জগতের নিয়ম। এই ভাব সমভাবে থাকে না বলিয়া তাহা ত্রিকাল সত্য নহে, জ্ঞানপূর্ব্বক মায়া বা ভ্রম কহা যায়। যাহাকে মায়া বলিয়া কথিত হয়, সেই ভাবটীকেই মায়া কহে। অর্থাৎ একের ভাববৈচিত্র্যের অনন্তের লক্ষণ বিস্মৃত হওয়ার নাম মায়া বা ভ্রম। যেমন এক ব্যক্তি সময়ে সময়ে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলে বহু ভাবের ক্রীড়া হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবান্তর হয় না। সেই ব্যক্তির বহু ভাবের পরিচয় পাইবার তাহা হেতুস্বরূপ, অথবা যেমন বহুরূপী নানাবর্ণে পরিণত হইয়া একের বহুভাব শিক্ষা দেয়, কিম্বা জড়-জগতে রূঢ় পদার্থেরা বহু যৌগিকের রূপে একের বহুভাব প্রকটিত করে, সেইরূপ এক ব্রহ্ম বহুভাবে পরিব্যাপ্ত আছেন বলিয়া তিনিই অনন্ত শব্দে অভিহিত হইবার একমাত্র পাত্র।

যদ্যপি জগৎ পরিবর্ত্তনশীল না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের অনন্ত ভাব কিরূপে বুঝা যাইত? কেবল অনন্ত ভাব নহে, এক এবং অনন্ত। এই অনন্ত ভাব যখন স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান জন্মায়, তখনই তাহাকে মায়া কহে।

ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব যে প্রকার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন,

তদ্দ্বারা জগৎ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমুদয় একেরই বিকাশ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। এই মীমাংসা আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা আমরা যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা ইহাও বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, শক্তি বলিলে ঠিক তাহা হয় না। বলিবার, ভাবিবার, উপাস্য উপাসনার ভাব আসিলেই ব্রহ্ম-বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মশক্তি ভাবেই ধারণা স্থান পাইয়া থাকে। ব্রহ্মশক্তি বলিলেই শক্তিরই বিকাশ হয়। এই শক্তিকেই সাধকেরা ইচ্ছামত সম্বোধন করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মের লক্ষণাদি নিরূপণান্তর ব্রহ্ম পূজার স্থলে শক্তি পূজারই ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রহ্ম বলিয়া ডাকিলে, ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলে সাধকের কখন প্রাণ শীতল হয় না, কিন্তু যে একবার মা আনন্দময়ী, কোথায় অভয়া, কোথায় ব্রহ্মময়ী বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে পারে, অমনি সেই মহাশক্তি, সেই স্নেহময়ী মা তাহার কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য্য ব্রহ্মই করেন বটে, কিন্তু কার্য্যের ভাব থাকিবার নিমিত্ত শক্তির ভাবও আসিয়া থাকে। এই শক্তি মা বলিয়া উল্লিখিত।

আমরা সংসারে দেখিতে পাই যে, দুষ্ট বালকেরা বাবাকে দেখিলে ভয়ে আকুলিত হইয়া থাকে, তাঁহার নিকটে যাইবার কখন সাহস হয় না, কিন্তু মাতার নিকটে সে প্রকার ভয়ের সঞ্চার হয় না, অশেষ অপরাধের অপরাধী হইয়াও মাতার নিকটে নিরপরাধীর ন্যায় উপবেশন করিতে পারা যায়। একবার তাঁহার কাছে যাইয়া, মা! আমার বড় ক্লেশ হইয়াছে বলিতে পারিলে মাতার আর স্নেহের অবধি থাকে না। তিনি তখনই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা

করিতে থাকেন। এমন মধুর মাতৃভাব কি শুষ্ক ব্রহ্মভাবের সহিত তুলনা হইতে পারে? পিতা ব্যতীত মাতার দ্বারা যদিও সন্তান জন্মায় না, কিন্তু মাতা ব্যতীত পিতার দ্বারা কখন সন্তান জন্মিতে পারে না, সন্তান সম্বন্ধে মাতা এবং পিতা উভয়ে সমান প্রয়োজন, কিন্তু জীবন রক্ষা করে কে? কাহার দ্বারা দেহের সৃষ্টি হয়? কাহার দ্বারা দেহের পরিবর্দ্ধন হয়? ভূমিষ্ঠকালে কে স্তন্যসুধা দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করেন? পিতা না মাতা? আমরা বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া যখন চীৎকার করি, পিতা নিকটে থাকিলেও মাতা সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। পিতা কি দিয়া সান্ত্বনা করিবেন? এইজন্য যাহারা সংসার-চক্রে পতিত হইয়া উপর্য্যুপরি আঘাত প্রত্যাঘাতে কাতর হইয়া মা মা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, তখনই মা জগৎজননী ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। এইজন্য আমাদের মাতৃভাবে পূজার এত আড়ম্বর, মাতৃভাবে উপাসনার এত মাধুর্য্য।

ব্রহ্ম-শক্তি লইয়া মতান্তর হওয়া অদ্যকার কথা নহে এবং এই কথা লইয়া অনেকেরই ভ্রম জন্মিয়াছে। সাধারণ মনুষ্যাদির কথা কি, প্রবল ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানের আদর্শবিশেষ শঙ্করাচার্য্যও শক্তি লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে একদা শঙ্করাচার্য্য কাশীধামে অবস্থিতি কালে উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়া-ছিল যে, তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে শৌচাদি ত্যাগ করিতে যাইতে পারিতেন না। মা অন্নপূর্ণা শঙ্করের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া এক আহিরিণীর রূপে দধি বিক্রয় করিবার ছলনায় গমন করিতে ছিলেন। দধির নাম শুনিয়া শঙ্করের উহা ভক্ষণ করিবার নিতান্ত

স্পৃহা জন্মিল। তিনি অতি ক্লেশে বিকৃত স্বরে আহিরিণীকে বার বার ডাকিতে লাগিলেন। আহিরিণী তচ্ছ্রবণে কহিলেন যে, "আমি স্ত্রীলোক, পুরুষের বাটীতে প্রবেশ করি না। যাহার দধির প্রয়োজন হয়, সে আমার নিকট আসিয়া লইয়া যায়।" শঙ্কর কহিলেন যে, "দেখ, বাহিরে যাইবার আমার শক্তি নাই, এমন কি উঠিবারও আমার শক্তি নাই।" আহিরিণী অমনি আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিলেন, "কি! কি! তুমি বলিলে কি? তোমার শক্তি নাই? শক্তি আবার কি?" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র শঙ্করের ভ্রমোচ্ছেদ হইয়া আসিল।

শঙ্করের ন্যায় জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তির যখন ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছিল, তখন সাধারণ নরনারীর কথা হিসাবের অন্তর্গত নহে। বিশেষতঃ আমাদের যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রের বা ভাবের প্রকৃত অর্থ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বদা এ প্রকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাঁহার যে পর্য্যন্ত জ্ঞান, যাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির যে পর্য্যন্ত দৌড়, যাঁহার যে পর্য্যন্ত ধারণা, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবেন কিরূপে? ঘোর বিষয়ী, কামিনীকাঞ্চন-পরতন্ত্র আত্মাভিমানী কখন কোন কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ধার করিতে কি কৃতকার্য্য হইয়াছেন? ধর্ম্মের অর্থ বোধ করিতে হইলে প্রকৃত ধাম্মিক হওয়া চাই, শুদ্ধ চিত্ত হওয়া চাই, নির্লোভী হওয়া চাই, অভিমান বিবর্জ্জিত হওয়া চাই, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সেরূপ কয়জন ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন? আজকাল অনধিকারীর হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত রহিয়াছে, সুতরাং তদ্রূপই ফল ফলিতেছে। তাহা না হইলে, যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে আর্য্যেরা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাদি আশ্রমান্তর্গত হইয়া কুম্ভকাদি যোগাবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেন, সেই ব্রহ্ম-

জ্ঞান এমন হাটে বাজারে ছড়াছড়ি, বালক, বনিতা, যুবক, প্রৌঢ়, কামিনীকাঞ্চনমিশ্রিত নরনারী অবকাশমতে স্বেচ্ছানুযায়ী সকলেই লাভ করিতেছেন, ইহা কি সামান্য রহস্যের কথা! রামকৃষ্ণদেব সেই জন্য এই ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মশক্তি বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, রামকৃষ্ণদেব বার বার বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বলিয়া কখন পূজা হয় না, কখন উপাসনা হয় না। যেহেতু ব্রহ্ম অজ্ঞেয় বস্তু। তিনি বলিতেন, যেমন কেহ নিদ্রিত হইলে সেই নিদ্রাকালের অবস্থা তাহার জ্ঞানের অতীত বিষয়। কেহ নিদ্রা যাইলে সে ঘুমাইতেছে কি না, একথা কি তাহার বোধ থাকে? কখন নহে। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গের পর নিদ্রার পূর্ব্বাপর সমস্ত বিচার করিয়া নিদ্রাকালের বা মধ্য সময় একপ্রকার বুঝিয়া লওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞানও অবিকল তদ্রূপ। ব্রহ্মজ্ঞান সেইজন্য জ্ঞানের অধিকার-ভুক্ত নহে। কিন্তু নিদ্রাকাল যেমন নিদ্রার পূর্ব্বাপরের ভাবের দ্বারা একপ্রকার বুঝা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানকে যত্তপি জ্ঞান বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার বলা যাইতে পারে। রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন, যেমন সমুদ্রে লবণের ছবি ফেলিয়া দিলে উহা দ্রবীভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ পুত্তলিকার আর তথায় স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না, সেইরূপ যে কেহ ব্রহ্মদর্শনেচ্ছুক হইয়া তথায় যাইতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহার আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যেমন পারার হ্রদে সীসার চাপ ফেলিয়া দিলে পারার সহিত সীসা একাকার হইয়া যায়, সীসা আর তথায় স্বভাবে থাকিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মে গমন করিলে তথায় তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং, একথা বেদবাক্য, যিনি এক ব্যতীত দুই নহেন, তথায় আমি এবং ব্রহ্ম, এই দুই ভাব কিরূপে থাকিবে?

রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য বলিতেন যে, তথায় সেব্য সেবক নাই, জ্ঞেয় জ্ঞাতা নাই এবং উপাস্য উপাসক নাই। বলিতে, কহিতে, জানিতে, বুঝিতে, যাহা কিছু উপাসকের জ্ঞান থাকে, তাহা শক্তির বিকাশ। যে কেহ যেরূপে যাহা বলিয়া উপাসনা করেন, তাহা শক্তিপূজা ব্যতীত ব্রহ্ম —বিশুদ্ধ ব্রহ্মপূজা হইতে পারে না। এই শক্তিপূজাকে রামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের পূজা করেন, যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মশক্তিরই অর্থাৎ যুগল পূজা করিয়া থাকেন, ইহাতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

অবতারতত্ত্বে দেখা যায় যে, দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভগবানের অবতরণ হওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেক তত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। শাস্ত্রমতে ব্রহ্মজ্ঞানী হইবার যে প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান-কালে উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানী আপনাকে প্রচার করিলেই হইল। দেবদেবী না মানিলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়; ইহাই এখনকার বিশ্বাস এবং সেইরূপেই কার্য্য চলিতেছে। অতএব এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে কখন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কহা যাইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্ম-সংস্কার করিতে পারেন কে? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি; অতএব ধর্ম্ম-স্থাপন করা তাঁহার কার্য্য। রামকৃষ্ণদেব সেই কার্য্য করিয়াছেন, সেই বিকৃত সনাতন ব্রহ্মধর্ম্ম পুনরায় স্বাভাবিকাবস্থায় সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেবকে আমরা অবতার ব্যতীত আর

কি বলিব? অনেকে একুশ অবতার ও দশাবতার ব্যতীত অবতার স্বীকার করেন না। ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইবার কারণ এবং লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনন্ত অবতারের অবতরণ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।' এই গীতাবাক্য যাঁহারা অবিশ্বাস করিয়া দশাবতার এবং একুশাবতার স্বীকার করেন, তাঁহাদের আমি অহিন্দু বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। আমি ইতিপূর্ব্বে বার বার বলিয়াছি যে, আমাদের কোন শাস্ত্রের সহিত কোন শাস্ত্রের স্থূলে মিল থাকিতে পারে না। যেহেতু উহাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র প্রকার, কিন্তু মূলে সকলই এক। আমরা স্বল্পবুদ্ধিপ্রসূত সংকীর্ণ জ্ঞান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির কার্য্য আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া থাকি। যে হিন্দু-শাস্ত্র সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মদর্শী ঋষিদিগের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র আমরা অহংজ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের ভ্রম-প্রমাদ বাহির করিয়া দিতেছি, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? হিন্দুশাস্ত্র সমুদয় সত্য; বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি কিছুই মিথ্যা নহে, ইহা রামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন। কেবল বলা নহে, তাহার মীমাংসাও করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত ধর্ম্মের মীমাংসকরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি অবতার।

কথিত হইয়াছে যে, দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক অবতারের আগমন হয়। আমাদের এখনকার অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আমরা ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিবার একেবারে অযোগ্য পাত্র হইয়া পড়িয়াছি। সাধন ব্যতীত ভগবান্ লাভ হয় না, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের সাধন করিবার শক্তি কতদূর, তাহা আমরা কে না জানি? ভগবানের নাম লইবার সময় নাই। একবার

চুপ করিয়া ধ্যান করিবার অবকাশ নাই এবং বলিলেও মনের স্থিরতা হয় না। সাধন করা একেবারেই আমাদের সাধ্যাতীত কথা। দশটার পর অনাহারে থাকিলে শিরঃপীড়া হয়, অনশন ব্রত পালন করিব কিরূপে? খবরের কাগজ পড়িতে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে থাকে, শাস্ত্রের গভীরতম তাৎপর্য্য কেমন করিয়া চিন্তায় স্থান পাইতে পারে? আমাদের শরীর সকল ব্যাধির মন্দিরবিশেষ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা কে না বুঝিয়াছি? অজীর্ণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, জরা প্রভৃতি রোগ নাই, এমন পাঁচজন লোক দেখা যায় না। এই শরীর যোগের কঠোর সাধন করিবে কিরূপে? এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব আমাদের পরিত্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়া বকল্‌মা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

তাই আমি বলিতেছি, যে কেহ দীন হীন থাক, যে কেহ পতিত থাক, যে কেহ আপনাকে অসমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ, যে কেহ পরিত্রাণের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছ, আইস, রামকৃষ্ণের নিকট আইস, তাঁহাকে বকল্‌মা দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে দিন যাপন করিয়া যাও। একথা মিথ্যা বা কাল্পনিক নহে। আমি সত্যই বলিতেছি। একদিন আমি কি ছিলাম তাহা আমি জানি, রামকৃষ্ণে বকল্‌মা দিয়া এখন যে কি আনন্দে দিন যাপন করিতেছি, তাহাও আমি জানি, যে রামকৃষ্ণে বকল্‌মা দেয়, সেও অচিরাৎ আমার ন্যায় অবস্থায় উপনীত হয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। আপনারা প্রত্যক্ষ করুন, এই যুবকটি আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণ নামে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। উঁহার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করাপেক্ষা প্রত্যক্ষ করুন। যদ্যপি বক্তৃতার গুণে লোকের ধর্ম্মভাব উপস্থিত হইত, তাহা হইলে এতদিন কাহার ধর্ম্মের দুঃখ থাকিত না। কারণ মহামহোপাধ্যায়গণ বক্তৃতার হিল্লোলে সময়ে সময়ে আমাদিগকে বিঘূর্ণিত করিতে ছাড়েন

নাই। তখন আমার স্থায় মূর্খের দুটো কথায় কখন কোনপ্রকার ধর্ম্মের ভাব উপস্থিত হওয়া হাস্তাস্পদের কথা। রামকৃষ্ণের মহিমায় সমুদায় হইতেছে, রামকৃষ্ণের কৃপায় লোকের ভবঘোর বিদূরিত হইতেছে, রামকৃষ্ণই সকলের অভিমত প্রার্থনা সম্পূর্ণ করিতেছেন। যাঁহারা সাধন ভজন লইয়াছেন, তাঁহাদের এই পরামর্শ দিতেছি যে, যেমন গোপাঙ্গনারা কাত্যায়নী আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণের সহায়তা লইয়া দেখুন, অচিরাৎ তাঁহাদের ইষ্ট সাক্ষাৎ হয় কি না! যদ্যপি না হয়, তাহা হইলে আমি উপর্য্যুপরি বলিতেছি যে আমি সহস্র পাদুকার পাত্র হইব।

রামকৃষ্ণ পতিতদিগের একমাত্র উপায়, অবলম্বন, সহায় ও সম্পত্তি। যে অকপটে ভাবের ঘরে চুরি না রাখিয়া রামকৃষ্ণ বলে, তাহার সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে।

গীত

(১)

দীন হীন তারণ কারণ দীননাথ নাম হে।
পতিত তাপিত তাপহরণ পতিতপাবন নাম হে॥
কলুষনাশন কৃপানিধান করুণাময় নাম হে।
জগতজীবন ভকতপ্রাণ ভক্তাধীন নাম হে॥
পীতবসন মুরলীবদন মদনমোহন ঠাম হে।
সাধন ভজন বিহীন যে জন রামকৃষ্ণ নাম হে॥

(২)

ব্রহ্ম ব'লে প্রাণ গলে কই, মা ব'লে তাই তোরে ডাকি।
কোথা ব্রহ্ম পাইনে দেখা তোরে মা অন্তরে দেখি ॥
তুই তো এনেছিস্ ভবে, মা ছাড়া কি শিশু রবে,
অভয়া অভয় দিবে শমনে দেখাব ফাঁকি ॥
স্মরিতে সে প্রাণ কাঁদে, কে যেন রেখেছে বেঁধে—
চায়না প্রাণ ব্রহ্মপদে, ব্রহ্মময়ীর পদে থাকি ॥

(৩)

জ্ঞানে ব্রহ্ম না পাই দেখা, বুদ্ধি ক'রে না যায় জানা।
সে জনার ভাব ভাব্‌তে গেলে, ভাবনাতে তা বাগ মানে না ॥
সৃষ্টি হেরি সৃষ্টিপতি, অনুমানে হয় শকতি,
তাই বুঝি সে জগৎপতি—দেখায় আপন গুণপনা ॥
শক্তিধরের শক্তি হেরে, শক্তিহীনের প্রাণ শিহরে,
জীবের তরে বারে বারে রূপ ধরে সে দিতে চেনা ॥
ধরা ব্রহ্ম বিষম দায়, শক্তি বিনা কেবা ধরায়,
ব্রহ্ম সনে শক্তি খেলায় (যেন) বহ্নিসনে বহ্নিকণা ॥

(৪)

প্রাণ খুলে রামকৃষ্ণ ব'লে প্রেমে গ'লে চলে আয়।
যে ভবের মাঝে নাম পেয়েছে, বিদায় দেছে কালের দায় ॥
জুড়াতে অন্তরের জ্বালা বদন ভ'রে নামটী বলা,
ভক্তি সনে প্রাণে প্রাণে প্রাণটী গলা ,—
সাধে হেরবে হৃদে হৃদয়চাঁদে, রামকৃষ্ণ নামের মহিমায় ॥

সপ্তম বক্তৃতা সম্পূর্ণ ॥

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

অষ্টম বক্তৃতা

—:*:—

জ্ঞান ও ভক্তি

—:*:—

১৩০০ সাল, ২০ শে কার্ত্তিক, রবিবার, প্রাতঃ
৮ ঘটিকায় সিটি থিয়েটারে প্রদত্ত।

—:*:—

৫৭ রামকৃষ্ণাব্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

জ্ঞান ও ভক্তি

—*—

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

আমাদের দেশে জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি স্বতন্ত্র মত বা পন্থা বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই দুই মতের শাস্ত্রাদি প্রচলিত আছে। জ্ঞানীরা জ্ঞান-মার্গকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র রাজকীয় পথ বলিয়া মনে করেন এবং ভক্তিকে মায়ার ছলনা বোধে তদ্‌সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যকলাপকেও ভ্রমাত্মক :জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। জ্ঞানীরা জগৎকে মায়া বলেন। মায়া বলিলে ভ্রম বুঝায়। ভ্রমে যাহা শুনা যায়, তাহা প্রকৃত দেখা শুনা নহে। যেমন মরীচিকায় বারি ভ্রম হয়। তেমনি জগতে প্রকৃত বলিয়া আমাদের যে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, সে বাস্তবিক অপ্রাকৃত জ্ঞান। মরীচিকায় বারি যেমন জল নহে, তেমনি জগৎ দেখিয়া যে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, সে জ্ঞানও সত্য নহে। ভক্তিতে এই বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকে বলিয়া তাহাও ভ্রমের অধিকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

সংসারে আমরা নানা রসে অবস্থিত করিয়া থাকি। সংসার ভ্রম, সুতরাং বিবিধ রসও ভ্রম। শান্ত দাস্যাদি পঞ্চরস লইয়া আমাদের সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পঞ্চরস ভক্তিতে প্রয়োগ

করিয়া ভক্তেরা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বা আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করেন। জ্ঞানীরা ভক্তদিগের এই কার্য্যাদি ঈশ্বরবিরুদ্ধ ভাব বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। হাসা কাঁদাকে মানসিক দৌর্ব্বল্যজনিত স্নায়বীয় বিকারজনিত লক্ষণবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করেন। মুখের মাংসপেশী সকল আকুঞ্চিত হইলে হাসা বলি ; কাঁদিবার সময় চক্ষে রক্তাধিক্য হয়. সুতরাং তাহা হইতে জল বাহির হইয়া থাকে। করতালী দিয়া নৃত্য করাকে উন্মত্ততা বা বাতুলতা বলা হয়। ফলে জ্ঞানীরা ভক্তিকে একেবারেই গণনায় স্থান দেন না।

ভক্তেরা জ্ঞানকে ভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। এই নিমিত্ত ভক্তিগ্রন্থে মুক্তি ভক্তির দাসী এবং কোনস্থানে জ্ঞান ও ভক্তিকে পুরুষ এবং নারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরুষ যেমন কাহারও অন্তঃপুরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, সে বহির্বাটী হইতে তথাকার সংবাদ আনয়ন করিতে পারে, জ্ঞানও তদ্রূপ। কিন্তু ভক্তি স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্তঃপুরের সংবাদ প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত তত্ত্ব নিরূপণ সম্বন্ধে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে বিভিন্নতা আছে কি না তাহা রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ দ্বারা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত আমি পুনরায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। রামকৃষ্ণদেবের যদ্যপি কৃপা হয়, তাহা হইলে আমি এই অতীব গুরুতর জ্ঞান ও ভক্তি তত্ত্বের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে কৃতকার্য্য হইব। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি সাধকের অবস্থার বিষয়। সাধক যখন ভগবৎতত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার একপ্রকার অবস্থা এবং যখন তিনি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহবাসে দিন যাপন করেন, তখন আর একপ্রকার অবস্থা।

অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞানকে জ্ঞান এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ করাকে ভক্তি কহে। জ্ঞানপথাবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিলে ভগবান্‌কে জানা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া সম্ভোগ করা যায় না। পূর্ব্ব বক্তৃতাদিতে স্থানে স্থানে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানপথে সাধকেরা বাহ্য জগৎ হইতে আরোহণ বা বৈশ্লেষিক সূত্রাবলম্বন পূর্ব্বক 'নেতি' 'নেতি' করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম কারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগবানের জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানের পরবর্ত্তী অবস্থাকে বিজ্ঞান কহে। বিজ্ঞান মহাকারণের শেষ ভাগকে বলে। বিজ্ঞান লাভের পর সাধকের আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তিনি তখন ভগবানের সহিত একাকার হইয়া যান, এই অবস্থাকে নির্ব্বাণ কহা যায়। অতএব জ্ঞানের চরমাবস্থায় সাধক মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মুক্তি দুই প্রকার, প্রথম, জ্ঞান-মুক্তি এবং দ্বিতীয়, বিজ্ঞান-মুক্তি। সাধকেরা যখন বিচার দ্বারা স্থূল জগৎ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া লন, তখন তিনি জ্ঞানমুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ কেবল বিচার দ্বারা আপনাকে মুক্ত জ্ঞান করা। মানচিত্র দেখিয়া সমগ্র পৃথিবীর তত্ত্ব নিরূপণ করিলে যেরূপ জ্ঞানলাভ করা যায়, জ্ঞান-মুক্তিও সেইপ্রকার অবস্থার বিষয়। মনে মনে বিচারপূর্ব্বক স্ত্রী পুত্রাদি ধন জন সকলের মায়িক সম্বন্ধ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলে, কারণ-প্রসূত এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয়। ইহাকেই জ্ঞান-মুক্তির অবস্থা কহে। এই শ্রেণীর জ্ঞানীরা 'সোহং' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

নিগুর্ণ ঈশ্বর সাধনা করা জ্ঞানপন্থার উদ্দেশ্য। জ্ঞানীদিগের মতে জগৎ ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোর দ্বারা সংগঠিত। এই ত্রিগুণের সমষ্টিকে তাঁহারা মায়া কহেন, মায়ার অতীত ভাবকেই প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে৭

সাধকেরা যখন কারণাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মহাকারণের সম্মুখীন হন, তখন তাঁহাদের আর বহির্জ্ঞান থাকে না। তাঁহাদের মন বুদ্ধি এক-প্রকার বিলয় প্রাপ্ত হইয়া আইসে, এই অবস্থাকে সমাধি বলিয়া উল্লিখিত হয়। সাধকেরা যখন মায়ার হস্ত হইতে পরিমুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত সাধনা করেন, তখন এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলেই তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান-মুক্তিতে যে সমাধি হয়, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। অভ্যাস মতে উহার স্থায়ীভাব বৃদ্ধি হইতে পারে।

বিজ্ঞান-মুক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। সাধকেরা যখন জ্ঞানমুক্ত হইয়া মহাকারণে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তখন জীবাত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া কখন ব্রহ্মসমীপে এবং কখন তাঁহাতে যাইয়া সংযুক্ত হইয়া থাকেন। জীবাত্মা যে সময়ে ব্রহ্ম সন্নিধানে অর্থাৎ কারণ এবং মহাকারণের মধ্যস্থলে অবস্থিত করেন, তখন সাধক আপনার স্বরূপ ব্যতীত মহাকারণের আভাস বুঝিতে পারেন, পরে সেই জীবাত্মা দেহে প্রবেশ করিলে ক্রমে ক্রমে আরোহণ প্রক্রিয়ায় কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলাদি ভাবে অবতরণ পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সাধকেরাই প্রকৃত পক্ষে কারণ জ্ঞান হইতে 'সোহং' শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ইহাই প্রকৃত 'সোহং' এর তাৎপর্য্য।

যে সাধকের জীবাত্মা, কারণ এবং মহাকারণের মধ্যস্থান অতিক্রম করিয়া মহাকারণে প্রবেশ করে, তাঁহার সহজে সমাধি ভঙ্গ হয় না। সেই সাধক সহস্র সহস্র বৎসর সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। সে সাধক পুনরায় জীবাত্মা লাভ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারেন না।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণাদি কাহাকে বলে, তাহার আভাস

দিবার নিমিত্ত আমি একটি সহজ দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। যেমন কোন ব্যক্তি লোকালয় হইতে উপবন, বন, মাঠ, অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতটে যাইয়া উপস্থিত হইল। সমুদ্রতটে অবস্থিতি কালে তাহার ঘর বাটী ও অন্যান্য জ্ঞানও থাকে এবং সকলের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, একথাও তাহার ধারণা থাকে। তথায় সে একাকী, সুতরাং সর্ব্বত্রে সে আপনাকে অদ্বিতীয় জ্ঞান করে। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার কূলকিনারা দেখিতে পায় না, অনন্ত ব্যাপার, অনন্ত প্রকার তরঙ্গ রঙ্গ হিল্লোল ব্যতীত আর কিছু বুঝিতে পারে না এবং বুঝিবার উপায় থাকে না। যে ব্যক্তি নিতান্ত বুদ্ধিমান, সে ব্যক্তি সমুদ্রের জল আস্বাদন করিয়া লয়। সমুদ্র জানিবার জন্য যদ্যপি কেহ ঝাঁপ দেয়, তাহা হইলে সে কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহার নির্ণয় করিতে পারে কে? জ্ঞানপথও অবিকল তদ্রূপ। জ্ঞানপন্থার সাধকদিগের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁহারা উল্লিখিত হইয়া থাকেন। স্থূলে ব্রহ্মচারী, সূক্ষ্মে সন্ন্যাসী, কারণে পরমহংস এবং মহা-কারণে নির্ব্বাণমুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। জ্ঞান-পন্থীদিগের উদ্দেশ্য সত্য বাহির করা। বহির্জগতের প্রত্যেক বস্তু পরিবর্ত্তনশীল; এই এক অবস্থায় এক পদার্থ একপ্রকার ভাবের পরিচয় দিতেছে, পরক্ষণে তাহাকে আর সেরূপ দেখা যায় না। এই পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু-বান্ধবাদি লইয়া সংসার সংগঠন পূর্ব্বক দিনযাপন করা যাইতেছে; পিতা মাতা সত্য, ভাই ভগ্নী সত্য, স্ত্রী পুত্রাদি সত্য বলিয়া প্রতিক্ষণই অনুভব করা যায়; কিন্তু একে একে তাঁহারা কোথায় চলিয়া গেলেন, আর তাঁহাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা জ্ঞান জন্মিয়া যায়। এইরূপে

বাহ্য বস্তু হইতে সত্য মিথ্যা জ্ঞান সঞ্চারিত হইলে সত্যকে জানিবার তখন স্পৃহা জন্মায় এবং তাহার অনুসন্ধান করিবার ভাব আসিয়া মানবকে অধিকার করে। এই ভাবকে প্রভু সাধকের বৈখরী-অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যায় যখন সাধকের মনে মায়া অর্থাৎ স্থূল জগতের ভাব বিহীন হইয়া আইসে, তখন স্থূলভাববিশিষ্ট মনবুদ্ধি শুদ্ধতা লাভ করে। এই অবস্থার সাধককে সন্ন্যাসী বলা যায়। সন্ন্যাসী অর্থে ন্যাসী বা ত্যাগী বুঝায়।

সাধকের মনবুদ্ধি শুদ্ধ হইলে ভগবানের ভাব ধারণা করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ্যে সন্ন্যাস ভাবের এতদূর প্রাবল্য দেখা যায়। সন্ন্যাসীর মনে কোন ভাব উদয় হইলে তিনি তাহা বিশ্লিষ্ট করিয়া জ্ঞানের সম্বন্ধ বাহির করিতে চেষ্টা করেন, যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া হংসকে প্রদান করিলে সে ক্ষীরভাগ গ্রহণ করিয়া নীরভাগ ত্যাগ করিয়া থাকে। সন্ন্যাসীরা সাংসারিক ভাব ত্যাগ পূর্ব্বক যখন ভগবানের ভাব লইয়া দিনযাপন করিতে পারেন, তখন তাঁহারা পরমহংস নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পরমহংসেরা কারণে বিচরণ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণ বা মহাকারণের অবস্থা লোকাতীত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ভক্তি-মত জ্ঞানপন্থার বিপরীত অর্থাৎ অবরোহণ সূত্রাবলম্বন পূর্ব্বক সাধক কারণ-জ্ঞান লাভ করিয়া স্থূল ভাবের কার্য্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আরোহণ প্রণালীমতে কারণ এবং মহাকারণের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান লাভ হয়, যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া পূর্ব্ব বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছি। সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্থূলে নাবিয়া আসিলে সর্ব্বত্রেই একের বহুভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে যদিও একের বহুভাবের স্থূল দৃষ্টান্ত

প্রতীয়মান হয়, যথা, এক সূর্য্য, এক চন্দ্র, এক জল, এক বায়ু, এক স্বর্ণ, এক রৌপ্য নানাভাবে প্রদৃশ্যমান হইয়া থাকে, তথাপি আরোহণ সূত্রমতে কারণান্ত পর্য্যন্ত গমন করিবার ছলে প্রত্যাগমন না করিলে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্রে একেরই জাজ্বল্যমান প্রতিভা প্রত্যক্ষ করা যায় না; এইরূপ বৃক্ষ পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মহিমার্ণবের অনন্ত ভাবের ছবি সাধকের মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে উন্মাদবৎ করিয়া ফেলে। বৃক্ষপত্র দেখিয়া তাঁহার মনে হয় যে, ইহারা নিজ গঠনের ভিতরে কেমন করিয়া বল নিহিত করিয়া রাখে? এ কৌশল কাহার? এমন সুন্দর ব্যবস্থা কাহার? পত্রের, না সেই মহিমার্ণবের? কোথায় সূর্য্য আর কোথায় পত্র! সামান্য অকিঞ্চিৎকর বৃক্ষের পাতা দেখিয়া কেহ কি মনে করেন যে, আমাদের সমুদয় বল বিক্রম উহারই গর্ভজাত? বিশ্বাস হয় না, বুঝা যায় না। কিন্তু সে কথা সাধকের অগোচর নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ এই বচনাতীত অপূর্ব্ব মহিমা দেখিয়া তাঁহাকে গুণের আধার বলিতে কখনই পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে পারেন না। সেই মহাকারণস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে জগৎ-পতিরূপে দর্শন করিবামাত্র সাধক আপনেচ্ছায় রাজোপহার প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। এই কার্য্যকে স্বগুণ উপাসনা বা ভক্তি কহা যায়।

স্থূল ভাবের পরিসীমা নাই। যে দিকে যে কোন স্থূল পদার্থ লইয়া বিচার করা যায়, সেই দিকে সেই পদার্থই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনন্ত মহিমার পরিচয় দিয়া থাকে। গাছের পাতা কেবল বনের হেতুবিশেষ বলিলে তাহার সীমা হইয়া যায় না। তাহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে বলিলে অনেকে হাসিয়া উঠিবেন, হয় ত কেহ কেহ একথা বাতুলতার উচ্ছ্বাসবিশেষ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা নহে,

পৃথিবীমণ্ডলে জীব এবং উদ্ভিদ্ জগৎ, জগতের দুইটি বিশেষ বিভাগ। এই দুইটি শ্রেণী বিনষ্ট হইলে জগতে কেবল জল এবং পার্থিব পদার্থই অবশিষ্ট থাকে। তদ্দ্বারা বাস্তবিক পৃথিবীর পূর্ণ শোভা কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। এই জীব এবং উদ্ভিদ জগৎকে যে গুণে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। সামান্য বৃক্ষের পাতা আর কিছুই নহে, এই বিরাট শ্রেণীদ্বয়ের কল্যাণ বিধান করিতেছে। গাছের পাতা না থাকিলে গাছ বাঁচে না; গাছের পাতা না থাকিলে জীব বাঁচে না। কি অপার কৌশল! কি অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার! জীবগণ বায়ু ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকি। নিঃশ্বাসে দেহে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, প্রশ্বাসে তাহা পুনরায় বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস বায়ুর গুণ সম্পূর্ণ বিপরীত। নিঃশ্বাস বায়ুতে জীব-জীবন রক্ষা হয়, তাহা আমরা জানি, প্রশ্বাস বায়ুতে তাহা হয় না—জীব মরিয়া যায়। নবাব সেরাজুদ্দৌলার ভীষণ অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী সাধারণের অজ্ঞাত বিষয় নহে। বায়ুতে দুইটি বাষ্প মিশ্রিত আছে। অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। অক্সিজেনই প্রকৃত জীব-জীবনের অমৃতস্বরূপ। যেমন গরম জলে স্নান করিতে হইলে তাহার সহিত ঠাণ্ডা জল না মিশাইলে শরীর দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ অক্সিজেনের তীব্রভাব সাম্য করিবার জন্য দয়াময় নাইট্রোজেন মিলাইয়া দিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য মিশাইবার কৌশল! কোন দেশে কোন স্থানে কোন অবস্থায় উহাদের পরিমাণের কম বেশী হয় না। চারিভাগ নাইট্রোজেন একভাগ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত থাকিলে জীব-জীবন রক্ষা হয়, তাই তিনি তাহার চিরব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ ঘটনা দেখিলে কে না আশ্চর্য্য মানেন? কে না বিমোহিত হইয়া

তাঁহাকে অপার গুণনিধান জ্ঞানে মস্তকাবনত করিতে বাধ্য হন ;
এই বায়ু যখন জীবদেহে প্রবেশ করে, তখন ফুসফুসের ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ শৈরিক শোণিতকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। বায়ুর এই বিশুদ্ধ-করা শক্তি অক্সিজেনের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। শৈরিক শোণিত পরিশুদ্ধাবস্থায় ধামনিক শোণিত বলিয়া উল্লিখিত, ইহাই জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কারণবিশেষ।

যখন অক্সিজেন শৈরিক শোণিতকে পরিষ্কার করে, তখন পদার্থে পদার্থে সংযোগ বিয়োগ হয় বলিয়া উত্তাপ জন্মিয়া থাকে। এই উত্তাপও জীবনরক্ষার অপর কারণবিশেষ। প্রশ্বাস বায়ুতে কয়লা থাকে। এই কয়লা শৈরিক শোণিত হইতে অক্সিজেন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ইহার সহিত মিলিতাবস্থায় বহির্গত হয়। প্রশ্বাস বায়ুতে এই নিমিত্ত অক্সিজেন, কয়লা এবং নাইট্রোজেন থাকে। এই কয়লা পরিমাণ করিয়া দেখিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকি, জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়া ফেলি। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রত্যেক মনুষ্য হইতে গড়ে প্রায় এক পোয়া কয়লা বাহির হইয়া যাইতেছে। কেবল মনুষ্য নহে, প্রত্যেক জীব, কেবল জীব নহে, কয়লা কোক ও কাষ্ঠাদি দগ্ধ কালে, কেবল তাহা নহে, উৎসেচনাদির সময় অপরিষ্যাপ্ত কয়লা অক্সিজেনের সহিত বাষ্পাকারে বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই অসীম পরিমাণ কয়লা বাষ্প যদ্যপি পৃথিবীতে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হইত, তাহা হইলে জীব এবং উদ্ভিদশ্রেণী একেবারে পৃথিবীর বক্ষঃস্থল হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। কাহারও সাধ্য নাই যে, বায়ুকে কয়লা হইতে কোনরূপে পরিশুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু লীলাময় গুণমণির গুণের কি ইয়ত্তা আছে! গাছের পাতা, সামান্য গাছের পাতায় দ্বারা তিনি কি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন! পাতার সবুজ বর্ণ যাহা আমরা দেখিতে পাই, উহা

সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে কয়লাসংযুক্ত অকৃসিজেন বাষ্পকে বিকৃত করিয়া কয়লাকে ধরিয়া রাখে এবং অকৃসিজেনকে বাহির করিয়া দেয়। এই অকৃসিজেন পুনরায় বায়ুতে আসিয়া জীবদেহে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে উহা অঙ্গার লইয়া উদ্ভিজ্জদেহে প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে উভয়দিক বজায় রহিয়াছে। এই স্থূলভাব লইয়া সাধক যখন আলোচনা করিয়া দেখেন, তখন কি তিনি ভগবান্‌কে গুণনিধি না বলিয়া অন্য কথায় প্রাণের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতে পারেন? কখনই না। কে এমন সাধক আছেন যে, যিনি এই স্থূল রহস্য দেখিয়া ভগবান্‌কে রসিকশেখর বলিতে বাধ্য না হন? সামান্য বৃক্ষপত্র সামান্য দ্রষ্টার চক্ষে, সামান্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। আমরা পাতাকে কত মূল্যবান বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। সেও এক অবস্থার কথা। আবার সাধক হইয়া আরোহণ ও অবরোহণ সূত্রক্রমে সেই পাতা হইতে বিশ্বপাতার বিশ্বরচনার বিমল ছবি দর্শন করা যায়। এই অবস্থায় সাধকেরা সুতরাং তাঁহাকে গুণযুক্ত উপাসনা করিয়া থাকেন। স্থূলে প্রত্যেক পদার্থ হইতে তাঁহার গুণের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তাহা ধারণা করিয়া কীর্ত্তন করিলে ভক্তির কার্য্য হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত প্রভু বলিয়া গিয়াছেন যে, ভগবান্‌সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কার্য্যকে ভক্তি বলা কর্ত্তব্য।

ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞানভক্তি এবং বিজ্ঞানভক্তি। এই বিভাগদ্বয়কে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য ভক্তি বলিয়াও উল্লেখ করা যায়। কারণ ইহাতে অবরোহণ করিয়া স্থূল দর্শন দ্বারা যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাকে জ্ঞানভক্তি কহে। এই ভক্তিতে ভগবান্ সাধকের বোধে প্রকাশিত থাকেন।

বিজ্ঞানভক্তি স্বতন্ত্র প্রকার। ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া সাধক

যে সকল কার্য্য করেন, তাহাকে বিজ্ঞান বা মাধুর্য্য ভক্তি কহে।

বিজ্ঞানভক্তি তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, নিষ্ঠাভক্তি, ভাব এবং প্রেম। আপন অভিপ্রেত ভাবে অনুরক্ত থাকার নাম নিষ্ঠা। যেমন গুরুপ্রদর্শিত ইষ্টমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যরূপের অভিলাষী না হওয়া, আপন ইষ্টের গুণ কীর্ত্তন করা, আপন ইষ্টেরই কার্য্যে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকা নৈষ্ঠিক সাধকের লক্ষণ। নৈষ্ঠিক ভাবের কার্য্যকে ভক্তি কহে। নিষ্ঠার পূর্ণ বিকাশ পাইলে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাকে ভাব কহে এই সময়ে সাধক কায্যবিশেষের দ্বারা আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। সাধকের আনন্দাস্বাদ হইলেই ইষ্টের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধ নানাপ্রকার।—যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। কেহ বা এই পঞ্চভাবের যৌগিকবিশেষের দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। ইষ্টের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সাধকের যে অবস্থা হয়, তাহাকে প্রেম কহে। প্রভু বলিতেন যে, "ভাব পাকিলে প্রেম বলে"। সাধকের অবস্থাবিশেষে প্রেমের প্রকারান্তর আছে। যথা সাধারণী, সামঞ্জসা, একাঙ্গী এবং সমর্থা। সাধারণী প্রেমে শান্ত ভাব মিশ্রিত থাকে। এই নিমিত্ত ইষ্টের প্রতি মহান্, বীর্য্য, শৌর্য্যশালী, অসীম, অনন্ত গুণসম্পন্ন ভাব সাধকের মনে উপস্থিত থাকে। যে পর্য্যন্ত অভিপ্রেত ভালবাসার বস্তু না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত তাহা প্রাপ্ত হইবার যে অনুরাগ থাকে, তাহাকেও সাধারণী প্রেম কহে। সাধারণী প্রেম কাহাকে বলে, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি। একদা দুইটী প্রেমিক সাধক অরণ্যপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সম্মুখে একটী ভীষণাকার ব্যাঘ্র দেখিয়া একজন বলিলেন, "ভাই! আইস, আমরা হয় পথ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যদিক দিয়া গমন করি, না

হয় বৃক্ষের অন্তরালে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করি, ব্যাঘ্র চলিয়া যাইলে আমরা পুনরায় অগ্রসর হইব।" দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন কহিলেন, "ভাই! তোমার ন্যায় ভীরু সাধক আর কুত্রাপি দেখি নাই। ভগবান্ বিশ্বপাতা, তাঁহাকে তুমি অদ্যাপি জান না? তিনি সর্ব্বত্রে সর্ব্বব্যাপীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অন্তর্যামী, সর্ব্বসাক্ষী, আমরা তাঁহার পদাশ্রিত দাস, একথা তিনি বিলক্ষণ জানেন, তিনি এখনই আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, সে জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না।" প্রথম সাধক কহিলেন, "ভাই! সে সকল কথা আমি জানি, কিন্তু মনে কর দেখি, একটু লুকাইলে যখন ব্যাঘ্র আপনি চলিয়া যাইতে পারে, তখন আবার ভগবান্‌কে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি?" দ্বিতীয় সাধক কহিলেন, "ভাই! তোমার বিশ্বাস কম, তাইজন্য অমন কথা কহিতেছ। ব্রহ্মাণ্ডপতির আবার ক্লেশ? কথা শুনিলে হাসি পায়।" এই ব্যক্তির যে প্রকার প্রেম, তাহাকে সাধারণী প্রেম কহে।

সামঞ্জসা প্রেমে সাধক ইষ্টের নিকট ভালবাসার বিনিময় প্রত্যাশা করেন। ইষ্টের নিকট বর প্রার্থনা সামঞ্জসা প্রেমের দৃষ্টান্ত। যেমন ইষ্টের ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া ধন, পুত্র ও অন্যান্য কামনা পূর্ণ করিয়া লওয়া। অথবা যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে লাভ করিয়া উভয়ে সুখী হওয়াকে সামঞ্জসা প্রেম কহে।

একাঙ্গী প্রেমে সেবক আপনিই ইষ্টের নিকট সর্ব্বদা ভালবাসা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকে, নিজের মঙ্গল ব্যতীত ইষ্ট সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার দৃষ্টি থাকে না। তাঁহার ধারণা এই যে, ইষ্টের করিবার কিছুই নাই কি? তিনি বাসনা পূর্ণ করিতে বাধ্য, যদ্যপি না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নানাবিধ ক্লেশ দিব। একাঙ্গী প্রেমিকেরা নিজ স্বার্থের বশীভূত হইয়া ইষ্টকে বিধিমতে ক্লেশ দিয়াও ক্ষান্ত হন

না। কোন ভক্ত ইষ্টের নিকটে সর্ব্বদাই অভিমত কামনাদি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার ইষ্টও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া প্রেমিকের মনোরথ পূর্ণ করিতেন। একদিন ভক্ত অতিশয় গুরুতর আব্‌দার করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইষ্ট সে দিন কিছুই বলিলেন না। ভক্ত তখন প্রেমোন্মত্ততায় বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর! আপনি কি মনে করিয়াছেন? আমি আপনার চরণাশ্রিত, ও চরণ আপনার নহে। যগ্যপি আমায় বঞ্চনা করেন, তাঁহা হইলে অস্ত্রাঘাতে আপনার চরণ তুইটী ছেদন করিয়া লইয়া যাইব! আর আমার অভাব থাকিবে না। আমি বাটীতে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া পাদপদ্ম তুইটী হৃদ্‌পদ্মে ধারণপূর্ব্বক অবিচ্ছেদ শান্তি-নিকেতনে বসিয়া থাকিব।" একাঙ্গী প্রেমিকেরা বাস্তবিক স্বার্থপর, তাঁহারা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার সময়ে ইষ্টের প্রতি কোন ভালবাসার ভাব রাখেন না। একদা কোন কৃষ্ণভক্ত তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তির নিকটে লীলারূপে দর্শনপ্রার্থী হইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু সে রূপ তিনি দেখিতে পাইলেন না। ভক্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, "দেখ, এখনও বলিতেছি যে, যগ্যপি তুমি লীলারূপে আমায় দর্শন না দাও, তাহা হইলে আমি তোমার যৎপরোনাস্তি তুর্গতি করিব।" শ্রীমূর্ত্তি হইতে তথাপি কোন উত্তর আসিল না। তদনন্তর ভক্ত একটী বাঁশের লগুড় আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "এখনও বলিতেছি, যগ্যপি ভাল চাও, তাহা হইলে আমার বাসনা পূর্ণ কর।" শ্রীমূর্ত্তিকে তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে লগুড়াঘাতের দ্বারা মূর্ত্তিটী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "এই বাঁশ আমার স্কন্ধে রহিল, আমি দেশ বিদেশ, বন উপবন, নগর প্রান্তর, পাহাড় পর্ব্বত, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করিয়া যগ্যপি কোথাও তোমাকে দেখিতে পাই, তাহা

হইলে আমার এই মর্ম্ম বেদনার প্রতিশোধ লইব।" এই বলিয়া প্রেমিক-প্রবর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উন্মাদের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার একটী সঙ্গী জুটিল। সঙ্গীটাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই! তুমি স্কন্ধদেশে বাঁশ লইয়া ভ্রমণ করিতেছ কেন?" তিনি কহিলেন, "ভাই! আক্ষেপের কথা আর কি বলিব, আমি অমর হইব বলিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যক্ষ হইলে আমার মনের সাধ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি কি বলিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার পশ্চাৎগামী হইতে বলিয়া কোথায় পলায়ন করিলেন। তদবধি আমি গৃহ, স্ত্রী, পুত্রাদি সমুদয় ত্যাগ করিয়া বনে বনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কোন স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই। অনেক ক্লেশ পাইয়া পরে স্থির করিয়াছি যে, আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইল না, তাহা না হউক, কিন্তু একবার তাঁহাকে দেখা চাই। দেখিতে পাইলেই তাঁহার কি শাস্তি যে দিব, তাহা আমিই জানি।" এই কথা বলিয়া প্রথম ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তোমার স্কন্ধেও যে একটা বাঁশ দেখিতেছি, তুমিও কি আমার ন্যায় দাগা পাইয়াছ?" প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, "সে কথায় আর কাজ কি! আমি যদ্যপি কখন তাঁহাকে পাই এবং যে পর্য্যন্ত না পাইব, সে পর্য্যন্ত আমার বিশ্রাম নাই, তাহা হইলে বাঁশটী তাঁহার গুহ্যদেশে প্রবিষ্ট করিয়া ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া বাহির করিব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।" দ্বিতীয় ব্যক্তি উচ্চহাস্যে কহিলেন, "ভাইরে! মনের মত বন্ধু না হইলে প্রাণ বাঁচে না। আমিও অবিকল এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু আমি দেখ আছোলা বাঁশটী লইয়া বেড়াইতেছি।" এইরূপ প্রেমপরায়ণ ভক্তের ভক্তিকে একাঙ্গী প্রেম কহে।

সমর্থা প্রেমে প্রেমিক ভক্ত ইষ্টের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া রাখেন। ইষ্টের নিকটে তাঁহার অন্য কোন প্রার্থনা থাকে না, কেবল সেবাই তাঁহার একমাত্র বাসনা থাকে। সমর্থা প্রেমের প্রেমিক অতি বিরল। স্বার্থশূন্য প্রেম জীবদুর্লভ।, সাধারণ জীবে সমর্থা প্রেম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ইষ্ট সর্ব্বদা সুখে থাকেন, কোন সূত্রে তাঁহার কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, সমর্থা প্রেমিক এইরূপ সতর্কতায় ইষ্টের নিকট অবস্থিতি করেন। ইষ্ট চলিয়া যাইলে পাছে কঠিন মাটীতে পাদপদ্মে ক্লেশ হয়, এই মনে করিয়া সমর্থা প্রেমিক যেন বক্ষঃস্থল পাতিয়া পড়িয়া থাকেন। সাধারণী প্রেমিকের দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় ভক্তটীকে সমর্থা প্রেমিক কহা যায়; একদা অর্জ্জুনের মনে প্রেমাভিমান হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আমার প্রেম জগতে তুলনারহিত। স্বয়ং ভগবান্ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছেন। কি সম্পদে, কি বিপদে, সর্ব্ব সময়ে ছায়ার ন্যায় আমার সহিত রহিয়াছেন, এমন ভাগ্য কাহার হয়? দর্পহারী মধুসূদন অর্জ্জুনের এই অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্ত অমনি কৌশল বাহির করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, "দেখ সখা! অন্য দেশ ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, তোমার যদ্যপি ইচ্ছা হয়, আমার সমভিব্যাহারে আইস।" অর্জ্জুনের ভক্তাভিমান বৃত্তিটী আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহার মনে হইল যে, ঠাকুর আমায় যখন সখা বলেন, তখন আমার ন্যায় অদ্বিতীয় বীরভক্ত আর কুত্রাপি নাই, মনে মনে এইরূপ নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাত্রা করিলেন। কতই নগর গ্রাম, উপবন, বন, পাহাড়, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইলেন, তাহার সীমা করে কে? পরে এক প্রান্তরে যাইয়া দেখিলেন যে, একজন দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার

সম্মুখে অগ্রসর হইলে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু! লোকে শুষ্ক তৃণ যত্নপূর্ব্বক ফেলিয়া দিয়া নবীন তৃণ কাটিয়া লয়, তুমি ও বিপরীত কার্য্য করিতেছ কেন?" সে কহিল, "মহাশয়! আমার ইচ্ছা, আপনি চলিয়া যাইতেছেন, চলিয়া যা'ন।" অর্জ্জুন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাপু! তুমি অতিশয় মূর্খ! তুমি ভদ্র লোকের মান সম্ভ্রম রাখিয়া কথা কহিতেও জান না।" সে বলিল, "মহাশয়! সৌজন্যতা রাখিবার আমার সময় নাই, কেন আমায় বিরক্ত করিতেছেন? আপনাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, অনর্থক আমার সময় নষ্ট করিতেছেন কেন?" অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "সখা! এ ব্যক্তির স্বভাব বিকৃত হইয়াছে। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চল অগ্রসর হওয়া যাক্!" শ্রীকৃষ্ণ তখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিবার হেতু জানিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, তোমাকে বলিতেই হইবে। না বলিলে আমি তোমাকে ছাড়িব না।" সে তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "মহাশয়! বলিব আর কি? আমি গত নিশিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই স্থান দিয়া গমন করিবেন। এই জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি।" অর্জ্জুন কহিলেন, "শুষ্ক তৃণ পরিষ্কার করিবার কারণ কি?" সে কোন উত্তর প্রদান করিল না। অর্জ্জুন পুনরায় কহিলেন, "তুমি যে কোন উত্তর দিলে না?" সে তখন বিরক্ত হইয়া কহিল, "ভাল উৎপাতে পড়িলাম। আপনাদের সহিত কথা কহিতে আমার যে সময় নষ্ট হইতেছে, সে সময়ে কতদূর পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতাম, আপনারা আমায় ক্ষমা করুন, আর আমি কোন উত্তর দিব না।" অর্জ্জুন তথাপি কহিলেন, "তোমাকে বলিতেই হইবে।" অর্জ্জুনের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল, সে গদগদ স্বরে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আমি আপনার

চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমি কেন শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিতেছি, তাহা আর আপনাদের বলিব কি ? সে কথা আমার বলিবার নয়, আপনাদের শ্রবণ করিবারও নয়। স্ত্রী স্বামীর জন্য যে সকল কার্য্য করেন, তাহা কি অন্যের শ্রবণ-যোগ্য ? না সে কথা জিজ্ঞাসা করা কাহারও উচিত ?" এই ব্যক্তির নিকটে বস্ত্রাবৃত একখানি শাণিত অসি দেখিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! শুষ্ক তৃণ সংগ্রহের কারণ বলিলে না, কিন্তু অসিখানি সমভিব্যাহারে রাখিয়াছ, ইহার হেতু কি ?". অর্জ্জুনের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র সে নিরীহ ব্যক্তি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল, "কে আপনি ? আমার নিকট হইতে দূর হউন, আমার আজ কি কুপ্রভাত, কি দুর্দ্দিন, কি সর্ব্বনাশই হইবে, তাহা জানি না! সেই বর্ব্বর, বর্ব্বর-চূড়ামণি পাণ্ডব-কুল-কলঙ্ক পাষণ্ড অর্জ্জুনের নাম স্মরণ করিতে হইল!" অর্জ্জুনও ক্রোধে ঘূর্ণায়মান আরক্তিম নয়নে কহিলেন, "অর্জ্জুন তোমার কি করিয়াছে ?" হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক সে কহিল, "নিরস্ত হউন, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হউন, সেই পাণ্ডবের নাম আমার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যদ্যপি পুনর্ব্বার তাহার নামোচ্চারণ করেন, তাহা হইলে আপনার শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কে আপনি মূর্খাধম যে, সেই পাষণ্ড কুলাঙ্গারের কার্য্যকলাপ শ্রবণ করেন নাই ? তাহার ন্যায় নির্ম্মম নৃশংস ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। সে নির্ম্মমতার রাজ-চক্রবর্ত্তী। আহা! আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাষণ্ড যে কত ক্লেশ দিয়াছে, সে কথা মনে হইলে আমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া যাই। মহাশয়! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, নরাধম তাঁহাকে রথের সারথি করিয়াছে! ইহা অপেক্ষা আর সে নির্ম্মমতার কি পরিচয়

দিবে? দুরাচারের হৃদয় লৌহময়, লৌহ অপেক্ষা যদ্যপি কোন বস্তু কঠিনতম থাকে, তাহা হইলে অর্জ্জুনের হৃদয় ততোধিক কঠিন। মহাশয়! আর বলিতে পারি না, বর্ব্বর স্বার্থপরতার পূর্ণাবতার। দিন নাই, সময়াসময় নাই, স্থানাস্থান বোধ নাই, নিজের কার্য্যের জন্য যখন ইচ্ছা, তখনই প্রাণেশ্বরকে টানিয়া লইয়া যায়। যদ্যপি কখন সেই নৃশংস নর-পিশাচকে পাই, তাহা হইলে এই খড়্গের দ্বারা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কুক্কুর শৃগাল দ্বারা ভক্ষণ করাইব। আর একটা দুষ্টা অপ্রেমিকা, যাহাকে প্রভু আমার দয়া করিয়া দাসী জ্ঞান করিয়াছেন, সে অভিমানে আত্মহারা হইয়া আমার প্রাণবল্লভকে যথোচিত ক্লেশ দিয়াছে। মহাশয়! বলিব কি, ক্রোধে আমার বাক্‌রোধ হইয়া যাইতেছে, সে প্রভুকে একদিন ভোজন করিতে দেয় নাই৭ যদ্যপি কখন তাহার দেখা পাই, তবে বুঝিয়া লইব যে, সে নারী কেমন! এই দুইটী নর-নারীর নিমিত্ত আমি খড়্গভার বহন করিয়া বেড়াই-তেছি।" এই ব্যক্তির প্রেমকে সমর্থা প্রেম কহে।

উল্লিখিত প্রেমচতুষ্টয়ের মধ্যে সমর্থা প্রেম অতিশয় বিরল। একাঙ্গী প্রেমিকের সংখ্যাই অধিক। সকলেই বাসনায় পরিচালিত হইয়া থাকেন, বাসনাবিশেষ যাহাদের সাধনার আদি কারণ, তাহাদের কখন সমর্থা প্রেম সঞ্চারিত হইতে পারে না।

যদিও কতিপয় দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থা প্রেম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এই প্রেমের চূড়ান্ত ছবি বৃন্দাবনের গোপ গোপিকাদিগের কৃষ্ণ-প্রেম ব্যতীত কুত্রাপি দেখা যায় না। গোপ গোপিকারা কৃষ্ণগত প্রাণ ছিল। কৃষ্ণ ভিন্ন তাহারা কিছুই জানিত না। কৃষ্ণকে চক্ষের অন্তরাল করিতে তাহাদের যন্ত্রণার অবধি থাকিত না। চলিয়া যাইলে পাছে পদে কণ্টকাদি বিদ্ধ হয়, এই নিমিত্ত রাখালেরা তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ

স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করিত। গোপিকারা সর্ব্বদা বক্ষঃস্থল পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধারণ করিত। তাহাতেও তাহাদের প্রাণে তৃপ্তি হইত না। তাহারা সর্ব্বদা আক্ষেপ করিত যে, বিধাতা অতিশয় অরসিক। কোথায় কি নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না। বক্ষঃস্থলে কঠিন পয়োধর দুইটি স্থাপন করিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মের ক্লেশোৎপাদনের হেতু-স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। গোপিদিগের এ প্রকার কল্পনা কেবল কল্পনাপ্রসূত কথা নহে, শ্রীকৃষ্ণকে একথা তাহারা সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিত। তিনিও তাহা স্বীকার করিতেন। প্রেমের অপূর্ব্ব কাহিনী অপ্রেমিক আমরা কেমন করিয়া তাহা বুঝিব! আমরা স্বার্থযুক্ত হইয়া প্রতিনিয়ত দাও দাও বলিয়া ভগবান্‌কে বিরক্ত করিতেছি। বাসনার উপর বাসনা উঠিতেছে। একটি বাসনা চরিতার্থ হইতে না হইতে শত শত বাসনা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্থিত হইয়া ফল প্রত্যাশার অপেক্ষায় এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তাঁহাকে লইয়া সম্ভোগ, তাঁহার সেবা করা সুতরাং ফলপ্রত্যাশী প্রেমিকের অদৃষ্টে কখনই সম্ভবে না।

কথিত হইয়াছে যে, ভগবানের সেবা করাকে ভক্তি কহে। এই সেবা দ্বিবিধ, জ্ঞানমিশ্র সেবা এবং প্রত্যক্ষ সেবা।

ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষকে ভগবান্ বোধপূর্ব্বক সেবা করাকে জ্ঞান-মিশ্র সেবা বা ভক্তি কহা যায়। জ্ঞানমিশ্র ভক্তি নৈষ্ঠিক ভক্তের দ্বিতীয়াবস্থা বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় দুইভাবে কার্য্য হইয়া থাকে। প্রথম, গুরুকে ইষ্ট জ্ঞান করিয়া এবং দ্বিতীয়, অবতার কিম্বা দেবতাদিগের কৃত্রিম রূপবিশেষ লইয়া সেবাদি দ্বারা দিনযাপন করা জ্ঞানমিশ্র ভক্তির কার্য্য। গুরু এবং ইষ্ট পরিশেষে এক হইলেও স্থূলে তাঁহারা দুই ভাবাপন্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুকে ইষ্ট জ্ঞান করিতে হয় বলিয়া জ্ঞানমিশ্র শব্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই সেবায়

ইষ্ট জ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য হয়। অবতার কিম্বা অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজায় জড়বস্তুতে ভগবানের লীলারূপের জ্ঞান থাকে বলিয়া ইহাকেও জ্ঞানমিশ্র ভক্তি বলে।

এই দ্বিবিধ সেবার যে কার্য্য, প্রত্যক্ষ সেবারও সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। কার্য্যের কখনই ইতর বিশেষ হয় না, কিন্তু ভাবের তারতম্য হয় বলিয়া ভক্তের অবস্থারও তারতম্য হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ সেবায় ভগবানের লীলারূপের সহিত কার্য্য হইয়া থাকে। তখন গুরু ইষ্ট একাকার রূপে দর্শন হয়, সুতরাং ভক্তের মনে আর দ্বৈতভাব থাকিতে পারে না। অথবা জড় মূর্ত্তিতে চৈতন্য ভাব দেখিলে ভক্তের মনে আর কখনও জড়ভাব আসিতে পারে না।

প্রত্যক্ষ সেবায় প্রেমের কথা। জ্ঞানে প্রেম করা যায় না। এই নিমিত্ত প্রেমকেই ভগবানের স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। প্রেমময় ভগবান্ প্রেমের ক্রীড়া করিবার জন্য বার বার রূপ ধারণপূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে দেখা দিয়া থাকেন। ভক্তেরা সেই রূপ লইয়া প্রাণ ভরিয়া আনন্দ সম্ভোগ দ্বারা মানবজীবন সার্থক করিয়া লন। যাঁহারা প্রেমিক, যাঁহারা ভগবান্‌কে লইয়া রঙ্গরসে দিনাতিবাহিত করিতে চাহেন, যাঁহারা ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা করিবার জন্য লালায়িত হন, যাঁহারা ভগবানের স্পর্শ-সুখ আস্বাদন করিতে অভিলাষী হন, যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তিকে ভোজন করাইয়া প্রসাদ ধারণ করিতে ব্যাকুলিত হন, যাঁহারা ভগবানের শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিয়া বিষয়সন্তপ্ত কর্ণবিবরে অমৃতধারা ঢালিতে সচেষ্টিত হন, যাঁহারা রসময়ের রসিক-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা করিতে চাহেন, যাঁহারা স্থূল জগতের স্থূল পদার্থের মধ্যে নিত্য বস্তু দর্শন করিতে কৌতূহলাক্রান্ত হন, যাঁহারা বাক্য মনের অতীত বস্তুকে বাক্য মনের অধিকারসম্ভূত করিতে চাহেন, তাঁহারা

অবতারবিশেষে সে সাধ মিটাইয়া লন। একদা জনৈক প্রেমিক ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া দেশ বিদেশ পরিভ্রমণান্তর কোন লোকমুখে শ্রবণ করিলেন যে, তুলসীদাস রামচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত, তাঁহার আশ্রয় লইলে রামপাদপদ্ম একদিন অবশ্যই দর্শন হইবে। ভক্ত এই উপদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া অচিরে তুলসীদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক তুলসীদাসকে কহিলেন, "মহাশয়! আমি অতি হীন দুরাশয়, রামচন্দ্রের কৃপাহীন হইয়া পাষণ্ডের আকারে দিনযাপন করিতেছি। মহাশয়! আপনি বলিয়াছেন যে,—

'সাচ্ কহিয়ে, অধীন হইয়ে, ছোড় দেও পরধন কি আশ।
ইস্‌মে যব হরি নাহি মিলে, তব জামিন্ তুলসীদাস॥'

সাধূত্তম! আপনার অদেশমত আমার অবস্থা হইয়াছে কি না তাহা আমার বলিবার নহে, লোভ গিয়াছে কি না, আত্মাভিমানে অদ্যাপি গর্ব্বিত আছি কি না, মিথ্যা কথা আমার অধিকারে আছে কি না, আপনি তাহা বিচার করুন। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, অকপটে আপনার চরণপ্রান্তে আমি নিবেদন করিতেছি যে, রামরূপ দর্শনের জন্য আমি অস্থির হইয়াছি। প্রাণ রামরূপ দর্শনাভিলাষী। কোথায় আপনার রামচন্দ্র? কোথায় সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম? কোথায় সেই ধনুর্দ্ধারী রাবণারি জানকীবল্লভ? কোথায় সেই অনন্তাবতার সৌমিত্রেয়? একবার দয়া ক'রে হে মহাত্মন! তাঁহাদিগকে দেখান। আমি স্থির হই। আপনি জামিন আছেন কথাটা নিতান্ত কঠিন, নিতান্ত আশাপ্রদ কথা। অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের বাস্তবিক শান্তিবারিস্বরূপ কথা। এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক আমি মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি, যাহা হয়, একটা ব্যবস্থা করুন।"

তুলসীদাস এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি ভক্ত-চূড়ামণি, রাম লক্ষ্মণ আপনার, আপনি অনুরাগনিগড়ে তাঁহাদের বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনি কেন যে অদ্যাপি তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা আমার অগোচর বিষয়। যাহা হউক, আপনি পথ পর্য্যটনে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, এই স্থানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।" এই কথা বলিয়া তুলসীদাস গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া পূজায় উপবেশন করিলেন।

এমন সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন বালস্বরে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তুলসীদাস কোথায়? সাধু উত্তর করিলেন যে, তিনি এই গৃহে পূজায় বসিয়াছেন। পুনরায় বালস্বরে যেন কে বলিল, মিথ্যা কথা, সে যে ঘোড়ার ঘাস কাটিতেছে! এই সময়ে তুলসীদাসের মনে তাঁহার ঘোড়ার ঘাসের কথা বাস্তবিক উদয় হইয়াছিল, তিনি ঐ কথা শ্রবণমাত্র সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণামের অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পতিত রহিয়াছে। তুলসীদাস নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন যে, সাধুর আর সংজ্ঞা নাই, তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সাধুর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপনপূর্ব্বক তাঁহার কর্ণবিবরে রাম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। রামনাম শ্রবণমাত্রেই সাধুর বদনে অমিয় হাস্যচ্ছটা শোভা পাইতে লাগিল, পরে ক্রমে ক্রমে নয়নোন্মীলিত করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তুলসীদাসকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন যে, "আপনার কৃপায় আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, আমি রাম-লক্ষ্মণের যুগলরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমার ক্ষুদ্র আধার পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি প্রাণ ভরিয়া সেই রূপমাধুরী দর্শন করিয়া লইয়াছি। তাঁহারা বিদায় চাহিলেন। আমার

জন্য তাঁহাদের এত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। সেইজন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে বলিয়া আমি চরণে দণ্ডবৎ করিয়া সেই মোহন মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন করিতেছিলাম, আপনি আসিয়া আমার ভাবান্তর করিয়া দিয়াছেন। সেজন্য আমি দুঃখিত নই, আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন এই ভাব চিরকাল থাকে।" তুলসীদাস এতক্ষণ আপনাপনি ধিক্কার দিতেছিলেন। সাধুর কথা সমাপনান্তে কহিলেন, "সাধু! আপনিই ধন্য, আপনাকে আমি শত ধন্যবাদ দিই। আহা! ভুবনমোহন মূর্ত্তি আপনি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন, আর আমি সেই সময়ে ঘোড়ার ঘাস কাটিয়া লইলাম। আমি করিব কি! আমার ক্ষমতা কি! দাস আমি, গোলাম আমি, যখন যেমন রাখিবেন, তখন তেমনি থাকিব, একথা আর বলিয়া কি হইবে।"

লীলারসময় শ্রীহরি ভক্তদিগের সহিত কিরূপে প্রেমের অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহা নানা দেশে নানারূপে নানাভাবে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল মূর্ত্তির ধ্যান, তাঁহাদের উপদেশ এবং কার্য্যকলাপ শ্রবণ দ্বারা আমরা কৃতার্থ হইয়া থাকি। যে অবতার যে ভাবে বিহার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া সেই ভাবেই এখনও বিহার করা যায়। রামচন্দ্র, বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গাদি এবং যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদ শান্ত ভাবের অবতার, তাঁহাদের স্মরণ করিলে শান্তভাবেরই উদ্রেক হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণাবতার সেরূপ নহেন। তাঁহাতে সকল ভাব প্রকাশিত ছিল, তিনি সকল ভাবেরই খেলা করিয়াছিলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরাদি পঞ্চভাবের পূর্ণাভিনয় করিয়া সকল ভক্তের মনোসাধ পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত কৃষ্ণাবতারকে পূর্ণাবতার কহা যায়। যাঁহার বাৎসল্য ভাবপ্রবল মন, তাঁহার গোপালভাব সাধন অতীব সুলভ এবং স্বল্পায়াসে মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহার সখ্য প্রেমে হৃদয় সংগঠিত, শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কানাই ভাবে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। শান্ত ও দাস্য ভাবের কথাই নাই। মধুর ভাবের ভাবুক যাঁহারা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন অবতারের নিকট হৃদয় খুলিতে পারিবেন না। ভগবানের সহিত এইরূপে প্রেমের সম্বন্ধ যাঁহারা স্থাপন করিতে চাহেন, অবতারবিশেষ ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ করিবার উপায় নাই।

আমরা মনুষ্য, মনুষ্যের সহিত আমাদের ভাব বিনিময় হয়। আমরা সংসারে ভাব লইয়া অবস্থিতি করি। এই ভাব যখন পরিপক্ক হয়, তখনই আমরা আনন্দলাভ করিতে পারি। পিতা মাতার প্রেম শান্তভাবের পরিণতাবস্থাকে কহে। সে ভাব বাল্যকালেই আমরা বুঝিতে সক্ষম নহি। যখন আমরা পিতা মাতার সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে অনুধাবন করিতে সমর্থ হই, তখনই আমাদের হৃদয়ে নব ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাকেই প্রেম কহে। মধুর প্রেম স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্থাপিত হয়। নব বিবাহিত নর-নারী কখন মধুর প্রেম বুঝিতে পারে না। ইন্দ্রিয়াসক্ত নর-নারী যে প্রেমের কথা কহিয়া পরস্পরে বিমোহিত হয়, তাহাকে কদাচ প্রেম কহা যায় না। উহা কামের ছলনা-বিশেষ। প্রেম শব্দ যেমন শুনিতে মধুর, ইহার কার্য্যও তেমনি সুন্দর এবং বিমল। প্রেমে ছলনা নাই, আড়ম্বর নাই, অতিশয় সহজ ভাবে উহার কার্য্য হইয়া থাকে। এই বিমল শুদ্ধ প্রেমের মূরতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; যে নারী মধুর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া ডাকিলে তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইয়া আইসে। যদিও মধুর প্রেম নারী না হইলে স্ফূর্ত্তি পায় না, কিন্তু নারী ব্যতীত পুরুষেও এ ভাব লাভ সম্ভবে। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ মধুর ভাবের উদ্দেশ্য। নর নারী বলিয়া আমরা সাধারণ কথায়

যাহাদের উল্লেখ করিয়া থাকি, তত্ত্বপক্ষে তাহা বলা যায় না। পুরুষ এক অদ্বিতীয় ভগবান্, অন্যান্য সকলেই প্রকৃতি বা নারী। সাধারণ নর-নারী প্রকৃতিপ্রসূত, সুতরাং তাহারা সকলেই প্রকৃতিবিশেষ। সন্তানোৎপাদনের শক্তি দেখিয়া যে পুরুষ প্রকৃতি শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহা সম্পূর্ণ স্থূলের কথা। রামকৃষ্ণদের বলিতেন যে, উহা ভগবানের পাঁচ রকম কলের ন্যায় একটা কলের ব্যবস্থাবিশেষ মাত্র। তিনি আরও বলিতেন যে, সকলেই প্রকৃতি। স্ত্রী বলিলে প্রণালীবিশেষবিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত মনুষ্যকে বুঝায়। সেইরূপ লক্ষণ নারীতে যেমন, নরেও তেমনি দেখা যায়। প্রত্যেক লোমকূপ প্রণালীবিশেষ। মধুর প্রেমাভিলাষী নর যখন কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার জ্যোতিঃচ্ছটা লোমকূপে প্রবিষ্ট হয়, সেই সময়ে তাহাতে যে আনন্দানুভব হয়, তাহাতেই প্রকৃতির কার্য্য সাধিত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী পুরুষের মধুর ভাব বলিলে যে কুক্কুর শৃগালের ভাব উদ্দীপন হয়, তাহাকে মধুর প্রেম বলা যায় না।

মধুর প্রেমে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অধিকার আছে। ভক্তিমতে এই প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। শান্ত ও বাৎসল্যাদি ভাবে সংকোচ দেখা যায়, যেমন পিতা মাতার নিকটে মনের সকল কথা খুলিয়া বলা যায় না, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষেরা স্বচ্ছন্দে পরস্পরে সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতে পারে; এই নিমিত্ত মধুর-প্রেমে যে নারীর প্রকৃত মধুর প্রেম সঞ্চারিত হয়, তাহাতে কখন কাম-গন্ধ থাকিতে পারে না। যেমন মাতার নিকট সন্তানেরা শোভা পায়, সমুদয় পুরুষ মধুর প্রেমিকার নিকট সেইরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

একদা মীরাবাই নাম্নি সুচতুরা প্রেমিকা সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিবেন বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী

এই কথা শুনিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া পণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এই আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না বলিয়া যে অপরাধী হইলেন, তজ্জন্য মীরাদেবী যেন নিজগুণে মার্জ্জনা করেন। মীরা সনাতনের এই কথা শ্রবণমাত্রে বলিয়া উঠিলেন, "কি! বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ আছেন। বৃন্দাবনে অপর পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে, এ অতি অভিনব কথা! আবার পুরুষ কোথা হইতে জন্মিল, বৃন্দাবনেই বা কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? বৃন্দাবন গোপিকার বাসস্থান, ললিতা সখী করিতেছেন কি? আমি তাঁহাকে বলিয়া এখনই সনাতনকে বাহির করিয়া দিব।" সেই কথায় সনাতন গোস্বামীর ভ্রম বিদূরিত হইয়া যাইল। তিনি আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া পূর্ব্বসংস্কারকে দূর করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়া মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মীরা সনাতনকে দেখিয়া সখী সম্বোধন পূর্ব্বক উলঙ্গ অবস্থায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মধুর প্রেমের অপূর্ব্ব কাহিনী আমরা অনধিকারী, আমাদের তাহা আলোচনার বিষয় নহে। আমরা শুনিব এক, বুঝিব অন্য প্রকার। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রেমের পর মহাভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। ভক্তিমতের ইহাই চরমাবস্থা।

মহাভাবে ভক্ত তন্ময়ত্ব লাভ করেন। সে অবস্থায় তাঁহার বহির্জ্ঞান অথবা বাহ্যিক কোন সম্বন্ধ বোধ থাকে না। তিনি তখন সম্মুখে দেখেন ভগবান্‌কে, কর্ণে শ্রবণ করেন তাঁহারই নাম, মুখেও সেই নাম বলিতে বলিতে স্পন্দনরহিত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন, পরে ভাবাবসান হইয়া আসিলে পুনরায় বাহ্য জগতের কার্য্য করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। মহাভাবের ভক্ত নানা ভাবে অবস্থিতি

করিতে পারেন। এই অবস্থায় প্রায় জীবাত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় এবং লীলাময়ের রূপবিশেষের সহিত লীলাবিশেষের কার্য্য করিয়া পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যেমন বৃন্দাবনের কথা শ্রবণ করিতে করিতে সম্মুখে বৃন্দাবনই দেখিতে পান, তথায় যমুনা বহিতেছে, ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করিতেছে, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতেছে, ভক্তের জীবাত্মা একজন সখী হইয়া জলকেলিতে যোগদান করেন। জীবাত্মা যতক্ষণ পূর্ব্বদেহে প্রত্যাগমন না করে, সে পর্য্যন্ত সেই দেহের অন্য কোন কার্য্য থাকে না, উহা জড়বৎ একস্থানে অবস্থিতি করে। এই অবস্থাটীকে ভক্তিমতের সমাধি কহে।

মহাভাবের সমাধির অবস্থার সহিত জ্ঞানপন্থীদিগের সমাধির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। জ্ঞানপথের সমাধিতে জীবাত্মা ব্রহ্মের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক পরে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। মহাভাবেও জীবাত্মা জ্ঞানপন্থার ন্যায় শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় এবং ভগবানের রূপবিশেষের সন্নিহিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞান ও ভক্তি এক ভাবে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণদেব এই স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, শুদ্ধজ্ঞান এবং শুদ্ধভক্তি এক প্রকার। জ্ঞানীদিগের কেবল নির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা একমাত্র পরিণাম, ভক্তদিগেরও পরিণাম তদ্রূপ। ভক্ত যখন ভগবানের নিকটে থাকিতে বাসনা করেন, তখন প্রথমে তাঁহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, গুরু ইষ্ট দেখাইয়া তিনি তাঁহাতে মিশাইয়া যান, ভক্ত ইষ্ট দর্শন করিয়া তিনিও ইষ্টে বিলীন হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদা বলিতেন, যে কেহ জ্ঞানেই হউক কিম্বা ভক্তিতেই হউক, ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে, তাহার পরিণাম সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার।

জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহাতে কাহাকেই শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট বলা যায় না। জ্ঞানের উদ্দেশ্য যাহা, ভক্তির উদ্দেশ্যও তাহা, জ্ঞানের পরিণাম যাহা, ভক্তির পরিণামও তাহা, কিন্তু কার্য্যের প্রভেদ দেখা যায়। এই কার্য্য লইয়াই সাধকদিগের সহসা ভ্রম জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যদিও জ্ঞান ও ভক্তির উদ্দেশ্য এবং পরিণাম এক প্রকার বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। জ্ঞানে ভগবান্ সম্বন্ধ সত্ত্বেও ভগবানের রূপাদি দর্শন করা অভিপ্রায় নহে, ভক্তিতে রূপের প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত কোন কার্য্যই চলিতে পারে না, সুতরাং কার্য্যস্থলেই সম্পূর্ণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। রূপাদি দর্শন করিতে হইলে তথায় জ্ঞান সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। জ্ঞানে রূপ গলিয়া যায়, ভক্তিতে রূপ সংগঠিত হয়। প্রভু বলিতেন যে, জ্ঞানকে সূর্য্য এবং ভক্তিকে চন্দ্র বলিয়া তুলনা করা যায়। সূর্য্যরশ্মি অর্থাৎ উত্তাপে বরফ গলিয়া জল ও জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্রকিরণ অর্থাৎ শৈত্যস্পর্শে সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল এবং সেই জল বরফে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। জ্ঞানে ভগবান্ আকারবিহীন, ভক্তিতে আকারবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সংসার-প্রপীড়িত বিষয়-রসাভিষিক্ত সাংসারিক লোকেরা জ্ঞানে ঈশ্বর-ধারণা করিতে অশক্ত। তাঁহারা সাংসারিক নানাবিধ ভাবে দেহ মন প্রাণ সংগঠিত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই সকল অভ্যস্থ সংস্কার দূর করিয়া শুদ্ধ মনে অবরোহণ প্রণালী মতে সাধন করা তাঁহাদের পক্ষে যারপরনাই দুরূহ ব্যাপার, বলিতে কি কস্মিনকালে তাহা হইবার নহে। মনে সংস্কাররূপ আবরণ পতিত হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত দয়াময় শ্রীহরি দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া সাংসারিক ভাবে কিরূপে

ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাংসারিক নরনারীদিগের ভগবানের স্পৃহা জন্মিলে তাঁহাদের হৃদয়ের সাংসারিক ভাব সম্বন্ধহীন করিয়া ভগবানে প্রয়োগ করিবামাত্র অতি সত্বর কার্য্য সিদ্ধ হইয়া আইসে। ভক্তিমতে ভাবের খেলা, জ্ঞানে অভাবের খেলা। সাংসারিক লোকেরা ভাবে সিদ্ধ, যেহেতু শান্তদাস্যাদি বিবিধ ভাবেই সংসার সংগঠিত হয়; ভাব লইয়া ঈশ্বর সাধন করা তাঁহাদের পক্ষে সুলভ, জ্ঞানমতে কোন ভাব নাই, তাঁহাদের অভাব মতই সুলভ। ভাবসংযুক্ত নরনারীর অভাব বা জ্ঞান-পথ যেমন কঠিন, অভাব বা জ্ঞানপন্থীদিগের ভাব বা শক্তি তদ্রূপ কঠিন। কার্য্যক্ষেত্রে অধিকারী হিসাবেই কার্য্য এবং তাহাই হওয়া উচিত।

কথিত হইল যে, সাধারণ সাংসারিক নরনারীর পক্ষে ভক্তি-মতই শ্রেয়ঃ। জ্ঞান-পথ তাহাদের একেবারেই নিষিদ্ধ। সাংসারিক প্রাচীরের মধ্যস্থলে বসিয়া কস্মিন্‌কালে এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না। একথা বিশেষ করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা অনেক সময়ে নিজ নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়া থাকি। যে বিষয়ে অধিকার নাই, যাহা করিতে শক্তি নাই, যাহা কোনও কালে আয়ত্ত করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আন্দোলন করিলে কি ফল হইবে? এই নিমিত্ত সাংসারিক নরনারীদিগের জ্ঞান-পথে কোন ফল ফলে না। লাভের মধ্যে ভগবান্ সম্বন্ধে কখন বিশ্বাস থাকে, কখন অবিশ্বাসী হইয়া কপটতার পরিচয় দিয়া যাইতে হয়। এ কথা আমার বিরচিত বা কল্পনাপ্রসূত কথা নহে। বেদান্তাদি শাস্ত্রবিশেষ লইয়া যিনি নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাহারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তিনি তথায় এক প্রকার দেখেন, আবার ভক্তিমতে তাহার বিপরীত ভাব প্রত্যক্ষ করেন, অনধিকারী তিনি কেমন করিয়া এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য

করিতে পারিবেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া পড়ে। তিনি শাস্ত্রবিশেষে দেখেন যে, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ভগবানের স্বরূপ, স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গ, জীব উদ্ভিদাদি প্রত্যেক বস্তু ভগবানের স্বরূপ, আবার শাস্ত্রবিশেষে দেখিতে পান যে, এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিও নশ্বর দেহধারী, তাঁহারাও মায়া, শুদ্ধ সত্য স্বরূপ যিনি তিনিই একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর।

যাঁহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণে আরোহণ এবং মহাকারণ, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলে অবরোহণ প্রণালী অনুসারে সাধন না করিয়াছেন, তাঁহারা কখন ব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক রহস্য জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বোধও হয় না। এই নিমিত্ত এই প্রকার নরনারী উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া সুবিধামত কার্য্য করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের অধিকারী এবং অনধিকারী সম্বন্ধে আমি একটী উপাখ্যান প্রদান করিতেছি। একদা কোন ব্রাহ্মণ কোন রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদান্তে কহিলেন, "মহারাজ! দিন ফুরাইয়া গেল, রাজকার্য্যেই আপনার জীবন নিঃশেষিত হইয়া আসিল, পরকালের উপায় কি করিতেছেন?" রাজা সহাস্যে বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলুন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দেখুন কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত আপনি আর কিছুই শিখিলেন না। ইহার দ্বারা আপনার কি পরিত্রাণ হওয়া সম্ভবে? আমি আজ কয়েকদিন মহারাজের কথা ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, আপনি আমার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করুন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের লীলা বিবৃত হইয়াছে। যে শ্রবণ করে, যে বলে এবং যাহার স্থানে পাঠ হয়, সকলেরই ত্রিকুল পবিত্র হয়। অতএব মহারাজ! আজ্ঞা করুন, কোন্ তারিখ হইতে এই সর্ব্বজনপূজিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, হিন্দু-সন্তানের হৃদয়-

রত্ন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিব ?" রাজা ব্রাহ্মণের এই সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয় ! আপনি নিজে কি বুঝিয়াছেন ?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "সে কি মহারাজ ! এই ব্যবসায় আমি আমার চুল পাকাইলাম, অনুমান পাঁচ সহস্রবার সংকল্পিত হইয়া পাঠ করিয়াছি, সমুদয় গ্রন্থখানি টীকা টিপ্পনি সহ আমার কণ্ঠস্থ আছে। বলেন যদি, আমি মহারাজকে এখনি শ্রবণ করাইতে পারি।" রাজা তথাপি কহিতে লাগিলেন যে, আপনি নিজে বুঝিয়া আমাকে বুঝাইতে আসিবেন, আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়া আপনার মুখবিগলিত অমৃতধারা শ্রবণপূর্ব্বক জীবন পবিত্র করিব। ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিতে না পারিয়া বিরক্তচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এক সপ্তাহ অতীত না হইতেই তিনি পুনরায় রাজ-সদনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়াই কহিলেন "মহাশয় ! পুনরায় আসিয়াছেন ? আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই, আপনার নিকটে আমি পরে বুঝিব, এক্ষণে আপনি যান, পুনরায় বুঝিবার চেষ্টা করুন।" ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ ! কথাটা সহজে বলিলেই হয়, কিন্তু রাজবুদ্ধি আপনার, কৌশল ব্যতীত কথা কহিতে জানেন না ; তাই ব্রাহ্মণের প্রতি সেই রাজ-কৌশল প্রয়োগ হইতেছে। আমি মহারাজকে বলিলাম যে শ্রীমদ্ভাগবত আমার কণ্ঠস্থ। গুরুকরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অধ্যাপনা কার্য্যেও নিযুক্ত আছি। আমার শিষ্যেরাও বিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, মহারাজ আমাকে পুনরায় অধ্যয়ন করিতে বার বার আজ্ঞা করিতেছেন, এ কথা আর মহারাজকে কি বলিব—ব্রাহ্মণের দুরদৃষ্টই বলিতে হইবে !" রাজা কহিলেন, "মহাশয় ! দুঃখিত হইবেন না, আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিতেছি, লইয়া যান, কিন্তু অনুরোধ এই, আপনি শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে

চেষ্টা করুন।" ব্রাহ্মণ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, রাজার অনুচিত অনুরোধে তেমনি বিষন্ন হইলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অতি গুপ্তভাবে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমেই তাঁহার মনে হইল যে, এ গ্রন্থের নাম পারমহংস-সংহিতা। পরমহংসদিগের আলোচনার গ্রন্থ। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, ইহা বাস্তবিক পরমহংসদিগেরই যোগ্য গ্রন্থ। পরমহংসেরা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসী, পরে পরমহংস ভাবে সর্ব্ব-চৈতন্য-জ্ঞান লাভান্তে স্থুলে অবতরণ পূর্ব্বক ভক্তিতে ভগবানের লীলামূর্ত্তি দর্শন ও লীলাকাহিনী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দ্বারা পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত সাংসারিক নরনারীরা না যোগ-তত্ত্বের অধিকারী, না বৃন্দাবনের প্রেমলীলার অধিকারী; সত্য সত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর মর্ম্ম আমরা কি ভাবে গ্রহণ করি? যখন সেই গোপাঙ্গনাদির মধুর প্রেমের ক্রীড়া পাঠ করা যায়, তখন আপনাদের অভ্যস্থ ভাবই উদ্দীপনা হইয়া যায়, পরকীয়া প্রেমের আধিক্যতা বর্দ্ধিত হয়। তাহা গৃহীর, বিষয়ীর, কামিনীর অঞ্চলাশ্রিত ব্যক্তির জন্য কখন নহে। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শৃঙ্গার রসাধ্যায় শ্রবণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের মনে যখন এইরূপ ছবি উদয় হইতে লাগিল, তখন তিনি আপনিই লজ্জা পাইতে লাগিলেন। আবার নূতন ভাব আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। তিনি গ্রন্থারম্ভেই মানসপটে দেখিলেন যে, বক্তা এবং শ্রোতা কে? চিরকুমার, জ্ঞান ও ভক্তির মূরতি, তাপস-শ্রেষ্ঠ, পরমহংস, বালকাকার শুকদেব বক্তা এবং কামিনী-কাঞ্চন-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট দেহাভিমানবিদলিত জাহ্নবীতীরস্থ

পরীক্ষিত শ্রোতা। ব্রাহ্মণের এইরূপ বিজ্ঞানদৃষ্টি হইবামাত্র অমনি আত্মধিক্কার দিয়া রাজাকে গুরু সম্বোধন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তিনি মনে করিলেন, হায় হায়! কি ভ্রমেই আবদ্ধ হইয়া এতদিন ঘুরিতেছিলাম। যেমন আমি বক্তা, আমার শ্রোতাও তেমন, ফলও তেমনি ফলিয়া থাকে।

অধিকারীভেদে কার্য্যের তারতম্য হয় এবং নিজ অবস্থা ভুলিয়া অন্যের ভাব দৃষ্টি করিতে যাইলে যে বিভীষিকায় পতিত হইতে হয়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। আমরা নিজে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সে যাহা হউক, জ্ঞানী ভক্তিমতের তাৎপর্য্য বোধ না করিতে পারিলে অথবা ভক্ত জ্ঞানের উদ্দেশ্য না বুঝিলে উভয়ক্ষেত্রে একপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। একদা জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য কাশি হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে দেখিলেন যে, একজন মলিন ছিন্নবস্ত্রধারী সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমে বিমর্দ্দিত পথের ধারে কুক্কুরকে লইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছে। শঙ্করাচার্য্য তাহাকে অবজ্ঞাভাবে কিয়ৎকাল দর্শনপূর্ব্বক হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, শুদ্ধাচারী না হইলে জীবের কতদূর হীনাবস্থা হয়, তাহার জলন্ত ছবি আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। একে উচ্ছিষ্ট ভোজন, কাহার কোন জাতির উচ্ছিষ্ট, তাহার হিসাব নাই। পথের ধার সর্ব্বদাই মল মূত্রাদিতে পঙ্কিল থাকে, আবার অস্পর্শীয় কুক্কুর সমভিব্যাহারে লইয়া একত্রে ভোজন করা কি বিড়ম্বনা! জ্ঞানপথ বিমুখ হইলে জীবের এতই দুর্দ্দশা হয়? শঙ্করের মনে যখন এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, তখন সেই মলিনবেশী ব্যক্তি সহাস্যে শঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "শঙ্কর! হাসিতেছ কেন? তুমি কি জান না যে, এই পৃথিবী বিষ্ণুর স্বরূপ, বিষ্ণুই তাহাতে বিরাজ

করিতেছেন, বিষ্ণুই রূপভেদে ভোজন করিতেছেন, তুমিও বিষ্ণু, এই বিশ্বসংসার বিষ্ণুতে পরিপূর্ণ। বিষ্ণু হইয়া তুমি হাসিতেছ কেন?” শঙ্করাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই কথা শ্রবণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, সেই ব্যক্তির ছিন্নবসন বাঘাম্বরে পরিণত হইয়া গেল, কর্দ্দমাদি বিভূতির ভাবে শোভা পাইতে লাগিল, কুক্কুর বৃষভের আকার ধারণ করিল, তিনি নিজে মহেশ্বর হইয়া তদ্‌পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শঙ্করকে কৃতার্থ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। শঙ্করাচার্য্য সেইদিন বলিয়াছিলেন যে, “হে পরমেশ্বর! আমি তোমায় নিরাকার জ্ঞানস্বরূপাদি বলিয়া যে স্তব করিয়াছি, তাহাতে তোমার সীমা করিয়া দিয়াছি, সে জন্য আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। আমি তোমাকে সীমাবিশিষ্ট দেখিলাম, তাহাতেও আমার অপরাধ হইয়াছে, অতএব সে জন্যও আমায় ক্ষমা কর! হে ভগবান্! হে পরমেশ্বর! তুমি নিরাকার, তুমি সাকার, তুমি আর যে কি তাহা আমি বুঝিতে অশক্ত। এমন যে কে তুমি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।” অতএব জ্ঞানী হইলে ভক্তি বুঝা যায় না।

জ্ঞান ও ভক্তির কার্য্য, উদ্দেশ্য এবং অধিকারী সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার আভাস দেওয়া হইল। যদিও জ্ঞানী এবং ভক্ত দুইটী স্বতন্ত্র অবস্থার কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞান ভক্তিকে যে সাধক একাকার করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুরসিক এবং ইহজগতে পরমানন্দ লাভ করিয়া যাইতে পারেন। মনুষ্যই মনুষ্য সমাজের পুষ্টিকারক। যদ্যপি জ্ঞানের নিমিত্ত সকলকে সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় এবং তাহা না করিলেও জ্ঞানলাভ হইবার উপায় নাই, তাহা হইলে সংসার অরণ্য, অরণ্য লোকালয় হইয়া যাইবে। তিনি বলিতেন যে, সর্ব্বপ্রথমে সংসারে লিপ্ত না হইয়া জ্ঞানলাভপূর্ব্বক ভক্তি

আশ্রয় করিয়া যে সংসারে বাস করে, সেই ধন্য। রামপ্রসাদ তাহার দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদের মনের অবস্থা দুইটী গীতে প্রকাশ আছে।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তা চেয়ে দেখ্‌লি না।
ত্রিভুবন যে কালীর মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জান না।

এই স্থানে তিনি সর্ব্বত্রে কালীকেই অনুভব করিয়াছেন। পরে দেখা যায় যে, কে জানে কালী কেমন, ষড়-দর্শনে না পায় দর্শন ইত্যাদি, অথবা এই গীতের শেষে কথিত হইয়াছে, মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, উন্মত্ত আঁধার ঘরে, চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে এবং মৃত্যুকালে নির্ব্বাণবিষয়ক গীতে তাঁহার জ্ঞান-ভাবের প্রকাশ আছে। অতএব রামপ্রসাদ জ্ঞান-ভক্তির আদর্শবিশেষ। জ্ঞানের মহাকারণ নির্ব্বাণ, তাহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে এবং ভক্তিতে রূপাদি দর্শন ও প্রেমালাপন, তাহাও তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ব্রহ্মময়ী রূপ স্থানে স্থানে দর্শন করিতেছেন, তাহা জনশ্রুতি এবং তদ্বিরচিত গীতের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি একদা কাশি যাত্রা করিবেন বলিয়া মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, অবিলম্বে ভাব-দৃষ্টিতে আপন গৃহে বারাণসীর ছবি দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

কাজ কি আমার কাশি।
কালিপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥

প্রেমালাপন সম্বন্ধে সেই রসিক প্রেমিকবিশেষ কিছু প্রকাশ করেন নাই এবং তাহা বলিবারও নহে। কিন্তু তাঁহার একটী ঘটনা সকলে বিদিত আছেন। রামপ্রসাদ একদিন তাঁহার তনয়াকে লইয়া বাগানের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। তনয়া কিয়ৎকাল পরে বলিল যে, অনেক

বেলা হইয়াছে, এ-বেলা এই পর্য্যন্ত থাক বলিয়া প্রস্থান করে। রাম-প্রসাদ তাহা শুনিতে পান নাই। তিনি বেড়া বাঁধা সমাপ্ত করিয়া কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি এইবার গৃহে যাও, আমিও পশ্চাৎ যাইতেছি। কন্যা সে কথায় সায় দিয়া প্রস্থান করিল। রামপ্রসাদ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা ভোজনাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছে। রামপ্রসাদকে দেখিয়া কহিল, "আপনার এত বিলম্ব হইল যে?" রামপ্রসাদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "সে কি? একদণ্ড হয় নাই আমি তোমাকে বাটী আসিতে বলিয়াছি, ইহার মধ্যে তোমার পান ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে?" কন্যা কহিল, "আমি অনেক-ক্ষণ আসিয়াছি, সেই যে আপনাকে বলিয়া আসিলাম।" রামপ্রসাদ সরোদনে কৃতাঞ্জলিপুটে কালীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন "মাগো! তোর এমনি খেলাই বটে! যখন চতুর্ব্বিধান্ন প্রস্তুত করিয়া তোকে মা মা বলিয়া ডাকি, তখন আমার মনোসাধ পূর্ণ করিতে তোর ইচ্ছা হয় না। যখন মনে হয় যে, তোকে শয্যায় শয়ন করাইয়া তোর পদ সেবা করিব, তখন মা তোর দয়া হয় না! তোকে ডাকি নাই, তোকে কোন কথা বলি নাই, তুই আমার মা আমি তোর সন্তান, তুই কিনা আজ আমার কন্যারূপে বেড়া বাঁধিয়া গেলি! হায়! এ আক্ষেপ রাখি কোথায়! মা তুই বেড়া বাঁধিয়া রামপ্রসাদকে ছলনা করিয়া গেলি! দোষ কি মা তোর! যেমন আমি সংসারবেড়ায় বেষ্টিত থাকিয়া পুনরায় সেই বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিতেছিলাম, তুই ভক্তবৎসলা তাহা পরি-পূর্ণ করিয়া দিলি। দেখিস্ মা! বেড়া বাঁধিয়া গেলি বটে, কিন্তু যেন অন্তিমকালে বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া না মরি!" এই নিমিত্ত রাম-প্রসাদ মরণকালে সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া একেবারে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেইজন্য সর্ব্বদাই বলিতেন যে,

রসে বসে থাকাই সকলের কর্ত্তব্য। রসে বসে থাকিতে হইলে জ্ঞান-ভক্তি একমাত্র উপায়।

জ্ঞান-ভক্তি জ্ঞানপন্থায় এবং জ্ঞান-ভক্তি ভক্তিমতে দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানপথের জ্ঞান-ভক্তির বৃত্তান্ত তদন্ত করিয়াছি, তাহাতে রূপাদির সম্বন্ধ নাই। এই জ্ঞান-ভক্তিকে ঐশ্বর্য্য ভাব কহে। ভক্তির জ্ঞান-ভক্তির নাম মাধুর্য্য ভাব। এই ভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম শক্তির বিকাশ বলিয়া ধারণা থাকে। এই ভক্তির অপূর্ব্ব মহিমা। যদি কেহ ভগবান্‌কে লইয়া সম্ভোগ করিতে চাহেন, তাঁহার এই ভাবেই মনোবাসনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

জ্ঞান-ভক্তির সাধকদিগের অতি মনোহর চরিত্র, ঠাকুর সর্ব্বদাই বলিতেন যে, জ্ঞান-ভক্তির সাধকদিগকে বীর-ভক্ত কহা যায়। তাঁহাদের যেমন জ্ঞান প্রবল, তেমনি ভক্তি। এমন সাধকদিগের পক্ষে সংসার যেমন, অরণ্যও তেমন। তাহাদিগের ধ্যান জ্ঞান ঈশ্বর। ঈশ্বরের নিয়োজিত ভৃত্য বিবেচনায় সংসারে অবস্থিতি করে, সুতরাং সংসারে আর তাহার কিছুই করিতে পারে না। এই বীর ভক্তদিগের জন্য ভগবান্ সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। বীর ভক্তদিগের বাহ্যিক কার্য্যকলাপ স্বতন্ত্র এবং অন্তরের কার্য্যকলাপ স্বতন্ত্র প্রকার। কেহ হয় ত বাহ্যিক সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন, কেহ হয় ত সাধারণ ভাবের সীমায় অবস্থিতি করেন। এ প্রকার ভাবের ইতরবিশেষে আভ্যন্তরিক ভাবের কখন দোষ ঘটে না।

ভক্তির কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য এবং অনির্ব্বচনীয়। ভগবান্ ভক্তের পুরস্কার কিরূপে প্রদান করেন, তাহা ভক্ত ব্যতীত অপরে জানিতে পারে না।

কোন স্থানে এক ব্যক্তির নিবাস ছিল। সে সাধক হইয়া কখন

কি জ্ঞানমতে, কি ভক্তিমতে কোন কার্য্যই করে নাই। সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় দিনযাপন করিত। ভগবানের প্রতি অন্তরে অন্তরে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সকল কর্ম্মে তাঁহারই ইচ্ছা প্রত্যক্ষ করিত। একদিন সায়ংকালে ভোজনাদি সমাপনান্তে স্থানান্তরে প্রয়োজন বশতঃ গমন করিতেছিল, পথিমধ্যে অন্ধকার হইয়া আসিল। পথের পার্শ্ববর্ত্তী বনের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি, ললাটে সিন্দুর, চক্ষু দুইটী আরক্তিম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধান রক্ত-বসন, উন্মাদের ন্যায় বাহির হইয়া একদিকে ছুটিয়া গেল। ইহাকে সহসা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আকার প্রকারে ইহাকে সাধক বলিয়া বুঝা গেল, কিন্তু লোকটা বোধ হয় সাধনভ্রষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, ব্যাপারটা কি একবার দেখিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া সে বনে প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিল যে, বিল্বমূলে একটা শব-দেহ বন্ধনাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। নিকটে কারণ (মদিরা), চাউল, ছোলা-ভাজা এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত রহিয়াছে। সে ইতস্ততঃ চাহিয়া মনে ভাবিল যে, ঐ ব্যক্তি এই সকল আয়োজন করিয়া বসিয়াছিল, নিশ্চয় কোন বিভীষিকা দর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহা হউক, এমন সুবিধা পাইয়া ছাড়িয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। সে নির্ভীকের ন্যায় শবের বক্ষঃস্থলে যাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক কালীনাম জপ করিতে লাগিল। একশত আটবার কালীনাম উচ্চারণ করিতে অমনি কালী আসিয়া বলিলেন, "বাছা! বর নাও।" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সে আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিল, "মা! আমি কোন বরের প্রত্যাশা করি না। তোমাকে দেখিব বলিয়া কখন মনে বাসনাও করি নাই, চাহিব কি? সে যাহা হউক, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমায় বলিয়া দাও, আমি কি পুণ্যে তোমায় দর্শন করিলাম? ভক্তিতে

যে তোমায় ডাকে মা, তুমি তাকে দেখা দাও, তাহা আমার নিশ্চিত ধারণা আছে; কিন্তু আমি তোমায় পূর্ব্বে ভাবি নাই, তবে কেন আমার ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন হইল? আর ঐ সাধক তোমায় কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কত ক্লেশে এই কঠোর শব সাধনার আয়োজন করিয়াছিল, সে ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পাগল হইল এবং আমি মাছ ভাত খাইয়া বন্ধু-দর্শনে যাইতেছিলাম, সহসা যাহা কেহ কখন শ্রবণ করে নাই, এমন অসম্ভব ঘটনা—কালীদর্শন, বিনা গুরুকরণে, বিনা সাধনে, বিনা ভজনে, আমার ভাগ্যে ঘটিল! মা! ইহা অপেক্ষা আর মানবজন্মের অন্য কি বাসনা হইতে পারে?" কালী হাসিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি পূর্ব্ব জন্মে এই পর্য্যন্ত করিয়া রাখিয়াছিলে, অজ্ঞান কারণবশতঃ তুমি সিদ্ধ মনোরথ হও নাই, আমি তোমার জন্য সময় বুঝিয়া এই ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে আসিয়া দেখা দিলাম।"

ভগবান্ অন্তর্যামী, কাহার কি প্রকার বাসনা তিনি জানেন; কাহাকে কেমন ভাবে দেখা দিতে হয় বা না হয়, তাহা তিনিই জানেন। ভক্তেতে তাঁহাকে চায়, তাঁহার সেবা চায়, সুতরাং তিনি তাহার মনোরথ পূর্ণ না করিলে আর কে করিবে?

ঠাকুর বলিতেন যে, ভাব লইয়া কথা, যাহার যেমন ভাব, তাহার সেইরূপ বস্তু লাভ হইয়া থাকে। ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে বাহ্যিক ভাবে ভগবান্ লাভ হয় না। বাহ্যিকভাবের উদ্দেশ্য লোকের মনোরঞ্জন করা; সে সাধ পূর্ণ হয়, কিন্তু আভ্যন্তরিক ভাব লইয়া ভগবানের সম্বন্ধ। সেই ভাব যদ্যপি ভাবের মত হয়, যদ্যপি তাহা বিশুদ্ধ হয়, যদ্যপি তাহা বাস্তবিক বিশ্বাসে হয়, তাহা হইলে তাহার বাসনা চরিতার্থ হইবার পক্ষে কখনও কোনমতে বিঘ্ন বাধা হয় না।

কোন স্থানে এক দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল। তাঁহার

পরিবারবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণী এবং সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নী পরম রূপবতী এক কন্যা ছিল। কন্যাটির রূপে গুণে সকলেই বিমোহিত হইত। সেই গ্রামের জমীদার কন্যাটির রূপ ও গুণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুত্রবধূ করিয়াছিলেন। জমীদার বিবাহের পর সর্ব্বমঙ্গলাকে আর পিত্রালয়ে পাঠাইতেন না। যদ্যপি বিশেষ কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ সর্ব্বমঙ্গলাকে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে জমীদার পাঁচটা দ্বারবান্ দশটা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিতেন এবং পুত্রবধূর ভোজনের জন্য পাচিকা দ্বারা নানাপ্রকার ভোজ্য সামগ্রীও পাঠাইয়া দিতেন। সর্ব্বমঙ্গলার শাশুড়ী মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়া দিতেন যে, দেখ বাছা! যেন তোমার মায়ের কাছে কিছু খাইও না। সে সকল দ্রব্য তোমার পেটে সহ্য হইবে না। সর্ব্বমঙ্গলা সুতরাং যদিও মাতা-পিতার নিকট আসিত, কিন্তু না কিছু আহার করিত, না দুদণ্ড প্রাণ ভরিয়া কথা কহিতে পারিত। একটু বসিতে না বসিতে অমনি তাহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পরিচারিকারা বার বার অনুরোধ করিত। সর্ব্বমঙ্গলা বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে বলিল, "মা! আর আমাকে আনিতে পাঠাইও না। তুমি সমাচার পাইবে, আমি ভাল আছি এবং বাবাকেও আর পাঠাইও না।" সর্ব্বমঙ্গলার বাপের বাড়ী আসা বন্ধ হইল। সর্ব্বমঙ্গলার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার ন্যায় ভক্তিমান্ অতি বিরল। তিনি বাৎসল্যরসের অবতার-বিশেষ; যেন গিরিজা মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যলীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণবেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ দশভুজাকে আপনার কন্যাভাবে আরাধনা করিতেন। পরে অনেক বয়সে ঐ কন্যাটি জন্মায়, এইজন্য তাহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বমঙ্গলাকে পাইয়া ব্রাহ্মণ উমা জ্ঞান করিয়া তাহার লালন পালন করিয়া নবম বৎসরে

বিবাহ দেন। বিবাহের পর কন্যাকে সর্ব্বদা দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত বিষাদিত হইয়া দিনযাপন করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাহার শ্বশুরালয়ে যাইয়া দেখিয়া আসিতেন এবং লুকাইয়া কিছু খাওয়াইতেন। যখন সর্ব্বমঙ্গলা আসা বন্ধ করিল এবং পিতাকে তাহার শ্বশুরালয়ে গমন করিতেও নিষেধ করিল, ব্রাহ্মণ তদবধি তাহার জন্য সর্ব্বদা রোদন করিতেন। একদিন স্বপনে দেখিলেন যে, দশভুজা আপনি ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাবা! আমাকে কেন বিস্মৃত হইয়া আছ? আমি অনেকদিন যে তোমার কাছে আসি নাই? অনেকদিন যার কাছে কিছু খাই নাই, বাবা! মার কাছে না খেলে কি পেট ভরে? আর কে তেমন করিয়া খাওয়াইতে জানে? তুমি বল, এবার আমাকে আনবে?" ব্রাহ্মণের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ব্রাহ্মণীকে সমস্ত কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণীও যারপরনাই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু কিরূপে দশভুজা-পূজা সমাধা হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দেখ, আমাদের সামর্থ্য অসামর্থ্য লইয়া কোন কথাই নাই। আমরা মাকে আনিতে চাহি নাই, তিনি আপনি আসিবেন বলিয়াছেন। যদ্যপি স্বপ্ন সত্য হয়, তাঁহার আসাও সত্য হইবে এবং আমরা এই দরিদ্রাবস্থায় তাঁহার পূজা সমাধা করিতে পারিব।" এইরূপে ক্রমে দুর্গোৎসব সন্নিহিত হইল। ব্রাহ্মণ কি করিবেন, কোন উপায় নাই। ব্রাহ্মণী বলিলে তিনি বলিতেন যে, মার যদ্যপি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সেই রাত্রেই ব্রাহ্মণকে পুনরায় স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, "আর দিন নাই, তুমি অপেক্ষা করিতেছ কেন? প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে দাও, আমি তবে যাইতে পারিব।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মা! তোর এ কি বিড়ম্বনা! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন ক'রে

প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পূজা করিব?" দেবী কহিলেন, "তোমার যাহা আছে, তাহাতেই হইবে।"

ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণীকে সকল কথা কহিলেন। ইহা শ্রবণপূর্ব্বক রহস্য করিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, তোমার কি আছে না আছে, আমি কিরূপে জানিব? অবশ্য গুপ্তধন না থাকিলে তিনি এমন কথা বলিবেন কেন? ব্রাহ্মণ বিষাদিত হইয়া কহিলেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলে না, ঐ ভাণ্ড খুলিয়া দেখ, কত সম্পত্তি আছে। ব্রাহ্মণী ভাঁড়ের ভিতর হইতে বারোটী টাকা বাহির করিলেন, ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে সেই ভাণ্ডেতে কিছু কিছু ফেলিয়া রাখিতেন, পুনরায় তাহা হইতে কখন কিছু বাহির করিয়া লইতেন না। বহুকাল সঞ্চয় করিয়া বারো টাকা হইয়াছে দেখিয়া পুলকিত হইলেন। তিনি সেইদিন প্রত্যূষে কুমারবাড়ী যাইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। কুমার সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণকে পাগল বলিয়া স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কাতরতা দেখিয়া কুমার বিনামূল্যে প্রতিমা দিতে চাহিল। অন্যান্য ঠাকুর নির্ম্মাণের জন্য কারিকরেরা নিযুক্ত ছিল, সুতরাং কুমার নিজে ব্রাহ্মণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিল। প্রতিমার রূপ দেখিয়া কুমার নিজেই কাঁদিয়া সারা হইতে লাগিল। তেমন প্রতিমা কুমার কখন গড়িতে পারে নাই, কেহ কখন তেমন মনোহর প্রতিমূর্ত্তিও দেখে নাই। কুমারের স্ত্রী সেই প্রতিমা নিজে পূজা করিতে চাহিল, কিন্তু কুমার তাহা শুনিল না। ব্রাহ্মণের ভক্তিতে সেই মূর্ত্তির অপূর্ব্বকান্তি হইয়াছে, তাঁহাকে কি বঞ্চনা করা যায়, এই বলিয়া নিজ পত্নীকে সান্ত্বনা করিল। পরে চতুর্থীর দিন ব্রাহ্মণ পূজার সমুদায় আয়োজন করিয়া তালপত্রের কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কুমারবাটী হইতে প্রতিমা আনিতে গমন

করিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কুমার দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক কহিল, "ঠাকুর! আপনি সামান্য নন্। ব্রাহ্মণ বটেন, ভূদেব আপনি, কিন্তু সাধারণ ভূদেব অপেক্ষা বিশেষ প্রভেদ আছে। মহাশয়! বলুন দেখি, আপনি ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এমন প্রতিমা কি কখন দেখিয়াছেন? আহা! মা যেন বিরাজ করিতেছেন। মহাশয়! আমি ধন্য, ধন্য আমার কুমার বৃত্তি! এতদিন মাকে গড়িয়া এতদিনে যে তিনি অধমের প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আপনি কিছু মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মহামূল্যের সামগ্রী পাইয়াছি; অমূল্য ধন আমায় আপনি দিয়াছেন। আর যদ্যপি কিছু দিতে ইচ্ছা হয়, আপনার চরণধূলা দিয়া যান এবং আশীর্ব্বাদ করুন, আজ যেমন আমার হৃদয়ের অবস্থা রহিয়াছে, এমনি অবস্থা যেন সর্ব্বক্ষণ থাকে।" ব্রাহ্মণের প্রতিমা দেখিয়া স্বপ্নে তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল। অবিকল সেইরূপ চরণ, অবিকল সেইরূপ হাসি হাসি মুখ, সকলই অবিকল সেইরূপ। তাঁহার হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস অতি ক্লেশে প্রদমিত রাখিয়া আপনি মস্তকে করিয়া সেই প্রতিমা গৃহে আনয়ন করিলেন। পর্ণকুটীরে প্রতিমা সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! একবার দেখে যাও, মা আমার এসেছেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর উভয়ে মিলিয়া প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী অতঃপর শঙ্খনিনাদাদি মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গার্হস্থ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চমীর প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণী কহিলেন যে, তুমি শীঘ্র সর্ব্বমঙ্গলাকে আনিতে যাও। সে না আসিলে পূজা বন্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ পাগলের ন্যায় এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক আর

কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া তৎক্ষণাৎ জমীদারের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। বহির্বাটীতে বৈবাহিককে দেখিয়া নমস্কার করণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন—মহাশয়! আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছি, সর্ব্বমঙ্গলাকে চারটী দিনের জন্য পাঠাইতে হইবে। বাটীতে মা আসিয়াছেন, অদৃষ্টক্রমে ব্রাহ্মণী কিছুই স্পর্শ করিতে পারিবে না, অতএব সর্ব্বমঙ্গলাকে পাঠাইয়া আমায় চিরদিনের জন্য বাধিত করিয়া রাখুন। জমীদার এমন উত্তর করিলেন যে, ব্রাহ্মণ আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্রীঠাকুরাণীকে যাইয়া অনুরোধ করিলেন। তিনিও ধনাভিমানে আত্মহারা, দুই চারিটী মর্ম্মভেদী কথা কহিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ অগত্যা সর্ব্বমঙ্গলার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার দুটী পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "মাগো! তুই কেন আমার কন্যাসন্তান হইয়াছিলি? আমার কন্যা আমার নয়? আজ দুই দিন পরকে দিয়াছি বলিয়া আমার সর্ব্বস্বধন সর্ব্বমঙ্গলাও পর হইয়া গেল?" সর্ব্বমঙ্গলা পিতার অশ্রু মুছাইয়া কহিতে লাগিল, "বাবা! তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে আমার কান্না পায়। কি ক'রবো বল—আমি পরাধীনা, শ্বশুর শাশুড়ীর অমতে কেমন ক'রে তোমার সঙ্গে যাই বল? তুমি এখন যাও, আমি শাশুড়ীকে বুঝাইয়া যদি পারি তাহা হইলে বৈকালে যাইব।" ব্রাহ্মণ এই আশ্বাসে নিরস্ত হইয়া চলিয়া আসিলেন। জমীদারের বাটি অতিক্রম করিয়া আসিবামাত্র পশ্চাৎ হইতে "বাবা দাঁড়াও, আমি আসিয়াছি," বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা ডাকিল। ব্রাহ্মণ সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কেমন করে এলে?" সর্ব্ব-মঙ্গলা কহিল, "তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল, আমি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাই ছুটিয়া আসিলাম।"

ব্রাহ্মণ কহিল, "যদ্যপি তোমার শ্বশুর বলপ্রয়োগে দ্বারবান পাঠাইয়া লইয়া যায়, আমি কেমন করিয়া তোমায় রাখিব?" সর্ব্বমঙ্গলা কহিল, "শ্বশুরের সাধ্য কি? আমার ইচ্ছা না হইলে তিনি কথন আমায় নিয়ে যেতে পার্‌বেন না। আমার ইচ্ছা কেন বল্‌ছি—তুমি আমায় যতদিন রাখ্‌বে, এবার আমি ততদিন থাক্‌বো। তুমি যেদিন আমায় চলিয়া যাইতে বলিবে, সেইদিন চলিয়া যাইব।" "মা! আমি কি তোমায় যাও বলিয়া আর পাঠাইব, কথন তাহা মনে করিও না", এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পরমানন্দে সর্ব্বমঙ্গলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মা সর্ব্বমঙ্গলার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিমা দেখিয়া বলিল, "বাবা! বেশ ঠাকুর হইয়াছে।" এই বলিয়া মা মা বলিয়া ব্রাহ্মণীর নিকটে চলিয়া গেল। সর্ব্বমঙ্গলা মাতার নিকট উপবেশন পূর্ব্বক কহিল, "মা! আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাইতে দাও।" ব্রাহ্মণী কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি বড় মানুষের বৌ, তোমার শাশুড়ী ক্ষীর ছানা কত কি খাওয়ায়, আমি তোমার দীন দুঃখী মাতা কোথায় কি পাব বল? মা, কিছু মনে করিও না।" সর্ব্বমঙ্গলা ম্লানবদনে কহিল, "মা! অনেক দিন আসি নাই বলিয়া বুঝি পর ভাবিতেছ? তাহা না হইলে এমন কথা বল? আমি কি খাবার লোভে আত্মহারা হইয়াছি? অমন মনে করিও না। শাশুড়ী যদ্যপি আমায় ক্ষীর সর দেখাইয়া ভুলাইতে পারিতেন, তাহা হইলে পূজার সময় তাঁহাদের ফেলিয়া আসিব কেন?"

যাহা হউক, তিন দিন সর্ব্বমঙ্গলা ব্রাহ্মণের সমুদয় কার্য্য করিয়া পূজা সমাধা করাইলেন। নবমীর দিবস ব্রাহ্মণকে কহিল, "বাবা! তুমি যেমন ভক্তি ক'রে পূজা করিলে, কিন্তু একটীও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে না, ইহাতে পূজা সম্পূর্ণ হইবে না। কি বল? আমি আজ পাড়ার ব্রাহ্মণদের

নিমন্ত্রণ করিয়া আসি।" ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ব্রাহ্মণী! সর্ব্বমঙ্গলার এখনও সেই স্বভাবটী সমান রহিয়াছে।" সর্ব্বমঙ্গলাকে কহিলেন, "বাছা! আমার আয়োজন কত তা'ত তুমি দেখিয়াছ। ইহাতে কি ব্রাহ্মণভোজন হয়? লোকে আমায় পাগল বল্‌বে।" সর্ব্বমঙ্গলা সে সব কথা শুনিল না। সে ছুটিয়া পাড়ার সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, বোধ হয় দুই একটীকে বলিয়া আসিয়াছে। বেলা দুই প্রহরের সময় পালে পালে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা সে সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। যত ব্রাহ্মণসংখ্যা বাড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণ ততই ক্রোধান্বিত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে নানাবিধ কটুকাটব্য বলিয়া আপনার হৃদয়ে এবং ললাটে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, কি অশুভক্ষণেই সর্ব্বমঙ্গলাকে আনিতে গিয়াছিলাম! আজ বোধ হয় সর্ব্বমঙ্গলা হইতেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। সর্ব্বমঙ্গলা পিতাকে তিরস্কার করিতে নিষেধ করিয়া কহিল, "বাবা! তুমি অত রাগ করিতেছ কেন? আমায় কর্ম্ম করিতে আনিয়াছ, আমার কর্ম্ম আমিই করিব। তোমাকে যদ্যপি ব্রাহ্মণেরা কিছু বলেন, তখন তুমি আমায় যাহা ইচ্ছা বলিও। যে সময় তুমি আমাকে তাড়না করিবে সে সময় তুমি প্রতিমার পাদপদ্মে বিল্বদল দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তাঁহার ধ্যান করগে, তোমার সকলদিক্ মঙ্গল হইবে।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মহাপ্রসাদ লইয়া সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়গণ! আমার পিতা দরিদ্র, মা দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার প্রসাদ আপনারাও দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। আপনারা এ মহাপ্রসাদ না ধারণ করিলে মা কখন তৃপ্তিলাভ

করিবেন না। বাবা আমার দরিদ্র, এ কথা যেন আপনারা বিস্মৃত না হন।" সর্ব্বমঙ্গলার অমৃতময় কথা শ্রবণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরা প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া অমৃতলাভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মণের বাস্তবিক ভক্তি আছে। আহা! চিরকাল প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইলাম, কিন্তু এমন প্রসাদ কখনও ভাগ্যে সংঘটন হয় নাই। সর্ব্বমঙ্গলার কথায় বিশেষতঃ সকলে আপ্যায়িত হইয়া ব্রাহ্মণের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণের আর আনন্দের অবধি রহিল না।

পরদিবস বিজয়া। ব্রাহ্মণী প্রাতঃস্নান সমাপ্ত করিয়া বিজয়ার আয়োজন করিয়া দিলেন, সর্ব্বমঙ্গলা সে দিবস আর কিছুই করিল না। সে চুপ করিয়া প্রতিমার পার্শ্বে যাইয়া বসিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বিজয়ার কার্য্য সমাপনান্তে ধ্যানযুক্ত হইয়া দধিকড়মা নিবেদন করিয়া নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, সর্ব্বমঙ্গলা তাহা ভোজন করিতেছে। ব্রাহ্মণ তনয়ার কুব্যবহার দেখিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণীকে পুনরায় দধিকড়মার আয়োজন করিয়া দিতে কহিলেন। ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিলেন। দ্বিতীয়বারেও সর্ব্বমঙ্গলা ঐরূপ ভোজন করিয়া ফেলিল। তৃতীয়বারে যখন সর্ব্বমঙ্গলা পুনরায় উচ্ছিষ্ট করিল, তখন ব্রাহ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে দূর হ বলিয়া তথা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণী চতুর্থবার দধিকড়মার আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "আহা! দূর্ হ কি বলিতে আছে, তুমি সর্ব্বমঙ্গলাকে দূর্ হ বলিয়াছ—সে আমার কাছে যাইয়া কত কাঁদিতে লাগিল, আমি তাহাকে ভুলাইয়া ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণ চতুর্থবারে দধিকড়মা নিবেদন করিয়া দিলেন, কিন্তু হৃদয়ে তৃপ্তি হইল না। ব্রাহ্মণের মনে কেমন আশঙ্কা

আসিয়া অধিকার করিল। তিনি দধিকড়মার পাত্র আপনি লইয়া সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, আর কোন উত্তর পাইলেন না। ব্রাহ্মণী চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ সেই দধি কড়মার পাত্র সঙ্গে লইয়া জমীদারের বাটীতে গমন করিলেন। তথায় সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিয়া অতি মনস্তাপে কহিলেন, "বাছা! আমি তোর পিতা, কিছু মনে করিস্ নে, এই নে মা যত পারিস্ খা।" সর্ব্বমঙ্গলা অবাক্ হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "বাছা! আমি তোর পিতা, অধিক বলিলে তোর অকল্যাণ হইবে, কিছু মনে করিস্ নে।" সর্ব্বমঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকথা সমুদয় বলিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বাবা! আমিত যাই নাই!" ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণমাত্রে উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "কি? কি? তুই যাস্ নাই? হায়! হায়! আমি ইতিপূর্ব্বে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই! মা গো! সর্ব্বমঙ্গলা কোথায় তুমি? একবার ফিরিয়া আইস। একবার আমায় বাবা বলিয়া ডাক। মাগো! কি সর্ব্বনাশ করিলাম! ধরা দিয়া কেন মায়ায় আবদ্ধ করিয়া পলায়ন করিলি মা? তুই বলিয়াছিলি যে, যাও না বলিলে যাইব না। তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট আমার! দরিদ্র ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে এত সুখ কি সম্ভবে? কিন্তু মা! কৌশল করিয়া গেলি, তোকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? মা! তুই ধরা না দিলে কি কেউ তোকে দেখিতে পায়? কিন্তু মা সর্ব্বমঙ্গলা! আমার মনে বড় ক্ষেদ রহিল যে, তোকে সামান্য দধিকড়মার জন্য দূর হ বলিয়া তাড়াইয়া দিলাম! এ আক্ষেপ যাইবার নহে! মা গো! যেমন দয়া ক'রে বাবা ব'লে এসেছিলি, তেমনি ক'রে

আবার আয়! এসে এই দধিকড়মা ভোজন করিয়া যা। আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব।" ব্রাহ্মণ শুনিতে পাইলেন যে, অন্তরীক্ষ হইতে সর্ব্বমঙ্গলার স্বরে কে বলিল, "বাবা! ও আমার খাওয়া হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সর্ব্বমঙ্গলারূপ ধ্যান করিলে হৃদয়ে আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। এ জন্মে তুমি আমার সে রূপ আর দেখিতে পাইবে না।" ভক্তিতে অঘটন সংঘটন হয়। ভক্তের নিমিত্ত ভগবান্ না করেন কি? ভক্তমাল গ্রন্থে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। আমরা নিজ জীবনের কত ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা আর কি বলিব। সে যাহা হউক, ভক্তিমতে ভক্তের বাসনা পূর্ণ পরিমাণে সম্পূর্ণ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভক্তির মহিমা এতই অপার যে, নিজের ভক্তি না থাকিলেও বল-পূর্ব্বক যদ্যপি কেহ ভক্তির কার্য্য করিতে বাধ্য করায়, তাহাতেও উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে।

একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজ রাজধানীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, প্রত্যেককে শ্যামাপূজার রাত্রে প্রতিমা আনিয়া পূজা করিতে হইবে। যে কেহ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহার শিরশ্ছেদন দণ্ড হইবে। সকলেই এই ঘোষণা শ্রবণপূর্ব্বক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং নিজ নিজ অবস্থানুসারে পূজার ব্যবস্থা করিল। রাজধানীতে আনন্দের অবধি নাই। রাজা পরিষদ্‌বর্গ লইয়া ছদ্মবেশে প্রত্যেক পল্লীতে প্রত্যেক বাটীতে পূজা দেখিবার ভান করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় যামিনী অবসান হইয়া আসিল। এমন সময়ে তিনি যুগীপাড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকল বাড়ীতেই প্রতিমা বসিয়া আছেন, কোথাও পূজা হইয়া গিয়াছে, কোথাও পূজা হইতেছে এবং কোথাও তখনও পূজা হয় নাই। রাজা একটি কুটীরের নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতরেও একখানি প্রতিমা

এবং তাঁহার সমক্ষে এক ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া রহিয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে ফুল বিল্বপত্রাদি এবং নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে অন্নব্যঞ্জনাদি সংস্থাপিত রহিয়াছে। রাজা শ্রবণ করিলেন যে, সেই ব্যক্তি বলিতেছে, "মা! আর উপায় নাই। রাত্রি প্রভাত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, এখনও পঁচিশ ঘরে পূজা বাকী রহিয়াছে। ইহা সারিয়া পণ্ডিত কখনও আসিতে পারিবেন না। মা! উপায় কি হবে? হয়ত এতক্ষণে রাজার চর বাহির হইয়া সকল সন্ধান লইয়া যাইতেছে, যেমন সূর্য্যোদয় হইবে, অমনি শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হইবে। মা গো! তখন আর কে আমায় রক্ষা করিবে? এমন নির্ম্মম রাজা নয় যে, কোন কথা শুনিবেন; মাগো! কি আর বলিব! যা তোমার ইচ্ছা, তাই কর, আমি আর কি করিব? যদ্যপি প্রাণ যায়, সে দোষ আমার নহে। আমার ক্ষমতা মত আয়োজন করিতে বাকী করি নাই। রাজার আজ্ঞা পালন করিয়াছি। যদ্যপি পূজা করিতে জানিতাম, তাহা হইলে আপনি তাহা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতাম।" অতঃপর রাজা দেখিলেন যে, একটি বালিকা প্রতিমা হইতে বাহির হইয়া কহিল, "কেন তুমি ভাবিতেছ? আমি কালী, এই দেখ, আমি আসিয়াছি। তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না। তোমার সকল ভাবনা অদ্যাবধি দূর হইল। আমার পূজা কর না?" সে কহিল, "কি করিয়া পূজা করিব, মন্ত্রাদি জানি না।" বালিকারূপী কালী কহিলেন, "মন্ত্রের প্রয়োজন নাই, শাস্ত্রের আবশ্যক নাই, তুমি মা বলিয়া অঞ্জলি পূরিয়া ফুল দাও, আমি তাই সানন্দে গ্রহণ করিব।" জয় কালী, জয় কালী বলিয়া সে তাহাই করিল। পূজান্তে সেই অন্নব্যঞ্জনাদি তিনি ভোজন করিয়াছেন, এমন সময় রাজা মা মা শব্দে তাহার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন সেই বালিকার চরণ ধরিতে যাইবেন, সে অমনি অদৃশ্য হইয়া যাইল। রাজা তখন আর্ত্তনাদ

করিয়া কহিলেন, "মাগো! এতদিনে আমি তোমার ভাব বুঝিলাম। ছার কুলাভিমানে, ছার ধনাভিমানে,—মনে করি যে, আমার ন্যায় ভক্ত আর কেহ ত্রিভুবনে নাই। আমি বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করাই, মনে করি, সেই পূজাই তোমার প্রকৃত পূজা। স্বর্ণপাত্রে অতি পবিত্র ভাবে দুষ্প্রাপ্য উপাদেয় সামগ্রী সকল দিয়া মনে করি যে, তোমাকে আমার রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু মা! আজ আমার সে ভ্রম বিদূরিত হইল। তুমি বাস্তবিক পতিতপাবনী দীনবৎসলা নাম ধারণ কর, একথা অলীক নহে। মা! দাসে কৃপা ক'রে অভিমান চূর্ণ করিয়া দাও।"

রামকৃষ্ণদেব জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম; কি বলিতে কি বলিয়াছি, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে অশক্ত। আমি জ্ঞানী নহি, আমি ভক্তও নহি, জ্ঞান ভক্তির কথা কি বলিব? কি বুঝাইব? ছিলাম পামর পাষণ্ড, রামকৃষ্ণ দয়া করিয়াছিলেন। অতিশয় দয়ালু তিনি, দয়ার অবতার বলিয়া আমাদের মত হতভাগাদিগকে চরণছায়া দিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের জ্ঞান যাহাকে বলে তাহাও রামকৃষ্ণ, ভক্তি যাহাকে বলে তাহাও রামকৃষ্ণ, জ্ঞান-ভক্তি যাহাকে বলে তাহাও রামকৃষ্ণ, আমরা তাঁহাতেই সকল ভাব দেখিতে পাই। ভগবান্ বলিয়া আর কাহাকেও এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, তাঁহার কথা কিরূপে বলিব?

রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছি জ্ঞানের আকর, রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছি ভক্তির মূরতি, রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছি প্রেমের প্রস্রবণ। জ্ঞান ভক্তি প্রেম মহাভাবাদির সমষ্টি তাঁহাতেই দেখিয়াছি। যখন তিনি 'তৎ' বলিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চলিয়া যাইতেন, তখন সে সমাধিকালে

তৎ শব্দ তাঁহার কর্ণবিবরে উচ্চারণ না করিলে সে সমাধির কখন অবসান হইত না। সবিকল্প সমাধিতে যে ভাবে যে নামে সমাধি হইত, সেই ভাব বা নাম উচ্চারণ করিতে হইত, তবে সমাধির বিরাম হইত। জ্ঞান ভক্তি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা তাঁহারই ছবি দিয়াছি। বলিয়াছি আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি, বলিয়াছি আমি পণ্ডিত নহি। রামকৃষ্ণের দাস, তাঁহার কথা এবং তাঁহাকেই আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি। দোষ গুণ আমার নহে, সকলই রামকৃষ্ণের। রামকৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর, পাষণ্ডের দেবতা, অজ্ঞানীর জ্ঞান-স্বরূপ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা। ভজনপূজনবিহীন সাধ্যসাধনাবিহীন অসমর্থ নিরুপায়ের পরিত্রাতা রামকৃষ্ণ। আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি, তাই আমাদের ন্যায় যদ্যপি কেহ দুস্তর জলধির হিল্লোলে কূল কিনারা না পাইয়া থাকেন, আসুন, বলুন রামকৃষ্ণ, দেখিবেন হৃদয় ভরিয়া যাইবে। অকূলে কূল দেখিতে পাইবেন। তমসাবৃত হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্য্য ও ভক্তি-চন্দ্র উদয় হইবে, তখন রামকৃষ্ণ—যেমন যুগল নাম—তেমনি জ্ঞান ভক্তিও যুগলভাবে হৃদয়ে সমুদিত থাকিয়া আনন্দের পারাবার উথলিয়া পড়িবে। বর্ত্তমানকালে জ্ঞান-ভক্তি ব্যতীত কার্য্য চলিবে না, কেবল জ্ঞান কেবল ভক্তি স্থান পাইবে না, তাই জ্ঞান-ভক্তির অবতার রামকৃষ্ণ কলির অবোধ জীব উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কলির জীবতরান রামকৃষ্ণ নামের প্রত্যক্ষ অবতার হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, "যে কেহ ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত, জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমার নিকট আসিবে, তাহারই মনোসাধ পূর্ণ হইবে।"

গীত

(১)

এক তুমি হে ভব ভয়হারী, সৃজন-পালন-প্রলয়কারী ॥
যে ধঁনুধারী তুমি সে মুরারী, গোকুলবিহারী প্রেমপ্রহরী ॥
তুমি উমা রমা ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
ব্রজেশ্বরী তুমি কিশোরী,
ত্রিতাপহারিণী শমনবারিণী তুমি মা জগজ্জননী :—
প্রাণের বেদনা, তুমি কি বোঝনা, ভুলনা ভুলনা শ্রীহরি :—
ভরসা তব ও চরণ-তরী,
মোরা রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম ভিখারী ॥

(২)

ফেলেদে ছার বিষয়-জ্ঞান তুই, চাস্ যদি সে পরম জ্ঞানে।
আসল জ্ঞান সে শুদ্ধ জ্ঞান, যার ভক্তি জাগে প্রাণে প্রাণে ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে নীরস ধ্যানে,
নিরাকার তায় অনুমানে,
তপন কিরণে যেন সলিল মিশায় বাষ্প সনে :—
শশধরের বিমল করে,
বাষ্প ফিরে রূপতো ধরে,
উষার শোভা তুষার হারে, জুড়ায় জীবন সেবনে ॥
সেবিতে সাধ বড় মনে,
ভক্তি দিয়ে এ সন্তানে স্থান দে মা রাঙ্গা চরণে :—
পেয়ে অভয় পদছায়া,
ঘুচেছে সকল মায়া,
দেখি তুই মহামায়া, তোর কোলে সবে শয়নে ॥

(৩)

জ্ঞানের জোরে পেতে তোরে কে পারে বল্‌তে পারি না।
কত মুনি ঋষি ঘোর তপস্বী লাখ বছরে ফল ফলে না॥
এ কলির জীবন এখন তখন কখন সাধন হবে বল না।
তাই ভক্তি ভরে ডাকি তোরে নামটী কি তোর বলে দেনা॥
শক্তিহীন যে কৃপার অধীন জ্ঞানে স্বাধীন আর র'ব না।
যেন অবোধ ব'লে কৃপা মেলে, তুই না দিলে আর পাব না॥

(৪)

ডাক্‌চে তোরে দয়াল ঠাকুর আয়রে নেচে আয়।
রামকৃষ্ণ ব'লে কুতূহলে বিদায় দে মোহ মায়ায়॥
থাক্‌তে ভবে আনা গোনা,
জ্বালা হতে পার পাবে না,
জুড়াতে সে সব যাতনা রামকৃষ্ণ নাম উপায় :—
রামকৃষ্ণ ব'লে যাবি চলে মোক্ষ ঠেলে পায়॥

অষ্টম বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী

নবম বক্তৃতা

—:*:—

বিবেক ও বৈরাগ্য

—:*:—

১৩০০ সাল, ১৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, প্রাতঃ ৮ ঘটিকায়
সিটি থিয়েটারে প্রদত্ত।

—:*:—

৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথিত

বিবেক ও বৈরাগ্য

ব্রাহ্মণাদি সকলের চরণে প্রণাম।

বিগত আট মাস রামকৃষ্ণদেবকথিত ধর্ম্ম বিষয়ের অতি গভীরতম উপদেশ সাধারণের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে আমি কার্য্য করিয়া আসিতেছি। অদ্য যে প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমারই হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। আমি অকপটে বলিতেছি যে, অগ্রে বিবেক বৈরাগ্যের তাৎপর্য্য আপনিই বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইয়া একেবারে আপনাদিগের সমক্ষে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তখন মনে হইয়াছিল যে, ঠাকুরের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই একরকম করিয়া বলিয়া যাইব। কিন্তু মহাশয়গণ! আমি যে নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তাহার ফল আমি বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। বিবেকী এবং বৈরাগী হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে লাভ করি নাই, সুতরাং বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি কিরূপে বুঝিব? আমি অদ্যাপি কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি নাই, আমি অদ্যাপি "আমি এবং আমার" জ্ঞানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আমার মুখে কি

বিবেক এবং বৈরাগ্যের কথা শোভা পায়? এই নিমিত্তই আমার পক্ষে এই বিষয়টী বিড়ম্বনা হইয়াছে। কিন্তু কি করিব, লোকলজ্জা এখনও যায় নাই। একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, কি বলিয়া এখন পৃষ্ঠদেশ দেখাইব? এই ভাবিয়া রামকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অদ্য আপনাদের সমক্ষে অগ্রসর হইয়াছি। তাঁহার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

বিবেক ও বৈরাগ্য বিষয় আমাদের দেশে নূতন নহে। যেমন ভাষায় অধিকার পাইবার নিমিত্ত বর্ণমালা শিক্ষা করা বিধেয়, তেমনি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিবেক ও বৈরাগ্য আশ্রয় করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই নিমিত্ত আর্য্যগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হইয়া গুরু-গৃহে অবস্থিতি করিতেন। তথায় তাঁহারা জড় ও চৈতন্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণাদি ভিন্ন ভিন্ন সোপান দ্বারা চিন্তাবলে আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া সমুদয় বুঝিয়া লইবার শক্তি লাভ করিতেন। শিক্ষার দ্বারা এইরূপে বিচারক্ষম হইয়া যখন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে যত্নবান হইতেন, তখনই পৃথিবীর আভ্যন্তরিক রহস্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া যাইত। এই নিমিত্ত এই প্রকার ব্যক্তিদিগের সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন অর্থাৎ বৈরাগী হওয়া ভিন্ন উপায় থাকিত না। আর্য্যদিগের এই ভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সংসারের সহিত আত্মসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করাকে বিবেক ও বৈরাগ্য কহা যায়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, বিবেক শব্দে সদসৎ বিচার এবং বৈরাগ্য শব্দে অসৎকে ত্যাগ করিয়া সৎ অবলম্বন করাকে বুঝায়, অর্থাৎ সংসারের সহিত নিজ নিজ সম্বন্ধ নিরূপণ করাকে বিবেক এবং তাহার সহিত নিজ নিজ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাকে বৈরাগ্য কহে।

সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি এবং তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কেন? এই দুইটী বিষয় আলোচনা করা আমার অদ্যকার সঙ্কল্প।

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "সংসার কেমন? যেমন আম্‌ড়া, শস্যের সঙ্গে খোঁজ নেই, আঁটি আর চাম্‌ড়া, খেলে হয় অম্লশূল।"

ফলের মধ্যে যেমন আম্‌ড়া ফল নিকৃষ্ট। ইহার আকৃতি যেরূপ, প্রকৃতি সেরূপ নহে। দেখিতে নিতান্ত ক্ষুদ্রও নহে, কিন্তু ইহার ছাল ফেলিয়া দিলে আঁটিই সর্ব্বস্ব বলিয়া দেখা যায় ও শাঁস নাম মাত্র। সংসারও তদ্রূপ। বাহির হইতে উহার শোভা অতি মনোহর বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। সাংসারিক গঠন দেখিলে কাহার মন না তাহাতে আকৃষ্ট হয়? কাঞ্চনের বিচিত্র অভিনয় দর্শন এবং পুরুষ প্রকৃতির অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিলে সংসারকেই সুখ শান্তির আকর বলিয়া কাহার না নিশ্চিত ধারণা হইয়া যায়? সংসারের এই বাহ্য শোভা আম্‌ড়ার ন্যায় প্রীতিপ্রদ বলিয়া রামকৃষ্ণদেব উল্লেখ করিয়াছেন। সংসারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে আম্‌ড়ার ন্যায় কিঞ্চিৎ অম্ল-মধুর আস্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ মধুর রস কখনই প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পঞ্চরসে সংসার সংগঠিত হইয়া থাকে। পঞ্চম বা শেষ রসটীকে মধুর বলিয়া কথিত হয়। এই পঞ্চরস ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে জন্মিয়া থাকে, যথা—গুরুজনে শান্ত, নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে দাস্য, সমতুল ব্যক্তিকে সখ্য, সন্তানভাবে বাৎসল্য এবং স্ত্রী-পুরুষ ভাবে মধুর। সাধারণ ভাবে এই মধুর রসকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের জ্ঞান আছে এবং সেই মতেই সকলেই পরিচালিত হইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব এই মধুর রসের সহিত অম্ল সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত মধুর রসে যদিও বিকৃতভাব থাকে না, কিন্তু সংসারে তাহা নাই; বিশেষতঃ উহা অম্লসংযুক্ত হইলে মধুরতার

প্রকৃত আস্বাদন থাকে না এবং তাহার ধর্ম্মেরও অন্যরূপ পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপ মধুর রসে বিমোহিত হইয়া আমরা তাহাকে যাহাই মনে করি, বা তৎসম্বন্ধে যে কোন প্রকার ধারণা জন্মিয়া যায়, তাহা বাস্তবিক অপ্রকৃতভাব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংসারে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত আর কোন বস্তুতে আমাদের মন আবদ্ধ নাই। আমাদের জ্ঞান, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আমাদের সুখ শান্তির একমাত্র নিদান কামিনী-কাঞ্চন। ইষ্টমন্ত্র অপেক্ষা কামিনী-কাঞ্চন আমাদের প্রিয়তম; পিতা, মাতা, ভাই-ভগ্নী অপেক্ষা কামিনী-কাঞ্চন প্রিয়তম; পারিবারিক, সামাজিক এবং লৌকিক সম্বন্ধ অপেক্ষা কামিনী-কাঞ্চন প্রিয়তম। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য আমরা না করিতে পারি এবং না করিতেছি কি? মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, এমন কি গলায় ছুরি দিয়াও কামিনীকাঞ্চন সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং সংসার কামিনীকাঞ্চনরূপ অম্লমধুর রসের যৌগিকবিশেষ। কামিনীর মধুর রস এবং কাঞ্চনের অম্লরস এই দুই রস আমাদের মুখরোচক হইয়া রহিয়াছে। কেবল মধু সেবনে মধুরতার আস্বাদন বিকৃত হইয়া আইসে, মধ্যে মধ্যে অম্ল সম্বন্ধ থাকিলে আস্বাদনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত প্রভু সংসারকে কেবল মধুর না বলিয়া অম্ল মধুর বলিয়া গিয়াছেন। কামিনী-সম্বন্ধ প্রীতপ্রদ বটে, কিন্তু অর্থ না থাকিলে সে সুখ স্থায়ী হয় না এবং তাহার সৌন্দর্য্যও প্রকাশ পায় না। অতএব আমড়ার অম্লমধুর রসের সহিত কামিনী-কাঞ্চন ভাবের তুলনা দ্বারা প্রভু আমার প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতঃপর বলিয়াছেন যে, আমড়া অধিক দিন খাইলে অম্লশূল রোগের সঞ্চার হইয়া থাকে, সংসারেও তদ্রূপ ঘটনা দেখা যায়। যে সুখ ও

শান্তির প্রত্যাশায় কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব স্বীকার করা যায়, তাহার বিনিময়ে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, কস্মিন্‌কালে তৃপ্তি-সাধনই হয় না। কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, যেরূপ ভাবে তাহা লাভ হইলে আমরা সার্থক জীবন বলিয়া জ্ঞান করি, সেরূপ ভাবে কৈ আমরা কামিনী-কাঞ্চন প্রাপ্ত হইয়া থাকি? পুত্রেরা মনে করে যে, মনের মত সুরূপা স্ত্রী হইলে কামিনীর সাধ মিটিতে পারে, কিন্তু পিতা মাতা সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কাঞ্চনের পরিমাণ দেখিতে চান। তাঁহারা দেখেন যে, একটী একটী পুত্রের দ্বারা খরচ-খরচা বাদে কত টাকা লাভ হইল। লাভালাভের হিসাবে, না পুত্রের মনতুষ্টি হইল, না পিতা মাতার মন উঠিল; সুতরাং কামিনী-কাঞ্চন দ্বারা কাহার কোন পক্ষে তৃপ্তিসাধন হইল না। যথায় মনের মত কামিনী লাভ হয়, তথায় কিন্তু কাঞ্চন সম্বন্ধের ন্যূনতা হইলে সুখের ব্যাঘাত পড়িয়া যায়; তাহাতেও তৃপ্তিসাধন হয় না এবং প্রচুর কাঞ্চন থাকিলে কামিনীর আধিক্যতা হেতু তদ্দ্বারাও তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না। তাহারা কোনমতে আমাদের তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিয়া যে নিরস্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। তাহাদের দ্বারা নানাবিধ উপসর্গরূপ অম্লশূল জন্মিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে অশেষ প্রকার ক্লেশে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখে। কামিনী-কাঞ্চনে সুখ কোথায়? সুখী হইবার আশায় জীবন পণ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে পরিশেষে সর্ব্বতোভাবে হতাশ হইতে হয়। এ বিষয় অধিক করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তি প্রাণে প্রাণে তাহা প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন। যখন উপর্য্যুপরি হতাশে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত মনে মনে বাসনার সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন কামিনী-কাঞ্চনের অধিকার হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিলেও বিফলমনোরথ

হইতে হয়। আমড়া খাইয়া যখন শূলরোগ আসিয়া অধিকার করে, তখন আমড়া খাওয়া ছাড়িয়া দিলে রোগ কমিবে কেন? হয় ত কোথাও সংসারের অনাটন, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে; অর্থের আনুকূল্য নাই বলিয়া স্ত্রী যাইবে কোথায়, পুত্র কন্যারা যাইবে কোথায়? কে তাহার হইয়া কন্যার বিবাহকালে টাকা ঢালিয়া দিয়া দায়োদ্ধার করিবে? পুত্রের পীড়ায় সুচিকিৎসক দ্বারা কে চিকিৎসা করাইবে? অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে এবং সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহের দ্বারা পরিচারিকা অপেক্ষা হীনাবস্থা হইতে তাহার স্ত্রীকে কে মর্য্যাদাপন্নভাবে উত্তোলন করিবে? এই প্রকার যখন চিন্তার উপরে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়, তখন তাহার মনে হয় যে, কেন এমন হলাহল ইচ্ছা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি? মধুর মধুরতাকে যে সময় হলাহল বলিয়া জ্ঞান হয়, সে সময়ের অবস্থাকে কেহ কেহ বিবেকের প্রারম্ভকাল বলিয়া উল্লেখ করেন। এইরূপ চিন্তার দ্বারা যদিও ক্রমে আত্মজ্ঞানোদয় হয়, আত্মাবস্থার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয় এবং আপন পর কে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়, যদিও সেই বিবেকী দিব্য-চক্ষে দেখিতে পায় যে, বাস্তবিক কেহ কাহারও নহে, স্ত্রী-পুত্রদিগকে প্রাণাধিক বলিয়া যে সংস্কার জন্মিয়া থাকে, তাহা ভ্রম এবং আত্মছলনা-বিশেষ, ও তাহাদের দ্বারা সুখের আশা একেবারে কল্পনামাত্র, কিন্তু এইরূপ সাংসারিক হতাশ হইতে যে বিবেক ও বৈরাগ্য ভাব আইসে, তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পুত্রবিয়োগে সংসার শূন্যময় দেখা যায় এবং আপনার জীবনকেও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি পুনরায় পুত্র কামনা করে, পুত্র না জন্মিলে পুত্রেষ্টীযাগ করিয়া থাকে এবং পুত্র লাভ করিলে শোক একেবারে দূরীভূত না হইলেও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অর্থ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যদ্যপি কেহ

অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া সর্ব্বদা পারিবারিক ক্লেশে দগ্ধীভূত হয়, তাহার মনে ঔসাস্যভাব উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ঠাকুর বলিতেন যে, অনেকে এই অবস্থায় সন্ন্যাসী হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া যায়। যখন তাহারা কোন স্থানে অর্থের কোনপ্রকার সুবিধা দেখিতে পায়, বা তাহাদের কোথাও কাজ কর্ম্ম হইবার সুবিধা হয়, তখন তাহারা স্ত্রী-পুত্রদিগকে পত্র লিখিয়া আপনাদের সমাচার পাঠাইয়া দেয়। প্রভু বলিয়াছেন যে, আপন মন আপনার বিষয় ভাবিতে পারে, কিন্তু মন হারাইয়া ফেলিলে, মন চুরি হইয়া যাইলে, তাহার কার্য্য আর কে করিবে? তিনি বলিতেন যে, মন প্রথমে ষোল আনা থাকে। মনের কার্য্য আরম্ভ হইলে পিতা, মাতা এবং বিদ্যাদিতে চারি আনা ব্যয় হইয়া যায়। অবশিষ্ট বারো আনা মন থাকে। বিবাহের পর স্ত্রীতে আট আনা খরচ হইয়া যায়, অবশিষ্ট চারি আনা লইয়া থাকিতে হয়। তাহা হইতে কিয়দংশ সন্তানাদিতে যায় এবং কিয়দংশ লইয়া সমুদয় কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ বিভাগ সর্ব্বত্রে দেখা যায় না। কেহ কামিনীতে হয়ত ষোল আনার উপরে পাঁচসিকা পাঁচ আনা মন অর্পণ করিয়া রাখিয়াছে, অথবা কেহ হয়ত অর্থেই এরূপভাবে মন সমর্পণ করিয়া দিনযাপন করিতেছে, অথবা কেহ পাঁচ বিষয়ে মনকে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়া পাঁচভাবে বিঘূর্ণিত হইতেছে।

যখন যাহাদের মন কামিনী-কাঞ্চনে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের কামিনী-কাঞ্চনই মনস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কামিনী-কাঞ্চনের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। আমরা এ কথা আপনাদের কার্য্যকলাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিব। যখন কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি, সে কার্য্যে কিরূপ ব্যয় হইবে, তাহা অগ্রে বিচার করিয়া দেখি; অর্থ যদ্যপি অনুমতি দেয়, তবে সে কার্য্যসাধন করিতে পারি।

কামিনীর পরামর্শ ব্যতীত আমরা যে কোন কর্ম্ম করিতে পারি কি না, তাহা আপন অন্তঃপুরেই দৃষ্টিপাত করিলেই যথেষ্ট হইবে। কামিনী ও কাঞ্চন সকলের ঈশ্বর ও ঈশ্বরী। ঈশ্বর-পথে লইয়া যাওয়া বা না যাওয়াও তাহাদের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বা না করা তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, শুভাশুভ কার্য্যাদি করা বা না করাও তাহাদের ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে, অতএব যখন আমাদের দৈহিক কার্য্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কারণ দেখা যায়, তখন আমরা যাহা কিছু করিতে চেষ্টা করি, তাহা কামিনীকাঞ্চন কারণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই নিমিত্তই সংসারে বিবেক বা বৈরাগ্য আসিলে তাহাকে প্রকৃত বিবেক ও বৈরাগ্য কহা যায় না। হিসাবমত উহাকে অভাব ও হতাশ বলে। এই অবস্থায় একেবারেই বৈরাগ্য আসিতে পারে না। পূর্ব্বকালে এই নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সদসৎ বিচার করিবার অধিকারী হইয়া তবে সংসারাশ্রমে কেহ কেহ প্রবেশ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সে বিধি নাই। সংসারে লিপ্ত থাকিয়া বিবেক ও বৈরাগ্যের ভাব লাভ করা জীবের পক্ষে একেবারে অসাধ্য বিষয়।

অসাধ্য বলিবার হেতু এই যে, মন ও বুদ্ধির দ্বারা আমাদের দৈহিক কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। মন দেহের অধীশ্বর। তিনি সঙ্কল্প করেন, বুদ্ধি মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়াদি কর্ম্মচারীবিশেষ। মন হইল, কাশী যাত্রা করিব। অমনি যে বিচারভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই বুদ্ধির কার্য্য কহা যায়। এই বিচার দ্বারা কাশী যাইবার ব্যবস্থাদি হয়। যখন তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তখনই ইন্দ্রিয়দিগের সহায়তা অপেক্ষা করিয়া থাকে। সে সময় যদ্যপি চলিবার শক্তি না থাকে, কাশী যাইবার ইচ্ছাসত্ত্বেও যাওয়া হয় না। অতএব মন বুদ্ধি এবং

ইন্দ্রিয়াদির পরস্পর সহায়তার দ্বারা কার্য্য সাধন হইবার সম্ভাবনা। কোন কার্য্য সম্বন্ধে যদ্যপি তিনের সম্পূর্ণ যোগ না থাকে, তাহা হইলে কদাচ কোন কার্য্যই হইতে পারে না। যেমন মাদক দ্রব্যের পরাক্রমে মনকে মত্ত করিলে স্বাভাবিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, যেমন কু-সংসর্গে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যাইলে মনের মত কার্য্য করিতে দেয় না, সংসারক্ষেত্রে কামিনীকাঞ্চন মন-বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দেয় বলিয়া সেই মন-বুদ্ধির দ্বারা কোনমতে স্বাভাবিক কার্য্য হওয়া তেমনই একেবারে সম্ভবনীয় নহে। মাতাল কেমন করিয়া তাহার নিজ দেহের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিবে? সে অবস্থায় যে, আর সে পূর্ব্বভাবে থাকে না। সে তখন বুঝিতে পারে না যে, বাটীর ছাদের উপর হইতে লম্ফপ্রদান করিলে শরীর বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, সে তখন বুঝিতে পারে না যে, কটিদেশের বস্ত্র মস্তকে বাঁধিলে কিরূপ দেখায়? সে মাদকতার পরাক্রমে যাহা বলে, তাহার মর্ম্ম হয় ত অনেক সময় সে আপনি বুঝিতে পারে না। তাহার এই প্রকার কার্য্য যেমন তাহার পক্ষে সময়োপযোগী হইলেও প্রকৃত মন-বুদ্ধির কার্য্য নহে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কামিনীকাঞ্চন রসাভিষিক্ত ব্যক্তির কার্য্যও সেইমত প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যে প্রকার ভৃত্য নিজ মন ও বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতে কখনই সক্ষম হইতে পারে না, প্রভুর আদেশ তাহার মনের উপর যাইয়া কার্য্য করাইয়া লয়, সেইপ্রকার কামিনী-কাঞ্চন ভাব আমাদের মনের উপরে একাধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করাইতেছে। অতএব আমাদের মন আর আমাদের নাই, আমরা পুরুষ হইয়া প্রকৃতি এবং জড় হইয়া গিয়াছি। যদিও মনে জানি যে, আমি কর্ত্তা, কিন্তু হুকুম চলে কামিনীঠাকুরাণীর, কার্য্য হয় তাহার আদেশে; এইরূপে

মনহারা হইয়া আমরা সংসারে বসতি করিয়া থাকি। আমার শরীর বটে কিন্তু পরাধীন, শৃঙ্খলে আবদ্ধ, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিব কিরূপে? এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, "গৌরাঙ্গ বলেন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের গতি কোন কালে নাই।" সংসারী জীব সকল কার্য্যের বহির্ভূত। তাহারা যখন সাধারণ কার্য্যে অপটু, সাধারণ কার্য্যে মন-বুদ্ধির সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, তখন ঈশ্বর-চিন্তা করিবে কিরূপে? সৎ বস্তু বাছিয়া লইবে কিরূপে? ফলে, সংসারের ভিতরে বসিয়া বিবেকের কার্য্য একেবারেই হইবার নহে। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে সর্ব্বাগ্রে বিবেকী হইয়া সদসদ্ বস্তু বুঝিয়া তবে কেহ কেহ সংসারে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু সে নিয়ম আর নাই, সে ব্যবস্থা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এখন গৃহস্থাশ্রমী হওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া ধর্ম্মের নিয়ম কখন বিপর্য্যয় হইতে পারে না। সে কালে যাহা বিধি ছিল, এখনও তাহাই আছে, পাত্র এবং কাল হিসাবে বিধির কিঞ্চিৎ তারতম্য হইতে পারে। ভগবান্ পরিত্রাতা, একথা চারি যুগের মত, তিনি অদ্বিতীয়, একথা চারি যুগের মত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে বিবেকী হইতে হয়, ইহাও চারি যুগের মত। দুর্ব্বল এবং বলীয়ান বিচারে, যে প্রকার পথ্য ও ঔষধের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য করা যায়, সাধনকার্য্যেও কালভেদে সেইপ্রকার ব্যবস্থার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিতে হইলে, বা তদ্সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে সদসদ্ বিচার দ্বারা সৎবস্তু বা ভগবান্ নির্ণয়পূর্ব্বক তাঁহার বৃত্তান্ত তদন্ত করিলে বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রাণ লাভ করা যায়।

এই জগতে ভগবান্ ভিন্ন সমুদয় বস্তু অসৎ, ইহাই বিবেকের চরম ফল। ভগবান্ সৎ, তদ্ব্যতীত সকলই অসৎ। একথার তাৎপর্য্য কি?

সৎএর অর্থ কি? ইহার অর্থ অনেক প্রকার। নিত্য, সত্য, মঙ্গল ইত্যাদি। যদ্যপি সৎকে নিত্য কহা যায়, তাহা হইলে অসৎ অর্থে অনিত্য বুঝাইবে। অনিত্য বস্তু যাহা, তাহাদের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিচার দ্বারা এই প্রকার মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংসার অনিত্য, একথা কাহার নিকট নূতন নহে। প্রতিক্ষণে অনিত্য সম্বন্ধের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তাহা আমরা সম্ভোগও করিতেছি। সংসারের এই রহস্য আমরা প্রাণে প্রাণে জানিয়াও তাহাকে নিত্য জ্ঞানপূর্ব্বক নিত্যবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া দিন-যাপন করিয়া যাইতেছি। প্রতিদিন দিনমণির উদয়ে নূতন দিন প্রাপ্ত হইয়া আমরা কতই সঙ্কল্প করিয়া থাকি, কতই ব্যবস্থা করিয়া থাকি, কতই আশা ভরসা করিয়া থাকি, কিন্তু দিন গতে যখন ঘোর নিশার ক্রোড়ে হতচেতনবৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পতিত থাকি, তখন সে সকল সঙ্কল্প যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার তত্ত্বের আর কি কখন জ্ঞান থাকিতে পারে? যদ্যপি পুনরায় নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সঙ্কল্পের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, কিন্তু যদ্যপি আর নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে সে স্থানের সঙ্কল্প সেই স্থানেই নিহিত রহিয়া যায়। প্রতিদিন নিদ্রাকালে আমাদের সহিত সমুদয় বাহ্য বস্তুর বিলয় হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও আমরা নিত্য এবং অনিত্য বস্তু চিনিতে পারিতেছি না, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমরা জানি যে, মানুষ কি পদার্থের গুণে ঘুমাইয়া আবার জাগে এবং কি পদার্থের অবর্ত্তমানে আর চক্ষু মেলিয়া চায় না, আর কথা কয় না, আর সঙ্কল্প করে না, তথাপি সেই বস্তু—সেই নিত্য বস্তুতে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে চাহে না। সেই বস্তুই নিত্য, সেই চৈতন্য বস্তুই নিত্য, তিনিই সৎ। এই সৎ বস্তু যতক্ষণ যে আধার অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রীড়া

করেন, ততক্ষণ সেই আধার কার্য্য করিতে পারে। আমরা এই আধারের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিত্যকে বিস্মৃত হই বলিয়া এ প্রকার ভাবকে মায়া কহে, অর্থাৎ যাহাকে নিত্য বলিয়া জ্ঞান করা হইল, তাহা প্রকৃতপক্ষে নিত্য নহে, কারণ প্রতি মুহূর্ত্তে সে অনিত্য ও অসত্য ভাবের পরিচয় দিতেছে, তথাপি তাহাকে সত্য এবং নিত্য মনে করিলে উহা ভ্রমের কার্য্য না বলিয়া আর কি বলা যাইবে? পিতামাতা অনিত্য, ভাইভগ্নী অনিত্য, স্ত্রীপুত্র অনিত্য, ধনৈশ্বর্য্য অনিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কোনমতে নিত্য চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি পায় না, ইহাই জগতের অদ্ভুত ব্যাপার। সে যাহা হউক, যে ব্যক্তির এই প্রকার নিত্যানিত্যের জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে প্রকৃত বিবেকী কহে। নিত্যানিত্যের জ্ঞানলাভের পর যখন অনিত্যে আর কোন আস্থা থাকে না, তখন তাহাকে বৈরাগ্যের লক্ষণ কহা যায়। বিবেকী হইয়া যে ব্যক্তি সংসারে লিপ্ত হয়, তাহাকে আর কামিনীকাঞ্চনে প্রতারণা করিতে পারে না। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "কাঁটাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে জ্ঞানরূপ তৈল লাভ করা সকলের কর্ত্তব্য।"

সদসদ্ বিচার করা বিবেকের কার্য্য বলিয়া যদিও কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেবল বিচারে আবদ্ধ রাখিলে কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময়ে ঠকিয়া যাইতে হয়। রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত বলিতেন যে, বিবেকী হইয়া বৈরাগী না হইলে অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া না যাইলে সময়ে বিভ্রাট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি বলিতেন যে, জীবমাত্রেই সুখের অনুসন্ধানে প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করিতেছে। যত প্রকার সুখ আছে, তাহার মধ্যে কামিনীকাঞ্চনের ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এমন সুখের বস্তু আর নাই; তাহা দর্শন করিবামাত্র অমনি মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়। যে বিবেকী কামিনী-কাঞ্চনের প্রকৃত

আভ্যন্তরিক রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়াছেন, তাহার পক্ষে উহারা অতিশয় বিঘ্নকারী, তদ্‌সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপাখ্যান আছে। ঠাকুর বলিয়াছেন যে, বিবেকী দুই প্রকার। জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিবেকী। যাঁহারা সংসারের আভ্যন্তরিক রহস্য বিশেষরূপে অবগত না হইয়া বিচারে কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ কহিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য বিশুদ্ধবিবেকী ও পরম বৈরাগী ছিলেন। তিনি কোন শাস্ত্রে দেখিয়াছিলেন যে, বিবেকী এবং বৈরাগী হইলেও কামিনীকাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে নিস্তার নাই। বিবেকীর কখন কামিনীকাঞ্চনের সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। তিনি কামিনীকে স্পর্শ করিবেন না, এমন কি, তাহার গাত্রস্পর্শিত বায়ু যেন কোনমতে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে না পারে। শঙ্করাচার্য্য ক্রোধান্বিত হইয়া সেই শ্লোকগুলি কাটিয়া লিখিলেন যে, বিবেকীর মন কখন কামিনীকাঞ্চনের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে না। অনিত্য বলিয়া যাহা একবার ধারণা হইয়া গিয়াছে, তাহা নিত্য জ্ঞান হইবে কিরূপে? সূর্য্য প্রকাশিত হইলে আর তথায় অন্ধকার থাকিতে পারে না।

পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করের পাণ্ডিত্যে তখনকার পণ্ডিত মহাশয়েরা ইতিপূর্ব্বেই পরাজিত হইয়াছিলেন, শাস্ত্রবাক্য খণ্ডনকালে কেহ শঙ্করের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না। পণ্ডিত মহাশয়েরা এই মনস্তাপ তাঁহাদের পত্নীদিগকে জানাইলেন। কামিনীগণ শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্যের গরব শুনিয়া তাঁহারা মৃদু হাস্যে কহিলেন যে, চিরকাল বৈরাগীদের কত কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কামিনীকে অবজ্ঞা করিয়া কামিনীর বক্ষে অবস্থিতি করিতে শিবও কৃতকার্য্য হন নাই। পুরুষের বুকে কামিনী বিরাজ করে, এই ত জানি। এ আবার কোন যোগী যে,

কামিনীর বুকে বসিতে চায়? এই কথা বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যে, কামিনী বড় কি বিবেক বড়, আমরা শীঘ্রই মীমাংসা করিয়া দিব।

পর দিবস হইতে যে স্থানে শঙ্করাচার্য্য যোগ ধ্যান করিতেন, এই ব্রাহ্মণকামিনীগণ সেই স্থানের সন্নিকটে যাইয়া নানাবিধ হাবভাব অঙ্গ-ভঙ্গী এবং নানাবিধ আদিরসোদ্দীপক প্রসঙ্গের রঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন। তেজীয়ান তাপসশ্রেষ্ঠ বিবেকচূড়ামণি শঙ্করাচার্য্য সে দিকে দৃষ্টিপাত করা দূরে থাকুক, তাহা গণনায়ও স্থান দিলেন না। তাঁহারা কামিনী, কি বনের বৃক্ষবিশেষ, অথবা কুটীরের প্রাচীর, তাঁহার মনে এরূপ কোন ভাবের আবেশ হইল না। ক্রমে ক্রমে কয়েক দিবস এই-রূপে অতিবাহিত হইয়া যাইল। একদিন শঙ্করাচার্য্য কামিনীদিগের অতিরিক্ত রসলীলা দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, ব্যাপার কি? তিনি এক দৃষ্টিতে কামিনীদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কামিনীরা শঙ্করাচার্য্যের ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নয়নের কারিকুরি, অঙ্গচালনা প্রভৃতি নানাপ্রকার সন্ধানে শঙ্করকে নূতন ছবি দেখাইলেন। এ ছবি তিনি কখনও দেখেন নাই, কামিনীই দেখিয়াছিলেন; তাঁহাদের রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ত কখনও শঙ্করের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এক অভিনব ঘটনা বলিয়া জ্ঞান হইল এবং সেই চিন্তাই তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। তিনি ধ্যান করিবার জন্য যখনই নয়ন মুদিত করেন, তখনই কামিনীদিগের সেই মোহিনী প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সময়ে সময়ে উন্মাদবৎ হইয়া যেন তাহাদের ধরিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, একদিন শঙ্করাচার্য্য নদীতে স্নান

করিতেছেন, এমন সময়ে কক্ষে কুম্ভ জনৈক কামিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শঙ্করকে একাকী দেখিয়া চতুরা কতই রঙ্গ আরম্ভ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য এতদ্দর্শনে উন্মাদবৎ হইয়া পড়িলেন। কামিনী শঙ্করের দিকে নয়নভঙ্গীর দ্বারা কটাক্ষ করিয়া কহিলেন,—"সাধুজী! আমার জলের কলসীটা তুলিয়া দিবে?" শঙ্কর আনন্দে গদগদ হইয়া জলপূর্ণ কুম্ভ কামিনীর কক্ষে উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিবার নিমিত্ত যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি সেই কুল-কামিনী শঙ্করের গালে এক চড় মারিয়া বলিলেন—"যা—মূর্খ, যা—বিবেকীরা কামিনীবিজয়ী কি না, এ কথা এখন বুঝিতে পারিলি?" রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য বলিতেন যে, যেমন সর্পকে দেখিলে বলিতে হয় যে, "মা মনসা! লেজটী দেখিয়ে মুখটী লুকিয়ে চলে যাও, তেমনি কামিনীর সংশ্রবে না আসিয়া একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করাই বিবেকীর কর্ত্তব্য।"

কামিনী কর্ত্তৃক শঙ্করাচার্য্যের এই প্রকার পদস্খলিত হইবার হেতু কি? কামিনীর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকাই তাহার কারণ বলিতে হইবে। যাঁহারা কামিনীর মায়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা কামিনী শুনিলেই সতর্ক হইতে চেষ্টা করেন। রামকৃষ্ণদেব তজ্জন্য বার বার বলিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞান করা বিবেকীর ধর্ম্ম। স্ত্রী মাত্রেই মাতৃজ্ঞান থাকিলে, বিবেকীর মনাকর্ষণ করিতে কেহই কখন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যাবৎকাল কামিনীতে মাতৃজ্ঞান না হয়, তাবৎকাল বিবেক পরিপক্ক হইতে পারে না এবং বিবেক পরিপক্ক হইলে বৈরাগ্যোদয় হইবারও আর অপেক্ষা থাকে না।

কামিনীদিগের প্রতি মাতৃজ্ঞান অভ্যস্ত হইলেও অব্যাহতি নাই। কামিনী যে কি বিচিত্র সৃষ্টি, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে আর কিছুই ভরসা থাকে না।

কোন ঋষি ব্রহ্মচর্য্যকাল পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক গৃহাশ্রমী না হইয়া একেবারে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সন্ন্যাসী, স্বভাবতঃ গৃহীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাদের ঘৃণা থাকে। ঋষিঠাকুরের এই ভাবটী অতিশয় প্রবল ছিল। এই অভিমানে তিনি কোন মুনিদিগের সহিত বাক্যালাপই করিতেন না। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, গম্ভীরভাবে তিনি চলিয়া যাইতেন। মুনিগণ ঋষিঠাকুরের নিকটে অপমানিত হইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে, ঋষির যেমন সন্ন্যাসের অভিমান, যদ্যপি কোন সূত্রে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, নতুবা লোকালয়ে বাহির হওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। সকলে পরামর্শ করিয়া জনৈক বারাঙ্গনাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "বাছা! আমরা মুনি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কল্যাণ হউক! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমাকে আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।" বারাঙ্গনা লজ্জিতা হইয়া কহিল, "মহাশয়গণ! আমি অতি হীন বারাঙ্গনা, আমায় অধিক বলিতেছেন কেন? আমি আপনাদের দাসী, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।" মুনিগণ কহিলেন, "বাছা! অমুক ঋষি দার-পরিগ্রহ না করিয়া অভিমানে আর দিক্‌বিদিক্ দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে কামিনীর দাস বলিয়া ঘৃণা করেন। যদ্যপি তুমি তাঁহার এই অভিমান চূর্ণ করিতে পার, তাহা হইলে আমরা এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই।" বারাঙ্গনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যদ্যপি আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব।" এই বলিয়া বারাঙ্গনা বিদায় গ্রহণ করিল।

ঋষি কামিনী সম্বন্ধে যে কেবল অন্ধ বিচার দ্বারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি কামিনীর কুহকভাবও অবগত

ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি পুরুষমানুষ ব্যতীত কোন স্ত্রীলোককে আশ্রমবাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেন না। বারাঙ্গনা কিরূপে, কি ছলনায় যে ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহা ভাবিয়া বিষাদিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে সে নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে, রাজমহিষীর রূপ ধারণ ব্যতীত আর কোন উপায় চলিবে না। এই স্থির করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রাজমহিষীর বেশে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমায় রক্ষা করুন, আমি অমুক দেশের নৃপতির মহিষী, রাজার সহিত বনে মৃগয়ায় আসিয়া মহীপতির সঙ্গবিহীনা হইয়া দস্যু-হস্তে পতিত হইয়াছিলাম। অনেক ক্লেশে আমি দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি নিতান্ত শ্রান্তযুক্তা হইয়া পড়িয়াছি, যদ্যপি দয়া করিয়া কন্যাজ্ঞানে আমায় আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমার প্রাণ রক্ষা হয় এবং রাজাও আনন্দিত হইবেন। রাজধানী কতদূর আমি জানি না, কোথায় আসিয়াছি তাহাও জানি না, কোথায় যাইব তাহাও জানি না, এই নিমিত্ত, পিতা! আমায় কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র স্থান দেখাইয়া দিন, আমি বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করি।" ঋষি কি করিবেন, ভাবিয়া কুলকিনারা দেখিতে পাইলেন না। একবার মনে হইল, যদ্যপি কেহ ছলনা করিতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইবে, আর যদ্যপি এই দেশের মহিষীই হন, তাহা হইলে আশ্রয় না দিলে রাজার বিরাগভাজন হইব। বিরাগভাজন হই তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মাতার ক্লেশ হইবে, তাহাই বা কিরূপে করি? পরামর্শই বা করি কাহার সহিত? হয়ত রাজমহিষীকে আশ্রম হইতে দূরীভূত করিতে চাহিয়াছি বলিয়া কেহ রাজার কর্ণগোচর করিয়া দিলে তিনি প্রাণে আঘাত পাইবেন। যাহা হউক, বোধ হয় রাজা সত্বর আসিয়া মাতাকে লইয়া

যাইবেন। কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ঋষিঠাকুর তাহাকে একখানি পর্ণকুটীর দেখাইয়া দিলেন। ছদ্মবেশিনী সেই কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

প্রতি মুহূর্ত্তে রাজার উপস্থিতি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ঋষির মনে হইল যে, স্ত্রীলোকটী কে? বাস্তবিক কি রাজ্ঞী, না মুনিরা আমায় পরীক্ষা করিবে বলিয়া কোন বারবিলাসিনীকে ছদ্মবেশে পাঠাইয়া দিয়াছে? যাহা হউক, অন্ত আর এমন সময় কি করিব? এই ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "রাজ্ঞী মাতা! রাজা ত আসিলেন না এবং আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য কোন দূতও আসিল না, রজনী সমাগত হইল, একাকিনী যাইবেন বা কোথায়? আপনি যেমন বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, আমিও ততোধিক হইয়াছি। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়াছি, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধই রাখি নাই। এই আশ্রমের নিয়ম ছিল যে, কখন কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহার রাত্রি যাপন করা অনুমানের অতীত কথা। কিন্তু কি জানি, বিধির কি চক্র বলিতে পারি না, আপনি আশ্রমে আগমন করিয়া আমার সেই চির ব্রত ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। সে যাহা হউক, একথা পূর্ব্বে ভাবিলে ভাল হইত। এক্ষণে আমার মিনতি এই, আপনি যেই হউন, রাত্রিকালে কখন দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন না। যদ্যপি আমিও সে কথা বলি, তাহা হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।" এই বলিয়া ঋষি আপন কুটীরে যাইয়া শয়ন করিলেন।

ঋষির মনে কামিনীভাব প্রতিফলিত হওয়া অবধি ঘন ঘন সেই ছবিই দেখিতেছিলেন, শয়ন করিয়া তাঁহার শয্যা কণ্টকিত বোধ হইতে লাগিল, কোনমতে নিদ্রাকর্ষণ হইল না। গভীর রজনীযোগে বারাঙ্গনা একটী বিরহসূচক গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গীতে

ঋষি কামোন্মত্ত হইয়া আপন কুটির হইতে বাহিরে আসিয়া কহিতে লাগিলেন, "সুন্দরী! কথা শুন, দয়া করিয়া দ্বার খুলিয়া দাও, তোমার সমক্ষে বসিয়া সঙ্গীতসুধা শ্রবণ-বিবরে ঢালিয়া পশুবৎ জীবন পবিত্র করিয়া লই। আহা! কি সুমধুর স্বর তোমার, কি রমণীয় চেহারা, কি গীতের পদলালিত্য! সুন্দরী! দরজা খোল, তৃষিত শ্রবণবিবর সার্থক করি।" ঋষির কথা শ্রবণপূর্ব্বক বারাঙ্গনা কহিল, "মহাশয়! আমি কি করিব, আপনি দরজা খুলিতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া আপনার বাক্য লঙ্ঘন করিব?" ঋষি পুনরায় কহিলেন, "আমি নিষেধ করিয়াছি, আমিই অনুমতি করিতেছি, তাহাতে তোমার কিছুই অপরাধ হইবে না।" বারাঙ্গনা তথাপি শুনিল না। ঋষি অতঃপর আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। ঋষি যতই অস্থির হইতে লাগিলেন, বারাঙ্গনা ততই মোহিনী জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ঋষি আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাচীরের ছিদ্রবিশেষ দ্বারা মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া সুন্দরী! সুন্দরী! বলিয়া বার বার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মুনিগণ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ঋষিরাজ! কি হইতেছে? সন্ন্যাসীর কি এই রীতি? বিবেকী হইয়া রাজমহিষীর প্রতি আক্রমণ?" ঋষি পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ছিদ্র হইতে সহসা মস্তকটী বাহির হইল না। সুতরাং সকলে ঋষির দুর্দ্দশা দেখিতে পাইলেন।

জ্ঞানে বিবেকী বা বৈরাগী হইলে যে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহা কখন নহে। কামিনীকাঞ্চন কিরূপ অলক্ষিত ভাবে যে আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বিবেকী ঋষিদিগের যখন কামিনীর দ্বারা পতন হইয়াছে, তখন আমরা সামান্য জীব, কামিনীর

ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া কিরূপে বিবেকী বা বৈরাগী হইতে পারি? রামকৃষ্ণদেব এসম্বন্ধে যে ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। বিবেক ও বৈরাগ্য সর্ব্বসাধারণের জন্য ব্যবস্থা নহে। তিনি পাত্র বিচার করিয়া কাহাকেও বিবেকী ও বৈরাগী এবং পাত্র বিচার করিয়া কাহাকেও সংসারের ভিতরে সত্য বস্তুতে মন-প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক কামিনীকাঞ্চনকে অসার জ্ঞান করিয়া দিন যাপন করিতে বলিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সকল প্রকার সেবক আছেন। তিনি বলিতেন যে, কেহ বিবেকী ও বৈরাগী হইল বলিয়া যে তাহাকে গৃহী ভক্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে, তাহা নহে। ভাব লইয়া সকলেই আপনাপনি শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যখন বিবেকীরা অবস্থাবিশেষে কামিনীকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইতে পারেন এবং কামিনীকাঞ্চনে অভিভূত ব্যক্তির একেবারে বিবেকের অধিকারই নাই, তখন বিবেক বৈরাগ্যের ফল কি? বিবেকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সৎকে অবলম্বন করা এবং অসৎকে পরিত্যাগ করা। যে স্থানে এ প্রকার কার্য্য হয়, সে স্থানে কখন বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না। সৎবস্তু লাভ না করিলে অসৎকে কেহ কখন ত্যাগ করিতে পারে না। যেমন একটী সোপান হইতে অপর সোপানে পদস্থাপন করিলে দ্বিতীয় পদ উত্তোলন করা যায়।

কথিত হইয়াছে যে, মনই সকল কার্য্যের আদি কারণ। প্রভু বলিতেন যে, মনের গুণেই সকল প্রকার ফল ফলিয়া থাকে। মনেই বিবেকী, মনেই বৈরাগী। মন হইতে কোন বস্তু পরিভ্রষ্ট হইয়া যাইলে, তাহার আর মনের উপর অধিকার থাকে না। যদিও কামিনী কোন সময়ে মনের অদ্বিতীয় অধীশ্বরী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহাকে পদচ্যুত হইতে নাই, এমন কোন কথা নাই। যদ্যপি প্রকৃত

বিবেক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সকল অবস্থায় সমান ফল ফলিয়া থাকে। অতএব মন হইতে কামিনীকাঞ্চনভাব বিদূরিত করিতে পারিলেই প্রকৃত বিবেকের কার্য্য হইয়া থাকে।

কথাটা শুনিতে অতি মধুর, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা যারপর-নাই গুরুতর ব্যাপার। যে বিবেক শিক্ষার জন্য পুরাকালে আর্য্যগণ বহু ক্লেশ পাইয়াছেন, যে বিবেক লাভ করিয়া শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মা-দিগেরও পদস্খলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই বিবেক কি কখন ঘোর সংসারের মধ্যে থাকিয়া লাভ করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, যেস্থানে সত্য বোধ হইয়াছে, সে স্থানে আশঙ্কা কিসের? বিবেকের ফলে সত্য লাভ হয়, বিবেকের দ্বারা সাংসারিক ভাব হইতে মনকে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত করিয়া থাকে। যখন ঈশ্বরের দিকে কেহ গমন করে, তখন তাহার অবশ্যই কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি গিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে ঈশ্বরের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিবে কেন? যতক্ষণ কেহ কামিনী কামিনী বলিয়া কাঁদিবে, ততক্ষণ তথায় ঈশ্বর আসিবেন কেন? হায়রে পয়সা পয়সা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলে তথায় ভগবান্ আসিবেন কেন? যতক্ষণ যাহাদের এই প্রকার ভাব বলবতী থাকে, ততক্ষণ তাহাদের মুখে ঈশ্বর শব্দ বালকের ঈশ্বর বলার ন্যায় শুনায়। সে যদিও ঈশ্বর বলিতেছে, কিন্তু সে ঈশ্বর চাহেনা, তাহার ঈশ্বর লইতে ইচ্ছা নাই, ঈশ্বর দেখিতে সাধ হয় নাই। সে চাহে কাঞ্চন, চাহে কামিনী, চাহে পুত্র, চাহে মান, চাহে মর্য্যাদা। সে ব্যক্তির বিবেক কপটতামাত্র, তাহার বৈরাগ্যভাব লোকের মন ভুলাইবার জন্য ছলনাবিশেষ। বিজ্ঞানী বিবেকী হইলে সে বিবেকীর মনে সদাই সত্যজ্ঞান বিরাজিত থাকে, কামিনীর প্রতি সর্ব্বদাই মাতৃভাব এবং অর্থের দিকে দৃষ্টি থাকে না। কি

হইবে, কোথায় যাইব, ইত্যাকার কোন চিন্তাই তাহার মনে স্থান পায় না। এই অবস্থায় আনন্দ বিরাজিত থাকে। এরূপ আনন্দ বিবেকপ্রসূত হয় বলিয়া বিবেকানন্দ কহা যাইতে পারে।

সম্প্রতি বিবেকানন্দ স্বামীর অনেক কথা শ্রবণ করা যাইতেছে। এই ব্যক্তি মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় গমন করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটী বর্ক্তৃতা দিয়া তথাকার নরনারীর মনপ্রাণ অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। আমেরিকার সংবাদপত্রে এই নব যুবার ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইতেছে। তাঁহার মুখের ভঙ্গীর কত বর্ণনা বাহির হইয়াছে, চলনের কত কথা চলিতেছে, তাঁহার হাস্যচ্ছটার কতই সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। সে বিবেকানন্দের সকল কথা আমাদের দেশে এখনও সম্যকরূপে প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার দুই একটী কথার মারপেঁচ ধরিয়া সাম্প্রদায়িক খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা যথেষ্ট আন্দোলন করিতেছেন। আমেরিকার সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, বিবেকানন্দের অবস্থা দেখিয়া, কথা শুনিয়া, চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় যে যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এই যুবা এমন কি বলিয়াছেন, এমন কি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, হাজার হাজার পণ্ডিত বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন? কেহ কেহ তাঁহাকে বুদ্ধ বলিয়া পূজা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহার সহিত দুটা কথা কহিবার জন্য, একবার করস্পর্শ করিবার প্রত্যাশায়, শত শত নরনারী অবসর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। যদ্যপি এই যুবার বিদ্যাবুদ্ধি পরিমাণ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিরাট সভার কেন, চিকাগোর একজন সামান্য ব্যক্তির অপেক্ষা হয়ত পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ হইবে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালীর রূপ যত হওয়া সম্ভবে, তাহার অতিরিক্ত কিম্বা

বাজার ছাড়া কোন প্রকার অদ্ভুত রূপ তাঁহার নহে। ফকিরি ঢংএর পরিচ্ছদ, তবে কি দেখিয়া চিকাগোর নরনারী বিমোহিত হইলেন? কথার ভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার বক্তৃতায় সকলের হৃদয়-তন্ত্রী স্পন্দিত হইয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্মের ঘরে হস্ত স্পর্শিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এই বিবেকানন্দ স্বামী কে? কোথায় তাঁহার জন্মভূমি? কে তাঁহার গুরু? কে তাঁহার ঈশ্বর? কাহার কথায় চিকাগোর ধর্ম্মজগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে?

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দাস। গুরু বলিয়া তিনি পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভগবান্ কে? রামকৃষ্ণ। বিবেকানন্দের কি দেখিয়া চিকাগো ভুলিয়াছে? তাঁহাকে দেখিয়াই ভুলিয়াছে। তাঁহার বিবেকের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ভুলিয়াছে। তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, কামিনীকাঞ্চনকে অসৎ এবং রামকৃষ্ণকে সৎ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। তিনি কামিনীমাত্রকেই প্রভুর উপদেশের ন্যায় আনন্দময়ী মা বলিতে শিখিয়াছেন, কাঞ্চনকে কাকবিষ্ঠাবৎ উপলব্ধি করিয়াছেন। এই কামিনীকাঞ্চনভাবে ঔদাস্য দেখিয়া চিকাগো অবাক হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করা সামান্য কথা নহে। বর্ত্তমান-কালের দেবদেবী কাঞ্চন এবং কামিনী। কাঞ্চনকামিনীর পূজাই সর্ব্বদেশে প্রচলিত হইয়াছে। কামিনী সম্ভোগের বস্তু, উপাদেয় বস্তু। যে কামিনীর ভুজাশ্রয়ে বঞ্চিত হয়, তাহার মানবজন্মই বৃথা। যে কামিনীর মধুর রসাস্বাদন করিতে না পারিল, তাহার আর আত্মপরিচয় দিবার কিছুই জন্মিল না। এমন কামিনী, এমন রমণী, এমন মনো-মোহিনী, পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়া বিভুর চরণরেণু মস্তকে লইয়া বিবেকানন্দ আনন্দচিত্তে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা

দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়সুখানুসন্ধায়ী কি মনে করিবে ? বিবেকের আনন্দ—বিভুর পাদপদ্ম বিনিঃসৃত—তাহা কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধীয় নহে। বিষয়ীরা সে আনন্দ কোথায় দেখিবে ? সুতরাং তাহা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। এই নূতন ভাব, নূতন আনন্দ দর্শন করিয়া, এই কামিনীকাঞ্চন-ভাববিবর্জ্জিত নূতন আনন্দমূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিকাগো অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকেই বলে বিবেক। এই বিবেক ভাব রামকৃষ্ণ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব রামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের চিহ্নিত দাস, চির বৈরাগী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইতিপূর্ব্বে এই কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ায় তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার নাম নরেন্দ্র। নরেন্দ্র প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্ম সম্প্রদায়াদি নানা স্থানে সত্যানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হয় নাই; কোন স্থানে তাঁহার প্রাণে আনন্দ স্ফূর্ত্তি পায় নাই; কোন স্থানে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় নাই; পরিশেষে দয়াময় রামকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের দয়ায়, তাঁহার কৃপায়, তাঁহার করুণায়, তাঁহার চরণবলে নরেন্দ্র আজ বিবেকানন্দ স্বামী, আজ বিবেকানন্দ নামে সকলে উৎসাহিত, সকলে তাঁহার কথা, তাঁহার উপদেশ লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। এ কি বিবেকানন্দের শক্তি ? না সেই সর্ব্বশক্তির আকর রামকৃষ্ণের মহিমা ?

একদা এই রঙ্গমন্দিরের সম্মুখস্থিত ভক্তিভাজন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে রামকৃষ্ণদেবের আগমন হইয়াছিল। এই স্থানে পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণির নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি গমন করেন। আমরা অনেকেই পশ্চাদ্গমন

করিয়াছিলাম। আমাদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছিলেন যে, "হ্যাগা, তুমি যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছ, তোমার চাপরাস আছে?" চূড়ামণি মহাশয় কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, এবং আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনরায় কহিলেন, "দেখ, যখন রাস্তায় অনেক লোক গোলমাল করে, তখন পাহারাওলা আসিবামাত্র সকলে সরিয়া পড়ে, লোকের হিসাবে পাহারাওলা স্বতন্ত্র কোন প্রকার জীব নহে। তবে লোকে কেন সরিয়া যায়? কেন তাহাকে ভয় করে? কেন তাহার কথা শুনে? পাহারাওলা সামান্য লোক, তাহার বেতন ৬৲ টাকা, তাহাকে কেহ ভয় করে না, কিন্তু যে তাহার চাপরাস আছে, তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া থাকে; যেহেতু চাপরাস মহাশক্তির পরিচায়ক। সেইরূপ ভগবানের আদেশ এবং ইচ্ছা না হইলে, তাঁহার শক্তি কাহার ভিতর না প্রবিষ্ট হইলে, যে যত পণ্ডিত হউক, যে যত জ্ঞানী হউক, যে যত বহুদর্শী হউক, যে যত শাস্ত্রজ্ঞ হউক, যে যত সুবক্তা হউক, কেহ কখনও লোকের মন হরণ করিতে পারে না। সাবানের ফেণা সাময়িক স্ফীত হয়, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আর তাহার সে অবস্থা থাকে না। একদিন, দুইদিন বা দশদিন পাণ্ডিত্যপরাক্রমে হাজার লোক একত্রিত করা সম্ভব, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না।" তাই বলিতেছি যে, নরেন্দ্র আমাদের এ দেশের একজন সামান্য যুবা, রাজার চলন বিদ্যা ব্যতীত বিদ্যায় সুপণ্ডিত হন নাই, তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মজগতে এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য হুলস্থূল সংঘটিত হওয়া, সেই পাঞ্চভৌতিক দেহের বা তদসম্ভূত মন-বুদ্ধির কর্ম্ম নহে। তাঁহার মনের উপরে, সংস্বরূপ রামকৃষ্ণ একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি বিবেকী, বিজ্ঞান বিবেকী—জ্ঞান বিবেকী নহেন, তাঁহার মন

এক্ষণে সৎএ পরিপূর্ণ, তাঁহার মুখে যাহা বাহির হইতেছে, সুতরাং তাহা সৎপ্রসূত, মহাশক্তিপ্রসূত, রামকৃষ্ণপ্রসূত, এই নিমিত্ত সে কথার এত জোর, এত বিক্রম এবং তদ্দ্বারা সকলে বিমোহিত হইয়াছেন।

এক্ষণে জ্ঞান বিবেকী এবং বিজ্ঞান বিবেকী কাহাকে বলে, আমরা বুঝিলাম। জ্ঞান বিবেকে কেবল অসৎ এবং সৎএর বিচার হইয়া থাকে। যখন তাহাদের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া আভ্যন্তরিক রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন তাঁহাকে বিজ্ঞান বিবেকী কহে।

বর্ত্তমানকালে বিবেক বৈরাগ্য শব্দ দুইটি শব্দবিশেষ হইয়া রহিয়াছে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আপাততঃ বিবেক ও বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধ রাখিয়া কস্মিন্‌কালে বিবেক বা বৈরাগ্য সাধন হইতে পারে না। কামিনীকাঞ্চনের অসারতা জ্ঞানই বিবেক ও বৈরাগ্যের চরম ফল, কিন্তু এ প্রকার ভাব কি কুত্রাপি আছে? না কোন সম্প্রদায়ে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে? হরিসভা আজকাল হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ স্থান, তথায় কিরূপে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই জানি। শাস্ত্রপাঠ, নারায়ণ পূজা, অন্নদান, বস্ত্রদান, বক্তৃতা এবং হরিসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা সভার কার্য্য পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। বিবেক ও বৈরাগ্য কোথায়? বিবেকে অভিমান চূর্ণ হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু এ প্রকার সভায় অভিমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত যে সকল পূজাদিকার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকি, তাহাতে কি এক পরমাণু বিবেকের কিম্বা বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়? কোথাও আপন ইন্দ্রিয়াদি পরিতোষণের নিমিত্তই সমুদায় ব্যবস্থা হয়, কোথাও বা দেবীর নিকট হইতে পুত্র, ধন, মান ইত্যাদি অসৎ শ্রেণীর সামগ্রীগুলি যত্নপূর্ব্বক, শুদ্ধাচারী হইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া

থাকি। ইহাকে কি বিবেক কহা যাইবে? এ প্রকার পূজায়, এ প্রকার ভগবৎ-অর্চ্চনায় কস্মিন্‌কালে কেহ কখন বিবেকী হইয়াও সৎবস্তু লাভ করিতে পারেন নাই। যে পরিমাণে মন অসৎএ গমন করিবে, সেই পরিমাণে উহা সৎ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

একদা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "সখা! চল কতিপয় দেশ পর্য্যটন করিয়া আসি।" অর্জ্জুন "যে আজ্ঞা" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উভয়ে অনতিবিলম্বে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "অর্জ্জুন! আর আমি পথভ্রমণ করিতে পারিতেছি না, ক্ষুধা তৃষ্ণায় যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছি, চল এই সম্মুখের বাটীতে অতিথি হইয়া শান্তি লাভ করি।" অর্জ্জুন কহিলেন, "ঠাকুর! বাটী কোথায়? বোধ হয়, কোন দরিদ্রের কুটীর। দরিদ্রের অতিথি হইয়া কেন তাহাকে বিব্রত করিবে?" অর্জ্জুনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "কে বাটীতে আছ, অতিথি উপস্থিত" বলিয়া গৃহস্থকে ডাকিতে লাগিলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আমার সৌভাগ্য যে আজ আমায় অতিথি কৃপা করিয়াছেন।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইলেন। ব্রাহ্মণ বাস্তবিক দরিদ্র এবং ভিক্ষোপজীবী। তিনি প্রত্যহ যাহা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিতেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র উপায়। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ও একটী পুত্রসন্তান ছিল। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন উপস্থিত হন, সে সময়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে যাইতেছিলেন। অতিথির নাম শ্রবণ করিবামাত্র ভোজন ত্যাগ করিয়া তাঁহার, পুত্রের এবং ব্রাহ্মণীর নিমিত্ত যে সকল অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ছিল, তৎসমুদয় অতিথিদিগকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণকুমার, সুতরাং সকলে অনাহারে রহিলেন। ভোজনান্তে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "দ্বিজবর!

আমি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, নারায়ণ আপনার মঙ্গল করিবেন,” এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “ব্রাহ্মণ! তোমার সেবায় আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি তুমি নির্ব্বংশ হও।” শ্রীকৃষ্ণের এই ভীষণ কথা শ্রবণপূর্ব্বক অর্জ্জুন শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না।

তদনন্তর তাঁহারা পুনরায় দেশ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নকালে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির রাজপ্রাসাদ-বিনিন্দিত সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর দ্বার-দেশে দ্বারবানের সমাবেশ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “বাপু! আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাদের কিঞ্চিৎ আশ্রয় দিয়া রক্ষা কর।” জনৈক দ্বারবান গম্ভীর স্বরে কহিল, “ভিক্ষা দিবার বাবুর হুকুম নাই।” শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “বাবু মহাশয়ের দ্বারে অতিথি, দ্বারবান অতিথি বিদায় করিয়া দিতেছে।” বাবুর কাণে এই কথা প্রতিধ্বনিত হইবামাত্র তিনি দ্বারবানদিগকে তাড়না করিয়া বলিলেন যে, “তোমরা উপস্থিত থাকিতে ভিখারীরা আমার বাটীর সম্মুখে আমার নাম করিয়া চীৎকার করিতে সাহস করে? তোমরা তাহাদের এতদূর প্রশ্রয় দাও?” এই কথা সমাপ্ত হইবামাত্র দ্বারবানেরা লগুড় লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সুতরাং প্রাণভয়ে ভগবান্ পলায়ন করিলেন। দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বাবু! ধনে পুত্রে তুমি পরিপূর্ণ হও।” অর্জ্জুন আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, “সখা! তোমার কথায় প্রবেশ করে কে? যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাহাদের মুখের গ্রাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনারা অনাহারে থাকিয়া আমাদের

পরিতৃপ্ত করিল, তাহাদের একমাত্র সন্তাননিধিকে তুমি কালকবলিত করিলে! তাহারা অতিথিসৎকারের এই ফল পাইল। আর যাহার দ্বারে দ্বারবান কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে হইল, তাহাকে ধন ও পুত্রাদি দ্বারা পরমানন্দিত করিলে, এ প্রকার কার্য্য তোমার নিতান্ত অসঙ্গত।" শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, "সখা! তুমি আমার কথার ভাব বুঝিতে পার নাই। ঐ ব্রাহ্মণ বিবেকী হইয়া সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দ কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞানপূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পরমানন্দে দিনযাপন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পূর্ব্ব সঙ্কল্পসূত্রে উহার একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে উহার ষোল আনা মন আমাতে ছিল, পুত্র জন্মিবার পরে চারি আনা মন উহাতে খরচ হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পুত্রের বাৎসল্য-স্নেহে আমায় ভুলিয়াছিল, যদ্যপি পুত্রটীকে উহার ক্রোড় হইতে এই সময়ে অপহৃত করিয়া না লই, তাহা হইলে ক্রমে আরও মায়া বাড়িবে, আমা হইতে আরও মন খরচ হইয়া যাইবে। উহার সন্তানটী কাড়িয়া লইয়া আমি আপনি নিজে গোপালবেশে সর্ব্বদা বাৎসল্যরসে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ডুবাইয়া রাখিব। অর্জ্জুন! এ পক্ষে দেখ, ধনীরা বিবেকী নহে। তাহারা অসৎকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তুমি জানত যে, মনের সঙ্কল্পগুণে সকলে ফল প্রাপ্ত হয়। ধনীরা চাহে ধন, চাহে পুত্র, চাহে মান, চাহে অভিমান, আমাকে তাহাই প্রদান করিতে হয়। আমি করিব কি? ধন ও পুত্রের অসারতা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক জনকে দেখাইতেছি, তথাপি তাহারা তাহাই প্রার্থনা করিবে, তাহারই জন্য আমার সাধনা করিবে, তাহারই জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া বেড়াইবে, সুতরাং আমি অনিচ্ছায় তাহাদের অসার বস্তুই প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। তাহারা বুঝিয়াও

বুঝিতে চাহে না, দেখিয়াও দেখিতে চাহে না যে, সংসারে ধন পুত্রাদি দ্বারা সুখ শান্তি হয় না, তথাপি সেই অসৎ বস্তুতে ঘুরিয়া ফিরিয়া ধাবিত হইবে। একে ত মন নাই। মন কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার নির্ণয় করা যায় না; আবার তাহার উপর নিয়ত সংকল্প উঠিতেছে। এ প্রকার অবস্থায় তাহাদের আর কি উপায় হইবে? তাহাদের উপায় নাই বলিয়া যে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, তাহা নহে। অসৎ বস্তুর অসারতা কতদূর, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য এই ধনীকে পুনরায় অসার বস্তুই দিলাম। প্রথমে সে ধনের উপর ধন সঞ্চিত হইতে দেখিয়া পুলকে পূর্ণিত হইবে, জমীদারীর পশ্চাৎ জমীদারী লাভ হইতেছে দেখিয়া স্ফীত হইতে থাকিবে, পুত্রের পরে পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি বেষ্টিত হইয়া আনন্দের প্রস্রবণস্বরূপ জ্ঞান করিবে। কিন্তু অর্জ্জুন! চাহিয়া দেখ, উহাদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে, কি দুঃখে দিনযাপন করিতে হইতেছে! একে একে বিষয় গেল, মোকর্দ্দমায় ধন-রাশি বন্যার জলের স্রোতের ন্যায় বাহির হইয়া গেল, পুত্র মরিতেছে, পৌত্র মরিতেছে, দৌহিত্র মরিতেছে, কালে সংসার সমভূমিপ্রায় হইয়া আসিল; এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে অসৎ সৎ কে? এখন বিবেক আসিবে, এখন বিবেককে আশ্রয় করিবে, এখন আমায় লাভ করিবে।"

'বাস্তবিক আমরা সকলে সেই অবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছি। আমরা পলে পলে কাঞ্চনের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রাণে প্রাণে তাহার ফলাস্বাদন করিতেছি, তথাপি বিবেকের পদাশ্রয় লইতে ইচ্ছা হয় না। নরনারী উভয় উভয়কে বিশিষ্টরূপে চিনিতেছে, তথাপি উভয়ে উভয়ের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসা দেখাইতেছে, স্বামীও স্ত্রীর ভালবাসা দেখিতেছে। যে

সময় দম্পতী একত্রিত থাকে, অনেক স্থলে ভালবাসার ক্রীড়া হয় বটে, কিন্তু তাহাদের বিচ্ছেদ হইলে আর সেই পূর্ব্বের প্রেম পূর্ব্বরূপে কার্য্য করে না। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অশৌচ সমাপ্তি না হইতে তাহার স্বামী নবানুরাগে বালিকার কর-গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণয়িনীর প্রণয় বিস্মৃতির গর্ভে নিহিত করিয়া রাখে। সেই স্ত্রীর আত্মা স্বামীর এ প্রকার কার্য্য দেখিয়া কি মনে করে? তাহার কি মনে হয় না যে, সংসারে প্রেমের লেশমাত্র নাই? স্বামী যে প্রেমের অভিনয় করিতেন, তাহা বাস্তবিক কি প্রেম, না কাম? ভালবাসা নিজ স্বার্থের নিমিত্ত, তাহা কখন প্রেমে নহে বলিয়া তাহার নিশ্চিত ধারণা হইবে। স্ত্রীর স্বামী জীবন-মরণের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া কথিত হয়, তাহার বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে যখন সে পরপুরুষ ভজনা করিতে পারে, তখন তাহার ভালবাসার মূল্য কত? স্বামীর অবর্ত্তমানে উপপতিকে যখন স্বামীর পরিচ্ছদ, স্বামীর ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরী, স্বামীর বিলাসের সামগ্রী হৃদয় খুলিয়া প্রদান করিতে পারে, তখন সে স্ত্রীতে আত্মবিক্রয় করিয়া রাখা ভ্রমের কার্য্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?

একদা জনৈক মুসলমান তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিল, "আমার মৃত্যু হইলে তুমি অবশ্যই বিবাহ করিবে। কিন্তু একটী কথা বলিতেছি, দয়া করিয়া রক্ষা করিও। আমার কবরের মাটি যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয়, অন্ততঃ সে পর্য্যন্ত কাহাকেও আলিঙ্গন করিও না।" স্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "তুমি আমাকে এমনই প্রেমহীনা ইন্দ্রিয়পরায়ণা ইতর স্ত্রীলোক ভাবিয়াছ যে, আবার পরপুরুষের মুখাবলোকন করিব? এমন হৃদয়ভেদী কথা আর মুখে আনিও না।" স্বামী পুনরায় কহিল, "সে যাহা হউক, আমার

অনুরোধটী যেন বিস্মৃত হইও না।” কিয়দ্দিন পরে ঐ মুসলমানটীর মৃত্যু হইল। মুসলমান-পত্নীর রূপে অনেকেই পূর্ব্ব হইতেই বিমোহিত ছিল, স্বামীবিহীনা হইবামাত্র চতুর্দ্দিক দিয়া সকলে পরিণয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। মুসলমান-পত্নী তখন তাহার স্বামীর কথা ভাবিয়া মনে মনে আত্মধিক্কার দিতে লাগিল। সে অতঃপর কবরের নিকট যাইয়া দেখিল যে, উহা শুষ্ক হয় নাই। একবার ভাবিল যে স্বামী মরিয়া গিয়াছে, আমি যাহাই করি না কেন, সে আর আমায় কিছুই বলিতে পারিবে না, আবার তখনি মনে হইল যে, কবরের মাটি শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিতে বার বার অনুরোধ করিয়া গিয়াছে, কথাটা লঙ্ঘন করিই বা কিরূপে? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া কবর শুষ্ক করিবার নিমিত্ত পাখার বাতাস দিতে আরম্ভ করিল। মুসলমানের আত্মা যখন তাহার স্ত্রীর এই প্রকার স্বভাব দেখিবে, তখন তাহার মনে কি হইবে না যে, হায় হায় করিয়াছিলাম কি? কোথায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম? কাহার জন্য সর্ব্বদা বিব্রত হইয়াছিলাম? কাহাকে প্রাণের উপরে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম?

স্ত্রী এবং পুরুষের এইরূপ আত্মীয়তা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমরা অনেকে সম্ভোগও করিতেছি, তথাপি বিবেক আসে না, তথাপি আপন পর জ্ঞান হয় না, তথাপি, বোধোদয় হয় না। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কেমন, স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা কেমন, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আকর্ষণ কেমন, প্রতিদিন প্রতি গৃহে আমরা অবলোকন করিতেছি, তাহাদের অভিনয় দর্শন করিতেছি, কিন্তু কেমন মহামায়ার মায়া যে, তাঁহাতেই ঘুরিয়া ফিরিয়া পতিত হইতেছি। কাঞ্চনের মোহ অতিশয় বিশাল। ধনের সর্ব্বকালই বিষময়, আনিতে ক্লেশ, আনিবার যোগ্যতা লাভ করিবার সময়ে ক্লেশ, রাখিতে ক্লেশ এবং ব্যয়কালে ক্লেশ। যাহার

যত অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহার ততই আকাঙ্ক্ষা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহার ততই বিপদের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে; যাহার যত অর্থসম্বন্ধ কমিয়া যায়, তাহার তত শান্তি লাভ হইয়া থাকে। ধনীর নিদ্রা নাই, সর্ব্বদা অর্থের নিরাপদই অনুসন্ধান করা একমাত্র ধ্যেয় বস্তু বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। কিরূপে অর্থ বৃদ্ধি হইবে, তাহার ব্যবস্থা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান থাকে। তাহারা দিন রাত শয়নে স্বপনে হায়রে পয়সা, হায়রে পয়সা বলিয়া অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

একদা জনৈক রাজচক্রবর্ত্তী বহুসংখ্যক সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া ভৈরব নিনাদে গমন করিতেছিলেন। একটী সাধু এই প্রকার জাঁকজমক দেখিয়া কোন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, এত লোকজন বাজনা বাদ্য লইয়া কে যাইতেছে?" পথিক কহিল, "সাধুজী, ইনি এই দেশের রাজা, অমুক দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হয় বন্দী, না হয় বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য এবং ধনৈশ্বর্য্য সমুদয় আত্মসাৎ করিবেন, এই নিমিত্ত সসৈন্যে গমন করিতেছেন।" সাধু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ঝুলি হইতে একটী মোহর বাহির করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সাধু আমাকে একটী মোহর উপঢৌকন দিলেন কেন? কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কর।" মন্ত্রী রাজার অভিপ্রায় সাধুকে জ্ঞাপন করিলে সাধু কহিলেন, "আমি রাজার নিকট চাহিব কি? তোমরা দেখিলে যে, আমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দান করিলাম। পাত্রাভাবে আমার নিকট এই কাঞ্চনখণ্ড বহু দিবস রহিয়াছে, ইহার ভার বহন করা অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভগবান্ আমাকে অদ্য বিমুক্ত করিলেন।" রাজা হাসিয়া কহিলেন, "লোকে বাতুল হইলে সন্ন্যাসী হয়, এই আমার ধারণা ছিল, অদ্য তাহা

প্রত্যক্ষ করিলাম।” রাজার কথা সমাপন হইতে না হইতে সাধু কহিলেন, “রাজন্! সন্ন্যাসীরা বাতুল নহে, বাতুল আপনি। কাঞ্চনের দাস হইয়া কি করিতেছেন, কোথায়, কেন যাইতেছেন? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনি কাঞ্চনের ভিখারী কি না? আপনার ন্যায় দরিদ্র আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিতেছি না। আপনি কাঞ্চনের অনুরোধে নরপতিবিশেষকে সংহার করিবেন, তাহার সংসার ছারখার করিবেন, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করিবেন; কেবল তাহা নহে, রাজন্! ভাবিয়া দেখুন, এই কার্য্যে কত নরহত্যা হইবে, শোণিতধারায় মেদিনী কলুষিত হইবে, কত নারীকে অনাথিনী করিবেন, কত দুগ্ধপোষ্য শিশুকে অনাথ পথের ভিখারী করিবেন! রাজন্! এই সকল কার্য্য করিয়া কাঞ্চন লাভ করিতে যাত্রা করিতেছেন, অতএব আপনারই কাঞ্চনের বিশেষ অভাব; আপনি দীন দরিদ্র কাঞ্চনপ্রত্যাশী, সেইজন্য আপনাকে উপযুক্ত পাত্র বিচার করিয়া আমি কাঞ্চনমুদ্রা অর্পণ করিয়াছি। এ কার্য্যে বাস্তবিক আমার বাতুলতা হয় নাই।” আজ কাল আমাদের যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিবেক অবলম্বন ব্যতীত আর কল্যাণ নাই, এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সংসারে কিরূপে বিবেকী হইতে হয়, তাহার শিক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দ তাহার একটী দৃষ্টান্তবিশেষ। মন হইতে কামিনীকাঞ্চন কিরূপে ত্যাগ করিতে হয় এবং তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা বিবেকানন্দে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং সেই বিবেককুসুমসৌরভে আজ মেদিনী আমোদিত, তাই আজ চিকাগোবাসী-বাসিনী আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন। বলিয়াছি যে, বিবেকানন্দের রূপে নহে, বিদ্যায় নহে, বক্তৃতার হিল্লোলে নহে, পরিচ্ছদে নহে, কেবল বিবেকের প্রতাপে, বিবেকের মহিমায়,

সকলে যেন কারারুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই স্থানে সৎ এবং অসৎ কাহাকে কহে, আপনারা বুঝিয়া লউন। বিবেকানন্দ কামিনী-কাঞ্চনকে পরাজিত করিয়াছে বিবেকের দ্বারা, বিবেকানন্দের সম্পত্তি কেবল বিবেক, অতএব এই বিবেকই সৎ এবং কামিনীকাঞ্চন অসৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমি বার বার বলিয়া আসিতেছি যে রামকৃষ্ণদেব বর্ত্তমানকালের পরিত্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে সমুদায় ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনঃ সংস্থাপনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ নররূপে লীলা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের নবভাব প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" বক্তৃতায় সাধ্যমত প্রকাশ করিয়াছি। তিনি এই বলিতে আসিয়াছিলেন যে, "যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, হুতাশন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজনসমক্ষে এক অদ্বিতীয়, তেমনি ভগবান্ পরিত্রাতা এক অদ্বিতীয়। ভাষাভেদে যেমন জলের ভিন্ন ভিন্ন নাম, তেমনি ভাবভেদে ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম সকলের এক, উপাস্য দেবতা সকলের এক, উদ্দেশ্য বস্তুও সকলের এক, ধর্ম্মরাজ্যের এই নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ বিধান করিবার জন্য রামকৃষ্ণদেব নিজে সাধক হইয়া সকল ধর্ম্মের এক সত্য বহির্গত করিয়া বিবাদভঞ্জন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই ভাব, রামকৃষ্ণকথিত এই নব ভাব চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। এক বিশাল চন্দ্রাতপের নিম্নে নানাবিধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক উপবেশন করা, পরস্পর সম্ভাষণ করা, পরস্পর আপনাপন মত প্রকাশ করা অভিনব দৃশ্য, তাহার ভুল নাই; কিন্তু এই দৃশ্যের অভিনয় সূচনার বীজ বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বপন করিয়া গিয়াছেন। আজ চিকাগোয় তাহার প্রকাশ দেখিয়া মনে মনে আনন্দ এবং নিরানন্দ সমুদিত হইতেছে। এই নিমিত্ত আনন্দ যে, ভাবের কি বিচিত্র খেলা! চিকাগোর ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণের উপদেশ কর্ণে শ্রবণ না করিয়া আপনাপনি সেই ভাবসঙ্গত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে এবং নিরানন্দ যে, আমরা বঙ্গবাসী কি হতভাগ্য যে, সেই রামকৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে উপদেশ শ্রবণ করিয়া অদ্যাপি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না, অদ্যাপি তাঁহার ভাবের ঘরে প্রবেশ করিতে স্পৃহা জন্মিল না। আজ নয় মাস রামকৃষ্ণদেবের কথা লইয়া আমরা আন্দোলন করিয়া আসিলাম, কিন্তু কয়জন তাহা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন? এবং কয়জন তাঁহার বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইতে চেষ্টিত হইলেন? কিন্তু দেখুন চিকাগো! রামকৃষ্ণের কতিপয় উপদেশে তাঁহারা মাতিয়া উঠিয়াছেন। দেখুন মান্দ্রাজ! রামকৃষ্ণের উপদেশে তাঁহারা কতদূর উৎসাহিত হইয়াছেন। বিবেকানন্দের চিকাগো গমনকালীন সাতসহস্র মুদ্রা তাঁহারা চাঁদা করিয়া দিয়াছেন এবং সকলে স্থির করিয়াছেন যে, বিবেকানন্দ ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের ভাব অবলম্বন করিবেন। কিন্তু দেখুন বাঙ্গলাদেশ! অদ্যাপি কেবল কামিনীকাঞ্চন লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রামকৃষ্ণকে লইয়া দূর প্রদেশস্থিত নরনারীরা আনন্দ করিতেছেন, আর বঙ্গবাসী বঙ্গবাসিনীর অন্ততঃ একবার চক্ষু মেলিয়াও কাণ্ডকারখানা দেখিতে সাধ হইতেছে না, জড়বৎ স্থির হইয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশের এ প্রকার শোচনীয়াবস্থা না হইলে এই স্থানে ভগবান্ উপর্য্যুপরি অবতীর্ণ হইবেন কেন? বোম্বাই সহরও নবভাবের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, তথায় যদিও রামকৃষ্ণের নিত্য পূজা, সাময়িক উৎসবাদি হইতেছে ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি সরকারী

অহিফেন সভায় বোম্বাই সহরের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভ্য হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের কতিপয় ভক্তদিগকে দর্শন করিতে স্থানে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এমন কি বিবেকানন্দের মাতাকে পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া আনন্দিত হন।

তাই বলিতেছি, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম যে রামকৃষ্ণ নাম, রামকৃষ্ণদেব সেই নামের রূপ জানিবেন। যখন যে নরপতির রাজ্য হয়, তখন তাঁহারই হুকুম প্রবল হইয়া থাকে। সেই প্রকার যখন যিনি যে ভাবে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে সেই ভাবেই সকলে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ নব অবতার, তাঁহার ভাব নূতন, এই নূতন ভাবে যে পর্য্যন্ত কেহ দীক্ষিত না হইবেন, সে পর্য্যন্ত বাস্তবিক কল্যাণ হইবে না। যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভাব জ্ঞাত হইতে হইলে কৃষ্ণকে অবলম্বন করা বিধেয়, শ্রীরামের ভাবের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিতে হয়, আম্র ফল আমগাছে, গোলাপজাম গোলাপজাম-গাছে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই-রূপ রামকৃষ্ণদেবের ভাব লাভ করিতে হইলে রামকৃষ্ণকে অবলম্বন না করিলে কোন মতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, এখনও সময় আছে, এই বেলা রামকৃষ্ণ নাম সকলে আশ্রয় করুন।

রামকৃষ্ণ নাম আশ্রয় করিতে যদিও উপর্য্যুপরি অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, তাহা হইলে তাঁহাদের গুরুমন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণের ভাবের তাহা তাৎপর্য্য নহে। রামকৃষ্ণ নামে সকলে নিজ নিজ ভাবেই প্রবেশ করিতে পারিবেন, আপন আপন ইষ্টদর্শন পাইবেন, সকলের এক ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, সকলের সহিত বিবাদ মিটিবে ও দ্বেষাদ্বেষীর ভাব একেবারে উঠিয়া যাইবে। আর কেহ কাহার ভাবের প্রতি অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না,

আর কেহ কাহার ভাব লইয়া আন্দোলন করিতে পারিবেন না, আর কেহ কাহারও ভাবের ইতরবিশেষ করিতে পারিবেন না, আর কেহ কাহার ভাবের দোষ বাহির করিতে যত্নবান হইবেন না। রামকৃষ্ণ নামের গুণে সকলেরই আত্মজ্ঞান হইবে, তখন সকলে আপনার নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে কৃতকার্য্য হইবেন, তখন সকলে বিবেকের কার্য্য করিতে সামর্থ্য লাভ করিবেন, তখন সকলে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবেন যে, সেই নিত্য সত্য পরম পদার্থ ই একমাত্র সৎপদবাচ্য, তাঁহার পদাশ্রয় ভিন্ন শান্তি সুখের মুখাবলোকন করিবার উপায় নাই। সৎএর সহায় ভিন্ন অসতের বিলয়প্রাপ্ত হইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। দিনমণির দরশন ভিন্ন যেমন যামিনীর তমোরাশি যাইতে পারে না—তাহা তিরোহিত করিবার অন্য ব্যবস্থা নাই, তেমনি মানসক্ষেত্রে সত্যালোক প্রতিফলিত না হইলে অসত্যের ঘোর কস্মিন্‌কালে কাটিতে পারে না। বর্ত্তমানকালে রামকৃষ্ণ নামের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন জীবের বিবেক বিকশিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অনেকে বলিবেন, আমরা কেন রামকৃষ্ণ নাম লইব? বিবেক কি অন্য উপায়ে হইতে পারে না? না অন্য উপায় নাই? তাঁহাদিগের উত্তরে বলিতে হয়, উপায় থাকিলে আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন? কোথায় বিবেকের শিক্ষা হইতেছে? কোথায় বিবেকের দৃষ্টান্ত? কে কামিনীকাঞ্চনের অসত্যতা নিরূপণ করিয়া দিতেছেন?—রামকৃষ্ণদেব তাহা দেখাইয়াছেন, অদ্যাপি দেখাইতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে বিবেক একমাত্র দ্বারস্বরূপ, সেই বিবেকদ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের এক্ষণে ধর্ম্মালোচনা হইয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে কে পারে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই বিবেকরূপ পথ প্রাপ্ত

হইবার নিমিত্ত রামকৃষ্ণের সহায়তা বর্ত্তমানকালে একমাত্র উপায় জানিবেন।

রামকৃষ্ণদেব যে সাধারণ মনুষ্য নহেন, সে বিষয়ে যাহার অদ্যাপি ভ্রম আছে, তাহার অদৃষ্ট নিতান্ত বিরূপ বলিতে হইবে। চক্ষে দেখিতেছি যে, রামকৃষ্ণ নামে পৃথিবী প্রায় পরিপূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে; আমি অনুমান করি, আর দশ বৎসরের মধ্যে রামকৃষ্ণ নামে সমগ্র ধর্ম্মানুরাগী জনপদ একাকার হইবে, প্রত্যেক ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মধুর রামকৃষ্ণ নামে বিভোর হইয়া বিবেকের বিমল ছায়ায় উপবেশন করিবে, প্রত্যেক ...নী মহিলা অমৃতবৎ রামকৃষ্ণ নামে হৃদয়ে অমৃতধারা প্রাপ্ত হইয়া জীবনে অমৃত লাভ করিবে, প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক নরনারী রামকৃষ্ণ নামে সাম্প্রদায়িক প্রাচীরাবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকৃত প্রেমনিকেতন প্রাপ্ত হইবেন।

বিবেক ব্যতীত সৎবস্তু উপলব্ধি হয় না, তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। চিকাগো প্রভৃতি সভ্যতম দেশের লোকেরা সম্প্রতি যে সত্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কারণ কোথায়?—বিবেকানন্দ। যেহেতু বিবেকানন্দ দ্বারস্বরূপ হইয়া চিকাগোর নরনারীদিগের হৃদয়ে সৎস্বরূপ রামকৃষ্ণদেবের ভাব প্রদান করিয়াছে। অতএব বিবেকই সত্যলাভের একমাত্র উপায়। অতএব আর বৃথা দিন ক্ষেপন না করিয়া যাহাতে আমরা সকলে বিবেক ও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সদসৎএর তাৎপর্য্য বাহির করিতে পারি, এরূপ আয়োজন করা কর্ত্তব্য। কামিনীকাঞ্চনের দাসত্বকার্য্যে আর কতদিন বিনষ্ট করিব! একদিন ঐ দিনের অবসান হইবে, তখন আর কেহ কাহার সহায়তা করিতে পারিব না, আর কোন উপায় হইবে না, তখন বাস্তবিক নিজ নিজ কার্য্যের নিমিত্ত আপনাদিগকেই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

রামকৃষ্ণের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে তুরন্ত কামিনীকাঞ্চন আর ভ্রমে ফেলিতে পারিবে না। আর তাহারা নিজ নিজ কুহকমন্ত্রে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। একথা আমরা নিজ নিজ জীবনে জানি। যে কামিনীকাঞ্চনের ইঙ্গিতে আমরা একদিন পরিচালিত হইয়াছি, রামকৃষ্ণের শরণাপন্নকাল হইতে সেই কামিনীকাঞ্চনের বক্ষঃস্থল দিয়া স্বচ্ছন্দে যাইতে পারি; তাহা আত্মগরিমা নহে, রামকৃষ্ণ নামের গৌরব এবং মহিমা। তাঁহার আশ্রয় লইলে কি হয় বা না হয়, তাহা প্রত্যক্ষ সম্ভোগের বিষয়। বর্ণনায় সম্যকরূপে প্রকাশ করা যারপরনাই সাধ্যাতীত ব্যাপার।

গীত

(১)

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় ওহে ভগবান্।
এ দীনে, সাধনহীনে, সদাই দহে অভিমান॥
না জানি স্তুতি ভকতি, কোথা অগতির গতি,
রামকৃষ্ণ হে;—
রাঙ্গা পায়ের ছায়া দিয়ে শীতল কর তাপিত প্রাণ॥
রিপুছয় ঘুরে ফিরে, আমারে পাগল করে,
কোথায় আছ হে;—
তুমি না রাখিলে নাথ, কে আর করে পরিত্রাণ॥

(২)

ভাব্‌চো কি মন, মায়া ঘোরে।
দিন গেল, নিশি এল, শমন খাড়া শিয়রে ॥
জননীর কোলে ছিলে, মা ব'লে দিন কাটালে,
পরে রমণীর কলে হৃদয় হারালে ;—
ধন পুত্র দারা আদি, কেউত নয় সাথের সাথী
তুমি সিঙ্গা ফুঁক্‌লে যদি, গোবর দেবে সদোর দোরে ॥
দুনিয়ার ইয়ার মিলে, বল কত মজা পেলে,
জাননা সময় কালে কেউ চা'বেনা ফিরে :—
ছাড় সব ফাঁকির বন্ধু, ডাক সেই কৃপাসিন্ধু,
রামকৃষ্ণ দীনবন্ধু যত্নে রাখ হৃদ্‌মাঝারে ॥

(৩)

এখন সময় আছে কর সে মধুর নাম।
প্রাণ ভরে একস্বরে বল রামকৃষ্ণ নাম ॥
একে একে দিন গেল, কিবা ছিল কিবা হ'ল,
কেন আর মিছে ভোল, বল রামকৃষ্ণ নাম ;—
দেখেছ কি দেখিবে কি, দেখিলে ত সকল ফাঁকি,
আখেরের পথ খরচ বাকী, বল রামকৃষ্ণ নাম ॥
বেঁধোনা আর ভ্রমের টাটি, এখন মন কর খাঁটি,
দিনান্তরে হবে মাটি, বল রামকৃষ্ণ নাম ;—
জপ রামকৃষ্ণ নাম ভজ রামকৃষ্ণ নাম,
কহ রামকৃষ্ণ নাম, চলে যাও অনন্তধাম,
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে ভাই অবিরাম ॥

(৪)

মধুর নামে প্রাণ করে শীতল।
নাই ভবে জীবের আর ত সম্বল ॥
যে নামে পাতকী তরে, ভাসে শিলা সিন্ধুনীরে,
ভব পারের ভরসা কেবল ;—
পাষাণ মানবী হেরি স্বর্ণময় জীর্ণতরী,
পরশি সে চরণ কমল ;—
নামে পূরে আশা, না হয় বিফল ॥
চরণে সঁপিয়ে প্রাণ কর দুঃখ অবসান,
হও সবে আনন্দে বিহ্বল ;—
রামকৃষ্ণ নামে কর জনম সফল ॥

নবম বক্তৃতা সম্পূর্ণ।

সম্পূর্ণ।